খোলাফায়ে রাশেদীন

জীবন ও কর্ম

মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন

দারুস সালাম বাংলাদেশ

খোলাফায়ে রাশেদীন
জীবন ও কর্ম

গ্রন্থনা-সম্পাদনা

মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন

গবেষণায় উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
বি.এ অনার্স, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট (ফ্যাকাল্টি ফার্স্ট)
ইউজিসি মেরিট স্কলারশিপ-২০১৫, প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত
এম.এ, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট (ফ্যাকাল্টি ফার্স্ট),
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
এম.ফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

দারুস সালাম বাংলাদেশ
কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক প্রকাশনা
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯
E-mail: darussalambangladesh@gmail.com

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا۔

"হে আমার রব, তাদের (মাতা-পিতা) প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন।"

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا
قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا۔

"হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন।"

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আল হামদু লিল্লাহি রাব্বির আলামীন, ওয়াস্ সালাতু ওয়াস সালামু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ (সা.)

মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর খোলাফায়ে রাশেদীগণ ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তারা ইসলামকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও ভণ্ডনবীদের দমনের মাধ্যমে ইসলামী খিলাফত অক্ষুণ্ন রখেছেন। হযরত ওমর (রা.) প্রায় অর্ধ পৃথিবীতে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। জামেউল কুরআন হিসেবে পরিচিত হযরত উসমান (রা.) সুদীর্ঘ সময় ইসলামী রাষ্ট্রে ন্যায় ও শান্তির শাসন কায়েম করেছেন। হযরত আলী (রা.) ওসমান হত্যার বিচারের দাবীতে উত্তাল মুসলিম মিল্লাতকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। পরবর্তীতে খিলাফতের স্থলে রাজতন্ত্র চালু হয়। হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.) পুণরায় ইসলামি খিলাফতের শাসন ফিরিয়ে আনেন। তাই তাঁকে ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলা হয়। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেখানো পথ অনুসরণ করে খোলাফায়ে রাশেদীনেরা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তাদের সুদীর্ঘ জীবনে রয়েছে নানা শিক্ষণীয় ঘটনা, যা আমাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। সুতরাং আজকের এ সমাজে শান্তি

প্রতিষ্ঠা করতে হলে খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। তাদের আদর্শ অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য। রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের উচিত আমার সুন্নাত অনুসরণ করা এবং সুপথপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাত অনুসরণ করা' (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪২)।

রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণে পরবর্তী চার খলিফা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, তাই তাদের শাসনামলকে 'খিলাফাত আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ' বা 'আল খিলাফাতুর রাশিদা' বলা হয়। এ গ্রন্থে ইসলামের চার খলিফাসহ নবী দৌহিত্র হাসান-হোসাইন (রা.) এবং পঞ্চম খলিফা হিসেবে স্বীকৃত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রহ.)-এর জীবনে ঘটে যাওয়া মহামূল্যবান ঘটনাবলি সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। যে ঘটনাগুলো কোনো ব্যক্তির জীবনকে সুন্দর করে সাজানোর ক্ষেত্রে পরশ পাথরের মতো কাজ করবে। এসকল জীবনকাল মূল্যায়ন করলে ইসলাম ও বিশ্বমানবতার একজন সত্যনিষ্ঠ সেবক এবং ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গকারী এক মহামানবের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠে।

এ গ্রন্থ সংকলনে ইসলামী চিন্তাবিদগণের লিখনী নানাভাবে আমাকে উপকৃত করেছে। তাদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

পাঠক সমাজের যেকোনো ইতিবাচক সমালোচনা সাদরে গৃহিত হবে। এ গ্রন্থের সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা প্রার্থনা করে মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের মাগফিরাত কামনা করছি।

মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন

১৫.০১.২০৮

সূচিপত্র

অধ্যায়-৪ : খিলাফত লাভের পূর্বে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মদীনা জীবন

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

অধ্যায়-৩ : খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

অধ্যায়-৫ : ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও শেষ জীবন

উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

অধ্যায়-১ : উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যক্তিগত জীবন

অধ্যায়-৬ : উসমান (রা)-এর রাজ্যবিস্তার

অধ্যায়-৭ : কুরআন সংকলন ও উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

অধ্যায়-৮ : উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব

অধ্যায়-৯ : খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাহাদতের কারণ ও ঘটনাপ্রবাহ

অধ্যায়-১০ : উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর শাহাদত

আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

অধ্যায়-১ : আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বাল্যকাল

অধ্যায়-২ : আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মাক্কীজীবন

অধ্যায়-৩ : আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মদিনা জীবন

অধ্যায়-৪ : পূর্ববর্তী খলিফাদের শাসনামলে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

অধ্যায়-৮ : আলী-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা

অধ্যায়-৯ : আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পারিবারিক জীবন

ইসলামের পঞ্চম খলিফা

ওমর বিন আব্দুল আজীজ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

খোলাফায়ে রাশেদীন

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইসলামি শরীয়া মোতাবেক একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীকালে তাঁর ওফাতের পর খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক অনুসৃত হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে মুসলিম জাহানে খিলাফত সূচনা হয়। এরপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হন। খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনকাল ছিল মোট ত্রিশ বছর।

আরবি خُلَفَاءُ খোলাফা শব্দটি خَلِيْفَةٌ (খলিফা) শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ খলিফা, নেতা, ইমাম, প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত; অন্যের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত। আর رَاشِدِيْنَ (রাশেদীন) শব্দটি رَاشِدٌ (রাশেদীন) শব্দের বহুবচন। যার অর্থ সৎপথ প্রদর্শন করা। যেহেতু رَاشِدِيْنَ (রাশেদীন) শব্দটি বহুবচন। তাই এর অর্থ হবে সৎপথ প্রদর্শনকারিগণ। সুতরাং خُلَفَاءُ الرَّاشِدِيْنَ (খোলাফাউর রাশেদীন) অর্থ হচ্ছে, 'সৎপথ প্রদর্শনকারী প্রতিনিধিগণ। বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর যে চারজন প্রধান সাহাবি ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন, ইতিহাসে তাঁদেরকেই "খোলাফায়ে রাশেদীন" নামে অভিহিত করা হয় এবং তাঁদের পরিচালিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকেই বলা হয় 'খিলাফতে রাশেদা'।[১]

পবিত্র কুরআনের ভাষায় প্রত্যেক মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা; কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহর নেতাকে খলিফা বলা হয়। এ খিলাফত হচ্ছে মিনহাজুন্ নবুওয়াত বা নবুওয়াতের পদ্ধতি। ব্যাপকার্থে খিলাফত হচ্ছে ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইসলামের সরকার পদ্ধতিকে খিলাফত বলা হয়। ইসলামি জীবনব্যবস্থার পরিপূর্ণ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন হয়েছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে। আর তাঁদের ত্রিশ বছরের (৬৩২-৬৬১ খ্রি:) খিলাফত কালই ছিল

---

[১] মওলানা আব্দুল রহীম, খিলাফতে রাশেদা, (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪), পৃ. ২৯।

ইসলামি শাসনব্যবস্থার সোনালি যুগ। মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম আদম (আ.)কে পৃথিবীর খিলাফত দান করেছিলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যেও এ খিলাফত পুরুষানুক্রমে চলতে থাকে– যা বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ -এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। মুসলমানদের জনমতের ভিত্তিতে তাদের যে নেতা নির্বাচিত হন, তাঁকে ইমাম বা খলিফা বলে। তিনি পৃথিবীতে আল্লাহর নবীর প্রতিনিধি এবং মুসলমানদের নেতা।

খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতকাল

মুহাম্মদ ﷺ–এর ইন্তেকালের পর যে চারজন বিশিষ্ট সাহাবি আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী ইসলামি রাষ্ট্রের শাসনকার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে গেছেন, তাঁরা খোলাফায়ে রাশেদীন নামে পরিচিত। তাঁরা হলেন–

১. আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খিলাফতকাল ১১ হিজরী, ১৩ রবিউল আউয়াল থেকে ১৩ হিজরী, ২২ জমাদিউস্‌সানী (৬৩২ - ৬৩৪ খ্রি.)

২. ওমর ফারূক (রা.)-এর খিলাফতকাল ১৩ হিজরী, ২২ জমাদিউস্‌সানী থেকে ২৩ হিজরী, ২৭ জিলহজ্জ (৬৩৪ - ৬৪৪ খ্রি.)

৩. উসমান (রা.)-এর খিলাফতকাল ২৩ হিজরী, ৩০ জিলহজ থেকে ৩৫ হিজরী, ১৮ জিলহজ (৬৪৪ - ৬৫৬ খ্রি.)

৪. আলী (রা.)-এর খিলাফতকাল ৩৫ হিজরী, ১৯ জিলহজ থেকে ৪০ হিজরী, ২১ রমযান (৬৫৬ - ৬৬১খ্রি.)

মহানবী ﷺ এ খিলাফতের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে– "তোমাদের ওপর আমার আদর্শের অনুসরণ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের অনুসরণ অত্যাবশ্যক।" খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফতকাল সম্পর্কে সাধারণ বক্তব্য হলো- এ সময়সীমা ছিল ৩০ বছর। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ.

সাফিনা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "খিলাফত ত্রিশ বছর স্থায়ী হবে, এরপর মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করবেন।"[১]

---

[১] ইমাম আবু দাউদ, আস সুনান, হাদিস নং : ৪৬৪৬

এ হাদিসের তাৎপর্য এই যে, ন্যায়ের শাসন তো খোলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে থাকবে আর এ শুধু ত্রিশ বছর স্থায়ী হবে। এরপর, রাজতন্ত্র কায়েম হবে। বাস্তবিকই তাই হয়েছে। আবু সাঈদ সাফিনা থেকে এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, আবু বকর দুই বছর, ওমর দশ বছর, উসমান বারো বছর ও আলী ছয় বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং এই ত্রিশ বছর পর মারওয়ানী রাজত্ব কায়েম হয়ে যায়। বিশিষ্ট উলামারা ইমাম হাসান ছয় মাসের খিলাফতকে এই ত্রিশ বছরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কেননা, আলী ও উসমানের খিলাফত কয়েক মাস কম ছিল। আর পুরো ত্রিশ বছর হয় হাসান -এর ছয় মাস সময় মেলানোর পর। এরপর স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র কায়েম হয়।

অন্য হাদিসের হুজাইফা হতে উদ্ধৃত করেছেন, রাসূল বলেন, "তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত ঐ পর্যন্ত থাকবে যে পর্যন্ত মহান আল্লাহ চাইবেন। তারপর তিনি নবুওয়াত উঠিয়ে নেবেন। তারপর নবুওয়াতের পর খিলাফত নবুওয়াতের নিয়মে চলবে, যতদিন মহান আল্লাহ চাইবেন। তারপর মহান আল্লাহ খিলাফতও উঠিয়ে নেবেন। তারপর স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র কায়েম হবে, যতদিন মহান আল্লাহ চাইবেন। তারপর এই স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্রও উঠিয়ে নেবেন। তারপর, পুনরায় খিলাফত কায়েম হবে নবুওয়াতের পদ্ধতিতে। এরপর তিনি নীরব হয়ে গেলেন।"[৩]

[৩] বাইহাকী, দলাইলুন নবুওয়াত।

মুহাদ্দিসে কিরামের মতে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্য হলো ওমর বিন আব্দুল আজীজ। যেমনটি এই হাদিস রাবীদের মধ্য থেকে হুবাইব নামক রাবী তাৎপর্য বর্ণনা করেন। এমনকি, এই হাদিস ওমর বিন আব্দুল আজীজকে লিখে পাঠিয়ে দেন এবং লেখেন এই ভবিষ্যদ্বাণী আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। খিলাফতে রাশিদার পর কয়েকটি স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র কায়েমের কথা আছে যা খুব কঠিন হবে। এরপর খিলাফতের নিয়ম কায়েম হবে। এই নিয়মে খিলাফতের তাৎপর্য হলো ওমর বিন আব্দুল আজীজের শাসন। মহান আল্লাহই ভালো জানেন। এছাড়াও এমনটিও হতে পারে যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী ইমাম মাহদি (আ.)-এর ওপর প্রযোজ্য।

খোলাফায়ে রাশেদীনের উপাধি

আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর এক ব্যক্তি তাঁকে 'হে আল্লাহ্‌র খলিফা' বলে সম্বোধন করলে তিনি সাথে সাথে বলে উঠলেন, 'আমি আল্লাহ্‌র খলিফা নই, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলের খলিফা'। এভাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা নির্বাচনের পর তাঁকে 'খলিফায়ে রাসূল' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পর ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা নিযুক্ত হলে তিনি নিজে 'খলিফায়ে রাসূল'-'রাসূলের খলিফা' নামে অভিহিত হতে সম্মত হলেন না। এ বিষয়ে সমাজের লোকদের সাথে পরামর্শ করা হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি 'আমিরুল মু'মিনীন'- 'মুসলিম জনগণের রাষ্ট্রনেতা ও পরিচালক' সম্বোধনে সম্মত হলেন। পরবর্তী খলিফাদ্বয়ও এই সম্বোধনেই ভূষিত হয়েছেন। 'খলিফা' শব্দে অভিহিত হতে তাঁরা রাজি হননি এজন্য যে, এটা মেনে নিলে পরবর্তী খলিফার সম্বোধনে এ শব্দটির পুনরাবৃত্তি ঘটত তিনবার কিংবা ততোধিকবার আর এটা অত্যন্ত বিদঘুটে, অশ্রুতি মধুর, অমার্জিত এবং নিতান্তই অশোভন হয়ে পড়ত।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর 'খলিফায়ে রাসূল' উপাধিতে ভূষিত হওয়ার পরিবর্তে 'আমিরুল মু'মিনীন' নামে সম্বোধিত হতে সম্মত হওয়ার মূলে আরো একটি কারণ নিহিত ছিল। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন বলেছিলেন, আমি আল্লাহ্‌র খলিফা নই, আল্লাহ্‌র রাসূলের খলিফা', তখন শব্দটি আভিধানিক অর্থে (স্থলাভিষিক্ত) ব্যবহৃত হয়েছিল এবং লোকদেরকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়াই তাঁর একমাত্র মর্যাদা। এ কারণেই দ্বিতীয় খলিফা 'খলিফায়ে রাসূল' উপাধি গ্রহণের পরিবর্তে সম্পূর্ণ নতুন এবং দায়িত্ব ও পদমর্যাদার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ উপাধি 'আমিরুল মু'মিনীন' গ্রহণ করাই সমীচীন মনে করেছিলেন।[৪]

---

৪ মওলানা আব্দুল রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৭।

খোলাফায়ে রাশেদীন বলার কারণ

খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন এবং তাঁদের ত্রিশ বছরের খিলাফত যুগের নজিরবিহীন কৃতিত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তাঁদের খিলাফত যুগই খিলাফতে রাশেদীন হওয়ার যোগ্য। যেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে খিলাফত কালকে খিলাফতে রাশেদার যুগ বা খিলাফতে রাশেদীন বলা হয় তা নিচে তুলে ধরা হলো।

১. মহানবীর প্রতিনিধি : খোলাফায়ে রাশেদীনগণ মহানবী ﷺ-এর খলিফা হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। রাসূল ﷺ মদিনায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা ছিল ইসলামি রাষ্ট্র । খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে উক্ত শিশু রাষ্ট্র পূর্ণতা লাভ করে। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বিশ্বনবীর পবিত্র আদর্শ উজ্জ্বল অনির্বাণ প্রদীপে পরিণত হয়েছিল এবং সমগ্র পরিমণ্ডলকে এটি নির্মল আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত করে রেখেছিল। খলিফাদের প্রতিটি কাজ ও চিন্তায় এর গভীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। চারজন খলিফাই বিশ্বনবীর প্রিয়পাত্র, বন্ধু ও বিশিষ্ট সহকর্মী ছিলেন। অন্যান্য সাহাবিদের তুলনায় রাসূলের সাহচর্য এরাই সর্বাধিক লাভ করেছিলেন। এরা ছিলেন রাসূল ﷺ-এর বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত এবং তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত প্রাণ।[৫]

২. খলিফাদের সহজ-সরল জীবনযাপন : খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে খলিফাদের জীবনযাপন ছিল সাধারণ ও অনাড়ম্বর। খলিফাগণ মসজিদে বসেই রাজকার্য পরিচালনা করতেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে রাজকীয় জাঁক-জমক ও শান-শওকতের কোনো স্থান ছিল না। সাধারণ নাগরিকদের ন্যায় অতি সাধারণ ছিল খলিফাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন। তাঁরা প্রকাশ্য রাজপথে একাকী চলাফেরা করতেন; কোনো দেহরক্ষী তো দূরের কথা, নামেমাত্র পাহারাদারও ছিল না। প্রতিটি মানুষই অবাধে খলিফার নিকট উপস্থিত হতে পারত। তাদের ঘরবাড়ি ও সাজ-সরঞ্জাম ছিল সাধারণ পর্যায়ের।[৬]

৩. কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে আইন রচনা ও প্রয়োগ : খোলাফায়ে রাশেদীনগণ ইসলামি আইনের উৎস তথা কুরআন, হাদিস ও ইজমার ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। যে বিষয়ে তাতে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যেত না, সে বিষয়ে ইজতিহাদ পদ্ধতিতে রাসূলের আমলের বাস্তব দৃষ্টান্ত ও

---

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-৪১

অনুরূপ ঘটনাবলির সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এর সমাধান বের করা হতো এবং এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে পারদর্শী প্রতিটি নাগরিকেরই মতামত প্রকাশের সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল। কোনো বিষয়ে সকলের মতৈক্যের সমাধান হলেই, সে সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। আর কোনো বিষয়ে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হলে খলিফা কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে নিজস্ব রায় অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশ করতেন এবং তদনুযায়ী কার্য সম্পাদন করতেন। খলিফাগণ আইনের উর্ধ্বে ছিলেন না। তাঁদের শাসনামলে সকলের জন্য আইন সমভাবে প্রযোজ্য ছিল।

৪. পরামর্শভিত্তিক শাসন পরিচালনা : খোলাফায়ে রাশেদীনগণ ছিলেন প্রশাসনিক সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। শূরা বা উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করে তাঁরা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ইবনে খালদুনের মতে, "খিলাফত হচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠান যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে।" সে কারণে খলিফার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সাধারণভাবে রাষ্ট্রনীতি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা। কেবল আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করাই ছিল তার কাজ। শরীয়তের আইনকে বাস্তবায়ন করাই ছিল তাঁদের কর্তব্য। খোলাফায়ে রাশেদীন অধিকাংশ ব্যাপারেই দায়িত্বশীল সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করতেন।[৭]

৫. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা : খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বিদ্যমান দুইপক্ষের মধ্যে ইনসাফ বা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা খলিফার অন্যতম দায়িত্ব মনে করা হতো। এজন্য প্রথম দিকে তাঁরা প্রায় সব বিচারকার্য নিজেরাই সম্পন্ন করতেন। অবশ্য দূরবর্তী স্থানসমূহের জন্য নিজেদের পক্ষ হতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেন। প্রথম খলিফার আমলে প্রত্যেক শহরের জন্য নিযুক্ত শাসনকর্তাই বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। কিন্তু দ্বিতীয় খলিফা বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করেছিলেন। এজন্য প্রত্যেক শহরেই স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন বিচারপতি বা কাজী নিয়োগ করা হয়েছিল। বিচার বিভাগ প্রশাসন বিভাগের কর্তৃত্ব হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। বিচারপতি সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। খলিফার পক্ষ হতে তাঁদেরকে এ নির্দেশ দেওয়া হতো যে, তারা বিচারে যে রায়ই দিবেন, তা যেন সর্বতোভাবে কুরআন ও সুন্নাতে-রাসূলের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার শাসনকর্তা বিচারপতির ওপর কোনো প্রকার প্রভাববিস্তার কিংবা প্রভুত্ব খাটাতে পারতেন না।

---

[৭] মওলানা আব্দুল রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

৬. গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি। তাঁর কোনো পুত্রসন্তানও তাঁর ইন্তেকালের সময়ে জীবিত ছিলেন না। এ কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্য থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচনের ব্যবস্থা চালু হয়। খলিফাগণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হতেন। তবে সে নির্বাচন পদ্ধতি আধুনিককালের ন্যায় ছিল না। খোলাফায়ে রাশেদীনের খলিফাগণ যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। সে যুগের নির্বাচন পদ্ধতি ছিল দুটি। একটি হলো সরাসরি নির্বাচন যেমন– আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু প্রথম খলিফা হিসেবে জনগণের সরাসরি সমর্থনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। অপরটি হলো নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক মনোনয়ন দান। উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, শিক্ষিত, ন্যায়বান, আদর্শবান কয়েকজন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে খলিফাগণ তাঁদের মৃত্যুর পূর্বে একটি নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করতেন। খলিফার মৃত্যুর পর তাঁরা পরবর্তী যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য থেকে খলিফা নির্বাচন করতেন। এ পদ্ধতিতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। আদর্শ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী একজন আল্লাহভীরু, সৎ, যোগ্য, পদের প্রতি লোভহীন, সাহসী, কর্মঠ, বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করতেন। সকলে তাঁর হাতে হাত রেখে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতেন।
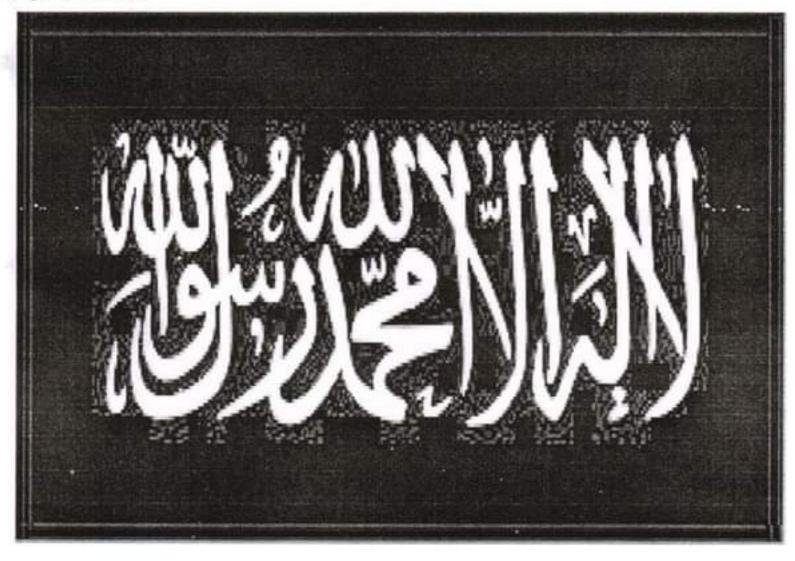
৭. খলিফাদের বেতন-ভাতা : খোলাফায়ে রাশেদীনের খলিফাদের কোনো বেতন দেওয়া হতো না। তাঁদের সরকারি অর্থে বা বাইতুল মালে তাঁদের কোনো প্রকার দাবি ছিল না। সাধারণ নাগরিকের মতো সরকারি ভাতা গ্রহণ করে তাঁরা সরকার পরিচালনার কাজ করতেন। অবশ্য তাঁদের অনেকেই এ ভাতা মৃত্যুর আগে নিজ সম্পত্তি থেকে বাইতুল মালে ফেরত দিয়ে গেছেন।

৮. বায়তুল মালের সুষ্ঠু বন্টন : খোলাফায়ে রাশেদীন বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডারকে জাতীয় সম্পদ ও আমানতের ধন মনে করতেন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মঞ্জুরী ব্যতীত নিজের জন্য কোনো অর্থ কেউ খরচ করতে পারতেন না। এছাড়া নিজেদের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যও তারা নিজেদের ক্ষমতা ও পদাধিকার বলে বায়তুল মাল হতে কিছুই ব্যয় করতেন না।[৮]

সর্বোপরি, ইসলামের ইতিহাসে খোলাফায়ে রাশেদীনের রাজত্বকাল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম চারজন খলিফার দীর্ঘ ৩০ বছর ছিল সত্যিকার খিলাফতে রাশেদার যুগ। তাঁদের যুগে ইসলাম পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন হয়েছিল। তাঁদের যুগ সকল যুগের জন্য আদর্শস্বরূপ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেন- "আমার ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ তোমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।"

---

[৮] মওলানা আব্দুল রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

আবু বকর আস সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

[খিলাফতকাল : ১১ হিজরী, ১৩ রবিউল আউয়াল থেকে ১৩ হিজরী, ২২ জমাদিউস্‌সানী]

অধ্যায়-১

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর পারিবারিক জীবন

নাম ও উপনাম

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর প্রকৃত নাম 'আব্দুল্লাহ'।[১] এর অর্থ আল্লাহর বান্দাহ। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ নাম রাখেন। ইবনু সীরীন ও 'আবদুর রাহমান ইবনুল কাসিম (রহ.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত, তাঁর নাম হলো 'আতীক। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, 'আতীক তাঁর নাম নয়; বরং উপাধি।[২]

ইসলামপূর্ব-যুগে তাঁর নাম ছিল আব্দুল কা'বা।[৩] বর্ণিত রয়েছে যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর মাতা ছিলেন মৃতবৎসা। তাই তিনি মানত করেছিলেন, যদি আমার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে জীবিত থাকে, তবে তার নাম রাখব 'আবদুল কা'বা (অর্থাৎ কা'বার বান্দাহ) এবং তাকে কা'বা ঘরের খিদমতের জন্য উৎসর্গ করে দেব। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জন্ম লাভ করার পর তাঁর মাতা তাঁর নাম রাখেন 'আবদুল কা'বা এবং তাঁকে কা'বা শরীফের খিদমতের কাজে উৎসর্গ করে দিলেন। দীন ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ মুশরিকী নাম পরিবর্তন করে তাঁর নাম রাখলেন 'আবদুল্লাহ। এটিই অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত।[৪]

কারো কারো মতে, তাঁর পিতা তাঁর নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ। কিন্তু তাঁর মা তাঁকে 'আবদুল কা'বা বলে ডাকতো। আবার কারো কারো মতে, তাঁর পিতামাতাই তাঁর নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা থেকে এরূপ রিওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, إِنَّ اِسْمَهُ الَّذِىْ سَمَّاهُ بِهٖ اَهْلُهُ لَعَبْدُ اللهِ "তাঁর পরিবারই তাঁর নাম রাখেন 'আবদুল্লাহ।"[৫]

---

[১] তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলুক, খ. ২, পৃ. ২১৮

[২] সুয়ূতী, তারীখুল খুলাফা, খ. পৃ. ১১

[৩] ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ. ২. পৃ. ১৩৮

[৪] 'আবদুল হালিম, সিদ্দীকে আকবর আবু বকর (রা.), পৃ. ৩-৪

[৫] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৩, পৃ. ১৭০

উপনাম (কুনিয়াত) আবু বকর। জাহিলী যুগ থেকেই এ উপনামে তিনি সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। 'বক্‌র' শব্দের অর্থ অগ্রবর্তী হওয়া (التقدم)। আল্লামা যামাখ্‌শারী (রহ.) বলেন, অনুপম স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী এবং যেকোনো মহৎ কাজে অগ্রগামী হবার কারণেই তাঁকে আবু বকর বলা হতো।[৬] কারো কারো মতে– উটের দেখাশুনা ও সেবা-পরিচর্যার কাজে সুদক্ষ ছিলেন বলে তিনি সর্বসাধারণের কাছে 'আবু বকর' নামে খ্যাতি লাভ করেন।[৭]

উপাধি

তাঁর বহু উপাধি ছিল, যা তাঁর উচ্চ মর্যাদা, সত্যনিষ্ঠতা ও আভিজাত্যের প্রমাণ বহন করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– আল-আতীক, আছ-সিদ্দিক, আল-আওয়াহ, আল-আতকা, সাহিবু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খলিফাতু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

১. আল-আতীক : আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি উপাধি ছিল আল-আতীক। আতীক শব্দের মূল অর্থ হলো মুক্ত, উৎকৃষ্ট, সুন্দর, প্রাচীন। তাঁকে আল-আতীক বলার কারণ হলো–

ক. যুবাইর ইবনে বাক্কার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গোত্রের কেউ কখনো এমন কোনো কাজ করেননি, যা দ্বারা তাঁকে দোষারোপ করা যেতে পারে। এ জন্যে তাঁকে আতীক বলা হতো।[৮]

খ. মূসা ইবনে তালহা (রহ.) বলেন, আতীক উপাধিটি তাঁর মায়ের দেওয়া।[৯] এর কারণ হলো, তাঁর মা ছিলেন মৃতবৎসা। তাঁর প্রত্যেকটি সন্তান জন্ম লাভের পর পর মারা যেত। তাই ছেলে আবু বকর জন্মগ্রহণ করার পর তিনি ছেলেকে নিয়ে বাইতুল্লাহ অভিমুখী হয়ে দোয়া করলেন, اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا عَتِيْقٌ مِنَ الْمَوْتِ فَهَبْهُ لِيْ "হে আল্লাহ, এই ছেলেটি মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত।তাই আমাকে এ ছেলেটি দান করুন।"[১০] অতঃপর, তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর ছেলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে বড় হতে চলেছেন, তখন তিনি তাঁকে 'আতীক' (মুক্তিপ্রাপ্ত) উপাধি দান করেন।[১১]

---

[৬] ইবনু মানযূর, লিসানুল আরাব, খ. ৪, পৃ. ৭৬

[৭] ফাইয়ূমী, আল-মিসবাহুল মুনীর, খ. ১, পৃ. ৩৫৬

[৮] ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ. ২, পৃ. ১৩৮; সুয়ূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ. ১১।

[৯] ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযিম, খ. ১, পৃ. ৪২৯

[১০] আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু, পৃ. ৩১।

[১১] সুহায়লী, আর-রাওদুন উনুফ, খ. ১, পৃ. ৪২৯।

গ. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উপাধি আতীক সম্বন্ধে তাঁর কন্যা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এই উপাধিটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেওয়া। একদিন তিনি আমার পিতাকে দেখে বলেছিলেন, اَنْتَ عَتِيْقُ اللهِ مِنَ النَّارِ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيْقًا "তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ঐ সময় থেকে তিনি 'আতীক নামে অভিহিত হন।"[১২]

২. আছ-সিদ্দিক : আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অপর একটি উপাধি হলো 'আছ-সিদ্দিক'। এ উপাধি দ্বারা তিনি সমধিক পরিচিত। 'আছ-সিদ্দিক' অর্থ মহাসত্যবাদী, অতিশয় সত্যপরায়ণ। তাঁকে 'আছ-সিদ্দিক' বলার আরো কারণ হলো :

ক. ঐতিহাসিক সুদ্দী (রহ.) ও অন্যান্যের মতে, জাহিলী যুগ থেকেই তিনি তাঁর সততা ও ন্যায়পরায়ণতার কারণে এ নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

খ. কারো কারো মতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সকল কাজে নিঃসঙ্কোচে সর্বাগ্রে সমর্থন করতেন এবং নিজেকে একজন সত্যপরায়ণ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এ কারণে তাঁকে 'আছ-সিদ্দিক' উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়।

গ. সঠিক কারণ হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ থেকে ফিরে আসার পর এর বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণনা করলে কাফিররা তাকে একেবারে আজগুবি ও অলীক কাহিনী বলে উড়িয়ে দেয়। এমনকি মুসলিমদের মধ্যেও কেউ কেউ সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায়; কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মি'রাজের ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে শুনামাত্রই বিনা দ্বিধায় একে সত্য বলে মেনে নিলেন। তখন তাঁর উপাধি হলো 'আছ-সিদ্দিক'।[১৩]

ঘ. একবার রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করেছিলেন। তাঁর সাথে আবু বকর, 'উমর ও 'উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখও ছিলেন। এ সময়, পাহাড়টি কেঁপে ওঠেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) পাহাড়কে উদ্দেশ্য করে বললেন,

اُثْبُتْ اُحُدُ! فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَّ صِدِّيْقٌ وَّ شَهِيْدَانِ

"উহুদ, স্থির হও! তোমার উপরে রয়েছে এক জন নবী, এক জন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ।"[১৪]

---

[১২] তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুল মানাকিব, হাদিস নং : ৩৬১২

[১৩] আল-ইসাবাহ : ৪/১৪৪-১৪৬, আল-মোজাম আল খাবির, তাবারানী কর্তৃক: ১/৫২ বুখারী, তিরমিজী

[১৪] বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল মানাকিব, হাদিস নং : ৩৩৯৯।
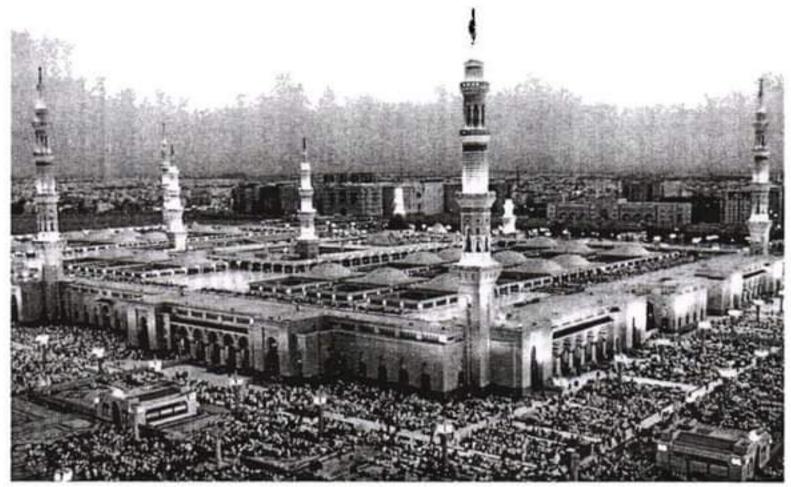
চিত্র : মসজিদে নববীর পিছনে উহুদ পর্বতের সৌন্দর্যময় দৃশ্য

৩. আল-আওয়াহ : আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু 'আল-আওয়াহ' নামেও পরিচিত ছিলেন। 'আল-আওয়াহ' অর্থ সকাতর প্রার্থনাকারী, আহাজারিকারী ও দয়ালু।

কারো কারো মতে– 'আল-আওয়াহ' হলেন এমন ব্যক্তি, যিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোনিবিষ্ট থাকেন। এ থেকে জানা যায় যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন অত্যন্ত আল্লাহভীরু এবং তাঁর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও মনোনিবিষ্ট ব্যক্তি। ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ (রহ.) বলেন, كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُسَمَّى الْاَوَّاهُ لِرَافَتِهٖ وَرَحْمَتِهٖ "আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অত্যন্ত কোমল, দয়ালু ও সহানভূতিপ্রবণ। এ কারণে তাঁকে 'আল-আওয়াহ' বলা হতো।"[১৫]

৪. আল-আতকা : 'আল-আতকা' শব্দের অর্থ আল্লাহভীরু। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এ উপাধি দান করেছেন। কুরআনের বাণী,

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى . الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى . وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى . اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى . وَلَسَوْفَ يَرْضٰى .

"আর তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে। যে তার সম্পদ দান করে আত্ম–শুদ্ধির উদ্দেশ্যে, আর তার প্রতি কারো এমন কোনো অনুগ্রহ নেই, যার

---

১৫ ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ. ৩০, পৃ. ৩৮৭

প্রতিদান দিতে হবে। কেবল তার মহান রবের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়। আর অচিরেই সে সন্তোষ লাভ করবে।"[১৬]

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, এ আয়াতগুলো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শানে নাযিল হয়। এখানে 'আল-আতকা' বলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বোঝানো হয়েছে।[১৭]

৫. সাহিবু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : 'সাহিব' শব্দের অর্থ সাথি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ সাথি ছিলেন। ইসলামের আগে এবং পরেও। সর্বাবস্থায় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকতেন এবং তাঁকে সহযোগিতা করতেন। হিজরতের সময় তিনিই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথি। আল্লাহ তা'আলাই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এ উপাধি দান করেন। হিজরতের ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا.

যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিল, সে তার সঙ্গীকে বলল, 'তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"[১৮]

এ আয়াতের মধ্যে 'সাহিব' বলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বুঝানো হয়েছে।

---

[১৬] অল-কুর'আন, সূরা আল-লায়ল ৯২: ১৭-২১।
[১৭] ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম, খ. ৮, পৃ. ৪২২।
[১৮] সূরা আত-তাওবাহ : ৪০

৬. খলিফাতু রাসূলিল্লাহ : রাসূলুল্লাহ -এর ওফাতের পর আবু বকর যখন মুসলিমগণের আমির নির্বাচিত হন, তখন তিনি নিজেই তাঁর জন্যে এ উপাধি বেছে নেন। ইবনে আবী মুলায়কাহ থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণের পর জনৈক ব্যক্তি তাঁকে "হে আল্লাহর খলিফা" বলে সম্বোধন করল। তখন তিনি সাথে সাথে এর বিরোধিতা করে বললেন, "আমি আল্লাহর খলিফা নই; বরং রাসূলুল্লাহ -এর খলিফা। আমি এতটুকুতেই সন্তুষ্ট।"[১৯]

জন্ম ও বংশ পরিচয়

আবু বকর হস্তি-সনের ঘটনার দু'বছর ছয় মাস[২০] পর মক্কাতুল মুকাররামার মিনায়[২১] জন্মলাভ করেন। আর রাসূলুল্লাহ জন্মলাভ করেন হস্তি-সনের ঘটনার ৫০ দিন পর। এ হিসাবে হি. পৃ. ৫১/৫৭৩ খ্রি. হলো তাঁর জন্ম সন। তিনি বয়সে রাসূলুল্লাহ -এর চেয়ে প্রায় দু'বছর চার মাসের ছোট ছিলেন। ইমাম সুয়ূতী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্মের দু'বছর কয়েক মাস পর আবু বকর জন্মগ্রহণ করেন।[২২]

তিনি আরবের সুবিখ্যাত কুরাইশ বংশের অন্যতম শাখা তায়িম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এই গোত্রটি আরবদেশে একটি অভিজাত গোত্র বলে সুপরিচিত ছিল। আবু বকর -এর বংশগত সম্পর্ক পিতা ও মাতা উভয়ের দিক দিয়েই ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ মুররাহ ইবনে কা'বে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ -এর সাথে মিলিত হয়েছে। তাঁর বংশলতিকা নিম্নরূপ–[২৩]

[১৯] ইবনু খালদূন, আল-মুকাদ্দামাহ, পৃ. ৯৭
[২০] ইবনু হাজার আসকালানী, আল-ইসাবাহ, খ. ২, পৃ. ১৫১।
[২১] ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযিম, খ. ১, পৃ. ৪২৯।
[২২] ইমাম সুয়ূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ. ১১।
[২৩] ইছামী, সিমতুন নুজূম, খ. ১, পৃ. ৪১৯।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নসবনামা
ফিহর (কোরাইশ)
গালিব
কাব
মূররা
আদী
কিলাব
তায়ম
কুসাই
সায়াদ
আবদে মানাফ
কা'ব
আমর
হাশিম
মুত্তালিব
নাওফিল
আব্দুশ শাসস
আমির
আব্দুল মুত্তালিব
আবু কুহাফা
আবু বকর (রাঃ)
আব্দুল্লাহ
আবু তালিব
আব্বাস (রা)
মুহাম্মদ (সাঃ)
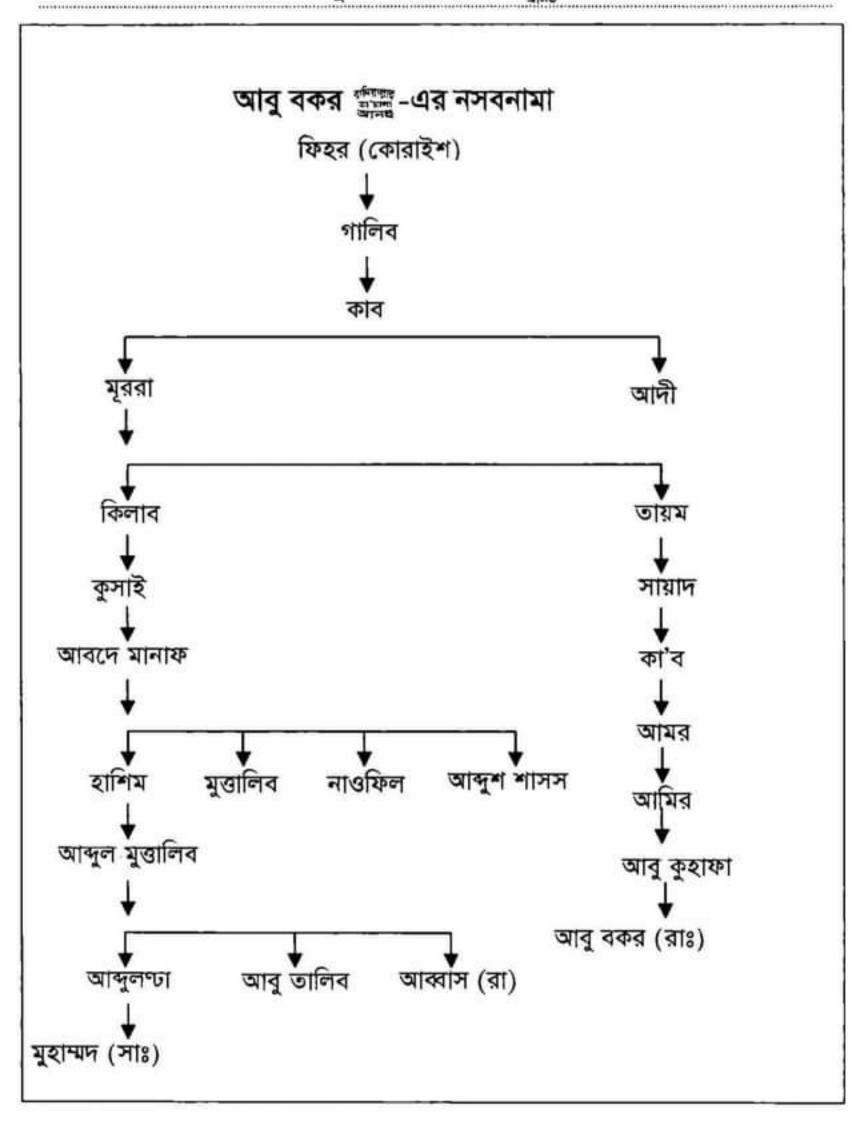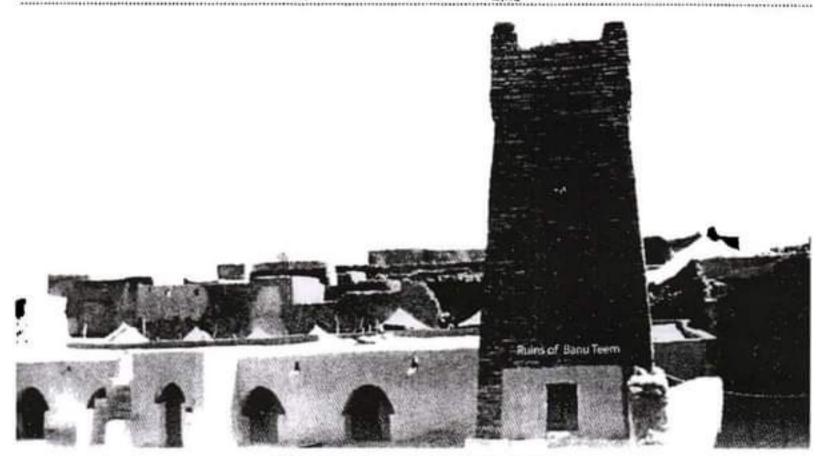
চিত্র : বনু তায়েম-এর ধ্বংসাবশেষ

পিতা-মাতা

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পিতার নাম উসমান এবং উপনাম আবু কুহাফাহ। তিনি হি.পূ. ৮৩/৫৪২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[২৪] তাঁর মাতার নাম ছিল কায়লাহ বিনতু আযাত।[২৫] আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পিতা আবু কুহাফাহ কুরাইশ বংশের একজন অতিশয় মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। মক্কার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। তাছাড়া সামাজিক কাজকর্মেও তাঁর অভিমত ও পরামর্শকে সবাই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করত। মক্কা বিজয় পর্যন্ত ইসলামের প্রতি তাঁর মধ্যে কোনোরূপ আগ্রহ দেখা যায়নি। তবে তিনি পুত্রকে কোনো সময়েই দীন ইসলাম থেকে বিরত রাখার জন্যে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। মক্কা বিজয়ের দিনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[২৬] আবু কুহাফাহ দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন। তিনি ১৪ হি./৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে মুহররম মাসে ৯৬/৯৭ বছর বয়সে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন।[২৭] শেষ বয়সে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল।[২৮]

তাঁর মাতার নাম সালমা। কারো কারো মতে, তাঁর মায়ের নাম ছিল লায়লা বিনতু সাখর।[২৯] তাঁর উপনাম উম্মুল খায়র। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাতা উম্মুল খায়র রাদিয়াল্লাহু আনহা। 'উম্মুল খায়র' অর্থ কল্যাণের জননী। তিনি বাস্তবিক পক্ষেই একজন

---

২৪ যিরাকলী, আল-আ'লাম, খ. ৪, পৃ. ২০৭।
২৫ সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, খ. ৪, পৃ. ১৫৯।
২৬ ইছামী, সিমতুন নুজূম, খ. ১, পৃ. ৪১৯
২৭ ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ. ২, পৃ. ২৩৮;
২৮ 'ইছামী, সিমতুন নুজূম, খ. ১, পৃ. ৪১৯।
২৯ ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ. ২, পৃ. ১৩৮।

পুণ্যবতী ও নেককার মহিলা ছিলেন স্বামীর অনেক আগেই, বলতে গেলে ইসলামের একেবারে প্রাথমিক কালেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[৩০] একদিন সকালবেলা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দারুল আরকামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার আম্মা এসেছেন! আপনি তাঁর জন্যে দোয়া করুন এবং তাঁকে ইসলামের দা'ওয়াত দিন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে দোয়া করলেন এবং তাঁকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানালেন। উম্মুল খায়র রাদিয়াল্লাহু আনহা সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি ৯০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।[৩১]

ভাই-বোন

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কোনো ভাই ছিল না। তাঁর মাত্র দু'জন বোন ছিলেন। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন তাঁর বৈমাত্রেয় বোন।[৩২]

১. উম্মু ফারওয়াহ : প্রথমে আবু উমায়মাহ আল-আযদীর সাথে উম্মু ফারওয়ার বিয়ে হয়। এ ঘরে তাঁর কন্যা উমাইমাহ জন্ম নেয়। এরপর তাঁর বিয়ে হয় তামীম ইবনে আওস আদ-দারী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে। তিনি ৯ম হিজরিতে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। উম্মু ফারওয়াহ যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর আশ'আছ ইবনে কায়স আল-কিন্দী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। এ ঘরে তাঁর তিন ছেলে মুহাম্মদ, ইসহাক ও ইসমা'ঈল এবং দুই কন্যা হাবাবাহ ও কুরাইবাহ জন্ম নেন।[৩৩]

২. কুরাইবাহ : আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অপর বোন কুরাইবাহ-এর সাথে কায়স ইবনে সা'দ ইবনে উবাদাহ আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিয়ে হয়। কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন মর্যাদাবান ও সাহসী সাহাবি ছিলেন। এ ঘরে তাঁর কোনো সন্তান-সন্তুতি ছিল না।[৩৪]

আকৃতি-প্রকৃতি

আকৃতি ও গঠনের দিক দিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অনন্যসাধারণ। দেহের আকার মধ্যম ছিল। খুব দীর্ঘকায়ও ছিলেন না, খুব খর্বকায়ও ছিলেন না। তাঁর বর্ণ ছিল শুভ্র, নাসিকা উন্নত। অবশ্যই তাঁর দেহাবয়ব খুবই ক্ষীণ ও শীর্ণ ছিল। ললাটদেশ প্রশস্ত ও উঁচু ছিল। বাহু দুটি ছিল বলিষ্ঠ পেশি সম্বলিত ও দীর্ঘ।

---

[৩০] 'ইছামী, সিমতুন নুজূম... খ. ১, পৃ. ৪১৯।
[৩১] আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু ফী মানাকিবিল 'আশারাহ, পৃ. ৩০।
[৩২] ইবনুল মুতাহহির, আল-বাদ'উ ওয়াত তারীখ, খ. ১, পৃ. ২৮৩
[৩৩] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৮, পৃ. ২৪৯।
[৩৪] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৮, পৃ. ২৪৯।

মুখমণ্ডল সদা প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল; কিন্তু তাতে গোশত ছিল কম। চক্ষুদ্বয় ঈষৎ কোটরাগত ছিল। মাথার চুল ও দাড়ি শেষের দিকে সাদা হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি তাতে মেহেদী ব্যবহার করতেন। স্বভাব খুবই কোমল ছিল; কিন্তু সমস্ত অবয়বটি খুবই গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল।

আবু বকর -এর স্ত্রীগণ

আবু বকর -এর চারজন স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'জনের সাথে ইসলামের পূর্বে এবং অপর দু'জনের সাথে ইসলাম গ্রহণের পরে বিয়ে হয়। ইসলামের পূর্বে যাঁদের সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিল তাঁরা হলেন–

১. কুতাইলাহ বিনতু 'আবদিল 'উযযা ইবনি আস'আদ : আবু বকর সর্বপ্রথম কুতাইলা বিনতু 'আবদিল 'উযযা ইবনি আস'আদকে বিয়ে করেন। কুতাইলাহর গর্ভে এক পুত্র 'আবদুল্লাহ এবং এক কন্যা আসমা' জন্মগ্রহণ করেন। আবু বকর তাঁকে ইসলাম-পূর্বকালে তালাক দেন।[৩৫] তাঁর ইসলাম গ্রহণ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

২. উম্মু রূমান বিনতু 'আমির : ইবনু ইসহাক (রহ.) বলেন, তাঁর নাম ছিল যায়নাব।[৩৬] আবু বকর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উম্মু রূমান -কে বিয়ে করেন। তাঁর সাথে প্রথমে আযদ গোত্রের 'আবদুল্লাহ ইবনে হারিছ ইবনে সাখবারাহর বিয়ে হয়।[৩৭] প্রথম স্বামী মারা গেলে আবু বকর উম্মু রূমান -কে বিয়ে করেন।[৩৮] এ ঘরে আবু বকর -এর এক ছেলে আবদুর রাহমান ও এক মেয়ে আয়েশা জন্মগ্রহণ করেন। উম্মু রূমান ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ঈমান আনেন। হিজরতের সময় আবু বকর তাঁকে মক্কায় ছেড়ে গিয়েছিলেন। পরে আবদুল্লাহ ইবনে উরায়কিতকে পাঠিয়ে তাঁকে মদিনায় নিয়ে যান।[৩৯] তিনি হিজরি ৬ষ্ঠ সনে যিলহাজ্জ মাসে মৃত্যুবরণ করেন।[৪০]

৩. আসমা' বিনতু 'উমাইস : ইসলাম গ্রহণের পর আবু বকর আসমা বিনতু উমাইস -কে বিয়ে করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ -এর স্ত্রী মায়মূনাহ -এর বৈপিত্রেয় বোন ছিলেন।[৪১] তিনি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায়

---

[৩৫] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৩, পৃ. ১৬৯ ও খ. ৮, পৃ. ২৫২।
[৩৬] ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ. ৪, পৃ. ৮৯।
[৩৭] ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ. ৪, পৃ. ৮৯।
[৩৮] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৮, পৃ. ২৭৬।
[৩৯] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৮, পৃ. ২৭৬।
[৪০] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৮, পৃ. ২৭৬।
[৪১] ইবনুল আছীর, আল-ইস্তি'আব, খ. ২, পৃ. ৭৫।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের প্রাথমিক প্রচারকেন্দ্র দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।[42] জাফর ইবনে আবী তালিব -এর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। এ ঘরে তাঁর তিন ছেলে 'আবদুল্লাহ, 'আওন ও মুহাম্মাদ জন্ম লাভ করেন। মূ'তার যুদ্ধে স্বামী জাফর -এর শাহাদাতের পর আবু বকর তাঁকে বিয়ে করেন। এ ঘরে তাঁর এক ছেলে মুহাম্মাদ জন্মগ্রহণ করেন।[43] আবু বকর -এর ওফাতের পর আসমা আলী -এর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ ঘরে তাঁর দুই ছেলে ইয়াহইয়া ও আওন জন্ম লাভ করেন।[44] তিনি আলী -এর ওফাতের পর সম্ভবত ৪০ হি./৬৬১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

৪. হাবীবাহ বিনতু খারিজাহ : মদিনায় হিজরতের পর আবু বকর খারিজাহ ইবনে যায়িদ -এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হন। হাবীবাহ ছিলেন তাঁর মেয়ে। আবু বকর -এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর আবু বকর তাঁকে নিয়ে 'সুনহ' নামক স্থানে বাস করতেন। আবু বকর -এর ওফাতের পর এ ঘরে তাঁর এক কন্যা উম্মু কুলছুম জন্মগ্রহণ করেন। আবু বকর -এর পর খুবাইব ইবনে আসাফ ইবনে 'উতবাহ -এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।[45]

আবু বকর -এর সন্তান-সন্ততি

চার স্ত্রী থেকে আবু বকর -এর ছয়জন সন্তান জন্ম লাভ করেন। তিনজন ছেলে ও তিনজন মেয়ে। ছেলেরা হলেন– আবদুর রাহমান, আবদুল্লাহ ও মুহাম্মাদ এবং মেয়েরা হলেন– আসমা, আয়েশা ও উম্মু কুলছুম ।[46]

১. আবদুর রাহমান : 'আবদুর রাহমান হলেন আবু বকর -এর বড় ছেলে এবং আয়েশা -এর সহোদর ভাই। তিনি উম্মু রূমান -এর গর্ভে জন্মলাভ করেন। হুদাইবিয়ার ঘটনার সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদিনায় এসে পিতার সাথে বাস করতে থাকেন। তিনি কুরাইশের শ্রেষ্ঠ বীর ও তীরন্দাজ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর এ দক্ষতা দীনের সাহায্যে ব্যবহৃত হয়। হুদাইবিয়ার পর সংঘটিত সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। তিনি হিজরি ৫৩/৫৫ সালে অকস্মাৎ মক্কাস্থ হাবাশীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁকে মক্কায় দাফন করা হয়।[47]

---

৪২ ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ. ৩, পৃ. ৪৩৬।
৪৩ ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৮, পৃ. ২৮০-২
৪৪ যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ. ২, পৃ. ২৭৬
৪৫ ইবনু আবদুল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ. ১, পৃ. ১৩১ ও খ. ২, পৃ. ৮৩
৪৬ আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু ..., পৃ. ১৩০
৪৭ ইবনু আবদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ. ১, পৃ. ২৪৯

২. আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু : আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন কুতাইলাহর গর্ভজাত ও আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সহোদর ভাই। তিনি ইসলামের প্রাথমিক কালে ঈমান আনেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের সময় তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-সহ ছাওর পর্বতের গুহায় অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর ওপর এ দায়িত্ব ছিল যে, তিনি সারাদিন কুরাইশদের সংবাদ সংগ্রহ করে বিকালে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌছে দিয়ে আসতেন। তাঁদের নিরাপদে মদিনায় পৌছার পর তিনি নিজে উম্মু রুমান, আয়েশা ও আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে সাথে নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। তিনি মক্কা বিজয়ে এবং হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তায়েফের যুদ্ধে তিনি একটি তীরের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন। চিকিৎসার পর কিছুটা সুস্থ হলেও পরে আবার ক্ষতস্থান ফুলে ওঠে এবং তাতেই তিনি হিজরি ১১ সনের শাওয়াল মাসে শাহাদাত বরণ করেন।[৪৮]

৩. মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু : মুহাম্মাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ছেলেদের মধ্যে কনিষ্ঠতম। বিদায় হজের সফরে ২৫ শে যুলকা'দাহ যুল-হুলাইফাহ নামক স্থানে আসমা বিনতু উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়।[৪৯] আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওফাতের পর তাঁর মা যখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তখন এ সম্পর্কের কারণে মুহাম্মাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু শৈশবকালে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে লালিত-পালিত হন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে ৩৭ হিজরিতে মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। যখন তিনি মিশরে পৌছেন, তখন আমির মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে তাঁর বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুহাম্মাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।[৫০]

৪. আসমা বিনতু আবী বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা : আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বোনদের মধ্যে বড় ছিলেন। তিনি নবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক-এর মতে, ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ১৮তম ছিলেন।[৫১] যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। মদিনায় হিজরতের সময় তিনি গর্ভবতী ছিলেন। পথে কুবা নামক স্থানে ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু জন্ম লাভ করেন। তাঁর উপাধি ছিল– যাতুন নিতাকাইন। এর অর্থ হলো– দুই কোমরবন্দওয়ালী। এর কারণ হলো– হিজরতের সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আব্বার জন্যে পথে পানাহারের জন্যে একটি চামড়ার থলিতে কিছু পানি ও

---

৪৮ ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ. ২, পৃ. ১৩৪।
৪৯ ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৮, পৃ. ২৮২
৫০ আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু..., পৃ. ১৩০
৫১ ইবনু 'আবদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ. ২, পৃ. ৭৪

অন্য একটি থলিতে কিছু খাবার প্রস্তুত করেছিলেন; কিন্তু পাত্রগুলো বাঁধার জন্যে তিনি কিছু পাচ্ছিলেন না। এ অবস্থায় তিনি নিজের কোমরবন্দ দুই টুকরো করে সেটা দিয়ে খাবার ও পানির পাত্রগুলো বেঁধেদিলেন। এ কারণেই তাঁকে এ উপাধি দেওয়া হয়।[৫২] তিনি অত্যন্ত ত্যাগী ও কষ্টসহিষ্ণু মহিলা ছিলেন। বিয়ের সময় স্বামীর একটি ঘোড়া ছাড়া তাঁর অন্যকোনো সম্পদ ছিল না। তিনি অতি দুঃখে-কষ্টের মধ্যে ঘরের সকল কাজ নিজ হাতেই আঞ্জাম দিতেন। আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হিজরি ৭৩ সালে প্রায় ১০০ বছর বয়সে মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৫৩]

৫. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা : আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অত্যন্ত স্নেহভাজন কন্যা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। উপাধি– আছ-সিদ্দিকা। 'আল-হুমাইরা' নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন। এর অর্থ আদুরের সুন্দরী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয় এবং নয় বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে সংসার করেন।[৫৪] তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। হাদিস, ফিকহ ও ফারা'য়িদ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সমসাময়িক লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা হলো ২২১০।[৫৫] চিকিৎসা ও কাব্যচর্চায়ও তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। তিনি সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মীও ছিলেন। যখন বক্তৃতা প্রদান করতেন, তখন শ্রোতাদের ওপর যাদুর মতো তার প্রভাব পড়তো। তিনি ৫৭/৫৮ হিজরির ১৭ রামাদান মঙ্গলবার মৃত্যুবরণ করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।[৫৬]

৬. উম্মু কুলছুম বিনতু আবী বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা : উম্মু কুলছুম রাদিয়াল্লাহু আনহা হলেন বোনদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর পর হাবীবাহ বিনতু খারিজাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[৫৭] তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু উষ্ট্রযুদ্ধে নিহত হন। এরপর তিনি আবদুর রাহমান ইবনে আবদিল্লাহ আল-মাখযূমী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বিয়ে করেন।[৫৮]

---

[৫২] বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুল জিহাদ, হাদিস নং : ২৭৫৭।
[৫৩] ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ. ৩, পৃ. ৪৩৫।
[৫৪] ইবনু 'আবদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ. ২, পৃ. ১০৮।
[৫৫] যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ. ১৩৯।
[৫৬] ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ. ৪, পৃ. ২৮।
[৫৭] ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ. ৪, পৃ. ১২০।
[৫৮] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৮, পৃ. ৪৬২।

অধ্যায়-২

আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ইসলাম-পূর্ব জীবন

আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর শৈশবকাল

আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছিলেন পিতামাতার একমাত্র পুত্রসন্তান। সুতরাং তিনি শৈশবকালে অত্যন্ত আদর-যত্ন ও স্নেহের সাথে একটি অনাবিল হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে বড়ই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দের মধ্যে প্রতিপালিত হন।[৫৯] গোটা খান্দানের জন্যে তিনি মুহাব্বাত ও ভালোবাসার কেন্দ্রস্থলস্বরূপ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিবেচনাশীল ও ধীমান স্বভাবের ওপর সৃষ্টি করেছিলেন। অতএব, বয়স বাড়ার সাথে সাথে তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, বিচার-বিবেচনা শক্তি এবং ব্যবসায়িক জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে। শৈশবকালে তিনি পিতার সকল কাজে সহায়তা করে অতিবাহিত করতেন। শৈশবে কখনো তিনি অন্যান্য বখাটে ছেলেদের মতো খেলাধুলায় সময় কাটাননি।

আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর যৌবনকাল

বিশ বছর বয়সে পদার্পণ করামাত্র ব্যবসা এবং সাংসারিক সমুদয় কাজ-কারবারের ভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। সদাচার, সাধারণ চরিত্র, দুস্থ ও বিপন্নের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন, ব্যবসা সম্বন্ধীয় যোগ্যতা প্রভৃতি গুণে তিনি সমগ্র মক্কাবাসীর ওপর অসাধারণ প্রভাববিস্তার করেছিলেন। দেশের জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষ তাঁকে ভক্তি ও সম্মানের সাথে দেখত। ব্যবসায় বিচক্ষণতা, ব্যবসায়ে সততা ও ধার্মিকতা তাঁকে এত জনপ্রিয় করে তুলেছিল যে, পিতা আবু কোহাফার যশ ও খ্যাতি তাঁর যশ ও খ্যাতির সম্মুখে ম্লান হয়ে পড়েছিল।

ব্যবসায় আত্মনিয়োগ

আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কাপড়ের ব্যবসায় করতেন এবং একজন সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে সকলের নিকট খ্যাতি লাভ করেছিলেন।[৬০] খাদীজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এবং অন্যান্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়িগণ যে মহল্লায় বাস করতেন, আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-ও সেই মহল্লার একজন বাসিন্দা ছিলেন। সিরিয়া, ইয়ামন প্রভৃতি দূর-দূরান্ত দেশসমূহে তাঁদের ব্যাসায় বিস্তৃত ছিল। খাদীজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে বিয়ে করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও এই মহল্লায়

---

[৫৯] হানী, তারীখুদ দা'ওয়াতি.., পৃ. ৩০।
[৬০] ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ. ২, পৃ. ১৫২।

এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ তা'আলা এক মহৎ উদ্দেশ্যে নিষ্পাপ এবং নিষ্কলুষ স্বভাব প্রদানপূর্বক সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রকৃতি ও স্বভাব সর্বদা এরূপ একজন নিষ্কলুষ চরিত্রবান লোকের সন্ধান করছিল। অবশ্য বাল্যকাল থেকেই পূত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হিসেবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি তাঁর দৃষ্টি পতিত হয়েছিল এবং বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্যে তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে পূর্ব থেকেই মনোনীত করে রেখেছিলেন। এক মহল্লায় একত্রে বসবাসের সুযোগে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। ক্রমে ক্রমে তাঁদের মধ্যে প্রগাঢ়, খাঁটি ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব পরিপক্ক হয়ে ওঠে। হাশেমী বংশীয় নওজওয়ানদের ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্য কোনো খাস দোস্ত ও বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকলে একমাত্র আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-ই ছিলেন। তাঁর ব্যবসার মূলধন ছিল চল্লিশ হাজার দিরহাম। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি এ সম্পদ উদারচিত্তে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন। হিজরতের সময় তাঁর কাছে পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল।[৬১] শাম ও ইয়ামান প্রভৃতি দেশসমূহ পর্যন্ত তাঁর ব্যবসার বিস্তৃত ছিল। এ উপলক্ষ্যে তিনি একাধিকবার শাম ও ইয়ামান সফর করেন। আঠারো বছর বয়সে প্রথমবারের মতো তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম সফর করেন।[৬২]

চিত্র : আস-শামে বুসরা শহরের ধ্বংসাবশেষ

[৬১] ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ. ২, পৃ. ১৫২।

[৬২] ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ. ১, পৃ. ১০৪

হিলফুল ফুযুল

আরবদেশে 'ফিজারের যুদ্ধ' নামে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সর্বশেষ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বয়স ছিল পনেরো (মতান্তরে বিশ) বছর। এ যুদ্ধ থেকে ফেরার পর কুরাইশের কয়েকটি গোত্র একত্রিত হয়ে পরামর্শ করে যে, ভবিষ্যতে এ যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়া উচিত। তা না হলে আরবরা ক্রমে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ উদ্দেশ্যে তারা মিলে 'হিলফুল ফুযুল' নামে একটি ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সংঘের সদস্যরা সকলেই এ মর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, "আমরা সর্বদা যালিমদেরকে প্রতিরোধ করব এবং মাযলূমদেরকে সাহায্য করব।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বয়সে কম হওয়া সত্ত্বেও এ সংঘের একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। তাঁর সাথে আবু বকর রা.-ও এ সংঘের মধ্যে শামিল ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ রিসালাতের মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার পরও এ সংঘের কার্যক্রমের প্রশংসা করতেন এবং বলতেন,

وَلَوْ اُدْعَىٰ بِهٖ فِي الْاِسْلَامِ لَاَجَبْتُ.

"ইসলামের যুগেও যদি আমাকে এ অঙ্গীকার পালনের জন্য ডাকা হতো, তবে আমি অবশ্যই সে ডাকে সাড়া দিতাম।"[৬৩]

সমাজসেবক ও আমানতদার

সমাজের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁর অংশগ্রহণ এবং হস্তার্পণ করাকে একান্ত জরুরি বলে বিবেচিত হতে লাগল। তাঁর অভিমতকে সমাজের লোকেরা নির্ভুল বলে স্বীকার করে নিতে লাগল। আবু বকর অল্পদিনের মধ্যে দেশে এমন অসাধারণ প্রভাববিস্তার করেছিলেন যে, কুরাইশ বংশের সম্মানিত এবং নেতৃস্থানীয় লোকেরাও তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। সমাজের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁর অংশগ্রহণ ও হস্তার্পণ করাকে একান্ত জরুরি বলে বিবেচিত হতে লাগল। সমাজের লোকেরা তাঁর অভিমত ও পরামর্শকে নির্ভুল ও খাঁটি বলে স্বীকার করে নিত। এমনকি এ সমস্ত কারণে খুন, যখম, মারামারি ও বিবাদ-বিসম্বাদ, মীমাংসায়, কেসাস, দিয়্যত (রক্তপণ) ও জরিমানার ব্যাপারে তাঁর রায় ও ফায়সালাকে চূড়ান্ত ও যথার্থ বলে মেনে নিত। অন্য কারো মীমাংসা তারা মানতে চায়নি। এ সমস্ত খুনের বিনিময় ও জরিমানার বিরাট বিরাট অঙ্কের টাকা জনগণ একমাত্র তাঁরই কাছে এনে জমা দিত। তিনি তা ন্যায্য প্রাপকদের

---

[৬৩] ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ১৩৩

মধ্যে সুষ্ঠুরূপে বিতরণ করতেন।[৬৪] লোকে নিজেদের জটিল জটিল সমস্যাসমূহে তাঁর পরামর্শ ও সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করত। নিজেদের যাবতীয় আমানতের মাল তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখত।[৬৫]

কুরাইশদের ভালোবাসার পাত্র

ইসলাম-পূর্বকালে অজ্ঞতার এই যুগটি অবশ্যই সর্বপ্রকারের মন্দ কাজে ও নিকৃষ্ট আচরণে পরিপূর্ণ ছিল। এমন কোনো কাজ ছিল না যা মক্কাবাসীরা করত না। এই অঞ্চলের যাবতীয় পাপানুষ্ঠান ও অপকর্মের পূর্ণ তালিকা প্রণয়ন করলে একটি বিরাট দফতর পরিপূর্ণ হয়ে পড়ত; কিন্তু এই পাপাচার এবং অমানুষিকতার যুগেও হাশেমী বংশের লোকেরা এবং আরও কতিপয় কুরাইশ বংশীয় লোক এমন ছিলেন যে, তাঁরা মনেপ্রাণে এ সমস্ত পাপাচার ও অমানুষিক কার্যকলাপকে ঘৃণা করতেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাদের শরীর তখনও পাপ-পঙ্কিল এবং অন্যায়-অবিচারের কালিমা হতে পবিত্র ছিল। বাল্যকাল হতেই স্বাভাবিকভাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্তরে সৎকাজের প্রেরণা এবং খোদাভীতি বিরাজমান ছিল। নির্লজ্জতা, অশ্লীল উক্তি, মদ্যপান প্রভৃতি নিকৃষ্টতম কার্যসমূহকে বাল্যকাল হতেই তিনি এমনভাবে ঘৃণা করতেন যে, কেউ তাঁকে এ সমস্ত কাজের প্রতি আহ্বান করলে বা এ সমস্ত মজলিসে ডাকলে তিনি পরিষ্কার জবাব দিতেন : "এ সমস্ত কাজকে আমি নিজের মান-সম্ভ্রম বিনাশকারী বলে মনে করি। কাজেই এ সমস্ত অপকর্মে আমি অংশগ্রহণ করব বলে কেউ কখনও আশা পোষণ করো না।" কুরাইশ সম্প্রদায়ের সকলের কাছে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সততা ও বিশ্বস্ততা এত দৃঢ়রূপে স্বীকৃত ছিল যে, তিনি বিদ্যমান থাকতে তারা অন্য কারো প্রতি নির্ভর এবং বিশ্বাস করত না। রক্তপণ এবং খুনখারাপি সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ ও জরিমানার টাকা জমা দেওয়ার ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ছাড়া অন্য কারো নাম প্রস্তাব করা হলে তাতে ঐকমত্য পাওয়া যেত না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাল্যবন্ধু

বয়স, পেশা, স্বভাব-চরিত্র, আরবদের ঘৃণ্য চালচলন ও রীতিনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা প্রভৃতি গুণে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং মিল ছিল বলেই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পেরেছিলেন। তাঁদের এই বন্ধুত্ব এত প্রগাঢ় ছিল যে, ব্যবসায়সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং বহির্দেশে যাতায়াতেও

---

[৬৪] ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযিম, খ. ১, পৃ. ১৯৬

[৬৫] ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ. ২, পৃ. ১৩৮।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকতেন।[৬৬] বাড়িতে থাকাকালে প্রতি সকালে ও বিকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গৃহে যাতায়াত করতেন। আয়েশা রেওয়াত করেন– "যখন থেকে আমার কিছু কিছু বোধশক্তি জন্মেছে, তখন হতে আমি আমার পিতামাতা উভয়কে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অত্মোৎসর্গকারী দেখতে পেয়েছি। এমন কোনো দিন অতিবাহিত হয়নি, যেদিন আল্লাহ তা'আলার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে ও বিকালে দুইবার আমাদের গৃহে যাতায়াত করেননি।"

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসা উপলক্ষ্যে শাম দেশে যাত্রা করলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মুহব্বতবশত তাঁর খিদমতের জন্যে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর সাথে দিয়েছিলেন।[৬৭] এ সফরেই বুহাইরাহ নামক খ্রিস্টান পাদ্রীর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ হয়। এ পাদ্রী ছিলেন একজন দরবেশ। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে কতিপয় লক্ষণ দেখে তাঁর চাচা আবু তালিবকে বললেন, এ ছেলেটি আখিরী যামানার নবী হবেন। এ কথা ইহুদিরা টের পেলে তাঁকে মেরে ফেলতে পারে। তাই অতি সত্বর তাঁকে নিয়ে দেশে ফিরে যান। আবু তালিব বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সাথে দিয়ে তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দেন। মোটকথা, নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল– তা বহু ঘটনার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভ বিবাহ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রচেষ্টায়ই হয়েছিল। এ বিয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিয়ে যে মহল্লায় বসবাস করতেন, সে একই মহল্লার একজন বাসিন্দা ছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। এভাবে একই মহল্লায় একত্রে বসবাসের সুযোগেও তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন ক্রমে প্রগাঢ় থেকে প্রগাঢ়তর হয়ে ওঠে।

বাল্যকাল থেকেই তাঁরা একে অপরকে মক্কানগরীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক চরিত্রবান, অধিক সত্যবাদী এবং অধিক সম্ভ্রান্ত লোক বলে জানতেন। এ কারণেই বাল্যকাল থেকেই তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই গভীর হৃদ্যতা গড়ে ওঠেছিল। নিজের ঘরে ভালো কোনো নাস্তা বা খাবার প্রস্তুত হলে তা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে নিয়ে আসতেন। অধিকাংশ সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাস্তার জন্যে যাইতুন তেলে ভাজা রুটি নিয়ে আসতেন। এটি মক্কা শরীফে একটি উপাদেয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য বলে বিবেচিত হতো। একবার

---

[৬৬] ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ. ১, পৃ. ১০৪।

[৬৭] তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুল মানাকিব, হাদিস নং : ৩৫৫৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে শাম দেশে যাচ্ছিলেন, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ জাতীয় বহু নাস্তা তৈরি করে তাঁর সাথে দিয়েছিলেন।[৬৮]

জাহেলী যুগে মূর্তিপূজা ও মদ থেকে দূরে থাকা

মূর্তিপূজার ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়ে তিনি যৌবনে পদার্পণ করেছেন বটে; কিন্তু কখনো মূর্তিপূজা করেননি। মূর্তিপূজাকে তিনি অন্তরের সাথে ঘৃণা করতেন।[৬৯] এক দিন তিনি সাহাবা কিরামের এক সমাবেশে বলেন, ما سجدت لصنم قط – "আমি কখনো কোনো মূর্তির সামনে মাথানত করিনি।"[৭০]

আজন্ম তিনি সত্যপরায়ণ ও সত্যানুসন্ধানী ছিলেন। এ কারণেই তিনি মহা সত্যের প্রতীক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বাল্যকাল হতে ভালোবাসতেন। সর্বপ্রকার অসৎকর্ম ও পাপাচারকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি একজন সদাচারী, দানশীল এবং অতিথিপরায়ণ ধনবান ব্যবসায়ী ছিলেন। দুস্থ ও দরিদ্র লোকদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন, বন্ধুবর্গের সাথে সদ্ব্যবহার তাঁর স্বভাবগত অভ্যাস ছিল। তাঁর স্বভাবের মধ্যে সহানুভূতির ছাপ এত অধিক ছিল যে, তিনি কেবল বন্ধুবান্ধবগণেরই নয়; বরং শত্রুদের দুঃখ-বেদনায় সাহায্য করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। অসৎকর্মের প্রতি ঘৃণা এবং সত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর স্বভাবের মধ্যে এত প্রকট ছিল যে, পাপানুষ্ঠান এবং মন্দ কাজের মজলিসে যোগদান করা তো দূরের কথা, ঐ সমস্ত মজলিসের কাছে দিয়ে যাতায়াত করাও তিনি পাপ মনে করতেন। আবু বকরের মধ্যে উল্লিখিত গুণাবলি লক্ষ করেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র কুরাইশ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বন্ধুত্বের জন্যে বেছে নিয়েছিলেন।

জ্ঞানবান আবু বকর

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জ্ঞানশক্তি ও কর্মশক্তি ইসলাম-পূর্বকালেও সমাজের বহু কাজে লেগেছে। আরবের গোত্রগুলোর বংশপরিচয় জ্ঞান সম্বন্ধে বর্তমানে যাকিছু আমাদের সম্মুখে রয়েছে, তা সম্পূর্ণই মুযআর যুবাইরী এবং যুবাইর ইবনে মুতয়েম হতে প্রাপ্ত। তাঁরা উভয়েই বংশপরিচয় জ্ঞান আবু বকর হতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসসান ইবনে সাবেতকে বললেন, তুমি আবু বকরের সাথে মেলামেশা করবে। কেননা, আরবের কওমসমূহের বংশপরিচয় সম্বন্ধে তিনি তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[৬৮] আবদুল হালীম, সিদ্দীকে আকবর আবু বকর (রা.), পৃ. ৭।

[৬৯] 'আলী আল-হালাবী, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৪৩৫।

[৭০] সাল্লাবী, আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.), পৃ. ২৬

إِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا

“বংশগতি বিদ্যায় আবু বকর কুরাইশদের মধ্যে নিঃসন্দেহে একজন দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন।”

কবিতা এবং প্রবন্ধ রচনায়ও তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল; কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তা পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি অতি উঁচুস্তরের মার্জিতভাষী বক্তাও ছিলেন। বনু হুযাইলের প্রখ্যাত কবি আবু যুওয়াইব বলেন, সকীফায়ে বনু সায়েদার ঘটনায় প্রথমে আনসার সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ অনেক লম্বা লম্বা বক্তৃতা প্রদানপূর্বক নিজেদের খেলাফতের দাবি পেশ করেছিলেন। সর্বশেষে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে যেই ভাষণ দিলেন, তা একমাত্র তাঁর দ্বারাই সম্ভব ছিল। তাঁর বক্তৃতা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। যে শব্দ ও বাক্যগুলো তিনি ব্যবহার করেছিলেন তা সম্পূর্ণরূপে স্থানোপযোগী ও সময়োচিত ছিল। তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে মন্ত্রের ন্যায় কাজ করেছিল। তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করলে শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর প্রতি সম্পূর্ণরূপে একাগ্রচিত্ত হয়ে শ্রবণ করে এবং তাঁর অনুগত হয়ে পড়ে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাবশার দিকে হিজরত করে চলে যেতে উদ্যত হলে ইবনুদ্দাগনা নামক একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কুরাইশ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে লক্ষ করে বলেছিলেন, “তোমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে খোঁজ করলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ন্যায় গুণবান অপর একজন লোক বের হবে না। অতএব, তাঁকে দেশ হতে বের হয়ে যেতে দেওয়া যায় না। তোমরা এমন একজন লোককে দেশান্তরিত করতে চাও, যিনি বংশপরিচিতিসংক্রান্ত হারানো সম্পদগুলোকে উদ্ধার করেছেন। তিনি সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয় লোকদের সাহায্য করেন, অভ্যাগত মেহমানদের সেবা করেন। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এ সমস্ত গুণের কথা মক্কাবাসীদের মধ্যে কেউ অস্বীকার করতে পারেনি।”

অধ্যায়-৩

ইসলাম গ্রহণ ও পরবর্তী জীবন

বিনা দ্বিধায় ইসলাম গ্রহণ

আবু বকর আছ-সিদ্দিক রাসূলুল্লাহ -এর নবুওয়াত প্রাপ্তির একেবারে প্রাথমিক কালেই তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। রাসূলুল্লাহ যাকে ইসলামের দাওয়াত জানিয়েছেন সে-ই প্রথমে কিছু না কিছু দ্বিধা-সংকোচ প্রকাশ করেছে; কিন্তু আবু বকর ইসলামের দাওয়াত শুনামাত্রই বিনা দ্বিধায় সংকোচহীন চিত্তে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ বলেন,

مَا دَعَوْتُ اَحَدًا اِلَى الْاِسْلَامِ اِلَّا كَانَتْ لَهُ عَنْهُ كَبْوَةٌ وَتَرَدُّدٌ وَنَظَرٌ اِلَّا اَبَا بَكْرٍ.
مَا عَتَمَ حِيْنَ ذَكَرْتُهُ لَهُ. وَمَا تَرَدَّدَ فِيْهِ.

"আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত জানিয়েছি, সে-ই শুরুতে কিছু না কিছু সংশয় ও দ্বিধা প্রকাশ করেছে এবং চিন্তা-ভাবনা করেছে; কিন্তু আবু বকর -কে আমি ইসলামের দাওয়াত দেওয়া মাত্রই সে আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে এবং কোনোরূপ সংশয় প্রকাশ করেনি।"[৭১]

কোনো কোনো সাহাবি তো এরূপ মন্তব্যও করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ -এর নবুওয়াত লাভের পূর্বেই আবু বকর তাঁর ওপর ঈমান আনেন। অর্থাৎ তিনি যে নবী হবেন এ কথা আবু বকর আগে থেকেই জানতেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, আবু বকর রাসূলুল্লাহ -এর নবুওয়াত লাভের বহু পূর্ব থেকেই এমন বহু লক্ষণ ও নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলেন, যাতে এ কথার প্রতি তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, অচিরেই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ -কে বান্দাহদের হিদায়াতের জন্যে নবীরূপে মনোনীত করবেন। এ জন্যে যখনই রাসূলুল্লাহ আবু বকর -কে ইসলামের দাওয়াত জানালেন, তখন কোনো ধরনের চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তৎক্ষণাৎ দাওয়াত গ্রহণ করে নেন।[৭২]

---

৭১ বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুবুওয়াত, হাদিস নং : ৪৬৯।
৭২ বাইহাকী, দালা'য়িলুন নুবুওয়াত, হাদিস নং : ৪৬৯।

সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী কে?

কারো দ্বিমত নেই, আবু বকর রাসূলুল্লাহ -এর নবুওয়াত লাভের একেবারে প্রাথমিক কালেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে সর্বপ্রথম কে ইসলাম গ্রহণ করেন তা নিয়ে বিশিষ্ট আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।[৭৩] এ সম্পর্কে বিভিন্ন রিওয়াতের মধ্যে চার জনের নাম দেখা যায়। তাঁরা হলেন–

১. আবু বকর আছ-সিদ্দিক : ইবরাহীম আন-নাখ'ঈ বলেন, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন আবু বকর ।[৭৪] আবু দাদরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আবু বকর আলী -কে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আমি তোমার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি।" আলী তাঁর এ কথা অস্বীকার করেননি।[৭৫]

২. আলী ইবনু আবী তালিব : সালমান, আবু যারর, মিকদাদ, খাব্বাব, জাবির, আবু সা'ঈদ আল-খুদরী ও যায়িদ ইবনুল আরকাম প্রমুখের মতে আলী সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।[৭৬] ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক বলেন, পুরুষগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন আলী , তখন তাঁর বয়স ছিল দশ বছর।[৭৭]

৩. খাদীজাতুল কুবরা : ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, সাধারণভাবে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহ -এর স্ত্রী খাদীজা বিনতু খুয়াইলিদ ।[৭৮]

৪. যায়িদ ইবনু হারিছাহ : ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন, সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন যায়িদ ইবনু হারিছাহ ।[৭৯]

ঐতিহাসিকদের এ কথাগুলোর সমন্বয়ে বলা যায়-

- সর্বপ্রথম যে নারী ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি হলেন খাদীজা ।[৮০]
- সর্বপ্রথম যে পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি হলেন আবু বকর ।
- সর্বপ্রথম যে কিশোর ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি হলেন আলী ।
- সর্বপ্রথম যে ক্রীতদাস ইসলাম গ্রহণ করেন, তিনি হলেন জায়েদ বিন হারেসা ।[৮১]

---

[৭৩] তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুল মানাকিব, হাদিস নং : ৩৬৬৭।
[৭৪] ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়াতি, খ. ১, পৃ. ৪০।
[৭৫] ইবনু আবদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ. ১, পৃ.২৯৫
[৭৬] আল-মুহিব্ব আত-তাবারী, আর-রিয়াদুন নাদিরাতু .., পৃ. ৩৭।
[৭৭] ইবনু ইসহাক, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ৪৫।
[৭৮] ইবনু ইসহাক, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ৪৫
[৭৯] ইবনুল জাওযী, সিফাতুস সাফওয়াতি, খ. ১, পৃ. ৬৬।
[৮০] (ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ. ৩, পৃ. ৩৬)

সফল ইসলাম প্রচারক

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে সমগ্র মক্কা শহরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াতের চর্চা হতে লাগল এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সর্বত্র আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল। মক্কাবাসীরা এমন অঘটন ঘটবে বলে কখনও মনে করেনি। কেননা, তারা তাঁকে গোটা গোত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং খুব বুদ্ধিমান লোক বলে মনে করত। অতএব, যখনই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন, তখনই চতুর্দিক হতে দলে দলে লোকজন তাঁর কাছে আসতে লাগল। কিছুসংখ্যক লোক তাঁর পিতা আবু কোহাফার কাছে গিয়ে তাঁকেও অনেক কিছু বলল; কিন্তু তিনি এমন নীরবতা অবলম্বন করলেন যে, এ ব্যাপারে একটি শব্দও মুখে আনলেন না।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করে চুপ করে বসে থাকেননি; বরং ইসলাম প্রচারে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাহায্য করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন এবং প্রথমে বন্ধুবান্ধবদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট করার কাজে মনোনিবেশ করলেন বাপদাদার অনুসৃত পন্থা এবং অন্তরের চির-জমাট প্রত্যয় ও আকীদা হতে ফিরে মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এমন নীরব এবং কার্যকর তবলীগ ধারাবাহিকভাবে আরম্ভ করে দিলেন যে, তার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব, যাঁরা মক্কা শহরে খুব সম্মানী ও প্রভাবশালী লোক ছিলেন, তাঁরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নীরব তবলীগে এমনভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়লেন যে, ইসলামরূপ নেওয়ামতকে পায়ে ঠেলে দিতে পারলেন না।

সর্বপ্রথম তিনি নিজের বিশিষ্ট বন্ধু ওসমানের কাছে গেলেন, অনেকক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথায় তিনি এত প্রভাবিত হয়ে পড়লেন যে, তৎক্ষণাৎ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণপূর্বক চির সৌভাগ্য লাভ করলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অতিশয় আনন্দিত হলেন। এর কারণ এই যে, তিনি শুধু তাঁর সম-সাময়িক ধনবান ব্যবসায়ীই ছিলেন না; বরং তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ এবং বিশ্বস্ত বন্ধুও ছিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যদিও পৌত্তলিক বংশে জন্মগ্রহণ করে প্রতিপালিত হয়েছিলেন; কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ন্যায় তাঁর অন্তরে এবং স্বভাবেও সত্যকে কবুল করার যোগ্যতা বিদ্যমান ছিল।

যাহোক, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করার ফলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের মধ্যে অতিমাত্রায় সাহস ও শক্তি অনুভব করতে লাগলেন। এর পরে তিনি তাঁর অন্যান্য

---

[৮১] ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ. ৩, পৃ. ৩৯।

বন্ধুবান্ধবের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। যুবাইর ইবনে আত্তামের কাছে গিয়ে তাঁকে ইসলামের দাওয়াত জানালেন। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলামরূপ নেয়ামত তাঁর সম্মুখে পেশ করলেন। অতঃপর আবদুর রহমান ইবনে আউফের কাছে গিয়ে তাঁকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করলেন। এ মহাপুরুষগণ আবু বকর رضي الله عنه-এর অকপট পরামর্শ ও উপদেশবাণী শুনে এত মোহিত হয়ে পড়লেন যে, সেই মুহূর্তেই তাঁরা নবী করীম صلى الله عليه وسلم-এর দরবারে গিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। মক্কা শহরে এঁরা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার এমন মুসলমান ছিলেন, যাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বদিক দিয়ে অসাধারণ প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরে এঁদের অকপট বিশ্বাস এবং ঈমানের দৃঢ়তা হতেই অনুমান করা যেতে পারে যে, মদিনায় হিজরত করে যাওয়ার পর যে দশজন মুসলমানকে বেহেশতী হওয়ার খোশখবর প্রদান করেছিলেন, এ চারজন মহামানবও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত।

এখন হতে আবু বকর رضي الله عنه-এর প্রচারে ও প্রচেষ্টায় এ চারজন মহাপুরুষও অংশগ্রহণ করলেন। এর পরে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করলেন, তাঁদের মধ্যে আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ, আসমা বিনতে আবু বকর, আবু সালামা ইবনে আব্দুল আসাদ, আরকাম ইবনে আবি আরকাম, উসমান ইবনে মাযউন এবং তাঁর ভাই কুদামা ইবনে মাযউন ও আবদুল্লাহ ইবনে মাযউনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক পূর্বোক্ত মহাপুরুষদের দলে তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহর নামও উল্লেখ করেছেন। তবলীগের এ গোপন প্রচেষ্টা চলতেই থাকল এবং উক্ত মহাপুরুষগণ নিরবচ্ছিন্নভাবে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করতেই থাকলেন। ফলে ওবায়দা ইবনে হারেস, সাঈদ ইবনে যায়েদ, খাব্বাব ইবনে আরত, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, উমাইর ইবনে আবি ওয়াক্কাস প্রমুখ ইসলাম জগতের প্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণও ইসলাম গ্রহণ করলেন।

পৌত্তলিকগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত থেকে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে দেওয়ার পরিণাম যে কত ভয়াবহ এবং বিপদসঙ্কুল তা তিনি ক্ষণিকের জন্যও চিন্তা করেননি। তিনি মক্কার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ব্যবসায়ীরা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের সাথে সদাচার ও সৎ-সম্পর্ক বজায় না রাখলে তাদের ব্যবসায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কাজেই তারা জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে কোনোকিছু করতে সাহস পায় না। সুতরাং ঈমান আনার পর নিজের ব্যবসায়ের খাতিরে নীরব থাকাই তাঁর জন্যে বাঞ্ছনীয় ছিল।

আর এ জন্যে নবী করীম ﷺ-ও তাঁকে কিছু বলতেন না; বরং তাঁর ইসলাম গ্রহণকেই যথেষ্ট মনে করে সন্তুষ্ট ছিলেন; কিন্তু সত্যধর্মের বিস্তার এবং তার উন্নতিসাধন নিজের ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে তিনি ব্যবসায়ের ক্ষতি এবং কাফিরদের অত্যাচার প্রভৃতি অসুবিধার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না; বরং জান ও মালের মায়া পরিত্যাগ করে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যে ইসলামের উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করলেন। পার্থিব ধনসম্পদ, মানসম্ভ্রম, প্রতাপ সবকিছুই তিনি ধর্মের জন্যে উৎসর্গ করে দিলেন।

ইসলাম গ্রহণ করার সময় তাঁর কাছে চল্লিশ হাজার দিরহাম মজুদ ছিল। মুসলমান হয়েও তিনি যথারীতি ব্যবসায়-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে লাগলেন। অবশ্য ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করার ফলে ব্যবসায়ের কাজে অধিক মনোনিবেশ করতে পারতেন না; কিন্তু অসাধারণ লাভ দ্বারা আল্লাহ পাক তাঁর এই ক্ষতিপূরণ করে দিলেন। তাঁর লাভের পরিমাণ পূর্বের চেয়ে কোনো অংশেই কমে যায়নি। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর সমস্ত টাকা-পয়সা ইসলামের জন্যে অকাতরে বিলিয়ে দিতে লাগলেন। পূর্ব সঞ্চিত চল্লিশ হাজার এবং পরবর্তীকালের প্রচুর লাভের সমুদয় টাকা ইসলামের খেদমতে ব্যয় করে যখন তিনি মদিনায় হিজরত করেন, তখন তাঁর কাছে মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে যে সমস্ত ক্রীতদাস তাঁদের কাফির প্রভু কর্তৃক নির্যাতিত হতেন, তিনি তাঁদেরকে খরিদ করে আল্লাহর ওয়াস্তে আযাদ করে দিতেন। তাঁর এ দানের প্রশংসায় স্বয়ং নবী করীম ﷺ বলেন, অর্থ এবং সাহায্য দ্বারা আমার প্রতি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-ই সর্বাপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছে।[৮২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন, "আমার প্রতি এমন কারো অনুগ্রহ নেই যার যথোচিত বিনিময় আমি প্রদান করিনি। কেবল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অসংখ্য অনুগ্রহ আমার ওপর রয়েছে, যার প্রতিদান বা বিনিময় আমি প্রদান করতে পারিনি। আল্লাহ তা'আলাই কিয়ামতের দিন তাঁর এ সমস্ত দান ও অনুগ্রহের যথোচিত বিনিময় প্রদান করবেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ধনসম্পদ আমার যত উপকার করেছে, আর কারো ধনসম্পদে আমি তত উপকৃত হইনি।"[৮৩]

একনজরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণকারী বিখ্যাত সাহাবিগণ :

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন সফল ইসলাম প্রচারক। তাঁর দাওয়াতের ফলে তাঁর পরিবারে তাঁর স্ত্রী উম্মে রুমান, কন্যা আয়েশা ও আসমা, পুত্র আব্দুল্লাহ,

---

[৮২] বুখারী, আল জামে।

[৮৩] তিরমিযি, আস সুনান।

ক্রীতদাস আমিন ইবন ফুহারা দাওয়াতের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু বকরের দাওয়াতে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন-

১. যুবায়ের ইবনে আওয়াম,
২. উসমান বিন আফফান,
৩. তালহা বিন উবাইদুল্লাহ,
৪. সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস,
৫. আব্দুর রহমান ইবনে আওফ,
৬. আবু ওবায়দাহ,
৭. খালিদ ইবনে সাঈদ,
৮. উসমান ইবনে মাযউন,
৯. আবু সালমা,
১০. খালিদ ইবনে সাঈদ,
১১. আরকাম ইবনে আবি আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ

এ সাহাবাগণ ইসলামের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রস্বরূপ। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন; কিন্তু এসব নক্ষত্রের সূর্যস্বরূপ কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ইবাদত ও কুরআন চর্চার সর্বপ্রথম কেন্দ্র

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে ইবাদত ও কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি অত্যধিক মনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি নিজের ঘরের মধ্যে একটি স্থান নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন, পরে ঘরের আঙিনায় একটি মসজিদ তৈরি করেছিলেন। সেখানে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা অনুযায়ী ইবাদত ও কুরআন তিলাওয়াত করতেন, নামায পড়তেন। কুরআন শরীফের যে সকল সূরা ও আয়াত তখন পর্যন্ত নাযিল হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনেই তা তিনি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। প্রত্যেক দিন সে নির্দিষ্ট স্থানে বসে ঐ সূরা ও আয়াতগুলো উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করতেন। তিনি ছিলেন খুবই কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি। তিলাওয়াতের সময় তাঁর চোখ থেকে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হতো। একদিকে আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং সেই সাথে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আবেগঘন আকর্ষণীয় ও সুমিষ্ট সুর কুরাইশ মহিলা ও যুবকদেরকে আকৃষ্ট করতে থাকে। তাদের অনেকেই তাঁর এ হৃদয়গ্রাহী তিলাওয়াত শুনবার জন্যে তাঁর দ্বারে সমবেত হতো।[৮৪] ইসলামের প্রাথমিক প্রচার

---

[৮৪] বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল হিওয়ালাত, হাদিস নং : ২১৩৪।

কেন্দ্র 'দারুল আরকাম' প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বপর্যন্ত আবু বকর এ মসজিদেই তাঁর ইবাদত ও তিলাওয়াত কার্যক্রম চলতে থাকে।

চিত্র : আল-আরকাম গৃহের নতুন চিত্র

প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা

আবু বকর ছিলেন মক্কার অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন বিত্তবান লোক। বলতে গেলে মক্কার সকল লোকই তাঁকে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান-গরিমা, বদান্যতা ও সততার জন্যে ভালোবাসতো। প্রথমদিকে মাত্র কয়েকজন গোলাম, বালক ও মহিলার ইসলাম গ্রহণ শত্রুদের মাথাব্যথার কারণ ছিল না; কিন্তু যেইমাত্র আবু বকর -এর মতো প্রভাবশালী ও সম্মানিত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং এর প্রচারকাজে আত্মনিয়োগ করলেন, তখন শত্রুরা তাঁর ওপর ক্রোধে ফেটে পড়ল। একপর্যায়ে তারা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে মারধরও করেছে।

আয়েশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মক্কায় রাসূলুল্লাহ -এর অনুসারীদের সংখ্যা যখন আটত্রিশে গিয়ে পৌছল, তখন আবু বকর রাসূলুল্লাহ -কে তাঁর নবুওয়াত লাভের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ বললেন, "আবু বকর! আমরা এখনো সংখ্যায় অল্প।" এ কথা বলে এবারও রাসূলুল্লাহ তাঁকে নিরস্ত্র করলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্মত হয়ে গেলেন। এ উদ্দেশ্যে সকল মুসলিম মসজিদে হারামে এসে জমায়েত হলেন। এ সময় আবু বকর আরয করলেন, কুরাইশদের ক্রোধ ও একগুঁয়েমি এখন এমন চরমে পৌছেছে যে, আপনার মুখে তাওহীদের বাণী শুনামাত্রই তারা আপনার ওপর লাফিয়ে পড়বে এবং আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা করবে। আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি আপনার

কথাগুলো ঘোষণা করে দিই। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি পেয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুতবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসা ছিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-ই ছিলেন ইসলামের প্রথম খতীব। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে আহ্বান জানিয়ে তিনিই সর্বপ্রথম খুতবা প্রদান করেন।"

কুরাইশদের অত্যাচার ভোগ

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম প্রচারের ঘোষণার এ সংবাদ মুশরিকদের কাছে পৌছে গিয়েছিল। তারা উত্তেজিত হয়ে মসজিদে এসে মুসলিমদেরকে নির্মমভাবে মারধর করতে লাগল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে পদদলিত করল। উতবা ইবনু রাবী'আহ একজন যালিম ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল। সে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে এগিয়ে আসল এবং চপ্পল দিয়ে তাঁর চেহারায় আঘাত করতে লাগল এবং তাঁর পেটের ওপর উঠে নাচতে লাগল। তাঁকে সে এত নিষ্ঠুরভাবে মারধর করল যে, তাঁর নাক চেপ্টা হয়ে চেহারার সাথে মিশে গেল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিজ গোত্র বনু তায়িম যখন এ খবর পেল, তখন দৌড়ে মসজিদে এল এবং মুশরিকদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সাথে নিয়ে তাঁর ঘরের দিকে গেল। এ সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু সম্পর্কে ঐ সমস্ত লোক প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেহুঁশ অবস্থায় ছিলেন। তাঁরা ফিরে মসজিদে হারামে গেল এবং বলল, যদি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা যায়, তা হলে আমরা উতবাকে অবশ্যই হত্যা করব। অতঃপর তারা আবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে আসল। ইতোমধ্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হুঁশ ফিরে এলে বনু তায়িমের লোকজন এবং তাঁর পিতা আবু কুহাফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে কথা বলার চেষ্টা করলেন। তখন তিনি প্রথম যে কথা বললেন তা হলো, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা কী?" এটা শুনে বনু তায়িমের লোকেরা রেগে গিয়ে তাঁকে তিরস্কার করে চলে গেল এবং তাঁর মাকে তাঁর দেখাশোনা করতে বলল। এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের আম্মাকেও একান্তে একই প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। এরই মধ্যে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বোন উম্মু জামীল রাদিয়াল্লাহু আনহা সেখানে এসে পৌছলেন এবং তাঁর কাছ থেকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ ও নিরাপদে আছেন এবং আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে অবস্থান করছেন, তখন তিনি শান্ত হলেন; কিন্তু তিনি সাথে সাথে এ কথাও বললেন, "আল্লাহর শপথ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজে গিয়ে সচক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে না দেখব, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো পানাহার করব না।" তাই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মু জামীল ও নিজের মাতার সহযোগিতায় তাঁদের ওপর

ভর করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেই এগিয়ে এসে তাঁকে চুমো খেলেন। মুসলিমরাও সমবেদনা জানানোর জন্যে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অবস্থা দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। এ সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কোনো অসুবিধা হয়নি। দুরাচারী ব্যক্তিটি আমার চেহারায় যা আঘাত করেছে তা ছাড়া। ইনি হলেন আমার স্নেহপরায়ণা মা। আপনি একজন বরকতময় সত্তা। আপনি তাঁকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিন এবং তাঁর জন্যে দোয়া করুন! আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আপনার মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।"

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে দোয়া করলেন এবং তাঁকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানালেন। ঐ দিনেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একমাস দারুল আরকামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অবস্থান করলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রহৃত হবার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮৫]

মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একান্ত অনুসারী

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূলূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একান্ত সাথি। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিত্য সহচররূপে জীবন অতিবাহিত করতেন। তাঁরা দুজনে মক্কায় অবস্থানকালে প্রায় এক সাথে থাকতেন। অনুমতি ছাড়া তিনি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। বলতেগেলে ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় মক্কায় তাঁদের দু'জনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইসলাম বিস্তার লাভ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও অভ্যাস ছিল, প্রত্যেক দিন সকাল বা বিকালে অন্তত একবার তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে তাশরীফ আনতেন এবং তাঁর সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন,

لَقَلَّ يَوْمٍ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ.

"এমন দিন কমই গেছে, যে দিন রাসূলুল্লাহ (সা) দিনের দুভাগের কোনো একভাগে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে আসেননি।"[৮৬]

---

[৮৫] আস-সালিহী আশ-শামী, সুবুলল হুদা ওয়ার রাশাদ, খ. ২, পৃ. ৩১৯-৩২০।
[৮৬] বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল বুয়ু, হাদিস নং : ১৯৯৪।

দাসমুক্তিতে অসামান্য অবদান

ইসলাম গ্রহণ করার সময় আবু বকর -এর কাছে চল্লিশ হাজার দিরহাম মজুদ ছিল। মুসলিম হবার পরও তিনি যথারীতি ব্যবসায়-বাণিজ্য চালিয়ে যেতেন। অবশ্যই ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করার ফলে ব্যবসায়ের কাজে অধিক মনোনিবেশ করতে পারতেন না; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর ব্যবসায় অসাধারণ লাভ দান করেন। তাঁর লাভের পরিমাণ পূর্বের চেয়ে কোনো অংশেই কমে যায়নি। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর সকল অর্থ-সম্পদ গরিব ও অসহায় গোলামদের জন্যে অকাতরে বিলিয়ে দেন। পূর্বসঞ্চিত চল্লিশ হাজার দিরহাম এবং পরবর্তীকালের প্রচুর লাভের সমস্ত অর্থ-সম্পদ গরিব মুসলিমদের কল্যাণে ব্যয় করে যখন তিনি মদিনায় হিজরত করেন, তখন তাঁর কাছে মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল।[৮৭]

আবু বকর যেসব গোলামকে খরিদ করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তাঁদের সংখ্যা ছিল সাত। 'উরওয়া থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, "আল্লাহর পথে নির্যাতিত হতো এরূপ সাত জন দাস-দাসীকে আবু বকর নিজের অর্থ দ্বারা মুক্ত করেন।" কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে কয়েকজন বেশি হতে পারে। নিচে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো–

১. বিলাল ইবনে রাবাহ আল-হাবশী : মক্কায় প্রথম পর্যায়ে যারা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেছিলেন, বিলাল ছিলেন তাঁদের একজন।[৮৮] বিলাল মক্কার জনৈক পাপিষ্ঠ কাফির উমাইয়াহ ইবনে খালফের ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি একজন অতি পবিত্র মনের সাচ্চা ও ঈমানের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অকুতোভয় ঈমানদার ছিলেন। যখন বিলাল -এর ইসলাম গ্রহণের কথা তাঁর মুনিব জানতে পারল, তখন থেকে সে তাঁর ওপর অকথ্য ও অবর্ণনীয় নির্যাতন আরম্ভ করে দিল। সে তাঁকে দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত মরু বালুকার ওপর শায়িত করে পিঠের ওপর ভারী পাথরখণ্ড চাপিয়ে দিত, যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। লোহার শলাকা আগুনে গরম করে তা দ্বারা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় দাগ দিত। এরপর সে বলত, ইসলাম ছেড়ে দাও। নয়তো তোমাকে এভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তখন তাওহীদের পাগল বিলাল শুধু 'আহাদ' 'আহাদ' (অর্থাৎ আল্লাহ এক, আল্লাহ এক) উচ্চারণ করতেন। তারপর ঐ নরাধম তাঁর গলায় একটি রশি বেঁধে দুষ্ট ছোকড়াদের হাতে তাঁকে

---

[৮৭] ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ. ২, পৃ. ১৫২।
[৮৮] ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ, বাব : ফী বিলাল (রা.) ওয়া ফাদলিহী খ. ৭, পৃ. ৫৩৭।

ছেড়ে দিত। তারা তাঁকে মক্কার কঙ্করময় অলি-গলিতে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যেত। এসব মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে সে খুব আনন্দ পেত এবং অট্টহাসি করত।

একদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উমাইয়ার ঘরের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। ঠিক সে সময়ে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর উমাইয়ার নিষ্ঠুর নির্যাতন চলছিল। তিনি এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে মনোবেদনায় অস্থির হয়ে পড়েন। উমাইয়াহকে উপদেশ দিলেন, বুঝাতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু সে উল্টো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দায়ী করে বলল, "তুমিই তো তাঁকে নষ্ট করে দিয়েছ! যদি তোমার দরদ থাকে, তবে তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও।" সাথে সাথে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আচ্ছা, আমার কাছে বিলালের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও সাহসী এবং তোমারই ধর্মের অনুসারী একজন কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম রয়েছে, আমি তাকে বিলালের বিনিময়ে তোমাকে দিতে চাই! উমাইয়াহ এ কথার ওপর সম্মত হলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাড়িতে গিয়ে তাঁর ঐ গোলাম নিয়ে আসেন এবং তাকে বিলালের বিনিময়ে দান করে বিলালকে গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তাঁকে আযাদ করে দেন।[৮৯] কোনো কোনো রিওয়ায়াতে রয়েছে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ৭ উকিয়া, মতান্তরে ৫ কিংবা ৪০ উকিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে খরিদ করেছিলেন।[৯০] ইবনু 'আসাকির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ বেচাকেনার পর কাফিররা মন্তব্য করে যে, আমরা এক উকিয়া কম হলেও তাকে বিক্রি করে দিতাম। অপরদিকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেন–

لَوْ أَبَوْا إِلَّا مِائَةَ أُوقِيَةٍ لَاشْتَرَيْتُهُ بِهَا

"তারা একশত উকিয়ার কম তাঁকে বিক্রি করতে সম্মত না হলে আমি তাদের দাবির সর্বসাকুল্য পরিশোধ করেই তাঁকে অবশ্যই খরিদ করতাম।"[৯১]

এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে সমুদয় ঘটনা খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই খুশি হন এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কল্যাণের জন্যে দোয়া করেন।[৯২]

২. আমির ইবনে ফুহাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু : নবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুল আরকামে প্রবেশ করার আগেই আমির ইবনে ফুহাইরা ইসলাম গ্রহণ করেন। আমির ইবনে ফুহাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বৈপিত্রিক ভাই আযদ গোত্রের তুফাইল ইবনে আবদিল্লাহ ইবনি সাখবারাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ক্রীতদাস ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁকে নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হতে

---

৮৯ ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৩১৭
৯০ যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ. ১, পৃ. ৩৫৩
৯১ ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ. ১০, পৃ. ৪৪২
৯২ ইবনু 'আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ. ১০, পৃ. ৪৪৪।

হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে ইসলামের ওপর অবিচল থাকেন। আবু বকর যখন তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তাঁকেও ক্রয় করে আযাদ করে দেন।[৯৩]

৩. আবু ফুকাইহাহ আল-জাহমী : তাঁর প্রকৃত নাম ইয়াসার।[৯৪] তিনি নবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার ক্রীতদাস ছিলেন।[৯৫] ইসলাম ত্যাগ করার জন্যে তাঁর ওপর কঠোর নির্যাতন চালানো হতো; কিন্তু তিনি অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে ইসলামের ওপর সুদৃঢ় থাকেন। দুপুরবেলা প্রখর রৌদ্রের সময় পায়ে লোহার শিকল পরিয়ে তাঁকে মরুপথ দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে উত্তপ্ত বালুকারাশির ওপর শোয়ানো হতো, অতঃপর পিঠের ওপর ভারী পাথর রেখে দেওয়া হতো, যাতে তিনি নড়াচড়া করতে না পারেন। এ অবস্থায় তিনি নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়তেন।[৯৬] একদিন নরাধম উমায়াহ ইবনে খালফ তাঁকে পায়ে রশি বেঁধে টেনে-হেঁচড়ে উত্তপ্ত বালুকারাশিতে নিয়ে আসে। এরপর সে গলায় রশি বেঁধে তাঁকে এমনভাবে ফাঁস দিতে লাগে যে, তাঁর প্রাণ বের হবার উপক্রম হয়। ঘটনাক্রমে এমন সময় আবু বকর সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু ফুকাইহাহ -এর এ অবস্থা দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি তাঁকে খরিদ করে আযাদ করে দেন।[৯৭]

৪. যিন্নীরাহ : তিনি নবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন। যিন্নীরাহ বনু 'আবদিদ্দারের ক্রীতদাসী ছিলেন। ইসলাম ত্যাগ করার জন্যে তাঁর ওপর কঠোর নির্যাতন চালানো হতো; কিন্তু তিনি অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে ইসলামের ওপর সুদৃঢ় থাকেন। আবু জাহল তাঁকে নির্মমভাবে নির্যাতন করত।[৯৮] আবু বকর তাঁর এ নির্যাতনের কথা জানতে পেরে তাঁকে খরিদ করে আযাদ করে দেন।[৯৯]

৫. জারিয়াতু বনী আমর ইবনি মু'আম্মাল : নবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় জারিয়াতু বনী আমর ইবনি মু'আম্মাল ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বনু মু'আম্মালের একজন ক্রীতদাসী ছিলেন।[১০০] তাঁর মুনিবের নাম জানা যায়নি। ওমর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁকে এমন নির্দয়ভাবে নির্যাতন করতেন যে, প্রহার করতে করতে তিনি নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তখন বলতেন, "আমি

---

৯৩ সাফাদী, আল-ওয়াফী ..., খ. ৫, পৃ. ৩২১।
৯৪ ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ. ১, পৃ. ৬৭
৯৫ ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৪, পৃ. ১২৩
৯৬ ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৪, পৃ. ১২৩।
৯৭ ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৪।
৯৮ ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ. ৩, পৃ. ৪৯৩।
৯৯ ইবনু 'আবদিল বারর, আল-ইস্তি'আব, খ. ২, পৃ. ৯৭।
১০০ ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৮, পৃ. ২৫৬

একটু বিশ্রাম নিই, তারপর আবার তোমাকে ধরব।" কিন্তু তিনি অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে জবাব দিতেন, "আল্লাহ তা'আলাও তোমার সাথে এরূপ আচরণ করবেন।"[১০১] আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে খরিদ করে আযাদ করে দেন।

৬. নাহদিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা ও ৭. বিনতুন নাহদিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা : নাহদিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা ও তাঁর মেয়ে উভয়েই বনু আবদুদ্দারের জনৈকা মহিলার ক্রীতদাসী ছিলেন। নবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম ত্যাগ করার জন্যে তাঁদের ওপরও কঠোর নির্যাতন চালানো হতো; কিন্তু তাঁরা অসীম ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে ইসলামের ওপর সুদৃঢ় থাকেন। একদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন যে, তাঁরা মুনিবের আটা পিষছেন। এ সময় তাঁদের মুনিব শপথ করে বলল যে, "আমি কখনো তোমাদের আযাদ করে দেব না।" এ কথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "অমুকের মা, তোমার শপথ ভেঙ্গে ফেল। তখন মহিলাটি বলল, "তুমি ভাঙ্গাও। তুমিই তাদের নষ্ট করেছ। অতএব, (যদি পার) তুমি তাদের আযাদ করে দাও।" এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যথাযথ মূল্যের বিনিময়ে তাঁদের খরিদ করে আযাদ করে দেন।[১০২]

৮. উম্মু উবাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা : উম্মু উবাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা বনু যুহরাহ গোত্রের একজন ক্রীতদাসী ছিলেন।[১০৩] নবুওয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর ওপরও কঠোর নির্যাতন চালানো হতো। ঐতিহাসিক বালাযুরী (রহ.) বলেন, আসওয়াদ ইবনে আবদ ইয়াগুছ নামক জনৈক পাপিষ্ঠ তাঁকে নির্যাতন করত। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর দুঃখ-কষ্টের কথা জানার পর তাঁকে খরিদ করে আযাদ করে দেন।[১০৪]

হিজরতের উদ্দেশে আবিসিনিয়া অভিমুখে যাত্রা

কাফিরদের অত্যাচার ও নির্যাতন ক্রমে এতই বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। কীভাবে এ নিরীহ ও নির্যাতিত মুসলিমদেরকে এ হিংস্র কাফিরদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়– তা তিনি ভাবতে লাগলেন। সাথে সাথে এও তিনি দেখতে পেলেন, জীবন উৎসর্গকারী মুসলিমদের পক্ষে মক্কা ভূখণ্ডে প্রকাশ্যে আল্লাহর ইবাদত করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশেষে তিনি নির্যাতিত মুসলিমদেরকে হাবশায় হিজরত করে চলে যাওয়ার জন্যে অনুমতি দেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,

---

১০১ ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৩১৯।
১০২ ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৪৯৩।
১০৩ বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, খ. ১, পৃ. ৮৪।
১০৪ ইবনু হাজার, আল-ইসাবাহ, খ. ৪, পৃ. ১০৭।

আমাকেও অন্যান্য মুহাজিরের সাথে হাবশায় হিজরত করে চলে যাওয়ার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকেও অনুমতি দিলেন।[১০৫]
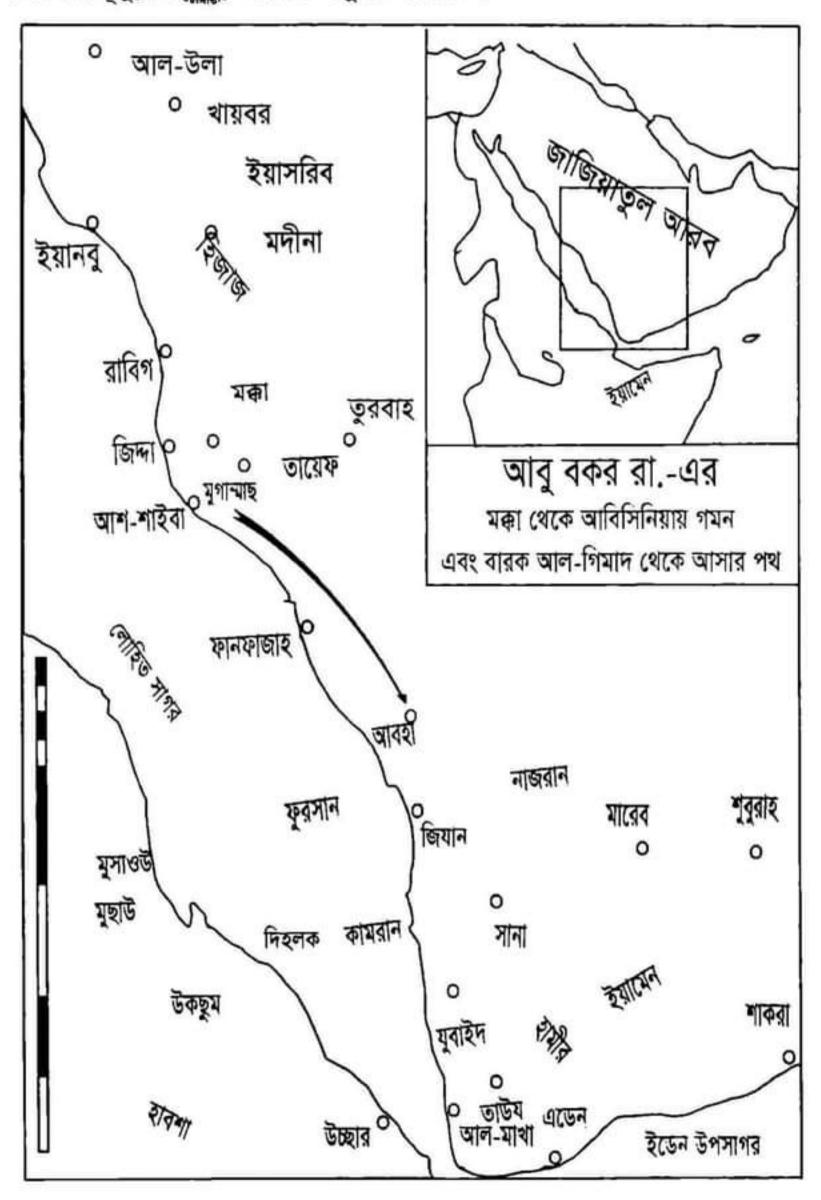
১০৫ ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ২০৪।

ইবনুদ দাগিনাহ-এর নিরাপত্তায় মক্কায় ফিরে আসা

নির্যাতিত মুসলিমদের এ কাফেলা আবু বকর -সহ জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে হাবশার উদ্দেশে রওয়ানা করল; কিন্তু বারকুল গিমাদ পৌছলে কারাহ গোত্রের নেতা ইবনুদ দাগিনাহর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। ইবনুদ দাগিনাহ জানতে চাইলেন, " আবু বকর , আপনি কোথায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন?" আবু বকর বললেন, "আমার গোত্র আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি যমীনে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াব এবং আমার রবের (নির্বিঘ্নে) ইবাদত করব।" এ কথা শুনে ইবনুদ দাগিনাহ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, "আপনার মতো লোক না দেশ ত্যাগ করে চলে যেতে পারে, না বিতাড়িত হতে পারে! আপনি তো নিঃস্বের উপার্জনের ব্যবস্থা করেন, আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, দুর্বলের বোঝা বহন করেন, অতিথির আদর-আপ্যায়ন করেন এবং সত্যপথের যাত্রীদের বিপদে সহযোগিতা করেন। আমি আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিলাম। আপনি ফিরে চলুন এবং নিজের দেশেই আপনার রবের ইবাদত করুন।"

এরপর ইবনুদ দাগিনাহ আবু বকর -কে সাথে নিয়ে মক্কায় আসলেন এবং কুরাইশের বিশিষ্টজনদের কাছে গিয়ে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করে বললেন, এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা এরূপ একজন ব্যক্তিকে শহরে অবস্থান করতে দিচ্ছ না। কুরাইশরা ইবনুদ দাগিনাহর বিরোধিতা করলো না। তারা বলল, আমরা তাঁকে মক্কায় থাকতে দিতে পারি। আপনি তাঁকে বলুন, "সে তার ঘরে নির্জনে তার রবের ইবাদত করবে। সেখানে নামায আদায় করবে, যা ইচ্ছা পড়বে; কিন্তু আমাদের কষ্ট দেবে না এবং প্রকাশ্যে এসব কিছু করবে না। কেননা আমাদের ভয় হয় যে, সে আমাদের স্ত্রী-পরিজনকে বিভ্রান্ত করে ফেলবে।"

কুরাইশের এসব কথা ইবনুদ দাগিনাহ আবু বকর -কে বললেন। আবু বকর -ও প্রথম প্রথম তাদের কথামতো গোপনে নিজের ঘরের মধ্যে 'ইবাদত ও তিলাওয়াত করতেন। এভাবে কিছুদিন অতিক্রান্ত হবার পর তিনি নিজের ঘরের আঙিনায় একটি মসজিদ তৈরি করে সেখানে নামায আদায় করতেন, তিলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতেন।

আমি একমাত্র আল্লাহর নিরাপত্তা কামনা করছি

আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং সেই সাথে আবু বকর -এর আবেগপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সুমিষ্ট স্বর কুরাইশ মহিলা ও যুবকদের আকৃষ্ট করতে থাকে। এতে কুরাইশ নেতৃবর্গ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ইবনুদ দাগিনাহর কাছে অভিযোগ করে যে, আবু বকর তাঁর কথা রাখছেন না। আপনি তাঁকে বলুন, যদি তিনি আপনার আশ্রয়ে থাকতে চান, তা হলে যেন কথামতো গোপনভাবে ইবাদত ও কুরআন

তিলাওয়াত করেন। যদি তিনি এতে সম্মত না হন, তা হলে যেন আপনার আশ্রয় থেকে বের হয়ে যান। ইবনুদ দাগিনাহ যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এ কথা বললেন, তখন তিনি জবাব দেন,

فَإِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ. وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"আমি আপনার যিম্মায় থাকতে চাচ্ছি না। আল্লাহর আশ্রয়ের ওপরই আমি সন্তুষ্ট আছি।"[১০৬]

এরপর ইবনুদ দাগিনাহ কুরাইশের উদ্দেশে বললেন, "আমার আশ্রিত ব্যক্তি ইবনু আবী কুহাফাহ আমার আশ্রয় ত্যাগ করেছে। এখন তাকে তোমাদের হাতে ছেড়ে দিলাম।" ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক (রহ.) বলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবনুদ দাগিনাহর আশ্রয় ছেড়ে বের হয়ে কা'বা ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে কুরাইশের জনৈক নরাধমের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সে তাঁর মাথার ওপর কিছু মাটি ছড়িয়ে দেয়। এ সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পাশ দিয়ে ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরাহ অথবা আস ইবনু ওয়া'য়িল যাচ্ছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তুমি কি দেখছ না! এ মূর্খ ব্যক্তিটি কি করছে।" সে বলল, "তুমি তো নিজেই এরূপ আচরণ করেছ।" এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

أَيْ رَبِّ. مَا أَحْلَمَكَ! أَيْ رَبِّ. مَا أَحْلَمَكَ! أَيْ رَبِّ. مَا أَحْلَمَكَ!

"আমার রাব্ব, তুমি কতই না ধৈর্যশীল! হে আমার রাব্ব, তুমি কতই না ধৈর্যশীল! হে আমার রাব্ব, তুমি কতই না ধৈর্যশীল!"[১০৭]

শি'আবে আবী তালিবে স্বেচ্ছায় অন্তরীণ বরণ

নবুওয়াতের সপ্তম সালে কুরাইশের কাফিররা সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এবং তাঁর সাথে গোটা বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব গোত্রের সমস্ত লোককে অবরুদ্ধ করে তাদের পানাহারের ও যোগাযোগের সকল পথ বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে তারা অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। এ মর্মে তাদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্রও সম্পাদিত হয় এবং এটি কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এর ফলে আবু লাহাব ছাড়া বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের মুসলিম-অমুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশু নির্বিশেষে সবাই শি'আবে আবী তালিবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এখানে তাঁরা খাদ্য ও পানীয় বস্তুর অভাবে ভীষণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে

---

[১০৬] বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল মানাকিব, হাদিস নং : ৩৬১৬।
[১০৭] ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, খ. ৩, পৃ. ১১৯।

তিন বছর অতিবাহিত করেন। আবু বকর আছ-সিদ্দিক বনু হাশিম কিংবা বনু মুত্তালিব বংশের লোক ছিলেন না বলে এ চুক্তিপত্রের আওতায় পড়েন না। তথাপি তিনি স্বেচ্ছায় হাশিমীদের সাথে গিয়ে অন্তরীণ বরণ করলেন এবং তাঁদের সাথে দুঃখ-কষ্টে অংশীদার হলেন।[১০৮]

তিন বছরের নানাবিধ অবর্ণনীয় দুঃখ ভোগ করার পর আল্লাহর কুদরতে কা'বা ঘরে লটকানো চুক্তিপত্রটি উইপোকা খেয়ে ছারখার করে ফেলে। তবে যেখানে যেখানে আল্লাহর নাম ছিল, তা-ই অবশিষ্ট থাকে। এতে অনেক লোকেই বিস্ময়াভিভূত হয়ে রাসূলুল্লাহ -এর প্রতি অত্যাচার করতে অসম্মতি প্রকাশ করলে তাদের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়। ফলে কাফিররা অবরোধ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এতে রাসূলুল্লাহ নিজের গোত্রের লোকজনসহ মুক্তি পেলেন। সেই সাথে আবু বকর -ও মুক্তি পেলেন। আবু তালিব এ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে একটি কবিতা রচনা করেন। এর একটি চরণ হলো নিম্নরূপ–

"মক্কাবাসীরা সাহল ইবনু বাইদা' কে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়ে দিল। ফলে আবু বকর ও মুহাম্মদ আনন্দিত হন।"[১০৯]

জামাই-শ্বশুর বন্ধনে আবদ্ধ

রাসূলুল্লাহ -এর স্ত্রী খাদীজা ও চাচা আবু তালিব মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েন। এরপর অধিকাংশ সময় তাঁকে উদাস ও চিন্তিত দেখা যেত। এ সময় খাওলাহ বিনতু হাকীম আয়েশা -এর সাথে রাসূলুল্লাহ -এর বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। অবশ্য এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ -কে দু'বার (মতান্তরে তিনবার) স্বপ্নে অবহিত করা হয়েছিল।[১১০] তাই এতে তিনি সম্মতি প্রকাশ করেন। খাওলাহ আয়েশা -এর মাতা উম্মু রূমান -এর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। তিনি আবু বকর -এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেন। আবু বকর বলেন, আমি যুবাইর ইবনে মুত'ইম -এর সাথে কথা দিয়ে ফেলেছি; কিন্তু যখন যুবাইর ইবনে মুত'ইম -এর সাথে পুনরায় এ ব্যাপারে আলোচনা হলো, তখন তিনি এ ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করেন। এবার আবু বকর সুযোগ পেয়ে যান। তিনি পাঁচশত দিরহাম মহরের বিনিময়ে আয়েশা -এর সাথে রাসূলুল্লাহ -এর বিয়ের আকদ সুসম্পন্ন করেন। সময়টি ছিল নবুওয়াতের একাদশ বর্ষের শাওয়াল মাস। তখন আয়েশা -এর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। হিজরতের ১ম বছর

১০৮ ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৩৫০-১।
১০৯ ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, খ. ১, পৃ. ৩৭৭
১১০ বুখারী, আস-সাহীহ, ৩৬০৬, ৪৬৮৮, ৬৪৯৪;

শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ঘরে তুলে আনেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র নয় বছর।[১১১] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিজরতের পর আমার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার পরিবারকে ঘরে তুলছেন না কেন?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন, 'মাহর' অর্থাৎ মহর আদায়ের অক্ষমতার কারণে। এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই সাড়ে বারো উকিয়া (অর্থাৎ ৬০০ দিরহাম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ তা আমার কাছে পাঠিয়ে দেন এবং আমাকে তাঁর ঘরে তুলে নেন।[১১২] বস্তুত এ নতুন আত্মীয়তার মাধ্যমে সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্থান আরো বৃদ্ধি পেল।

মিরাজের ঘটনাকে বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস

ইবনে কাইয়িম বলেছেন : "যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালবেলায় স্বগোত্রীয় লোকদের কাছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মিরাজের রজনীতে প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহের কথা বর্ণনা করলেন, তখন তারা এসব কিছুকে মিথ্যা ও আজগুবি গল্প বলে উড়িয়ে দিল। শুধু তাই নয়, তারা তাঁকে নানাভাবে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে থাকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। তারা বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে তাঁকে নানা প্রশ্ন করতে থাকে এবং উত্তরের জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করে। এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর দৃষ্টির সামনে বাইতুল মুকাদ্দাসের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি সেই চিত্র প্রত্যক্ষ করে তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে থাকেন। এর ফলে নির্দ্বিধায় তাদের সকল প্রশ্নের জবাব দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। তারা তাঁর কোনো কথার প্রতিবাদ করতে সক্ষম হয়নি।

তাছাড়া যাতায়াতের সময় তাদের যে কাফেলা তিনি দেখেছিলেন, তার আগমনের সময় এবং বিবরণও তিনি বর্ণনা করে শোনালেন। এমনকি কাফেলার অগ্রগামী উটের চিহ্নও তিনি বলে দিলেন। তাছাড়া কাফেলার যে যা কিছু বলেছিল সবকিছুই সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে গেল; কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরাইশ-মুশরিকগণ এসবকে কিছুতেই সত্য বলে মেনে নিতে চাইল না।[১১৩]

অপরদিকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসব কথা শোনামাত্র একে সত্য বলে মেনে নেন এবং এর সত্যতার ঘোষণা দিতে থাকেন। এ সময়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে 'সিদ্দিক'

১১১ আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদিস নং : ২৪৫৮৭
১১২ হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, কিতাবু মা'আরিফাতিস সাহাবাহ, হাদিস নং : ৬৭৯১।
১১৩ সহীহ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৬৮৬

উপাধিতে ভুষিত করা হয়। কারণ সকলে যখন এ ঘটনাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছিল তখন তিনি একে সর্বান্তকরণে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।[১১৪]

মদিনায় হিজরতকালে রাসূলুল্লাহ -এর সঙ্গী

হিজরতসংক্রান্ত এ বাণী প্রাপ্ত হওয়ার পর নবী করীম ঠিক দুপুরে আবু বকরের ঘরে তাশরীফ আনয়ন করলেন। উদ্দেশ্য ছিল হিজরতের সময় এবং উপায় সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। আয়েশা বর্ণনা করেছেন, "আমরা আব্বার (আবু বকরের) বাড়িতে ঠিক দুপুরে বসেছিলাম, তখন জনৈক ব্যক্তি এসে খবর দিল যে, নবী করীম মাথা ঢেকে এদিকে আসছেন। এটা দিনের এমন সময় ছিল, যে সময় রাসূলুল্লাহ সাধারণত কোথাও যেতেন না। আবু বকর বললেন : "আমার মাতা-পিতা আপনার জন্যে উৎসর্গ হোক, আপনি এ সময় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্যে এসেছেন?"

'আয়েশা বর্ণনা করেছেন : "রাসূলুল্লাহ ভেতরে আসার অনুমতি চাইলেন। তাঁকে ভেতরে আসার অনুমতি দেওয়া হলে তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর আবু বকর -কে বললেন : "আপনার কাছে যে সকল লোক রয়েছে তাদের সরিয়ে দিন।"

আবু বকর বললেন : "যথেষ্ট, আপনার গৃহিণী ছাড়া এখানে আর কেউই নেই। আপনার প্রতি আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক, হে আল্লাহর রাসূল ।"

তিনি বললেন : "ভালো, হিজরত করার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে আমাকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।"

আবু বকর বললেন : "সাথে .... হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক।" রাসূলুল্লাহ বললেন: "হ্যাঁ"।[১১৫]

অতঃপর হিজরতের সময়-সূচি নির্ধারণ করে রাসূলুল্লাহ নিজের ঘরে ফিরে আসেন। আবু বকর রাতের আগমনের জন্যে অপেক্ষায় রইলেন।

---

১১৪ ইবনে হিশাম, পৃ. ৩৯৯।
১১৫ সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ.. ৫৫৩।
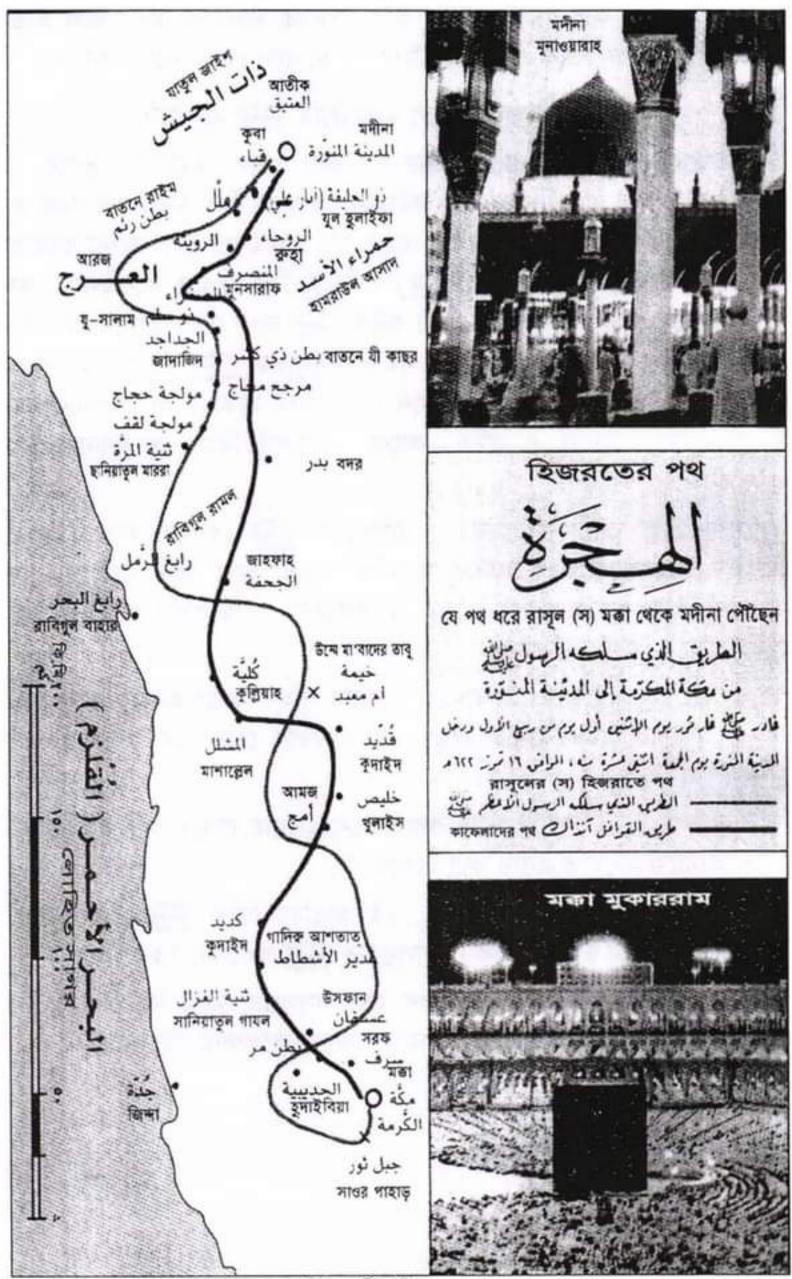
চিত্র : মদীনা হিজরতের পথ

সওর গুহায় নবী মুহাম্মদ ﷺ ও আবু বকর رضي الله عنه

রাসূলুল্লাহ ﷺ ২৭শে সফর ১৪ নবুওয়াত সাল মোতাবেক ১২/১৩ই সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রিস্টাব্দ মধ্যরাতের সামান্য কিছু সময় পর নিজ ঘর থেকে বের হয়ে জান-মালের ব্যাপারে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সঙ্গী আবু বকর رضي الله عنه-এর ঘরে যান। সেখান থেকে পেছনের একটি জানালা দিয়ে বের হয়ে দুজনেই ভিন্ন পথ বেয়ে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকেন, যাতে রাতের অন্ধকার থাকতেই তাঁর মক্কা নগরীর বাইরে চলে যেতে পারেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন যে, কুরাইশগণ তাঁকে দেখতে না পেয়ে সর্বশক্তি দিয়ে তাঁর সন্ধানে লেগে যাবে। তারা সর্বপ্রথম যে রাস্তায় দৃষ্টি দেবে তা হচ্ছে মদিনার কর্মব্যস্ত রাস্তা যা উত্তর দিকে গেছে। এজন্যে তাঁরা সেই পথে যেতে থাকলেন যে পথটি ছিল পথের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী অর্থাৎ ইয়েমেন যাওয়ার পথ। যা মক্কার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল। এ পথ ধরে পাঁচ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে সুপ্রসিদ্ধ সওর পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে পৌছলেন। এ পাহাড়টি ছিল খুব উঁচু, পর্বত-শীর্ষে আরোহণের পথ ছিল আঁকা-বাঁকা ও পাক জড়ানো। আরোহণের ব্যাপারটিও ছিল খুবই কষ্ট-সাধ্য। এ পাহাড়ের গায়ে এখানে সেখানে ছিল প্রচুর ধারালো পাথর যা রাসূলুল্লাহর ﷺ পদ-যুগলকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছিল। বলা হয়েছে যে, তিনি পদচিহ্ন গোপন করার জন্যে আঙুলের ওপর ভর দিয়ে চলছিলেন। এজন্যে তাঁর পা জখম হয়ে গিয়েছিল। আবু বকর رضي الله عنه-এর সহায়তায় তিনি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত গুহার পাশে গিয়ে পৌছলেন। এ গুহাটিই ইতিহাসে **'গারে সওর বা সওর গুহা'** নামে পরিচিত।
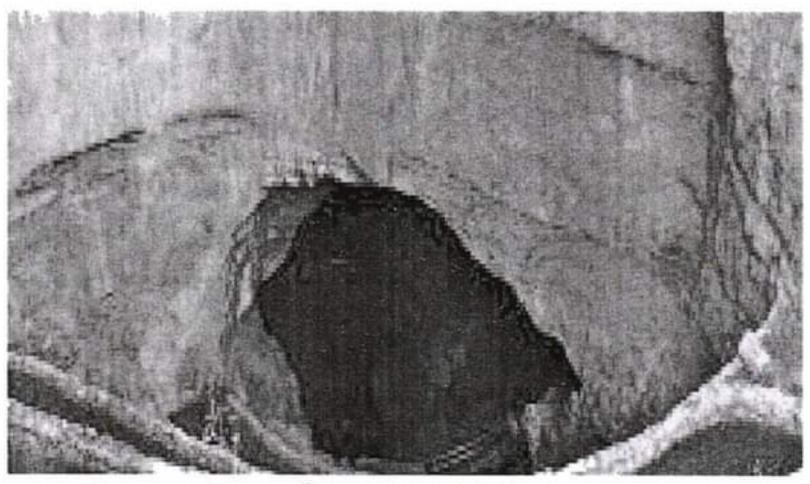
চিত্র : সওর গুহার প্রবেশদ্বার

গুহার কাছে গিয়ে আবু বকর বললেন : "আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি এখন গুহায় প্রবেশ করবেন না। প্রথমে আমি ঢুকে দেখে নিই এখানে অসুবিধাজনক কোনোকিছু আছে কি-না। যদি তেমন কিছু থাকে তাহলে প্রথমে তা আমার সম্মুখীন হবে এবং এর ফলে আপনাকে প্রাথমিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। একথা বলার পর আবু বকর গুহার ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং প্রথমে গুহাটি পরিষ্কার করে নিলেন। গুহার এক পাশে কতকগুলো ছিদ্র ছিল। নিজের কাপড় টুকরো টুকরো করে তিনি ছিদ্রপথের মুখগুলো বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু কাপড়ের টুকরোর ঘাটতির কারণে দু'টি ছিদ্রের মুখ বন্ধ করা সম্ভব হলো না। আবু বকর ছিদ্র দু'টির মুখে নিজ দু'টি পা দিয়ে বন্ধ করার পর ভেতরে আসার জন্যে রাসূলুল্লাহ -এর কাছে আরয পেশ করলেন। তিনি ভেতরে প্রবেশ করে আবু বকর -এর উরুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে আবু বকরের পায়ে ছিদ্রের মধ্যে থাকা সাপ কিংবা বিচ্ছু কোনো কিছুতে দংশন করল। তিনি বিষে কাতর হয়ে উঠলেন অথচ নড়াচড়া করলেন না এ ভয়ে যে, এর ফলে রাসূলুল্লাহ -এর ঘুম ভেঙে যেতে পারে। এদিকে বিষের তীব্রতায় তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকল এবং সেই অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ল রাসূলুল্লাহ -এর মুখমণ্ডলের ওপর। এর ফলে তাঁর ঘুম ভেঙে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন: "আবু বকর ! তোমার কী হয়েছে"?

তিনি আরয করলেন! "আমার মাতা-পিতা আপনার জন্যে কুরবান হোক। গর্তের ছিদ্র পথে কোনোকিছুতে আমার পায়ে কামড় দিয়েছে। এ কথা শোনে রাসূলুল্লাহ নিজের মুখ থেকে কিছুটা লালা নিয়ে সেই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। ফলে আবু বকরের দংশনজনিত বিষব্যথা দূর হয়। এ পাহাড় গুহায় তাঁরা উভয়ে একাধারে তিন রাত (শুক্র, শনি ও রবিবার) অবস্থান করলেন।

রাসূলুল্লাহ ও আবু বকর যে পাহাড় গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন অনুসন্ধানকারিগণ সেই গুহার প্রবেশ পথের কাছাকাছি পৌছে গেল, কিন্তু আল্লাহ আপন কাজে জয়ী হলেন। বুখারী শরীফে আনাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, "আবু বকর বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ -এর সাথে গুহায় থাকা অবস্থায় মাথা তুলে মানুষের পা দেখতে পেলাম। আমি বললাম– হে আল্লাহর নবী ! তাদের মধ্যে কেউ যদি শুধু নিজ দৃষ্টি নিচের দিকে নামায়, তাহলেই আমাদেরকে দেখে ফেলবে।" রাসূল বললেন– "আবু বকর চুপচাপ থাক। আমরা দুজন, আর তৃতীয় জন আছেন আল্লাহ তা'আলা।"

হিজরতে আবু বকর -এর সদস্যদের অবদান

আবু বকর তাঁর পরিবারের সদস্য ও গোলামদের ইসলাম গ্রহণ করিয়েই ক্ষান্ত হননি। তিনি তাঁদেরকে ইসলামের খিদমত করার মানসিকতাসম্পন্ন হিসেবে যোগ্য করে গড়ে তোলেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা হিজরতের সময় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

১. আব্দুল্লাহ বিন আবু বকরের অবদান : আবু বকর -এর পুত্র আব্দুল্লাহও ঐ সময় একই সাথে সেখানে রাতযাপন করতেন। আয়েশা -এর বর্ণনামতে, তিনি ছিলেন একজন কর্মঠ, বুদ্ধিমান ও ধীশক্তিসম্পন্ন যুবক। সকলের অগোচরে রাত গভীর হলে তিনি সেখানে যেতেন এবং সাহরীর সময়ের আগেই মক্কায় ফিরে এসে মক্কাবাসীদের সাথে মিলিত হতেন। এতে মনে হতো যেন তিনি মক্কাতেই রাতযাপন করেছেন। গুহায় আত্মগোপনকারিগণের বিরুদ্ধে মুশরিকগণ যেসব ষড়যন্ত্র করত, তা খুবই সঙ্গোপনে তিনি তাঁদের কাছে পৌছে দিতেন।

২. ক্রীতদাস আমির বিন ফুহাইরার অবদান : এদিকে আবু বকর -এর গোলাম আমির বিন ফুহাইরা পর্বতের ময়দানে ছাগল চরাত। যখন রাতের এক অংশ অতিবাহিত হয়ে যেত, তখন সে ছাগল নিয়ে গারে সওরের নিকটে যেত। আত্মগোপনকারী প্রিয় নবী এবং তাঁর সাহাবি -কে দুধ পান করাত। আবার প্রভাত হওয়ার আগেই সে ছাগলের পাল নিয়ে দূরে চলে যেত। পর পর তিন রাতই সে এরূপ করল। তাছাড়া আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর -এর যাতায়াতের পথে তাঁর পায়ের চিহ্নগুলো যাতে মিশে যায় তার জন্যে আমির বিন ফুহাইরা সেই পথে ছাগল চরাতে নিয়ে যেত।

৩. আয়েশা -এর অবদান : রাসূলুল্লাহ যখন আবু বকর -এর কাছে হিজরত সম্পর্কে বলেন তখন আয়েশা শুনতে পান। তিনি হিজরতের জন্যে খাবার তৈরি ও পানি সংগ্রহ করে দেন। এমনকি তাঁর তৈরি করা খাবার নিয়েই রাসূলুল্লাহ হিজরতের উদ্দেশে রওয়ানা করেন।

৪. আসমা -এর অবদান : হিজরতে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে আসমা বিনতে আবু বকর সফরের সামগ্রী নিয়ে এলেন, কিন্তু তাতে ঝুলানোর জন্যে বাঁধার রশি লাগাতে ভুলে গিয়েছিলেন। যখন যাত্রার সময় হয়ে এল এবং আসমা সামগ্রী ঝুলাতে গিয়ে দেখলেন তাতে রশি নেই, তখন তিনি তাঁর কোমরবন্ধ

খুললেন এবং তা দুভাগে ভাগ করে ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর এক অংশের সাহায্যে সামগ্রী ঝুলিয়ে দিলেন এবং দ্বিতীয় অংশের সাহায্যে কোমর বাঁধলেন। এ কারণেই তাঁর উপাধি হয়েছিল 'যাতুননেতাকাইন।' অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হিজরতের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সকালবেলা কুরাইশরা না পেয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে; কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোনো সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করল। সেখানে গিয়ে দরজায় করাঘাত করল। দরজার করাঘাত শুনে আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহা বের হলেন। তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার পিতা কোথায় আছেন?" তিনি বললেন– "আল্লাহই ভালো জানেন, আমি জানি না আব্বা কোথায় আছেন?" এতে বদবখ্‌ত খবীস আবু জাহল তাঁর গালে এমন জোরে চপেটাঘাত করল যে, তিনি ব্যথায় চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর কানের বালি খুলে পড়ে গেল।

অধ্যায়-৪

খিলাফত লাভের পূর্বে আবু বকর -এর মদিনা জীবন

ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ আবু বকর

মদিনায় আসার পর আনসার ও মুহাজেরগণের মধ্য হতে অনাত্মীয়ভাব দূরীকরণের নিমিত্ত রাসূল আকরম তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিলেন। এ বন্ধন স্থাপনের বেলায় উভয় পক্ষের সামাজিক মর্যাদার প্রতি কঠোরভাবে লক্ষ রাখা হয়েছিল। আবু বকর সিদ্দিককে মদিনার খাযরাজ গোত্রের একটি শাখা-গোত্রের খ্যাতনামা ও প্রসিদ্ধ সরদার খারেজা ইবনে-যায়েদের ধর্মীয় ভাই করে দেওয়া হলো।[১১৬] ইবনে হেশামের রেওয়ায়েত মতে আবু বকর -এর দীনী ভাইয়ের নাম খারেজা ইবনে যুহাইর দেখা যায়। এ মতভেদের কারণ সম্ভবত এই যে, খারেজার পিতার নাম যায়েদ, অথচ তাঁর পিতামহের কুনইয়াত ছিল আবু যুহাইর। সুতরাং তাঁর সঠিক নাম হচ্ছে খারেজা ইবনে আবু যুহাইর। মদিনা শহরের 'শাখ' নামক মহল্লায় তাঁর বাড়ি। আবু বকরের পরিবারবর্গ মদিনায় এসে পৌছিলে তিনি সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্যে উপার্জনের চেষ্টায় লেগে গেলেন। তাঁর পাতানো ভাই খারেজা ও তাঁর সাথে কাজে অংশগ্রহণ করতে লাগলেন। খারেজার সাথে তাঁর হৃদ্যতা এত গভীর হয়ে উঠেছিল যে, খারেজা তাঁর প্রিয়তমা কন্যা হাবীবাকে আবু বকর -এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দিলেন। এ হাবীবার গর্ভেই আবু বকর -এর কন্যা উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করেন।

আবু বকর -এর পত্নী উম্মে রূমান, কন্যা আয়েশা এবং অন্যান্য সন্তানগণ আবু আইয়ুব আনসারী -এর ঘরের কাছাকাছি অন্য একটি ঘরে অবস্থান করতেন। তিনি নিজে 'শাখ' মহল্লায় বাস করতেন এবং প্রত্যহ সেই বাড়িতেও যাতায়াত করে পরিবারবর্গের খোঁজখবর নিতেন।

---

[১১৬] ইবনু হাযম, জাওয়ামিউস সীরাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

মদিনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ইসলাম প্রচার

এভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহের এক সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে নিয়ে তিনি আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে থেকে ইসলাম প্রচারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্য করতে লাগলেন এবং মুসলমানদের নতুন কেন্দ্র মদিনা শহরকে শক্তিশালী করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বভাবত খুব শান্ত-শিষ্ট ও নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। নিজে কখনও বিধর্মীদের কারো ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ বা নিন্দা করে বিবাদ সৃষ্টি করা পছন্দ করতেন না; কিন্তু কোনো ইহুদি বা মুনাফিক কখনও ইসলামের প্রতি কটাক্ষ বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে তাও তিনি বরদাশত করতে পারতেন না।

হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা শরীফে আসার পর ইহুদিদের সাথে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। এর শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত এটাও ছিল যে, উভয় সম্প্রদায় তাদের নিজ নিজ ধর্মকর্মগুলো স্বাধীনভাবে পালন করতে পারবে। প্রথমে ইহুদিদের এ ধারণা ছিল যে, মুসলমানদেরকে কৌশলে আয়ত্তে আনতে পারলে এদিকে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করা যাবে।

কিন্তু তাদের সেই আশা পূর্ণ হলো না। ধর্মীয় এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ফলে মুহাজের ও আনসারদের মধ্যে প্রীতি ও বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ়তর হয়ে উঠতে লাগল। আওস এবং খাযরাজের মধ্যকার প্রাচীন শত্রুতাভাব চিরতরে লোপ পেয়ে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব জমে উঠল। এটা দেখে ইহুদিরা আর সহ্য করতে পারল না, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লেগে গেল এবং ইসলাম সম্বন্ধে নানা প্রকার ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল।

একদিন কতিপয় ইহুদি তাদের আলেম ফাখখাসের ঘরে বসে আলাপ-আলোচনা করছিল। ঘটনাক্রমে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সে পথে কোথাও গিয়েছিলেন, কয়েকজন ইহুদিকে একস্থানে একত্রিত দেখে তিনি এটাকে তবলীগের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন। অতএব, তিনি তাদের কাছে গিয়ে ফাখখাসকে সম্বোধন করে বললেন, হে ফাখখাস! তোমাদের ও আমাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। হে ফাখখাস! আল্লাহর শপথ করে বলতে পারি যে, তুমি অবশ্যই জান– মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল। তিনি আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে সত্যের বাণী নিয়ে আগমন করেছেন। এ কথা তুমি আসমানি কিতাব তওরাত পাঠ করে জানতে পেরেছ।

আবু বকর রাঃ-এর এ সংক্ষিপ্ত উপদেশবাণী শ্রবণ করে ফাখখাস একটু বিদ্রূপের হাসি হাসল এবং বলল, হে আবু বকর রাঃ! খোদার কসম করে বলতেছি, খোদার কাছে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই; বরং খোদাই আমাদের মুখাপেক্ষী। আমরা কোনো মতলবে কখনও তাঁর কাছে যাই না; বরং খোদাই আমাদের কাছে আসতে বাধ্য। আমরা তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী নই; কিন্তু খোদা আমাদের সাহায্য ব্যতীত চলতে পারেন না। আমাদের সাহায্য ব্যতীত তাঁর চলার উপায় থাকলে তিনি কখনও আমাদের কাছে কর্জ চাইতেন না। আবার তোমাদের রাসূল সাঃ বলে থাকেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে সুদ গ্রহণ করতে নিষেধ করেন।" অথচ তাঁর খোদা নিজেই আমাদেরকে সুদ দিয়ে থাকেন। তিনি অভাবমুক্ত হলে আমাদেরকে সুদ দিবেন কেন? দেখ না আল্লাহ নিজেই বলেন–

"এমন ব্যক্তি কেউ আছে কি? যে আল্লাহ তা'আলাকে কর্জে হাসানা দান করবে, সে কর্জের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে বহু গুণ বর্ধিত করে দিবেন।"

আল্লাহ তা'আলার কালামের প্রতি ফাখখাসের এরূপ বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তি করা আবু বকর রাঃ সহ্য করতে পারলেন না। সাথে সাথে তিনি ফাখখাসের গালে এমন জোরে চপেটাঘাত করলেন যে, মরদূদ ইহুদি অজ্ঞান হয়ে ধরাশায়ী হলো। অতঃপর তিনি বললেন, "হে আল্লাহর শত্রু! আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যদি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত না থাকত, তবে আল্লাহর কসম, আমি আজ তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।"

মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ

এ সময় রাসূলুল্লাহ সাঃ মদিনা শরীফে একটি মসজিদ নির্মাণের সংকল্প প্রকাশ করলেন। মসজিদের জন্যে যেই স্থানটি মনোনীত করা হলো তা ছিল সহল এবং সোহায়েল নামক দুইজন এতিম বালকের। মূল্য প্রদানের কথা উঠলে তারা মূল্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করল; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাঃ তাঁদেরকে মূল্য গ্রহণ করতে বাধ্য করলেন। উক্ত জমির মূল্য নির্ধারিত হলো দশ মেসকাল স্বর্ণ। অবশেষে বালকদ্বয় দশ মেসকাল স্বর্ণের বিনিময়ে উক্ত জমি মসজিদের জন্যে বিক্রয় করতে সম্মত হলো। আবু বকর রাঃ মক্কা শরীফ হতে যেই অর্থ তাঁর সাথে এনেছিলেন, তা হতে দশ মেসকাল স্বর্ণের বিনিময়ে উক্ত জমি খরিদ করে মসজিদের জন্যে দান করলেন।[১১৭] অতঃপর উক্ত স্থানটি সমতল করা হলে রাসূলুল্লাহ সাঃ মুহাজের ও আনসারগণকে নিয়ে মসজিদ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করে দিলেন।

---

[১১৭] ইবনু সাদ, তাবকাতুল কুবরা, খ.১, পৃ. ২৩৯।

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

এটা মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ। এটা হিজরি ২য় বর্ষের ১৭ই রমযান তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলামের প্রথম অবস্থা হতে মুসলমানগণ কাফিরদের তরফ হতে যে সমস্ত উৎপীড়ন ও নির্যাতন ভোগ করে আসছিলেন, এখন তার অবসান ঘটেছে। মদিনার জীবনে একমাত্র কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করার ব্যস্ততা ভিন্ন তাঁদের মনে আর কোনো প্রকার অস্থিরতা এবং পেরেশানী ছিল না। এই উদ্দীপনায় মাত্র তিনশত তেরো জন মুজাহিদ সহস্রাধিক কাফিরের গতিমুখ ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুজাহিদগণকে সাথে নিয়ে ১৭ই রমযান তারিখে বদরের ময়দানে পৌঁছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পশমি চাদর দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে একটি তাঁবু নির্মাণ করলেন এবং সা'দ ইবনে মুআযের পরামর্শক্রমে তা নিকটবর্তী পাহাড়ের ওপর খাটিয়ে দেওয়া হলো। নবীজীকে সেই তাঁবুর মধ্যে নিয়ে গিয়ে সা'দ তাঁকে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি এ তাঁবুর মধ্যে আরাম করুন। খোদা না করুন, যুদ্ধের গতি মুসলমানদের প্রতিকূলে দেখলে আপনি মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে উষ্ট্রে আরোহণ করে মদিনায় চলে যাবেন।"

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাঁবুর প্রহরায় নিযুক্ত রইলেন। তিনি একখানি নাঙ্গা তরবারি হাতে তাঁবুর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে রাসূলকে পাহারা দিতে লাগলেন।[১১৮]

চিত্র: বদর প্রান্তর

---

[১১৮] বাযযার, আল মুসনাদ, হাদিস নং : ৬৮৯ ।

শত্রুসৈন্যের সংখ্যা মুজাহিদগণের তুলনায় কয়েকগুণ অধিক ছিল। শত্রুসৈন্যগণ দলে দলে মুষ্টিমেয় মুজাহিদ বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদায় গিয়ে কাতর স্বরে মুসলমানদের জন্যে দোয়া করতে লাগলেন : "হে আল্লাহ! কুরাইশদের এ বিরাট বাহিনী যান-বাহনে ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আপনার নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্যে আসছে। হে আল্লাহ! এ যুদ্ধে আপনি আমাকে যে সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা দান করুন। হে আল্লাহ! মুসলিম মুজাহিদগণের এ ক্ষুদ্র বাহিনী যদি আজ এখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবে দুনিয়ার বুকে আর আপনার ইবাদত করা হবে না।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব অস্থিরতার সাথে এরূপ প্রার্থনা করছিলেন। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুর এই অস্থিরতা বরদাশত করতে পারছিলেন না। এমন সময় তিনি গায়েব হতে একটি গুরুগম্ভীর শব্দ শ্রবণ করে বুঝতে পারলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া কবুল হয়েছে। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাদর মোবারকের কোণ ধরে বলতে লাগলেন, "হে রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার এতটুকু দোয়াই যথেষ্ট।" তাঁর অনুরোধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা হতে মাথা উঠালেন। সাথে সাথে দেখতে পেলেন, জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে উপস্থিত, "কাফিরের দল শীঘ্রই পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক পলায়ন করবে।"[১১৯]

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী স্বীয় 'এযালাতুল খেফা' কিতাবে লিখেছেন– আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্তরে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এলহাম হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া কবুল হয়েছে। এরূপে ওহী আগমনের পূর্বে অনেকবারই কোনো কোনো সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে ওহীর বিষয়বস্তু এলহাম হতো। এটা ঐ সমুদয়েরই অন্যতম।

যাহোক, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবু হতে বাইরে তশরীফ এনে সেনাবাহিনীর দক্ষিণবাহু, যাতে মীকাঈল (আ)-ও ছিলেন, আবু বকর সিদ্দিকের হস্তে তার পরিচালনার ভার সোপর্দ করলেন। আর বামবাহু, যাতে ইসরাফীল (আ) ছিলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তার পরিচালক নিযুক্ত করলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে রেওয়ায়েত আছে তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি কূপ হতে পানি উঠাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম, এক ভীষণ ধূলিঝড় শুরু হয়েছে। এমন ধূলিঝড় আমি আর কখনও দেখিনি। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তা থেমে গেল, এর পরেই আবার এক ধূলিঝড় শুরু হয়ে আগের মতো কিছুদূর এসে থেমে গেল। এ ধূলিঝড়ও পূর্বের মতোই, তবে পূর্ব হতে কিছুটা লঘু ছিল। প্রথম ধূলিঝড়ের অন্তরালে জিবরাঈল (আ) এক হাজার ফেরেশতা নিয়ে অবতরণ করে দক্ষিণ বাহুর সাথে যোগদান করেন। এতে আবু বকর সিদ্দিকও ছিলেন। আর দ্বিতীয় ধূলিঝড়ের অন্তরালে মীকাঈল (আ)

---

[১১৯] বুখারী, আস সহীহ, হাদীস নং : ৩৬৫৯।

এক হাজার ফেরেশতাসহ এসে বাম বাহুতে যোগদান করলেন, এতে আমিও ছিলাম। অনুরূপভাবে ইসরাফীল (আ) এক হাজার ফেরেশতাসহ ধূলি উড়িয়ে এসে মুজাহিদ বাহিনীর সাথে যোগদান করলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণের সাহায্যে যখন শত্রুদলকে পর্যুদস্ত করে দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর অশ্বের পশ্চাতে বসিয়ে প্রবল বেগে চালনা করলেন। বেগ সামলাতে না পেরে অশ্ব-পৃষ্ঠ হতে আমার পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো; কিন্তু আল্লাহ আমাকে পতন হতে রক্ষা করলেন। আমি পুনরায় সোজা হয়ে বসলাম এবং পরাজয়োম্মুখ শত্রুদের প্রতি অস্ত্র চালাতে লাগলাম, এতে বহু শত্রু রক্তাক্ত দেহে ভূলুণ্ঠিত হলো। এ সত্য ও মিথ্যা নির্ধারণী যুদ্ধে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন দৃঢ়তাসহকারে কর্তব্য পালন করছিলেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের কর্তব্যও যথাবিহিত সমাধা করেছিলেন এবং সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রহরার কাজেও কোনো প্রকার ত্রুটি করেননি। যুদ্ধ করতে করতে একবার হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাদর মোবারক তাঁর কাঁধ হতে ঝুলে পড়ে যমীনের সাথে লেগে গেছে। সাথে সাথে তিনি তীরবেগে সেখানে গিয়ে চাদরখানি তাঁর কাঁধে উঠিয়ে দিয়ে মুহূর্তমধ্যে পুনরায় উত্তেজনাদায়ক কবিতা আবৃত্তি করতে করতে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।[১২০]

একবার তাঁর পুত্র আবদুর রহমান, যিনি তখন পর্যন্ত ঈমান আনেননি, শত্রু-সেনারূপে পিতার সামনে এসে পড়লেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ অস্ত্র সংবরণ করে অন্যদিকে চলে গেলেন। কিছুকাল পরে তিনি মুসলমান হয়ে একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন, "আব্বাজান! বদর যুদ্ধের দিন একবার আপনি আমার তরবারির আওতায় এসেছিলেন; কিন্তু আমি তরবারি সংবরণপূর্বক অন্যদিকে চলে গিয়েছিলাম।" আবু বকর বললেন, "আমি তোমাকে দেখতে পাইনি, দেখতে পেলে কখনও তোমাকে জীবিত ফিরে যেতে দিতাম না।"

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বদরের দিন এমন বীরত্বের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাঁবু পাহারা দিয়েছিলেন যে, তাঁর বীরত্ব দেখে কোনো কাফিরই ওদিকে অগ্রসর হতে সাহস করেনি।

অন্য একটি রেওয়ায়েতে দেখা যায় যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র আবদুর রহমান যখন কাফিরদের পক্ষ হতে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে প্রতিদ্বন্দ্বী ডাকল, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তরবারি হাতে তার দিকে দৌড়িয়ে যেতে উদ্যত হলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বারণ করলেন। কেননা, তিনি পিতা-পুত্রের যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে পছন্দ করেননি। শেষ পর্যন্ত মুজাহিদ বাহিনী জয়লাভ করল। সত্তর জন কাফির বন্দি হলো। বহুসংখ্যক কাফির নিহত হলো এবং অজস্র গনিমতের মাল

---

[১২০] আবদুল হালীম, সিদ্দীকে আকবর আবু বকর (রা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

মুসলমানদের হস্তগত হলো। তন্মধ্যে উট, ঘোড়া, খাদ্যশস্য এবং আরও নানা জাতীয় রণসম্ভার ছিল।

যাহোক, বন্দি কাফিরদেরকে নিয়ে মুজাহিদ বাহিনী বিজয়ীবেশে মদিনায় প্রবেশ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের সাথে বন্দিদের সম্বন্ধে পরামর্শ করতে বসলেন।

দীর্ঘ তেরো বছর ধরে নির্বিচারে ও নির্মমভাবে মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন চলে আসতেছিল। এদেরই অত্যাচারে মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়লে তাঁরা জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজ বন্দি কাফিরগণ দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে, তাদের কৃত সে তেরো বছরের অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিশোধ তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। অতএব, তারা আবু বকর রাঃ-কে সম্বোধন করে বলল, হে আবু বকর! আমরা তোমাকে বাল্যকাল হতে একজন সুবিবেচক ও শান্তিপ্রিয় লোক বলে জানি। তুমি অবশ্যই জান যে, আমরা আজ ঘটনাক্রমে তোমাদের হাতে বন্দি হয়ে পড়েছি। সকলেই তোমাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব। আমাদেরকে হত্যা করলে বা কোনো প্রকার কষ্ট দিলে তাতে তোমাদের আত্মীয়স্বজনকেই কষ্ট দেওয়া হবে। আমরা আজ তোমাকে আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি যে, তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে সুপারিশ করে আমাদের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করে দাও অথবা আমাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণকরত আমাদেরকে মুক্ত করে দাও।

আবু বকর তাদের কাকুতি-মিনতি দেখে বললেন, আচ্ছা, দেখা যাহক, কতটুকু কি করা যায়।

কাফিরগণ ওমরের কাছেও অনুরূপভাবে কাতর প্রার্থনা জানাল, কিন্তু ওমর রাঃ তাদের আবেদন শুনে শুধু একদৃষ্টিতে তাদের প্রতি তাকিয়ে রইলেন। আর কোনো কথাই বললেন না।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ রেওয়াত করেন যে, বদরের যুদ্ধের বন্দিদেরকে মদিনায় আনা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে ডেকে বললেন, আপনারা এ বন্দিদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করতে বলেন? আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাঃ বললেন, "অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করে এদেরকে তাতে নিক্ষেপ করা হোক।" এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আব্বাস (যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে কাফিরদের পক্ষে এ যুদ্ধে অংশ নেন এবং এক পর্যায়ে মুসলমানদের হাতে বন্দি হন। তবে পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করেন।) বলে উঠলেন, "আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি নিষ্ঠুর ও নির্মম হউন।" (অর্থাৎ আপনার হৃদয় বড়ই পাষাণ, আপনি এমন নিষ্ঠুর পরামর্শ কেমন করে দিতে পারলেন!) ওমর ফারূক রাঃ বললেন, হে রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি এদের সকলকে হত্যা করে ফেলুন, এরা আপনার শত্রু, তারা আপনাকে

অবিশ্বাস করেছে এবং আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "না, এদের জীবন বিনাশ করা সমীচীন নয়। এরা আপনারই সম্প্রদায় এবং আপনারই গোত্রের লোক। বিচিত্র নয় যে, অদূর ভবিষ্যতে এরা ইসলাম গ্রহণ করবে এবং মুসলমানদের দল ভারি করে তুলবে।"

বদর অভিযান
১৭ রমযান, ২য় হিঃ
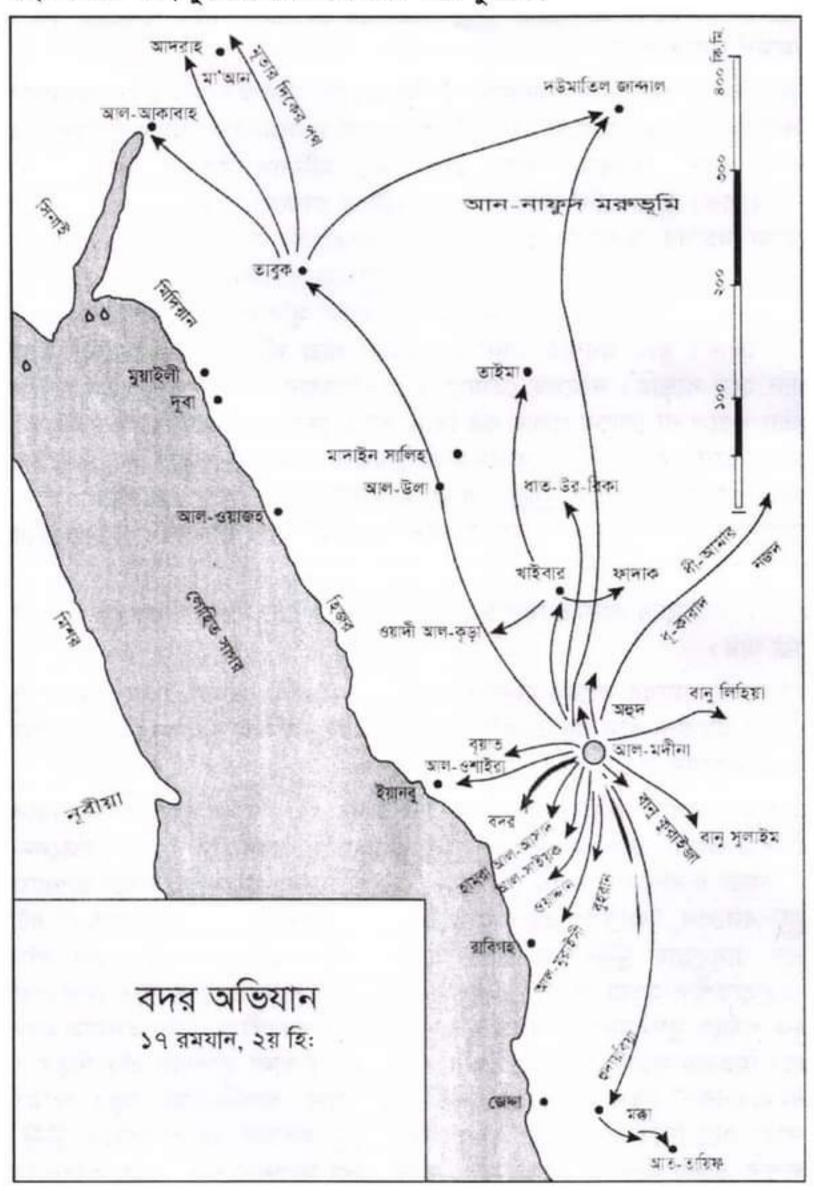
অবশেষে রাসূলে আকরাম (সা) বললেন, এই কাফিরদের দৃষ্টান্ত তাদের প্রাচীন কালের ভাইদেরই মতো, যাদের সম্বন্ধে নূহ (আ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি এ কাফিরদের মধ্য হতে একজন লোককেও যমীনের উপর বসবাসকারীরূপে জীবিত ছাড়বেন না। (অর্থাৎ, সকলকে ধ্বংস করে ফেলুন।) আর মূসা (আ) প্রার্থনা করেছিলেন, হে খোদা! তাদের ধনসম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তঃকরণ কঠিন করে দিন। আর ইবরাহীম (আ) প্রার্থনা করেছিলেন, হে খোদা! এদের মধ্যে যারা আমার অনুসরণ করেছে তারা আমারই দলভুক্ত। আর যারা আমার অবাধ্যতা করেছে, নিশ্চয়, আপনি অতি ক্ষমাশীল এবং অত্যন্ত দয়ালু। আর ঈসা (আ) প্রার্থনা করেছেন, "হে খোদা! আপনি যদি এদেরকে যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করেন, তবে এরা তো আপনারই বান্দা। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তবে নিশ্চয়, আপনি মহাশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী।"

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা দরিদ্র সম্প্রদায়, অতএব, হয়ত তোমরা এদেরকে মুক্তিপণ গ্রহণপূর্বক মুক্ত করে দাও, নতুবা এদেরকে হত্যা করে ফেল।[১২১] শেষ পর্যন্ত আবু বকর (রা)-এর অনুরোধক্রমে মুক্তিপণ গ্রহণ করে সমস্ত বন্দিকে মুক্ত করে দেওয়া হলো।

ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

বদর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যদিও মক্কাবাসীরা মুসলমানদের শক্তি ও সামর্থ্যে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছিল; কিন্তু শত্রুতার অগ্নি এবং প্রতিশোধের উত্তেজনা তাদেরকে অন্ধ করে দিয়েছিল। তারা বদর হতে প্রত্যাবর্তন করেই আর একটি যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবং পূর্ণ এক বছর ধরে বিভিন্ন প্রকারের প্রস্তুতি নিয়ে অধিক পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য এবং অন্যান্য নানাবিধ রণসম্ভার সংগ্রহ করে ফেলল। বদরের যুদ্ধের পূর্ণ এক বছর পরে তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে তারা মদিনা আক্রমণের জন্যে যাত্রা করল। তাদের সেনাবাহিনীতে তিন সহস্রাধিক যোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিল, তন্মধ্যে বহু শা'এর (কবি) এবং চৌদ্দজন মহিলাও ছিল। উত্তেজনামূলক কবিতা ও রণসঙ্গীত গেয়ে সৈন্যদের অন্তর উত্তেজিত করে এবং তিরস্কারের বাণ ছুটে পলায়নপর যোদ্ধাদেরকে ময়দানমুখী করাই ছিল তাদের কাজ। এ কাফির সেনাবাহিনী মদিনার অদূরে ওহুদ পাহাড়ের প্রান্তে এসে শিবির স্থাপন করল।

---

[১২১] তিরমিযী, আস সুনান, হাদিস নং : ৩০০৯ ।

মুসলমানগণ সংখ্যায় মাত্র সাতশত হলেও বদরের যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর এতে তাঁদের সাহস বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে এসে মুজাহিদবাহিনী নিজেদের সংখ্যার তুলনায় শত্রু সৈন্যের সংখ্যা বহুগুণে অধিক দেখেও তাদেরকে তুচ্ছ মনে করতে লাগলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিন সহস্তে সৈন্যদের ব্যূহ রচনা করে দিলেন। এ যুদ্ধেও আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহরক্ষী সহচরের দায়িত্ব পালন করেন।

এ যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী এমন বিক্রমের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলা করলেন যে, প্রথম আক্রমণেই শত্রুবাহিনী তাল সামলাতে অক্ষম হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। তারা সাহস হারিয়ে ফেলল। মুসলমান বাহিনী তখন কাফিরদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ভেবে গনিমতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবং শত্রুসৈন্যদের গতিবিধির প্রতি তাঁদের কোনো লক্ষই থাকল না।

মুজাহিদ বাহিনীর ব্যূহ রচনাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজ সৈন্যকে ওহুদ পাহাড়ের একটি গিরিপথের মুখ রক্ষার কাজে নিযুক্ত করে বলে দিলেন, মুজাহিদ বাহিনী জয়লাভ করুক বা পরাজিত হোক কোনো অবস্থায়ই তোমরা এই স্থান ত্যাগ করবে না। অন্যথায় মহাবিপদ অনিবার্য হয়ে পড়বে।

কিন্তু কাফিরবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে ইতস্তত দৌড়াতে আরম্ভ করলে মুসলিম বাহিনী যখন তাদের পরিত্যক্ত গনিমতের মাল সংগ্রহে লিপ্ত হলো, তখন গিরিপথ রক্ষাকারী অধিকাংশ মুজাহিদ ভাবলেন, যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই দলপতির নিষেধ অমান্য করে তারা গনিমতের মাল সংগ্রহ করবার জন্যে ছুটে গেলেন। এদিকে গিরিপথের অপর মুখে খালিদ ইবনে ওলিদ (তখনও মুসলমান হননি) ওঁতপেতে বসেছিলেন। সুযোগ পাওয়ামাত্র তিনি সদল-বলে পেছনের দিক হতে মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং পশ্চাৎ দিক হতে বৃষ্টি ধারার ন্যায় তীর বর্ষণ করতে লাগলেন। এ পর্যায়ে প্রখ্যাত কুরাইশ বীর আবদুল্লাহ ইবনে কোমাইয়ার তরবারির আঘাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মোবারক যখন আঘাতপ্রাপ্ত হলো এবং লৌহবর্মের দুটি কড়া তাঁর চেহারায় বিদ্ধ হয়ে গেল এবং তাঁর একখানা দন্ত মোবারক শহিদ হয়ে গেল। মুসলিমবাহিনী এমন আকস্মিকভাবে কাফির সৈন্য কর্তৃক পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার কল্পনাও করেননি। অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়ে তারা হতভম্ব ও বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কিসের গনিমতের মাল, আর কিসের যুদ্ধ, ইতস্তত ছুটে গিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। এ নিদারুণ মুহূর্তে বহু মুজাহিদ শহিদ ও যখম হলেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর পিতা হতে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, “ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানগণ যখন হঠাৎ কাফিরদের দ্বারা পুনরায় আক্রান্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, এরপর তাঁরা পুনরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে দৌড়ে আসলেন, এ ফিরে আসাদের মধ্যে আমিই ছিলাম প্রথম ব্যক্তি। আমি দূর হতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে দৌড়ে আসছিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেবে এক ব্যক্তি আমাকে জড়িয়ে ধরল। ইনি ছিলেন আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ।

সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে আবু বকর এবং ওমরই রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কাফিরদের কাছে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হতেন। এ জন্যই আবু সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে এই দুইজনের তালাশ করেছিল। বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়েত করেন যে, মুসলমানগণ বিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় আবু সুফিয়ান আমাদের দিকে অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ আছেন কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর উত্তর দিও না। আমরা নীরব রইলাম। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আছেন কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে এবারেও আমরা নীরব রইলাম। সে আবার জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে খাত্তাবের পুত্র ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আছেন কি? এবারও আমরা নবীজীর নির্দেশে চুপ করে রইলাম। এরপর আবু সুফিয়ান বলল, “মনে হয়, এরা সকলেই নিহত হয়েছেন। অন্যথায় অবশ্যই উত্তর পাওয়া যেত।” এটা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আর নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, ওরে কাফির! তুই মিথ্যুক। হে আল্লাহর দুশমন। তোকে অপমানিত করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা এদেরকে এখনও জীবিত রেখেছেন।[১২২]

এরপর কাফিরগণ মক্কার দিকে ফিরে গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন, কাফির বাহিনী পুনরায় আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে, কাজেই কিছুদূর পর্যন্ত তাদের পশ্চাদানুসরণ করা দরকার। তোমাদের মধ্যে কে কে এই অভিযানে যোগ দিতে চাও? সর্বপ্রথম অগ্রসর হয়ে আসলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। অতঃপর আরও সত্তরজন সাহাবিকে নিয়ে একটি মুজাহিদ বাহিনীকে কাফিরদের পশ্চাদানুসরণে পাঠানো হলো।[১২৩] তাঁরা ফিরে এসে জানালেন যে, কাফিরদের ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

---

[১২২] বুখারী, আস সহীহ, হাদীস নং : ২৮১২।

[১২৩] বুখারী, আস সহীহ, হাদীস নং : ৩৭৬৯।

ওহুদের যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সমস্ত রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, এ যুদ্ধের মহাসংকট সময়ে আবু বকর প্রাণভয়ে পলায়নকারীদের মধ্যে ছিলেন না; বরং সর্বক্ষণ রাসূল -এর হেফাযতে মশগুল ছিলেন।

খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

পঞ্চম হিজরি ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধেও আবু বকর অতিশয় বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ তাঁকে একটি নির্দিষ্ট দিকের হেফাযত কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্রদল নিয়ে অতি নিপুণতা ও যোগ্যতার সাথে উক্ত দিকের রক্ষণাবেক্ষণের কর্তব্য পালন করেছিলেন। তাঁর সেদিক দিয়ে কোনো শত্রুসৈন্যই পরিখা পার হওয়ার সাহস করেনি। আবু বরক যে স্থানে তাবু স্থাপণ করেছিলেন, বর্তমানে সেখানে 'মসজিদে আবু বকর সিদ্দিক ' নামে একটি মসজিদ রয়েছে।[১২৪]

খায়বরের যুদ্ধে আবু বকর

অনুরূপভাবে খায়বরের যুদ্ধেও প্রথমে আবু বকরের নেতৃত্বে ও সেনাপতিত্বে খায়বরের ইহুদিদের সুপ্রসিদ্ধ দুর্গসমূহ আক্রমণ করা হয়েছিল। আবু বকর এমন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন যে, সেদিন তাঁর হাতে দুর্গসমূহ বিজিত না হলেও ইহুদিদের প্রতিরোধে ফাটল ধরেছিল। অবশেষে আলী -এর হাতে খায়বরের দুর্গসমূহের পতন হয়।[১২৫]

কন্যা আয়েশার প্রতি অপবাদের ঘটনা

এটা ৫ম হিজরির ঘটনা। গযওয়ায়ে 'বনু মুস্তালিক' নামক যুদ্ধ মক্কাবাসী কাফির ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে আবু বকর প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত শরিক ছিলেন। মদিনার দিকে প্রত্যাবর্তনকালে মদিনার নিকটবর্তী কোনো স্থানে এসে সেনাবাহিনী রাতযাপন করে। রাতের শেষভাগে আয়েশা এস্তেনজা করতে যান। ফিরে এসে হঠাৎ দেখতে পান, তাঁর গলায় হার নেই। এস্তেনজার স্থানে বা পথে কোথাও পড়ে গিয়েছে ভেবে তা তালাশ করতে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেন, সেনাবাহিনী যাত্রা করে চলে গেছে। আয়েশা নিতান্ত একাকী বসে চিন্তা করতে লাগলেন। মনে করলেন, আমার খোঁজ নেওয়ার জন্য কেউ না কেউ অবশ্যই ফিরে আসবে। সৈন্যবাহিনী বিশ্রামাগার হতে যাত্রা করে গেলে, পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি অনুসন্ধান করে নেওয়ার কাজে সফওয়ান

---

[১২৪] সামহূদী, খুলাসাতুল ওয়াফা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।

[১২৫] বায়হাকী, দালায়িলুন নবুওয়াত, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ১৫৫১।

নিযুক্ত থাকতেন। তিনি অনুসন্ধান করতে করতে এদিকে এসে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কে দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইলেন এবং সবকিছু শুনে তাঁকে নিজের উটের ওপর আরোহণ করে তিনি উটের দড়ি ধরে টেনে নিয়ে সেনাবাহিনীর সাথে এসে মিলিত হলেন।

মুনাফিকদের এক দল সর্বদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার সুযোগ খুঁজে বেড়াত। তারা একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাতে আরম্ভ করল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্যে এটা ছিল একটি মহাপরীক্ষা এবং অত্যন্ত মর্মান্তিক ব্যাপার। তাঁর জন্যে সর্বাপেক্ষা অধিক হৃদয়বিদারক বিষয় ছিল এই যে, মেস্তাহ নামক একব্যক্তি ছিলেন তাঁর আত্মীয় এবং তাঁরই অন্নবস্ত্রে লালিত-পালিত। এ মেস্তাহও অপবাদ রটানোর কাজে মুনাফিকদের সাথে পুরোভাগে ছিল; কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই মহাপরীক্ষায় অসাধারণ ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেন এবং নীরবে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রেওয়ায়েত করেন, এই অপবাদ ছড়িয়ে পড়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসে বললেন, "আয়েশা, তোমার সম্বন্ধে এরূপ দুর্নাম আমার কানে পৌছেছে। তুমি এ ব্যাপারে নির্দোষ হলে আল্লাহ পাক ওহীযোগে তোমার নিষ্কলুষতা অবশ্যই ঘোষণা করবেন। আর যদি সত্যই তোমার পদস্খলন হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন। কেননা, কারো পদস্খলন হয়ে গেলে যদি সে তওবা করে আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করে থাকেন।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে এটা শুনে দুঃখে ও ক্ষোভে আমার অশ্রু এমনভাবে শুকিয়ে গেল যে, এক বিন্দু অশ্রুও চোখ থেকে নির্গত হলো না। আমি অতঃপর এ ঘটনা আমার পিতার কাছে বর্ণনা করলাম এবং আমার পক্ষ হতে প্রতি-উত্তর দেওয়ার কথা বললাম। তিনি বললেন, আমি কি উত্তর দিব? আল্লাহর শপথ, আমি এ বিষয়ে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে) কিছুই বলতে পারব না।[১২৬]

অবশেষে আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে ওহী নাযিল হলো। প্রকারান্তরে এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকরের পবিত্রতাও ঘোষিত হলো। যেমন, আল্লাহ তা'আলা সকলকে শামিল করেই বলেছেন, "তাঁরা সকলেই দুর্নাম রটনাকারীদের অপবাদ হতে পবিত্র।" কেননা, অপবাদের ঘটনা যদি সত্য বলে প্রমাণিত হতো, তবে তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকরের

---

[১২৬] বুখারী, আস সহীহ, হাদিস নং : ৩৮২৬।

আঁচলও কলুষিত হতো। বস্তুত এরূপ ক্ষেত্রে নারীর স্বামী এবং পিতা উভয়কেই নিন্দনীয় এবং দূষণীয় মনে করা হয়ে থাকে।

আবু বকর তাঁর দরিদ্র আত্মীয় উক্ত মেস্তাহ ইবনে আসাসাকে কিছু মাসিক বৃত্তি প্রদান করতেন। তাতেই মেস্তাহর খাওয়া পরার ব্যবস্থা হতো। এ নির্দোষিতাজ্ঞাপক আয়াত নাযিল হওয়ার পর হতে আবু বকর তা বন্ধ করে দিলেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনও দিবেন না বলে কসম করলেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করলেন, ইবনে আব্বাস এ আয়াতটির তফসীর এরূপ করেছেন– আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে আবু বকরকে সম্বোধন করে বলছেন, "আমি তোমাকে অনুগ্রহ ও সচ্ছলতা দান করেছি। অতএব, তুমি আত্মীয়স্বজনকে দান করা হতে বিরত থেকো না। আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।" আবু বকর এ ওহী নাযিল হওয়ার পর বললেন, আমি অবশ্যই মেস্তাহকে দান করব। কেননা, আল্লাহ তা'আলার দয়া এবং ক্ষমাই আমার অধিক কাম্য। অতঃপর তিনি মেস্তাহর প্রতি তাঁর পূর্বনির্ধারিত বৃত্তি পুনরায় চালু করে দিলেন। আর কখনও ভুল করবেন না বলেও কসম করলেন।[১২৭] সাময়িকভাবে মেস্তাহর ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকলেও বস্তুত একদিকে যেমন তিনি আবু বকর-এর নিকটতম আত্মীয় ছিলেন, অপরদিকে তিনি অভাবগ্রস্ত মুহাজেরও ছিলেন। সুতরাং আবু বকর নিজের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হলেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ

ইসলামের ইতিহাসে এটি একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একে মক্কা বিজয়ের সূচনা বলা হয়েছে। হিজরি ষষ্ঠ বর্ষে রাসূলে আকরাম নিজের একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে খানায়ে কা'বার যিয়ারত এবং ওমরার নিয়ত করে মক্কা শরীফ যাত্রা করতে ইচ্ছা করলেন। অতঃপর ষষ্ঠ হিজরির যিলক্বদ মাসে তিনি চৌদ্দশত সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে মক্কা শরীফ যাত্রা করলেন। কুরবানির জন্তুও সাথে নিলেন। মীকাতে গিয়ে এহরামও বাঁধলেন। পথিমধ্যে জানতে পারলেন যে, মক্কার কুরাইশগণ মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না বলে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাহাবায়ে কেরামের কাছে পরামর্শ চাইলেন। আবু বকর সিদ্দিক বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! যুদ্ধবিগ্রহ এবং খুন-খারাপি আপনার উদ্দেশ্য নয়। অতএব, আপনি খানায়ে কা'বার দিকে চলুন। কেউ আমাদের পথ

---

[১২৭] বুখারী, আস সহীহ, হাদিস নং : ৩৮২৬।

রোধ করলে কিংবা আমাদের কাজে হস্তক্ষেপ করলে আমরাও তার উপযুক্ত উত্তর দেব।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তাঁর সাথে একমত হলেন।[১২৮] সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে মক্কার নিকটবর্তী হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে তাঁবু ফেললেন। এ অবস্থার এক পর্যায়ে বনু সকীফের সর্দার ওরওয়া ইবনে মাসউদ কুরাইশদের পক্ষ হতে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্যে হুদায়বিয়ায় উপস্থিত হলেন। তিনি এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে লাগলেন। "হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি যদি আপনার স্বগোত্রের লোকদেরকে নির্মূল করে ফেলতে চান, তবে আরবের প্রাচীন যুগের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ করে দেখুন তো, কোনোকালে আরবের কেউ তার নিজের গোত্রকে নির্মূল করেছে কিনা? আর আমি নিশ্চিতরূপে বলছি যে, আপনি যদি আমাদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তবে আপনার সাথে আমি এমনসব লোক দেখতে পেয়েছি যারা যুদ্ধের সময় আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে একাকী ফেলে পলায়ন করবে। আবু বকর তাকে সরোষে ধমক দিয়ে বললেন, কাপুরুষ! ভাগ এখান থেকে। নিজের পথ ধর। তুই কি এ কল্পনা করছিস যে, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যুদ্ধক্ষেত্রে রেখে পলায়ন করব? ওরওয়া বলল, এই ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইনি আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু। ওরওয়া তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আজমাইন কে লক্ষ করে বলল, "আমার প্রতি আপনার অশেষ অনুগ্রহ না থাকলে আমি এখনই আপনার কথার উপযুক্ত উত্তর প্রদান করতাম।"[১২৯] অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ওরওয়া এক সময় ফিরে গেলেন; কিন্তু অচলাবস্থার নিরসন হলো না। তাই কাফিরদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মক্কায় পাঠালেন। পরে সংবাদ পাওয়া গেল যে, কাফিরগণ উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আজমাইন কে শহিদ করে ফেলেছে। এ সংবাদে মুসলমানগণ এক দিকে যেমন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শোকে অধীর হয়ে পড়লেন, অপর দিকে তেমনই কাফিরদের প্রতি ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমানের শোকে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি মুসলমানদেরকে একত্র করে তাঁদের থেকে জেহাদের বাইআত গ্রহণ করলেন এ বাইআত (শপথ গ্রহণ) ইতিহাসে 'বাইআতুর রেদোয়ান' নামে প্রসিদ্ধ। মুসলমানদের এই উত্তেজনা এবং জেহাদের জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া দেখে কাফিরগণ হতসাহস হয়ে পড়ল। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সন্ধির শর্তাবলি স্থির করার জন্যে সুহাইল ইবনে আমরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পাঠাল। যাহোক, শেষ পর্যন্ত সন্ধি হয়ে গেল এবং সন্ধির শর্তাবলি যথারীতি লিপিবদ্ধ হলো।

---

[১২৮] বুখারী, আস সহীহ, হাদিস নং : ৩৮৬০।

[১২৯] বুখারী, আস সহীহ, হাদিস নং : ২৫২৯।

সন্ধির শর্তগুলো বাহ্যত মুসলমানদের জন্যে আপাতদৃষ্টিতে অপমানকর বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ইসলামের ও মুসলমানদের অনুকূল ছিল। সর্বসাধারণ মুসলমানগণ এটা অনেক পরে বুঝতে পেরেছিলেন। ওমরের মতো সূক্ষ্মজ্ঞানী মহাপুরুষও প্রথমে উক্ত সন্ধির শর্তগুলোকে মুসলমানদের আত্মমর্যাদা হানিকর মনে করে রাসূলে আকরাম ﷺ-এর দরবারে তার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তার উত্তর দিয়েছিলেন। এতে তৃপ্ত না হয়ে তিনি আবু বকর রাঃ-এর কাছে গিয়ে ঠিক সেই প্রশ্নই করলেন, যা তিনি রাসূল ﷺ-এর দরবারে করেছিলেন। আবু বকর রাঃ ও তাঁকে ঠিক সেই উত্তরই দিয়েছিলেন, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়েছিলেন। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আবু বকর রাঃ-এর কীরূপ সম্পর্ক ছিল। একথাও বুঝা যায় যে, নবীজীর এলম ও জ্ঞান আবু বকর রাঃ-এর অন্তরে কীরূপ স্বভাবজাত হয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল।

অতঃপর মদিনায় ফিরে এসে পরবর্তী বছর ওমরাতুল ক্বাযা পালনের পূর্বে সন্ধির শর্ত মেনে চলা এবং যুদ্ধের পথ অবলম্বন করা সম্বন্ধে সাহাবায়ে কেরামের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক পরামর্শ করলেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্দিকে আকবরের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা হলো।

ব্যাপার এই ঘটল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়াহরা সন্ধির প্রায় এক বছর পরে খোযাআ গোত্রের একজন লোককে গুপ্তচর বৃত্তির জন্যে পাঠালেন। সে গিয়ে গোপনে কুরাইশদের জনবল ও সামরিক শক্তির সন্ধান নিয়ে আসবে। পরক্ষণে নিজেও 'ওমরাতুল ক্বাযা' আদায়ের উদ্দেশে সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছবার পূর্বেই গুপ্তচর সন্ধান নিয়ে ফিরে আসল এবং 'গাদীরুল আশতাত' নামক স্থানে রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। সে বর্ণনা করল যে, কুরাইশগণ বিভিন্ন গোত্রের লোকদের সমন্বয়ে এক বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করেছে। হাবভাবে বুঝা যায়, তারা অবশ্যই আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, আপনাকে তওয়াফ করতে দিবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ চাইলেন, এখন আমাদের কি করা কর্তব্য? আমরা কি প্রথমে ঐ সমস্ত লোকের প্রতি মনোযোগ দিব যারা খানায়ে কা'বা তওয়াফ করতে আমাদেরকে বাধা প্রদান করবে? তারা যদি আমাদের সাথে যুদ্ধ করে, আমরাও তাদের সাথে যুদ্ধ করব। মুশরিকগণ আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে জানে না। আর যদি তারা আমাদেরকে বাধা না দেয়, তবে আমরাও তাদেরকে কিছু বলব না। এ সম্বন্ধে আপনারা কি বলেন? আবু বকর রাঃ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি শুধু খানায়ে কা'বার তওয়াফের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন।

অতএব, আপনি খানায়ে কা'বার তওয়াফের জন্যে চলুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছা তবে আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে যাত্রা করুন। এ যাত্রা মুসলমানদের আয়োজন দেখে কাফিরগণ কোনো বাধা দিল না। মুসলমানগণ ওমরাতুল ক্বাযা পালন করে মদিনা শরীফে ফিরে গেলেন।
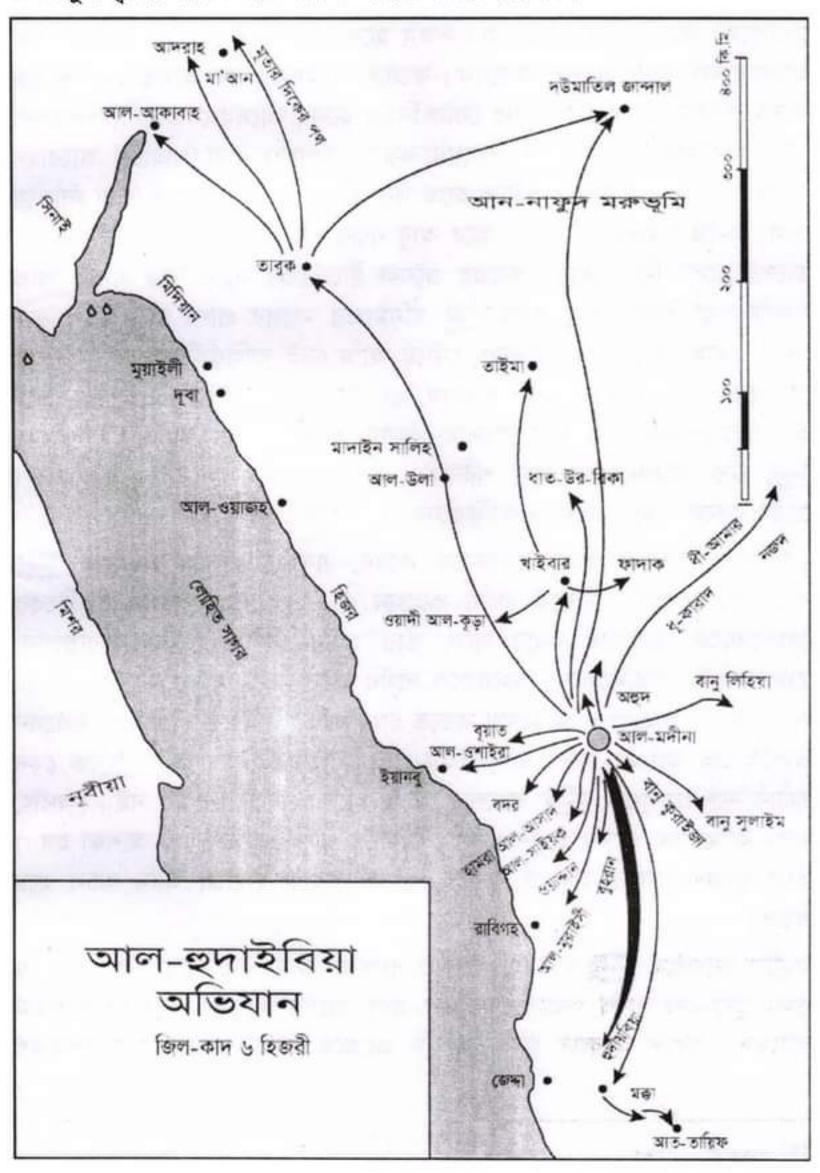
বনী ফাযারা অভিযানে অংশগ্রহণ

সালামাই ইবনে আকওয়া বলেন, রাসূলে আকরাম আবু বকর কে সেনাপতি করে আমাদেরকে বনী ফাযারা গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। আমরা সেখানে গিয়ে আবু বকরের নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধ করলাম। এমনকি তাদের জলাশয়ের কাছে গিয়ে পৌছলাম। সন্ধ্যা হলে আবু বকর আমাদেরকে সেখানে রাতযাপনের জন্যে আদেশ করলেন। ফজরের নামাযের পর আমরা পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করলাম। শত্রু পক্ষের বহু লোক নিহত হলো, তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা পরিবার-পরিজন সাথে নিয়ে পলায়ন করতে লাগল। এরা পাহাড়ে আরোহণ করতে যাচ্ছিল। আমি পশ্চাৎদিক হতে তীর ছুঁড়লাম। তীর দেখে তারা দাঁড়িয়ে গেল। আমি তাদেরকে ঘেরাও করে আবু বকর -এর কাছে নিয়ে আসলাম। তাদের মধ্যে বনী ফাযারা গোত্রের জনৈক স্ত্রীলোকের সাথে তার একটি অতি সুন্দরী কন্যা ছিল। আবু বকর গনিমতের মালের প্রাপ্য অংশস্বরূপ উক্ত কন্যাটি আমাকে দিলেন। মদিনায় পৌছে আমি সেই বালিকাটি রাসূল -এর খেদমতে পেশ করলাম এবং বললাম, হে রাসূলাল্লাহ! এ বালিকাটিকে আপনাকে হাদিয়াস্বরূপ দান করলাম। আমি তাকে স্পর্শও করিনি। রাসূলুল্লাহ উক্ত বালিকাটিকে মক্কা শরীফের ঐ সমস্ত মুসলমানদের মুক্তিপণস্বরূপ প্রেরণ করলেন, যাঁরা সেখানে কাফিরদের হাতে বন্দি ছিলেন।[১৩০]

মুস্তাদরাক কিতাবে হাকেম রেওয়াতে করেন, একদিন রাসূলে আকরাম সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে বর্ণনা করলেন যে, ঈসা (আ) যেমন চতুর্দিকের লোকদেরকে হেদায়েত করার জন্যে তাঁর হাওয়ারিগণকে প্রেরণ করেছিলেন, তদ্রূপ আমিও চতুর্দিকের লোকদেরকে ধর্মের ফরায়েয ও সুনান তা'লীম দেবার জন্যে আমার সাহাবিগণকে প্রেরণ করতে ইচ্ছা করি। উপস্থিত সাহাবিগণ বললেন, আপনি এই কাজের জন্যে আবু বকর ও ওমর ফারূককে কেন পাঠান না? রাসূলুল্লাহ বললেন, আমি তাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত নই। (অর্থাৎ, পাছে কাফিরগণ তাদের প্রাণনাশ করে ফেলতে পারে, আমার এই আশঙ্কা হয়।) তাঁরা দুইজন আমার চক্ষু ও কর্ণস্বরূপ। (তাঁদেরকে হারালে আমি অচল হয়ে পড়ব।

রাসূলে আকরাম ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে দিবা-রাত্র আবু বকর ও ওমর -এর সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাঁদের পরামর্শ অনুসারে কাজকর্ম করতেন। ইবনে আব্বাস 'আপনি প্রত্যেক কাজে তাঁদের সাথে পরামর্শ

---

১৩০ মুস্তাদরাকে হাকেম

করুন।' এই আয়াতটির তফসীরে (তাদের) সর্বনামটি দ্বারা আবু বকর রাঃ ও ওমর উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন।

ওমর ফারূক রাঃ বলেন, রাসূলে আকরাম সাঃ মুসলমানদের যাবতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে রাত্রিকালে আবু বকর রাঃ-এর সাথে পরামর্শ করতেন। আমিও তখন তাঁর সঙ্গেই থাকতাম।[১৩১]

আবদুর রহমান ইবনে গমন রেওয়ায়েত করেন, একদিন হুযুরে পাক সাঃ, আবু বকর রাঃ ও ওমর ফারূক রাঃ-কে বললেন, "আপনারা উভয়ে যখন কোনো পরামর্শে একমত হয়ে যান, তখন আমি তার ব্যতিক্রম করতে পারি না।"[১৩২]

একবার রাসূলে আকরাম সাঃ-এর পূতচরিত্রা বিবিগণ খোরপোষ বৃদ্ধির দাবিতে একমত হয়ে রাসূল সাঃ-এর কাছে আবেদন জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাঃ তাতে বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে কুরআন শরীফের সূরায়ে তাহরীম নাযিল হয়। তাতে আবু বকর রাঃ ও ওমর ফারূক রাঃ-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবু উমামা রাঃ আল্লাহ পাকের বাণী– আয়াতের তফসীর লিখতে গিয়ে আবু বকর এবং ওমর ফারূক রাঃ-এর নামই উল্লেখ করেছেন।

নো'মান ইবনে বশীর রেওয়ায়েত করেন, এ ঘটনার কথা শুনে আবু বকর রাসূল সাঃ-এর খেদমতে হাযির হয়ে এ ব্যাপারে প্রথমে আয়েশারই উচ্চৈঃস্বর শুনতে পান, তাতে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে আয়েশার প্রতি অগ্রসর হয়ে তাঁকে প্রহার করতে উদ্যত হন এবং তাঁকে ধমক দিয়ে বলেন, "তুমি রাসূল সাঃ-এর সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতেছ?"[১৩৩]

এ সময়ের মধ্যেই ঠিক জুমুআর নামাযের সময় সিরিয়া হতে কাপড় ব্যবসায়ীদের কাফেলা মাল নিয়ে মদিনায় ফিরে আসল, মসজিদের মুসল্লীরা রাসূল সাঃ-কে খোৎবা পাঠরত অবস্থায় ত্যাগ করে কাফেলার দিকে ছুটে গেল। কেবল বারোজন লোক অবশিষ্ট রইল। এই বারোজনের মধ্যে আবু বকর এবং ওমর রাঃ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৩৪]

মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত প্রথমে কাফিররাই ভঙ্গ করল। কিন্তু এর ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করে কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান সন্ধি পুনঃস্থাপনের জন্যে মদিনায়

---

১৩১ মুসনাদে আহমদ

১৩২ মুসনাদে আহমদ

১৩৩ আবু দাউদ

১৩৪ তিরমিযি, আস সুনান

ছুটে আসল। -এর সাথে আলাপ করে সুবিধাজনক উত্তর না পাওয়ায় আবু বকর -এর কাছে এবং পরে ওমর -এর কাছে গেল। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূল -এর পরে সর্বসাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আবু বকর -এর স্থান প্রথম এবং ওমর ফারুকের স্থান দ্বিতীয়। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক রেওয়ায়েত করেন, আবু সুফিয়ান প্রথমে রাসূল -এর কাছে এসে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করলে তিনি কোনোই উত্তর প্রদান করলেন না। অতঃপর সে আবু বকর -এর কাছে এসে সন্ধির প্রার্থনা জানাল। তিনি উত্তর করলেন, এ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে পারব না। অতঃপর সে ওমর ফারুকের কাছে গিয়ে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করল। তিনি বললেন, আমি রাসূল -এর দরবারে তোমাদের জন্যে সন্ধির সুপারিশ করব? আল্লাহর কসম! আমি যদি আমার মধ্যে একটি পিপীলিকার সমানও শক্তি পাই, তবুও তোমাদের বিরুদ্ধে জিহাদই করব।[১৩৫]

অতঃপর রাসূলুল্লাহ যখন সদলবলে মক্কা শহরে প্রবেশ করতে লাগলেন। শহরের স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ গৃহ হতে বের হয়ে মুসলিম সেনাবাহিনীর অশ্বসমূহের মুখে নিজেদের ওড়নার আঁচল বুলিয়ে দিতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ মৃদু হাসলেন এবং আবু বকর সিদ্দিক -কে বললেন, এ দৃশ্য সম্বন্ধে কবি হাসসান কী বলেছেন? আবু বকর হাসসানের কবিতাগুলো আবৃত্তি করে শুনালেন-

عَدِمَتْ بُنَيْتِي اِنْ لَمْ تَرَوْهَا * تَثِيْرُ النَّقْعَ مِنْ كَيْفِي كَدَاءُ

يُنَازِعْنَ الْاَسِرَّةَ مُسْرِعَاتٍ * يُلَطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ

অর্থাৎ, "আমার সন্তানগণ বিলীন হউক, যদি তারা অশ্বসমূহকে না দেখে- যা কাদ্দা নামক স্থানে ধূলি উড়িয়ে অগ্রসর হতে থাকে এবং তাড়াহুড়াবশত লাগামের সাথে ঝগড়া করতে থাকে। আর স্ত্রীলোকদের ওড়নার থাপ্পড় খেতে থাকে।"

রাসূলুল্লাহ বললেন, হাসসান যে দিকের কথা উল্লেখ করেছে, সেই দিক দিয়েই অর্থাৎ, কাদ্দার দিক দিয়েই মক্কায় প্রবেশ কর।[১৩৬]

মক্কা বিজয়ের দিনই আবু বকর -এর বৃদ্ধ পিতা আবু কোহাফা ইসলাম গ্রহণ করেন।

---

[১৩৫] বায়হাকী, দালায়েলুল নুবুওয়াত, হাদীস নং : ১৭৫৮

[১৩৬] হাকেম, আল মুসতাদরাক, হাদিস নং : ৪৪১৬

আদরাহ
মা'আন
আল-আকাবাহ
দাউমাতিল জান্দাল
আন-নাফুদ মরুভূমি
তাবুক
সিনাই
মিদিয়ান
মুয়াইলী
দূবা
তাইমা
মাদাইন সালিহ
আল-উলা
আল-ওয়াজহ
ধাত-উর-রিকা
খাইবার
ফাদাক
যী-আমার
নজদ
ওয়াদী আল-কূরা
হিজাজ
মিশর
লোহিত সাগর
অহুদ
বানু লিহিয়া
বুয়াত
আল-মদীনা
আল-ওশাইরা
ইয়ানবু
বদর
বানু সুলাইম
নুবীয়া
রাবিগহ
জেদ্দা
মক্কা
আত-তায়িফ
৪০০ কি.মি.
মক্কা বিজয়
(রমযান ৮ম হিজরী)
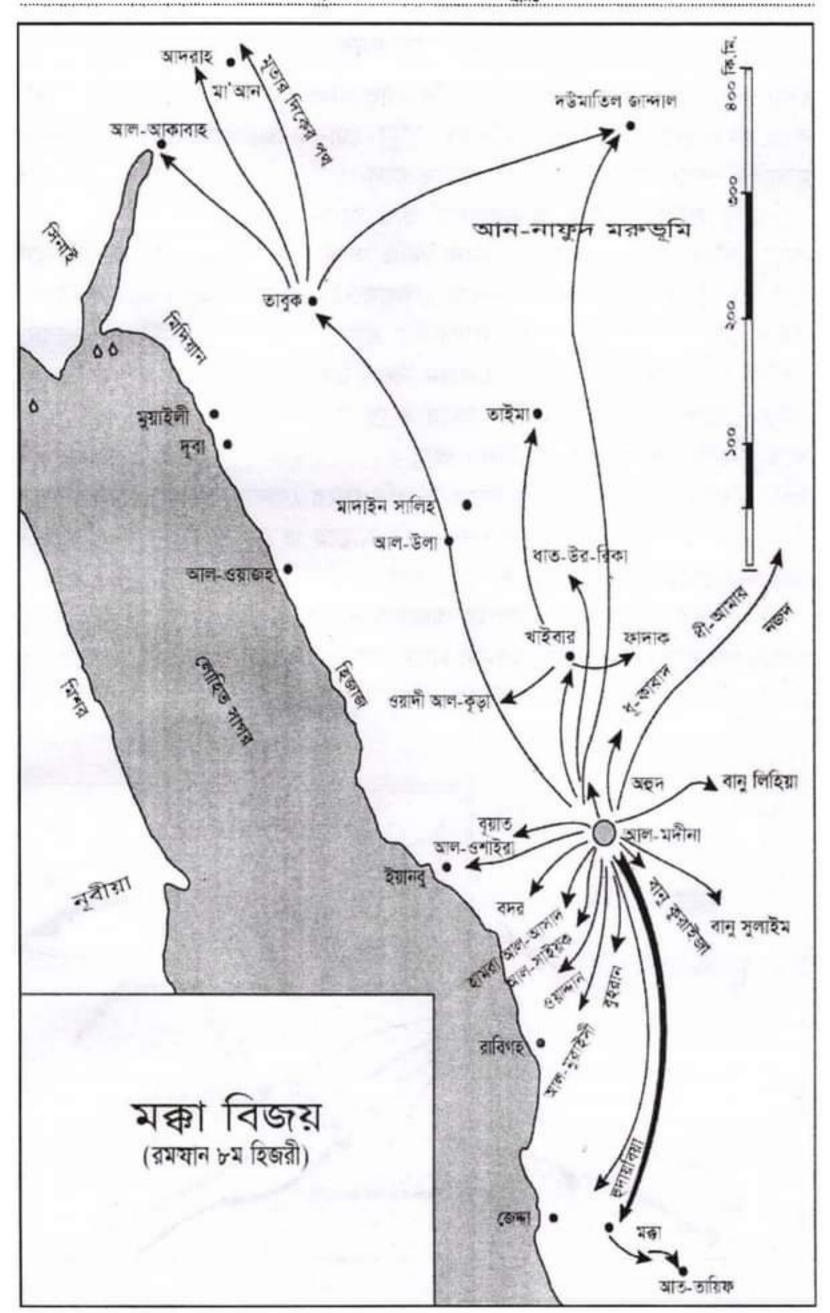
হুনাইনের যুদ্ধে আবু বকর

হুনাইনের যুদ্ধের দিনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর রায়কে প্রাধান্য দান করেছেন। হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করে দিয়েছিলেন– কোনো মুজাহিদ কোনো কাফিরকে হত্যা করেছে বলে সাক্ষী পেশ করলে তিনি উক্ত নিহত কাফিরের সাথে যাবতীয় আসবাবপত্র প্রাপ্ত হবেন। আবু ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ঘোষণা শুনে আমি আমার সাক্ষী তালাশ করার জন্যে দাঁড়ালাম, কিন্তু কোনো সাক্ষী দেখতে পেলাম না। অতঃপর আমি আমার ব্যাপার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে পেশ করলাম। এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপবিষ্ট লোকদের মধ্য হতে একজন বলে উঠল : আবু ক্বাতাদার হত্যাকৃত ব্যক্তির অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র আমার কাছে রয়েছে, আপনি তাকে বলে সম্মত করে এগুলো আমাকে দিয়ে দিন। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, এটা কখনও হতে পারে না যে, শৃগালকে আপনি শেরে খোদার সমকক্ষ করে দিবেন, আর শেরে খোদাকে ত্যাগ করবেন– যিনি আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হতে জিহাদ করেছেন। আবু ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে নিহত ব্যক্তির যাবতীয় আসবাবপত্র আমাকে দান করেন। এটা দ্বারা আমি একটি বাগান খরিদ করলাম, এটাই আমার প্রথম সম্পদ যা আমি সঞ্চয় করেছি।[১৩৭]
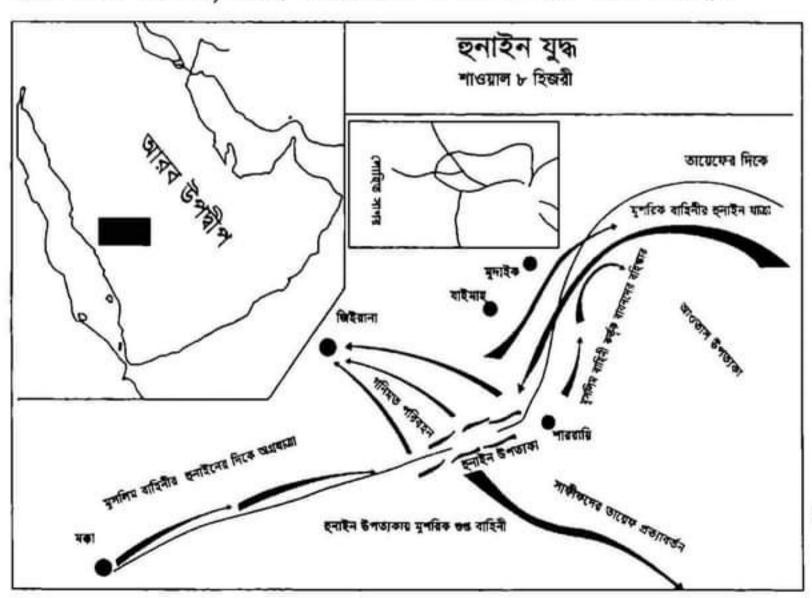
[১৩৭] বুখারী, আস সহীহ, হাদিস নং : ৩৯৭৮

তায়েফ অভিযানে আবু বকর

হুনাইনের যুদ্ধের পরপরই রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর রা.-এর সেনাপতিত্বে একদল মুজাহিদ নিয়ে তায়েফের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এ যুদ্ধে আবু বকর রা.-এর পুত্র আবদুল্লাহ শত্রুদের তীরে আহত হন। এই ক্ষতস্থান ফোঁড়ার আকার ধারণ করে এবং বহুদিন পর তিনি স্বীয় পিতার খেলাফতকালে শাহাদত প্রাপ্ত হন।[১৩৮] এ যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনী অকৃতকার্য হয়ে ফিরে আসে। আবু বকর রা. একটি স্বপ্ন দেখে রাসূল ﷺ-এর খেদমতে এ অভিযানের সময় তা বর্ণনা করেন এবং মন্তব্য করেন যে, হয়ত এ যাত্রা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিজয় দান করবেন না।

তাবুকের অভিযানে আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব

তাবুকের যুদ্ধকালেও আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। ওমর ফারূক রা. রেওয়ায়েত করেন যে, তাবুক যুদ্ধের জন্যে রণসম্ভার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে দান চাইলেন, তখন আমার কাছে অনেক মাল-সম্পদ ছিল। আমি মনে করলাম, আবু বকর রা. সকল সময়ই সকল নেককাজে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী থাকেন। কোনোদিন আমরা তাঁর ওপর প্রাধান্য লাভ করতে পারিনি। এবার আমি আবু বকর রা.-কে হার মানাব। এ মনে করে আমি আমার সমস্ত মালের অর্ধেক পৃথক করে নিয়ে রাসূল ﷺ-এর খেদমতে পেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "নিজের পরিবারের জন্যে গৃহে কি পরিমাণ মাল রেখে এসেছেন?" আমি বললাম, এর সমপরিমাণ মাল তাদের জন্যে রেখে এসেছি। অতঃপর আবু বকর রা.-ও অনেক মাল এনে রাসূল ﷺ-এর খেদমতে পেশ করলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "ঘরে কি পরিমাণ মাল পরিবারের লোকদের জন্যে রেখে এসেছেন?" তিনি বললেন, আমার সমস্ত মালই রাসূল ﷺ-এর খেদমতে পেশ করা হয়েছে। পরিবারের লোকদের জন্যে ঘরে আল্লাহ ও রাসূলকে রেখে এসেছি। ওমর রা. বলেন, সেদিন হতে আমি শিক্ষা পেলাম যে, সিদ্দিকের চেয়ে অগ্রগামী কখনই হতে পারব না।[১৩৯]

তাবুকের যুদ্ধেও আবু বকর রা.-ই সেনাপতি ছিলেন। তাবুকের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় এক রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন সাহাবিসহ কোনো একস্থানে বিশ্রাম করলেন এবং আবু বকর রা. ও ওমর ফারূক রা. সেনাবাহিনী নিয়ে তাবুকের দিকে অগ্রসর হয়ে থাকলেন। কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ রাসূল ﷺ-এর পবিত্র

---

[১৩৮] বায়হাকী, দালায়েলুল নুবুওয়াত, হাদীস নং : ১৯২৯

[১৩৯] আবু দাউদ, আস সুনান, হাদিস নং : ১৪২৯

মুখ হতে বের হলো– "মুজাহিদ বাহিনী আবু বকর ও ওমর -এর অনুসরণ করলে সঠিক পথের সন্ধান পাবে।"[১৪০]

---
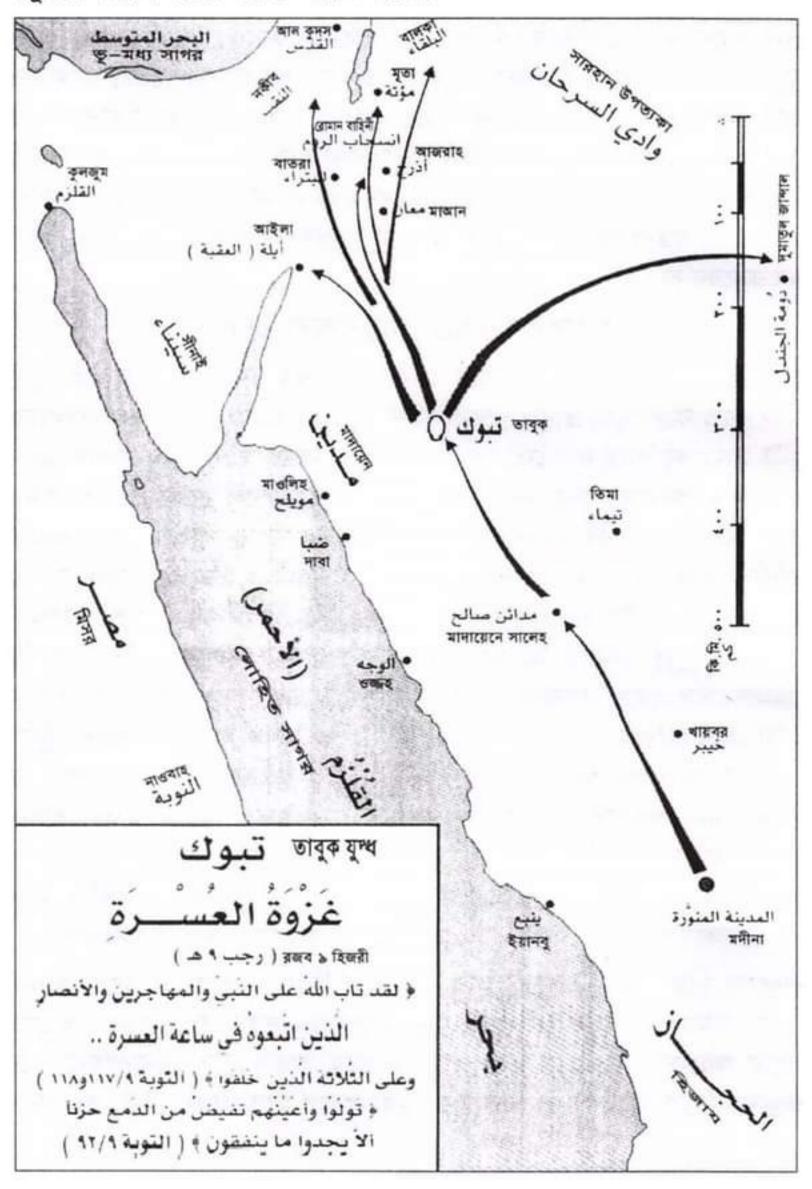
১৪০ মুসলিম, আস সহীহ, হাদিস নং : ১০৯৯

হজের নেতৃত্বে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু

নবম হিজরিতেই হজ ফরয হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর হতে ইসলাম প্রচারের পথের যাবতীয় বাধাবিঘ্ন দূরীভূত হয়ে যায়। চতুর্দিক হতে দলে দলে মানুষ মদিনায় এসে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূরদূরান্ত হতে আসা লোকদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা এবং রাষ্ট্রীয় অন্যান্য জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন এ বছর নিজে হজ করতে যেতে পারেননি। সুতরাং তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে আমিরুল হজ নিযুক্ত করলেন। তিনি তিনশত যাত্রীসহ মক্কা শরীফ যাত্রা করলেন।[১৪১] তাঁর যাত্রার অনতিকাল পরেই সূরায়ে বারাআত নাযিল হয়। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সূরায়ে বারাআত তবলীগের জন্যে আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু আনহু কাছে পাঠিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার পরিবারস্থ কোনো অতি কাছে আত্মীয় ব্যক্তি এর তবলীগ করবে। কারণ শত্রুগণ সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেছে। উক্ত সূরায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এ ঘোষণার জন্যে রাষ্ট্রপতি অথবা তাঁর কোনো নিকট আত্মীয় হওয়া প্রয়োজন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে ডেকে বললেন, সূরায়ে বারাআতের প্রথম দিকের এই আয়াতগুলো নিয়ে মক্কা শরীফ চলে যাও, কুরবানির পরে যখন হাজিগণ মিনায় একত্রিত হবে, তখন এ আয়াতগুলো প্রচার করে দিও। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উটনীর ওপর আরোহণ করে তাঁর ফরমানসহ মক্কা যাত্রা করলেন। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে এ অবস্থায় আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আমির হয়ে আসছেন, না আমীরের অধীন হয়ে আসছেন? আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমীরের অধীন হয়ে এসেছি। অতঃপর উভয়ে মক্কা শরীফে গমন করলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে নিয়ে যথারীতি হজ করলেন। এবারেও আরবের লোকেরা তাদের অজ্ঞ যুগের প্রথানুযায়ী সর্বসাধারণ হাজীদের সাথে আরাফায় অবস্থান না করে মুযদালেফায় অবস্থান করল। কুরবানির পরে হাজিগণ মিনায় সমবেত হলে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত সেই আয়াতগুলো প্রচার করলেন। তিনি আরো ঘোষণা করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ অনুসারে কাফেরদেরসাথে সকল প্রকার চুক্তি সমাপ্ত। মুশরিক ও যাদের সাথে কোনো চুক্তি ছিলো না তাদেরকে চারমাসের সময় দেয়া হয়। তবে মুসলিমদের সাথে সেসব মুশরিক চুক্তি পালনে ত্রুটি করেনি এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি তাদের চুক্তি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বলবৎ রাখা হয়।[১৪২]

---

১৪১ ইবনুল কাইয়্যুম, যাদুল মাআদ, খ.৩, পৃ. ৫১৮

১৪২ ইবনে কাসীর, আস সীরাতুন নববীয়্যাহ, খ. ৪, পৃ. ৬৯।

এ সম্পর্কে অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, ইবনে আব্বাস বলেছেন, রাসূলুল্লাহ আবু বকরকেই উক্ত আয়াতগুলো প্রচার করার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ তাঁর পশ্চাতে আলী -কেও পাঠালেন। আবু বকর পথেই কোনো এক মঞ্জিলে বিশ্রাম করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ বাইরে রাসূল -এর উটনীর আওয়াজ শুনে মনে করলেন, রাসূলুল্লাহ স্বয়ং তাশরীফ আনছেন। ব্যস্ততাসহকারে বের হয়ে আলী -কে দেখলেন। আলী রাসূল -এর চিঠি আবু বকরের হাতে প্রদান করে বললেন, আপনাকেই তিনি আমিরুল হজ নিযুক্ত করেছেন। আর আমাকে সূরা বারাআতের এ আয়াতগুলো প্রচার করতে আদেশ করেছেন। অবশেষে কুরবানির পরে আইয়্যামে তশরীকের মধ্যেই আলী নিম্নলিখিত বাণীসমূহ প্রচার করলেন : "নিশ্চয়, মুশরিকদের জন্যে আল্লাহ ও রাসূল -এর পক্ষ হতে কোনো নিরাপত্তা নেই। অতএব, তোমরা চারমাস কাল মাত্র যমীনের উপর স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পার। এ বছরের পর হতে আর কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না। আর কোনো উলঙ্গ ব্যক্তি খানায়ে কা'বার তওয়াফ করতে পারবে না। মুসলমানগণ ব্যতীত কোনো অমুসলিম বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।"[১৪৩]
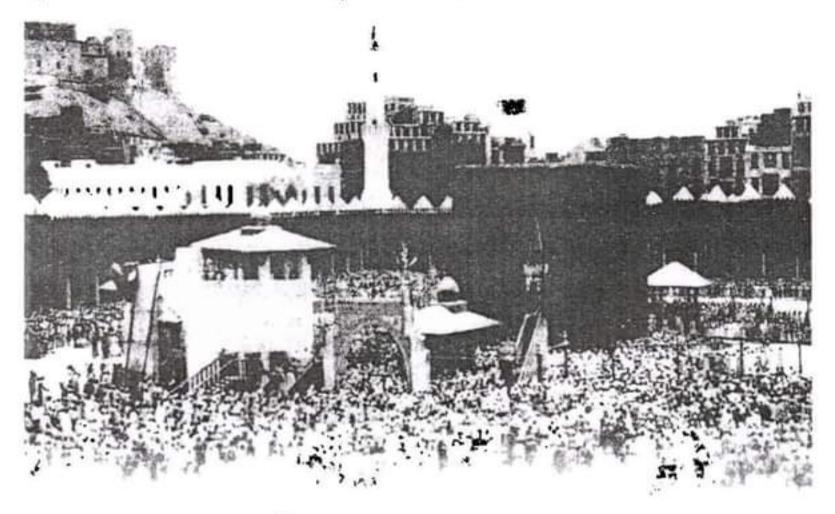
বিদায় হজে আবু বকর

হিজরি ১০ম বর্ষে বিদায় হজ সমাপনের সময়ও আবু বকর নবী করীম -এর সাথে ছিলেন। রাসূল -এর আসবাবপত্র ও খাদ্যসামগ্রী সিদ্দিকে আকবরের উটের ওপর ছিল। আসমা বিনতে আবু বকর রেওয়ায়েত করেন, আমিও এ সফরে আব্বার সাথে ছিলাম। 'আরাজ' নামক পাহাড়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ

১৪৩ নাসাঈ শরীফ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাপনের জন্যে বিতরণ করলেন। দস্তরানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক পাশে আয়েশা ও অপর পাশে আব্বা বসলেন, আমি আব্বার অপর পাশে বসলাম। আমরা সকলে বসে আব্বার গোলামের অপেক্ষা করতে লাগলাম, যিনি উট হতে খাদ্যসামগ্রী নামিয়ে আনছিলেন।

যথাসময়ে হজক্রিয়া সমাপন করে মদিনায় উপরে আসার সময় পথিমধ্যে একস্থানে সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হে লোকগণ! আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোনো একজন বান্দাকে দুনিয়া এবং আখিরাতের মধ্য হতে যেকোনো একটিকে বেছে নিতে স্বাধীন ক্ষমতা দান করেছেন, সেই বান্দা আখিরাতকেই পছন্দ করে নিয়েছে।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথাগুলো আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্তরে তীর ও ছুরির ন্যায় বিদ্ধ হলো। শুনেই তিনি কান্না করতে লাগলেন। উপস্থিত সকলে আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু আনহু কান্না দেখে বিস্মিত হলেন যে, এখানে কান্নার কারণ কী? তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ রহস্যময় কথার কিছুই বুঝতে পারেননি। তাঁরা জানতেন না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কয়েকটি বাক্যের মধ্যে নবুওয়াতের সূর্য অস্তমিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করছেন। অবশেষে মুসলমানগণ জানতে পারলেন যে, এ ঘটনার কিছুদিন পরেই রাসূলুলøাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তিম অসুস্থতা শুরু হয়ে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসুস্থতা ও আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নামাযে ইমামতি

১১শ হিজরির সফর মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসুস্থতা শুরু হলো। রোগের আক্রমণে খুব দুর্বল হয়ে পড়লে তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর স্থলে নামাযের ইমামতি করতে বললেন, আয়েশা সিদ্দিকা ও হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আরয করলেন, "আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব কোমলহৃদয় লোক, তিনি নামায পড়াতে কেঁদে ফেলবেন, তাতে লোকের নামায নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব, এ পদ অন্য কাউকেও দান করা হোক।" কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ়তার সাথে এবং কিছুটা ক্রোধান্বিত স্বরে বললেন না, আবু বকরই রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমামতি করবে। অতঃপর আয়েশা ও হাফসাকে লক্ষ করে বললেন, "তোমরা তো ঐ জাতীয় যারা ইউসুফ (আ)-কে প্রতারিত করার চেষ্টা করেছিল।" [১৪৪]

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু অবশ্য হুযুরে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে নামায পড়াতে ভালো মনে করতেন না। তিনি এটাকে বেআদবী বলে মনে করতেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ কেমন করে লঙ্ঘন করেন, শেষ পর্যন্ত ইমামতের কর্তব্য যথারীতি পালন করতে লাগলেন।

অন্তিম অসুস্থতার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতি বিশেষ মেহেরবানী করেছিলেন। ইন্তিকালের পাঁচদিন পূর্বে এক খোৎবা পাঠ করেন। তাতে আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু আনহু বহু ফযীলত বর্ণনা করেন। আর সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, যাদের ঘরের দরজা মসজিদের দিকে খোলা আছে,

---

১৪৪ বুখারী, আস সহীহ, হাদিস নং : ৬৩৮

একমাত্র আবু বকর ব্যতীত সকলেই সে সমস্ত দরজা বন্ধ করে দাও। অতঃপর তাঁকে নামাযের ইমাম নিযুক্ত করেন। এতে রাসূলুলøাহ #-এর পরে যে তাঁর খলিফা আবু বকর হবেন, এর প্রতি পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এছাড়া আবু বকর তাঁর পরে খলিফা হবেন, একথা লিখে দেওয়ার জন্যে তিনি অন্তিম মুহূর্তে কাগজ তালাশ করছিলেন; কিন্তু বিশেষ কোনো কারণে পরে তা করেননি। শেষ সময়ের আগেও যখনই রাসূলুল্লাহ কোনো কারণে মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে না পারতেন, তখনই আবু বকরকে নামায পড়িয়ে দিতে আদেশ করতেন। একবার তিনি বনু আমর ইবনে আউফ গোত্রের বিবাদ মীমাংসা করার জন্যে যাওয়ার সময় বেলালকে বলে গেলেন যে, তোমরা আবু বকরকে ইমাম করে নামায আদায় করে নিও। তাবুকের যুদ্ধেও আবু বকরকে সৈন্যদের ইমামত করার জন্যে আদেশ করেছিলেন।

অন্তিম মুহূর্তে আবু বকরের জন্যে খেলাফতনামা লিখে দেবার উদ্দেশ্যে কাগজ তলব করে পরে তা না লেখার কারণ সম্ভবত এই যে, যদি তিনি আবু বকরকে খলিফা নিযুক্ত করে যেতেন, তবে লোকে এটাই মনে করত যে, খলিফা নির্বাচন করা জনসাধারণের কাজ নয়; বরং রাসূল -এর কাজ। এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের দরুন ইসলামের তথা ধর্মের কী ক্ষতিই না সাধিত হতো! শিয়াদের ইমাম নির্বাচন সম্বন্ধীয় ব্যাপার হতে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তবে তিনি এতটুকু বলে গিয়েছিলেন যে, আমার পরে খেলাফতের পদের জন্যে আবু বকর ব্যতীত অন্য কারো প্রতি আল্লাহ তা'আলাও সন্তুষ্ট হবেন না, মুসলমানগণও সন্তুষ্ট হবে না। রাসূলুল্লাহ ওহী দ্বারা জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পরে খেলাফত আবু বকরের জন্যে আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে।

একদিন আবু বকর নামায পড়াতে আরম্ভ করলেন, সেদিন রাসূলুলøাহ -এর তবিয়ত কিছুটা সুস্থ ছিল। তিনি হুজরা হতে মসজিদে তশরীফ আনলেন। আবু বকর তা টের পেয়ে নামাযের মুসাল্লা হতে সরে আসতে চাইলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ তাঁকে নিষেধ করলেন এবং তাঁকে ডান পাশে রেখে নামায আদায় করলেন। রাসূল -এর নির্দেশানুসারে আবু বকর বৃহস্পতিবার ইশা থেকে নামাযের ইমামতি করেন। এভাবে রাসূল -এর জীবদ্দশায় আবু বকর মোট ১৭ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করে। কারো মতে ২১ ওয়াক্ত ইমামতি করেন।[১৪৫]

---

১৪৫ খালিদ মাহমূদ, খুলাফায়ে রাশিদীন, পৃ. ১২৫।

অধ্যায়-৫

রাসূলুল্লাহ -এর ইন্তিকাল ও খলিফা আবু বকর
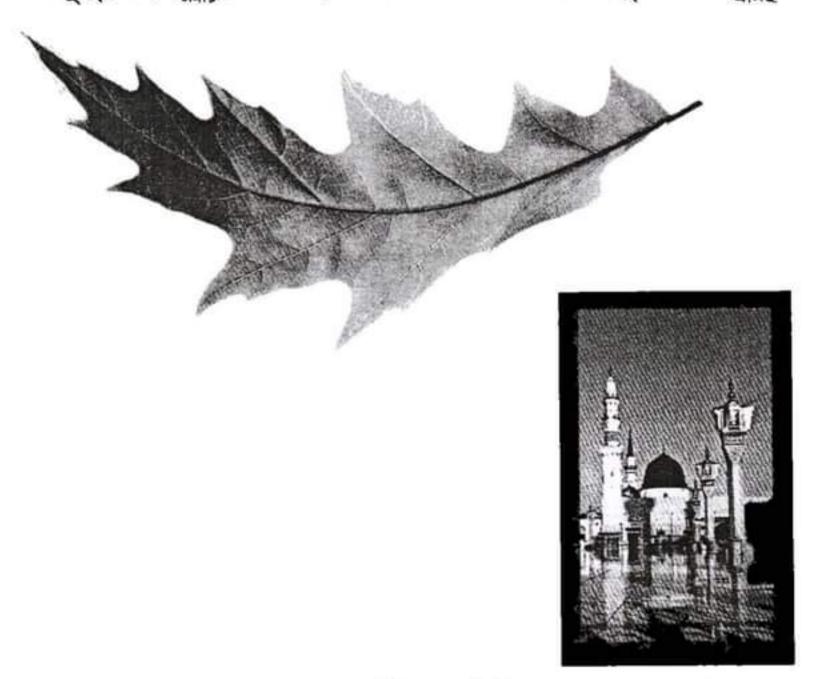
রাসূলুল্লাহ -এর ইন্তিকাল

একাদশ হিজরির ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার তেষট্টি বছর চার দিন বয়সে রাসূলুল্লাহ ইন্তিকাল করেন। প্রিয়তম রাসূল -এর মৃত্যু-সংবাদ শোনো মাত্র উমরের হুঁশ-বুদ্ধি লোপ পেতে থাকে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেন, কিছুসংখ্যক মুনাফিক মনে করেছে যে, রাসূলুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেছেন; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেননি; বরং আপন প্রতিপালকের কাছে চলে গিয়েছেন। যেমন মূসা বিন ইমরান (আ) আল্লাহর কাছে চলে গিয়েছেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে ৪০ রাত অনুপস্থিত থাকার পর তাদের কাছে পুনরায় ফিরে এসেছিলেন। অথচ চলে আসার পূর্বে বলা হতো যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ও অবশ্যই ফিরে

আসবেন এবং ঐ সকল লোকের হাত পা কেটে দেবেন যারা মনে করছে যে, প্রকৃতই তাঁর মৃত্যু হয়েছে"।[১৪৬]

এদিকে আবু বকর সানাহতে অবস্থিত নিজ বাড়ি হতে ঘোড়ায় চড়ে আসার পর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। এরপর লোকদের সাথে কোনো কথাবার্তা না বলে সরাসরি 'আয়েশা -এর কাছে চলে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ -এর কাছে পৌছলেন। নবী করীম -এর দেহ মুবারক তখন জরীদার ইয়েমেনী চাদর দ্বারা ঢাকা ছিল। আবু বকর পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে চাদর সরিয়ে তা চুম্বন করলেন এবং অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। আর বললেন, 'আমার মাতাপিতা আপনার জন্যে উৎসর্গীকৃত হোক। আল্লাহ আপনার ওপর দুবার মৃত্যু একত্রিত করবেন না, যে মৃত্যু আপনার ভাগ্যলিপিতে ছিল সেটা এসে গেছে। এরপর তিনি সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। সে সময় ওমর লোকদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। আবু বকর তাঁকে বললেন ওমর বস'। ওমর বসতে অস্বীকার করলেন। এদিকে সাহাবায়ে কেরাম ওমর -কে ছেড়ে দিয়ে আবু বকর -এর প্রতি অধিক মনোযোগী হলেন। আবু বকর বললেন-

"আল্লাহর প্রশংসার পর- তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ -এর পূজা করছিলে, তারা জেনে নিক যে, মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করছিল- অবশ্যই আল্লাহ সর্বদাই জীবিত থাকবেন, কখনোই মৃত্যুবরণ করবেন না। আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ.

"মুহাম্মদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বের অনেক রাসূল গত হয়ে গিয়েছেন। তবে কি যদি নবী মৃত্যুবরণ করেন কিংবা তাঁকে হত্যা করা হয়, তখন আপন আপন গোড়ালির ভরে আগের গোমরাহি অবস্থার দিকে ফিরে যাবে? স্মরণ রেখো, যারা আগের অবস্থায় ফিরে যাবে তারা আল্লাহর

---

[১৪৬] ইবনে হিশাম, সিরাতুন নববীয়্যাহ, খ.২, পৃ. ৬৫৫।

কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না এবং অতি শীঘ্রই আল্লাহর শোকরগোজারদের প্রতিদান দেওয়া হবে।"[১৪৭]

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু যাঁরা এতক্ষণ পর্যন্ত সীমাহীন শোক-বেদনায় কাতর অবস্থায় নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এ ভাষণ শোনোর পর তাঁরা সুনিশ্চিত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতই ওফাত লাভ করেছেন। এমতাবস্থায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহর কসম! এ ব্যাপারে এমনটি মনে হচ্ছিল, লোকজন যেন জানতই না যে, আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এ আয়াত পাঠ করেন, তখন সকলেই এ আয়াত সম্পর্কে যেন নতুনভাবে জানতে পারলেন। সকলকেই এ আয়াত তিলাওয়াত করতে দেখা গেল।"

সাঈদ বিন মুসাইয়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আল্লাহর কসম! আমি যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এ আয়াত পাঠ করতে শুনলাম, তখন আমি খুবই লজ্জিত বোধ করলাম। (অথবা আমার পিঠ ভেঙে পড়ল) এমনকি আমার দ্বারা আমার পা উঠানো সম্ভব হচ্ছিল না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এ আয়াত পাঠ করতে শুনে আমি মাটির দিকে গড়িয়ে পড়লাম। কারণ, আমি তখন বুঝতে সক্ষম হলাম যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতই ইন্তিকাল করেছেন।"[১৪৮]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর খিলাফত লাভ

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর খলিফা কে হবেন এ নিয়ে প্রাথমিক মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। আনসারগণ সর্বপ্রথম আলোচনা শুরু করেন, পরবর্তীতে আবু বকর, উমর এবং আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহসহ সাকীফায়ে বনী সায়িদায় এক দীর্ঘ আলাপ-আলোচনায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন। খিলাফত নিয়ে সৃষ্ট মতানৈক্য ও এর খলিফা নির্বাচন প্রক্রিয়া নিম্নে উপস্থাপিত হলো।

খলিফা নির্বাচনের প্রশ্নে আনসারগণ সা'দ বিন আবু উবায়দাকে প্রাথমিক সমর্থন দিয়ে সাকীফায়ে বনী সায়িদায় আলোচনা শুরু করেন। কিন্তু সাদ ইবনে আবু উবায়দা খলিফা হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এক দীর্ঘ ভাষণ দেন।[১৪৯] তখন আনসারগণ তাদের মধ্য থেকে অন্য আরেকজনকে খলিফা নির্বাচন করার জন্য আলোচনা শুরু করেন। তাবারী রচিত তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক গ্রন্থের এক

---

[১৪৭] আল-কুরআন ৩:১৪৪

[১৪৮] বুখারী, আস সহীহ, হাদিস নং : ১১৬৫

[১৪৯] ইবনু সাদ, আত তাবাকাতুল কুবরা, খ.৩, পৃ. ৫৬৮।

দুর্বল বর্ণনা থেকে জানা যায় আনসারগণ চেয়েছিলেন খলিফা দু'জন হোক। একজন আনসারদের মধ্য থেকে এবং অন্যজন মুহাজিরদের মধ্য থেকে।[১৫০] আল হুবাব ইবনুল মুনযির আল-আনসারী এ মতের উপস্থাপক। এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এ মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা খলিফা দুজন নির্বাচিত হলে তা সাংঘাতিক মতানৈক্যের কারণ হতো।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আহলে বায়তের অন্যান্য সদস্যরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাফন-দাফন নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহসহ অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবী মসজিদে নববীতে খিলাফত নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাতে বায়আতের প্রস্তাব করলে তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে বায়আতের প্রস্তাব করেন, ফলে সেখানে উপস্থিত সকলে এ প্রস্তাব মেনে নেয়।[১৫১] এমতাবস্থায় তারা সাকীফায়ে বনী সায়িদায় আনসারদের আলোচনার সংবাদ পেয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে উপস্থিত হয়ে ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকারে আনসার ও মুহাজিরদের অবদানের কথা উল্লেখ করে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। কিন্তু কোনোভাবেই আনসারগণ তাদের মত থেকে সরে আসছিলো না। অবশেষে আবু উবায়দা ইবনুল জররাহর এক চমৎকার ভাষণে আনসারদের মত পরিবর্তন হন। তিনি বলেন, "হে আনসার সম্প্রদায় ইসলামে সাহায্যে তোমরাই সকলের চেয়ে অগ্রবর্তী ছিলে। তোমরাই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ডেকে এনে আশ্রয় দিয়েছিলে। অতএব তোমরা সে দীনকে পরিবর্তন ও খণ্ডবিখণ্ড করার কাজে অগ্রবর্তী হয়ো না।"

এ মত সমর্থন করে আনসার নেতা খাজরায গোত্রপতি বশীর ইবনু সাদ বলেন, "এটা অনস্বীকার্য যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ বংশীয় ছিলেন। সুতরাং কুরাইশ বংশই খিলাফতের ন্যায্য অধিকারী। আল্লাহর কসম! এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করা আমার নিজের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, মুহাজিরদের বিরোধিতা করো না এবং তাদের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ো না।"

এ ভাষণের পর আনসারগণ নিজেদের দাবী ত্যাগ করে মুহাজিরদের পক্ষ থেকে খলিফা নির্বাচনে সম্মত হলো। এ সময় যায়িদ ইবনে ছাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের মধ্য থেকে ছিলেন। সুতরাং তার স্থলবর্তী খলিফাও

---

১৫০ তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ.২, পৃ. ৪৫৫-৪৫৬।

১৫১ যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, খ.১, পৃ. ৩৬২।

মুহাজিরদের মধ্য থেকেই হবেন। আমরা থাকবো তার পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী। যেমন আমরা রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় তার সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতাই ছিলাম।"[১৫২]

আবূ বকর রা. যখন প্রত্যক্ষ করলেন বিষয়টি মীমাংসার পথে, তখন তিনি ওমর রা. ও আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ রা.-এর হাত ধরে দাঁড়িয়ে উপস্থিত জনতাকে লক্ষ করে বললেন, তোমরা এ দুজনের একজনের হাতে বাইআত গ্রহণ করো। উপস্থিত জনতা এজনের পরিবর্তে আবূ বকর রা.-এর হাতেই বায়আত গ্রহণে সম্মত ছিলো। ওমর রা. তক্ষণাৎ দাড়িয়ে বললেন, "না, এরূপ হতে পারে না। আল্লাহর কসম! আপনি জীবিত থাকতে আমরা কাউকে খিলাফতের অধিকারী করতে পারি না। কেননা আপনি হলেন মুহাজিরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রাসূল ﷺ-এর সাওর গুহার সাথী, দুজনের দ্বিতীয় এবং নামাযে রাসূল ﷺ-এর প্রতিনিধি। নামায হলো দীনের সর্বোৎকৃষ্ট আমল। সুতরায় আপনি থাকতে অপর কারো খিলাফতের আসনে বসা উচিত হবে না। দেখি, আপনি হাত বাড়ান, আমরা আপনার হাতে বায়আত করবো।"[১৫৩]

বস্তুত ওমর রা.-এর এ কথার মাধ্যমে গোট উম্মতের প্রতিনিধিত্ব করা হলো। কেননা আনসারদের নেতৃস্থানীয় সকলেই এখানে উপস্থিত ছিলো এবং মুহাজিরদের শ্রেষ্ঠ দুই নেতাও এখানে উপস্থিত ছিলো। ওমর রা.-এর উদ্দীপনায় সবাই এ ব্যাপারে একমত হলেন যে, আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর ওপর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করা হোক। অবশেষে আবূ বকর রা. খিলাফত গ্রহণে রাজি হয়ে হাত বাড়ান। মুহাজিরদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম ওমর রা. এবং আনসারদের মধ্য থেকে বাসির ইবনে সা'দ রা. আবু বকর রা.-এর হাত ধরে বাইআত গ্রহণ করলেন। তারপর উপস্থিত জনতা বাইআত গ্রহণ করেন।[১৫৪]

রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের দ্বিতীয় দিন মসজিদে সকল সাধারণ মুসলমান আবূ বকর রা.-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। কোনো বর্ণনামতে ঐদিন ৩৩ হাজার সাহাবী বায়আত গ্রহণ করেছিলো।[১৫৫] ঐদিনই আলী রা. বায়আত গ্রহণ করেন।[১৫৬]

---

[১৫২] মুসতাদরাক আল হাকিম, হাদিস নং : ৪৪৩১

[১৫৩] তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ. ২, পৃ. ৪৫৮

[১৫৪] বুখারী, হাদিস নং : ৬৩২৮

[১৫৫] খতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, খ.৪, পৃ. ৩৭০।

[১৫৬] মুসতাদরাক আল হাকেম, হাদিস নং : ৪৪৩১

চিত্র : বনু সাইদার উঠনোর পুরাতন চিত্র

আবু বকর -এর খলিফা হওয়ার যথার্থতা

বয়োজ্যেষ্ঠতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি, আত্মত্যাগ, সামাজিক কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত প্রভাবের জন্যে ইসলামি রীতিতে আবু বকর যথার্থই প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। নিম্নলিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে আবু বকর -এর খিলাফত প্রাপ্তি ন্যায়সঙ্গত ও যথার্থ-

১. পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা আবু বকর -এর প্রতি ইঙ্গিত।

২. মুহাম্মদ -এর সাথে তাঁর বন্ধুত্ব।

৩. মুহাম্মদ -এর চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য।

৪. আবু বকরের প্রতি মহানবী -এর পূর্ণ আস্থা।

৫. মহানবী -এর কথা ও কাজের দ্বারা আবু বকর -এর প্রতি ইঙ্গিত।

৬. সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে আবু বকর -এর মর্যাদা।

মহানবী -এর ইন্তিকালের পর তাঁর নির্বাচনের ফলে ইসলামের প্রাথমিক দুর্যোগ কেটে যায়। তাঁর নির্বাচনে গণতন্ত্রের জয় বিঘোষিত হয়। ইসলামি জগতে এর পর হতে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। তাঁর খিলাফত প্রাপ্তি যুক্তিসঙ্গতও হয়েছিল। কেননা তাঁকে খলিফা মনোনীত করার ব্যাপারে ও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত প্রদর্শন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে- মহানবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর অন্তিম শয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন তিনি আবু বকরকে রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের নামাযের ইমামতি করার ভার দিয়েছিলেন।

ইসলামের খেদমতে এবং হযরতের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুগত্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জান-মাল কুরবান করতে সদা প্রস্তুত ছিলেন। ইসলাম রক্ষার জন্যে তিনি যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং দূরদর্শিতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ধর্মপরায়ণতা এবং অন্যান্য গুণে তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অপেক্ষা নিঃসন্দেহে উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ছিল না কিংবা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো তিনি উগ্র মেজাজের ছিলেন না। তিনি কুরাইশ বংশেরই একজন লোক ছিলেন এবং রক্তের সম্পর্কের চেয়ে ধর্মের সম্পর্কের ভিত্তিতে তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক বেশি প্রিয়পাত্র ছিলেন। কাজেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত প্রাপ্তি ন্যায়সঙ্গত ও যথার্থ।

খলিফা হিসেবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রথম ভাষণ

খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে যে বাণী প্রদান করেন তাতে তিনি বলেন, "হে মুসলমানগণ! আমাকে নেতা নির্বাচন করেছেন, যদিও আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই, যদি আমি ভালো কাজ করি, আমাকে সাহায্য করবেন, যদি অন্যায় ও খারাপ কাজের দিকে যাই, আমাকে সঠিক পথে এনে দিবেন। শাসকদের কাছে সত্য প্রকাশ করাই উত্তম আনুগত্য। সত্য গোপন রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। দুর্বল ও সবল উভয়ই আমার দৃষ্টিতে সমান। উভয়ের প্রতি আমি সমান বিচার প্রদর্শন করব। আমি যখন আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ পালন করি তখন তোমরাও আমাকে মান্য করবে। আর যদি তা লঙ্ঘন করি তা হলে তোমাদের আনুগত্যের বিন্দুমাত্র অধিকার আমার থাকবে না।"[১৫৭]

এরূপে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে তিনি খলিফা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা জনগণকে অবহিত করান। ইসলামি রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়েও যে স্বেচ্ছাচারী হওয়া যায় না এবং বিচারে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব নয়, তা তিনি পরিষ্কারভাবে বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। মাওলানা মুহম্মদ আলী বলেন, "অত্যুৎকৃষ্ট এই বক্তৃতার প্রতিটি শব্দই জ্ঞান-সমৃদ্ধ এবং এটা মুসলিম জাহানের কাছে আলোকের দিশারিস্বরূপ।"

১৫৭ আব্দুর রাযযাক, আল মুছান্নাফ, হাদিস নং : ২০৭০২

অধ্যায়-৬

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খিলাফতকাল

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার সাথে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসব সমস্যার সাফল্যজনক মোকাবিলা করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর মুসলমানদের এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যে, যদি আল্লাহ তা'আলা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাধ্যমে আমাদের ওপর করুণা না করতেন, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম।

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিদ্রোহ/রিদ্দার যুদ্ধ

ইসলামের এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত লাভ ছিল ইসলামের জন্যে আশীর্বাদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে মাত্র দু'বছর তিন মাস শাসনামলের অধিকাংশ সময় তাঁকে রিদ্দা যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়েছিল।

রিদ্দা আরবি শব্দ। এর অর্থ প্রত্যাবর্তনকরণ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর অল্পদিনের মধ্যে কিছুসংখ্যক নবদীক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুনরায় পৌত্তলিকতা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এ সময় আরব উপদ্বীপে কয়েকজন ভণ্ডনবীরও আবির্ভাব হয়। এরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। খলিফার দায়িত্বভার গ্রহণ করেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসব লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দীন ত্যাগী ও ভণ্ডনবীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মুসলিম বাহিনীর অভিযানই 'রিদ্দার যুদ্ধ' নামে ইতিহাসে খ্যাত।

হাসান আলী চৌধুরী বলেন, হযরতের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের সাথে সাথেই ইসলাম এমন চরম বিপদের মুখে পতিত হলো যে, এর অস্তিত্ব বজায় রাখা বড় কঠিন হয়ে পড়ল। ঐ সমস্ত বিদ্রোহী গোত্রের এবং ভণ্ডনবীদের পরিচালিত আন্দোলন ইসলামের ইতিহাসে 'স্বধর্মত্যাগী আন্দোলন' নামে পরিচিত এবং তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অভিযানকেই 'রিদ্দার যুদ্ধ' বলা হয়।
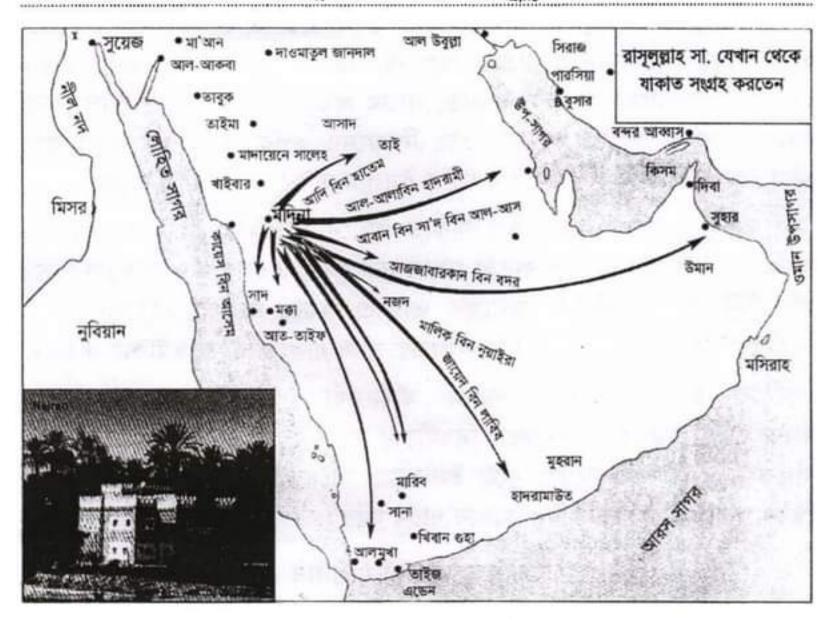
রিদ্দার যুদ্ধের পটভূমি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পূর্বে আরবের বিভিন্ন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তবে ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও জীবনাদর্শের মূল অনুশাসন সম্পর্কে তাদের অনেকেই অজ্ঞ ছিল। এছাড়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকা, যোগাযোগের অভাব, সময়ের স্বল্পতা, সংঘবদ্ধভাবে ইসলাম প্রচারের অভাবে এসব লোকজন ইসলামের বিরোধিতা শুরু করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায়ই মদিনা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র ও রাষ্ট্রের রাজধানী হওয়ার গৌরব অর্জন করে; কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর মক্কায় একশ্রেণির লোক ও অন্যান্য কুচক্রী মহল মদিনার প্রাধান্যকে অস্বীকার করে। ঐতিহাসিক পি. কে. হিট্টি বলেন, হিজাজ রাজধানীর প্রাধান্য ও তাদের ঈর্ষা বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল।

আরববাসীদের মধ্যে গোত্রপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বাতন্ত্র্যবোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নেতৃত্বের লোভ ছিল। ইসলাম প্রতিষ্ঠার ফলে এসব বিলীন হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠিত হয় ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য-মৈত্রীর সুমহান আদর্শ। ফলে বেদুঈনদের মনে দারুণ আঘাত হানে। তারা যেহেতু গোত্রের দলপতিকে অন্ধের মতো অনুসরণ করত, তাই গোত্রপতির ধর্ম ত্যাগের সাথে সাথে তারাও ধর্মত্যাগী হয়ে বিদ্রোহ শুরু করে।

ইসলামের নৈতিক অনুশাসন, রুচিসম্মত ও মার্জিত জীবনযাত্রায় স্বাধীনচেতা অনুশাসনমুক্ত আরববাসীরা অভ্যস্ত ছিল না। চিরদিনই তারা ছিল দুরন্ত বাধা-বন্ধনহীন। ইসলামের সালাত, যাকাত, সাওম প্রভৃতি নৈতিক অনুশাসনকে তারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি; বরং নিজেদের ওপর এগুলোকে যুলুম মনে করল। আর এ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে ইসলাম ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ হলো।

রিদ্দা যুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি। আরবের কতিপয় লোক মনে করল, এ যাকাত ব্যবস্থা কেবল নবী ﷺ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। নবী ﷺ যেহেতু ইন্তিকাল করেছেন, তাই এ যাকাত ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। ফলে তারা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের সময় যাকাত দিতে অস্বীকার করল।

একদিকে ইসলাম ত্যাগী বেদুঈন স্বার্থান্বেষী গোত্রপতি ও ভণ্ডনবীদের অপতৎপরতা শুরু হয়; অন্যদিকে বিধর্মীদের মধ্যে ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা এ মোক্ষম সুযোগ বুঝে ইসলামের বিরোধিতা বাড়িয়ে দেয়। এদের ইন্ধনে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে।

রিদ্দার যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ

যাকাত অস্বীকারকারীরা রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ শুরু করলো। এমতাবস্থায় কিছু সাহাবী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে তাকে সুপারিশ করতে লাগলেন যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা করা উচিত নয়, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর জবাবে তাদেরকে আরও কিছু শক্ত কথা দিয়ে বুঝালেন, "ওহী নাযিল বন্ধ হয়েছে, এবং দ্বীন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। আমি যখন জীবিত তখন কি আমি এটিকে (পরিবর্তন এবং সংশোধনের) সুযোগ দিয়ে ওহীর মর্যাদাকে অবদমিত করবো?" আরেক বর্ণনায় এসেছে, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "হে রাসূল ﷺ-এর খলিফা, লোকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করুন, তাদের সবক দিন, এবং তাদের সাথে বিনম্র আচরণ করুন।" যার জবাবে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أَجَبَّارٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَوَّارٌ فِي الْإِسْلَامِ؟

قَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَتَمَّ الدِّيْنُ. أَيَنْقُصُ وَأَنَا حَيٌّ؟

"আপনি কি আয়েমী জাহেলী যুগে দৃঢ় ছিলেন, যাতে ইসলামে দাখিল হয়ে কাপুরুষ হয়ে যাবেন? ওহী নাযিল বন্ধ হয়েছে; দ্বীন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, সুতরাং

আমি জীবিত থাকতে (পরিবর্তন এবং সংশোধনের মাধ্যমে) এটিকে কি অধঃপতিত করবো?"[১৫৮]

সমগ্র আরবে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লে নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামি সাম্রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিভিন্ন স্থানে তারা বিদ্রোহ করে যাকাত আদায় বন্ধ, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের হত্যা প্রভৃতি নাশকতামূলক কার্যক্রম চালায়। অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারাতে থাকেন। আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ, ভণ্ডনবীদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্র বিপন্ন হয়ে ওঠে। তাদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে ও ভণ্ডনবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে আবু বকর সেনাবাহিনীকে ১১টি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রতিটি বিভাগে এক একজন সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এরপর এক একটি দল আরবের বিভিন্ন অংশে পাঠান।

১. মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রথমে তোলায়হা ও পরে মালিক বিন নুবায়াবার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

২. ইকরামা বিন আবু জাহেল -কে মুসায়লামা কাযযাব-এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। সুরাহবিল ইকরামা -এর সাহায্যার্থে পরে যোগ দিয়েছিলেন।

৩. মোহাজির বিন আবি উমাইয়া -কে আসাদ আনসি ও কায়েস ইবনে আসের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ইয়ামেন ও হাজরামাউতে প্রেরণ করেন।

৪. খলিফা আবু বকর আমর ইবনুল আসকে আরব ও সিরিয়া সীমান্তে ওয়াদীয়হ এবং হাবিসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

৫. খলিফা আবু বকর খালিদ সাঈদকে স্থানীয় গোত্রসমূহ দমনে সিরিয়া পাঠান।

৬. খলিফা আবু বকর আলা ইবনে হাজরামীকে আল হাতাম ইবনে দাবিয়ার বিরুদ্ধে বাহরাইন প্রেরণ করেন।

৭. সুয়ায়দ ইবনে মাকরানকে খলিফা আবু বকর ইয়ামেনের নিম্নাঞ্চলের বিদ্রোহ দমনের জন্যে প্রেরণ করেন।

৮. আরফাজাহ ইবনে হাযছামাকে লাকিত ইবনে মালিক আল-আযদির বিরুদ্ধে মাহরায় প্রেরণ করা হয়।

---

[১৫৮] আবুল হাসান আলী আন-নাদভি রচিত আল-মুরতাদা, পৃষ্ঠা : ৭০, মিশকাত আল-মুসাবিয়াহ : ৬০৩৪

৯. খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযায়ফা ইবনে মুহসিনকে বনু সালাম ও হাওয়াজিন গোত্রদ্বয়কে দমন করার জন্যে প্রেরণ করেন।

১০. তুরাইফাকে খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরবের নিম্নাঞ্চল অভিযানে প্রেরণ করেন।

১১. খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সুরাহবিল ইবনে হামনাহকে ইয়ামামায় ইকরামার সাথে প্রেরণ করেন।[১৫৯]

মদিনাকে রক্ষা করার জন্যে একটি বাহিনীকে খলিফা তাঁর সাথে রাখেন। মদিনা থেকে প্রধান সেনাপতিরূপে তিনি দক্ষতা ও দৃঢ়তার সাথে বিদ্রোহ দমনে অভিযান পরিচালনা করেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনা রক্ষা করা এবং মুরতাদদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন:

১। তিনি মদিনার সকল পুরুষকে মসজিদে রাতে অবস্থানের আদেশ দিলেন, যাতে তারা সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকে এবং নবীর নগরীকে রক্ষা করে।

২। তিনি শহরের বিভিন্ন প্রবেশ পথে প্রহরী নিযুক্ত করেন।

৩। প্রহরীদের প্রহরা দেয়ার জন্য, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জেহাদে পরীক্ষিত এবং সাহসী নেতাদেরকে তাদের ওপর দৃষ্টি রাখার জন্য নিযুক্ত করেন। এদের মধ্যে ছিলেন : 'আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু, আয-যুবায়ের ইবনে আল-আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, 'আবদুর-রহমান ইবনে 'আউফ এবং 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

এভাবে যাকাত অস্বীকারকারী মুরতাদদের দমন করে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামি রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

[১৫৯] তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ.২, পৃ. ৪৭৯-৭৮০।

আল-মদীনা
আল-মনুওয়ারাহ
পুরাতাত্ত্বীক উপস্থাপনা
বনাঞ্চল
মাজমাউল আসিয়াল
ফলের বাগান
জাঘাবাহ
অহুদ পর্বত
আইন আশ-সুহাদা
ওয়াদী কানাহ
হাররাহ ওয়াকিম
রুমা কূপ
সানিয়াতুল ওয়াদা
খন্দক
আল-ফাতহ মসজিদ
বানী হারিশার বাড়ী
মসজিদ
আবী আইয়ুব কূপ
হাররাতুল ওয়াবরাহ
সাল-পর্বত
আস-সুনহ
বানী মুয়াবিয়ার আবাস
আল ইজারা মসজিদ
নজদের পথ
আল-আকীক উপত্যকা
সাইয়েদ বিন আল আস প্রাসাদ
ইয়ানবুর পথ
খাবার পানির কূপ
কূবা দরজা
আল-আওয়ালী দরজা
বানী জাফর মসজিদ
বানী কানজুকার আবাস
বানী জাফরের আবাস
ওয়াদী মাজুর
কুবার পথ
ওয়াদী বুথান
বানী কুরাইজার আবাস
ঘারস কূপ
আল-জুমা মসজিদ
উরওয়া কূপ
আরিশ কূপ
ফলের বাগান
কূবা মসজিদ
বানী আল-নাদিরের আবাস
সা'দ বিন খাইতামার বাড়ী
কুলসুম বিন আল-হাজমের বাড়ী
কাব বিন আল-আশরাফ দূর্গ
জুল হুলাইফা
ইইর পর্বত
হাররাহ
চিত্রন: আব্দুল কুদ্দুস আল-আনসারী

ভণ্ডনবীদের উদ্ভব ও তাদের পতন

মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত লাভের পর তাঁর সম্মান, প্রতিপত্তি এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাঁর সাফল্য প্রত্যক্ষ করে আরবের অনেক লোকের মনে নবুয়ত লাভের প্রেরণা তীব্রভাবে জেগে ওঠে। জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় তারা শুধু মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। তারা কখনো ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে মনেপ্রাণে মেনে নেয়নি। রাসূল ﷺ-এর জীবনের শেষদিকে আরবের বিভিন্ন অংশে কতিপয় ভণ্ডনবীর আবির্ভাব ঘটে। মহানবী ﷺ-এর ওফাতের পর তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং ইসলামের ধ্বংস সাধনে লিপ্ত হয়। যে সমস্ত ধর্মত্যাগী মুসলমান নিজেদেরকে নবী বলে দাবি করে তাদের মধ্যে ইয়ামেনের আনসি গোত্রের নেতা আসাদ আনসি, ইয়ামামার বনু হানিফা গোত্রের মুসায়লামা, বনু আসাদ গোত্রের তোলাইহা, বনূ ইয়ারবু গোত্রের মহিলা সাজাহ ভণ্ডনবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। নিচে সংক্ষেপে ভণ্ডনবীদের পরিচয় দেওয়া হলো-

১. আসওয়াদ আনাসি : ভণ্ডনবীদের মধ্যে ইয়ামেনের আনসি গোত্রের নেতা আসাওয়াদ আনাসি সর্বপ্রথম নবুয়ত দাবি করে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাসূল ﷺ-এর জীবিতাবস্থায় হিজরি দশম সালে সে নবুয়তের দাবিদার হয়।[১৬০] আল-আসওয়াদের প্রকৃত নাম আবহালাহ ইবনে কা'ব এবং তার ছদ্মনাম "ঘোমটা ওয়ালা", কারণ তিনি সবসময় নিজের মাথা এবং মুখমণ্ডল ঘোমটা দিয়ে ঢেকে রাখতেন। তিনি আল-আসওয়াদ আল-আনসিতে বেশি পরিচিত ছিলেন, কারণ তার গায়ের বর্ণ ছিল কালো। "আল-আসওয়াদ" শব্দের অর্থ হচ্ছে "কালো কোন কিছু।" সে ইয়ামেনে মুসলিম শাসনকর্তাকে বিতাড়িত ও হত্যা করে রাজধানী সানআ ও নাজরানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর সে পার্শ্ববর্তী গোত্রপ্রধানদের সহায়তায় একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করে এবং সমগ্র দক্ষিণ আরব তার দখলভুক্ত করে নেয়। মহানবী ﷺ এ বিদ্রোহ দমনের জন্যে সা'দ বিন জাবালকে প্রেরণ করেন; কিন্তু ভণ্ডনবী আসাদ মহানবী ﷺ-এর মৃত্যুর দু-এক দিন পূর্বে ইয়ামেনের নিহত শাসনকর্তার এক আত্মীয় ফিরোজ দায়লামী কর্তৃক নিহত হয়। মহানবী ﷺ-এর মৃত্যুর পর ইয়ামেনে পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। প্রথম খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

---

[১৬০] উলায়মী, আল উনসুল জালীল বি-তারীখিল কুদসি ওয়াল খালীল, খ.১, পৃ. ২২২।

চিত্র : সা'না বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ এবং পুরাতন ঐতিহাসিক নগরী

৩. তোলায়হা : নবম হিজরীতে উত্তর আরবের বনু সাদ গোত্রের তোলায়হা নামক এক ব্যক্তিও নিজেকে নবী বলে দাবি করে।[১৬১] মদিনার বেদুঈনদের সাথে ষড়যন্ত্র করে সে যাকাতবিরোধী এক আন্দোলন গড়ে তোলে। মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বুজাখার যুদ্ধে তাকে পরাজিত করেন। ফলে সে পালিয়ে গিয়ে সিরিয়ায় আত্মগোপন করে। খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বনু সাদ গোত্রকে ক্ষমা করে দেন। এ সুযোগে তোলায়হা ফিরে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

৪. সাজাহ : প্রথম খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইকরামা ও সুরাবলকে তার বিরুদ্ধে মুসায়লামার বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন। তারা এ যুদ্ধে মুসায়লামার বিরাট বাহিনীর কাছে পরাজিত হন। অতঃপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খালিদ বিন ওয়ালিদকে এ বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন। এ সময়ের মধ্য আরবের বনু ইয়ারবু গোত্রের খ্রিস্টান রমণী সাজাহ মুসায়লামার সাথে যোগদান করে তাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। মহাবীর খালিদের সাথে ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইয়ামামার যুদ্ধে মুসায়লামা অসংখ্য অনুচরসহ নিহত হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের বহু কুরআনে হাফিজ সাহাবি শাহাদাত বরণ করেন।

২. মুসায়লামা : মধ্য আরবের ইয়ামামায় বনু হানিফা গোত্রে অপর একজন ভণ্ডনবী মুসায়লামার জন্ম হয়। সে প্রতিনিধি আগমনের বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে; কিন্তু দেশে ফিরে গিয়েই নিজেকে নবী বলে দাবি

---

[১৬১] ইবনু কাছীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ৫, পৃ. ১০২।

করে। মুসায়লামা স্বলিখিত বাণীকে ঐশীবাণী বলে প্রচার করে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে লিখিত একটি পত্রে সে জানায় যে, ধর্ম প্রচার এবং আরব ভূমিতে শাসনকার্য নির্বাহের জন্যে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমতুল্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসায়লামার প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামি এবং ধর্মদ্রোহিতায় বিচলিত হন এবং একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে তাকে ধর্ম এবং রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ হতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। ভণ্ডনবীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন মুসায়লামা। সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূতের কথায় কর্ণপাত করেনি; উপরন্তু কুরআনের বাণী নকল করে নিজস্ব নামায পদ্ধতি চালু করে। মুসায়লামার দেওয়া চিঠির উত্তরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখেছিলেন, “আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে মিথ্যুক মুসায়লামার কাছে, পৃথিবীর মালিক আল্লাহ, তিনি যাকে খুশি এর উত্তরাধিকার দান করেন।” মুসায়লামা বনু-তমীমের সাজাহ নাম্নী এক খ্রিস্টান মহিলার পাণি গ্রহণ করে ইসলামের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করল। সাজাহও নবুয়ত দাবি করেছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা নির্বাচিত হবার পর মুসায়লামার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। ইকরামা ও সুরাহবিল ইয়ামামার বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে মুসায়লামার হাতে পরাজিত হলেন। তখন খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খালিদকে মুসায়লামার বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন।

এঅভিযান ইয়ামামার যুদ্ধ নামে পরিচিত। ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বনু হানিফার লোকেরা মুসলমানদের সাথে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করল। মুসলমানগণও সর্বশক্তি নিয়োগ করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করল। মুসায়লামা ও তার সাথিরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে প্রাচীর পরিবৃত্ত উদ্যান-নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করল এবং মুসলমানদের সম্মুখে নগরদ্বার বন্ধ করে দিল। মুসলমানগণ তাদের একজন দুর্ধর্ষ বীরপুরুষকে প্রাচীরের উপর উঠিয়ে দিল। তিনি অতর্কিতে নিচে লাফিয়ে পড়ে ডানে ও বামে তরবারি চালনা করলেন এবং নগরদ্বার খুলে দিলেন। মুসলমানগণ উত্তাল তরঙ্গের মতো নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করল। স্বল্প পরিসর স্থানে বহু লোকের ভিড়াভিড়িতে বনু হানিফার অগণিত লোক মৃত্যুবরণ করল। মুসায়লামা দশ সহস্র অনুচরসহ নিহত হলো। মুসলমানদের প্রায় বারো শত লোক মৃত্যুবরণ করল। এ যুদ্ধে বহু কুরআনে হাফেজ শহীদ হয়েছিলেন। মদিনার ঘরে ঘরে শোকের কালো ছায়া নেমে আসল। আনসার ও মুহাজিরদের কোনো গৃহ বাকি ছিল না যেখানে কারো মৃত্যুতে বিলাপ ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়নি। বনু হানিফার লোকেরা এরপর আত্মসমর্পণ করে ইসলাম ধর্মে পুনরায় ফিরে আসল।
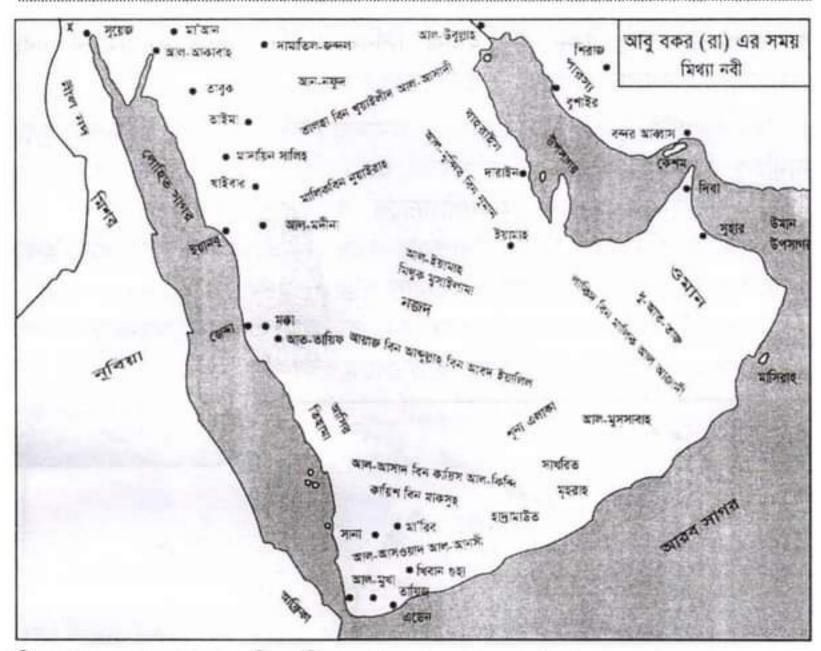
রিদ্দার যুদ্ধের ফলাফল : নিচে রিদ্দার যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা করা হলো–

১. ইসলামের অখণ্ডতা বজায় : প্রাক-ইসলামি যুগে আরব বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও এলাকায় বিভক্ত ছিল। ইসলাম ধর্ম অখণ্ড জাতি হিসেবে আরবাসীকে মর্যাদার আসন দেয়; কিন্তু নবীজীর ইন্তিকালের পর আরববাসীরা বিভক্ত হয়ে পড়লে পুনরায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের অখণ্ডতা বজায় রাখতে সক্ষম হন।

২. স্থায়ী মর্যাদা লাভ : মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার ভণ্ডনবীদের ওপর জয়লাভের পর ইসলাম অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে স্থায়ী মর্যাদা লাভ করল।

৩. মুসলমানদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর অল্পকালের মধ্যেই ইসলামের এ ধরনের ব্যর্থতা দেখে অনেক মুসলমানের মনেও সংশয় দেখা দেয়। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দৃঢ় প্রতিরোধের মুখে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হলে মুসলমানদের অন্তরে ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৪. রাষ্ট্রের সুদৃঢ় ভিত্তি : মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে শক্ত হাতে ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহীদের দমন করা হলে এ রাষ্ট্রের শক্তি ও ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়, যা বিরোধীদের কাছে অপরাজেয় মনে হয়েছিল।

৫. জয়ের দিগন্ত উন্মোচন : অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমনের পর আরবের বাইরে ইসলামের শক্তি সম্প্রসারণ করার অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সুযোগকে

কাজে লাগিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন এবং এরই সাথে ইসলামের জয়ের দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

৬. সামরিক শক্তি বৃদ্ধি : রিদ্দার যুদ্ধে মুসলমানরা নতুন নতুন কৌশল আয়ত্ত করে সামরিক দিক থেকে আরও শক্তিশালী হয়। রিদ্দা যুদ্ধের সময় রোমান ও পারসিকরা সীমান্ত প্রদেশে ধর্মত্যাগীদেরকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। তাই পরবর্তীকালে খলিফাগণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে এর প্রতিশোধ নিতে বাধ্য হন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য মুসলমানদের দখলে আসে। রিদ্দার যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে এক চরম পরীক্ষা। এ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মদিনার শিশু ইসলামি রাষ্ট্র দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পায়।

কুরআন সংকলণে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু
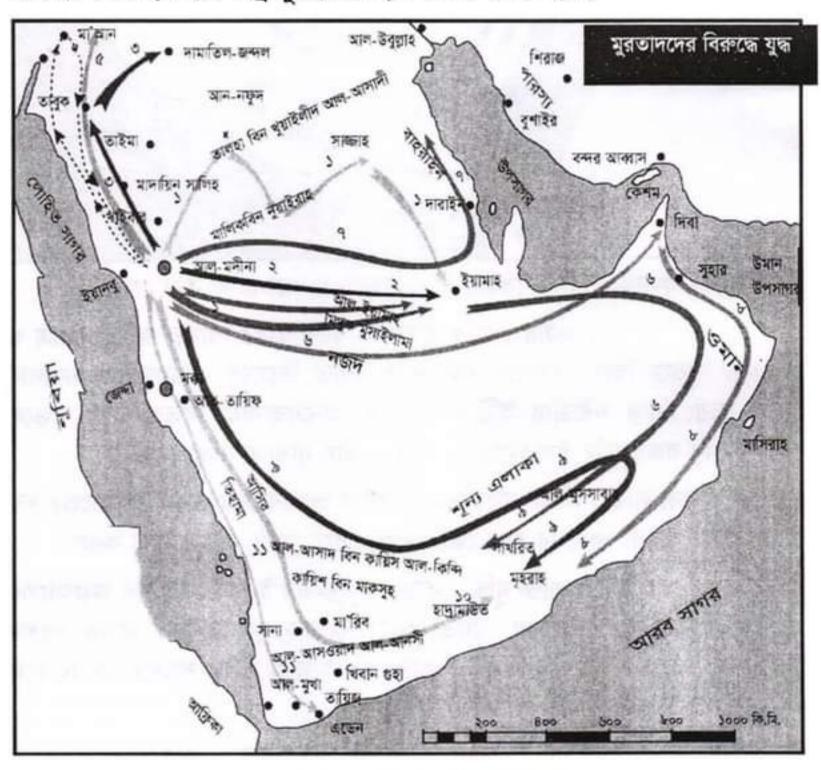
যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেন, তখন কুরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ ছিল না। এর অংশ বিশেষ মুখস্থ করা হোত, কিছু চামড়া অথবা হাড়ের উপর উৎকীর্ণ করা হোত। অনেক সাহাবী যাদের কুরআন মুখস্থ ছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর

শাসনামলে সর্বপ্রথম কুরআন লিখিতাকারে গ্রন্থাবদ্ধ হয়। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলে কুরআন সংকলনের পর্যায়গুলো আলোচনা করা হলো–

১. হাফেযে কুরআন সাহাবিদের শাহাদাত : মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিরোধানের পর ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রথম খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত আমলে ইসলামবিরোধী চক্র ও ভণ্ডনবীর বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদে বিশেষত মুসায়লামার বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের বহু হাফিয সাহাবি শাহাদাতবরণ করেন। এভাবে হাফিযগণ শাহাদাতবরণ করতে থাকলে কুরআন মজীদ সংরক্ষণ করা দুরূহ হয়ে পড়বে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে দূরদর্শী ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কুরআন সংগ্রহ করে একত্রে একটা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাকারে গ্রন্থিত করার সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

২. লিখিত বস্তুগুলোর একত্রায়ন জরুরি : মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় কুরআনের যেসব পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল, তা একই গ্রন্থে গ্রন্থিত ছিল না; বরং তা ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন চামড়া, হাড়, গাছের পাতা ও বাকল, পাথর প্রভৃতির উপর লিখিত ছিল। তাই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উমরের রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজটি করে যেতে পারেননি, তা করার সীমাহীন গুরুত্ব ও কল্যাণের দিক বিবেচনা করে এ প্রস্তাবে সম্মত হন।

৩. কুরআন গ্রন্থায়ন : আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "অহী লিখন দফতরের" প্রধান সচিব যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে প্রধান করে একটি "কুরআন গ্রন্থায়ন কমিশন" গঠন করেন। এ কমিটি অনেক পরিশ্রম করে কুরআনের একটি পূর্ণাঙ্গ বিশুদ্ধ গ্রন্থায়ন করেন। তারপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হুকুমে যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু সেগুলোকে একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ করে এক সুতায় গেঁথে দেন।

তারপর একে রাষ্ট্রীয়ভাবে হিফাজত করা হয়। পরে দ্বিতীয় খলিফা উমরের রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তিকালের পর নবীপত্নী উম্মুল মু'মিনীন হাফসার রাদিয়াল্লাহু আনহা কাছে তা সংরক্ষিত থাকে।

আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু আনহু সময়কার সংকলিত কুরআনের পাণ্ডুলিপির বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ-

১. প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক করে লেখা হয়েছিল। তাই তা অনেকগুলো সহীফায় বিভক্ত ছিল। এগুলোকে 'উম্ম' বা মূল পাণ্ডুলিপি বলা হতো।

২. মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশিত ও বিন্যাস পদ্ধতি মোতাবেক আয়াতগুলো সূরাসমূহের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বিন্যাস করা হয়েছিল। সূরাগুলো ধারাবাহিক করা হয়নি; বরং প্রতি সূরা আলাদা আলাদা লেখা হয়েছিল।

৩. এ পাণ্ডুলিপিতে 'কুরআনের সাতটি' পঠনরীতিই' সন্নিবেশিত করা হয়েছিল।

৪. এ পাণ্ডুলিপি 'হিরী' লিখন প্রণালিতে লেখা হয়েছিল।

৫. যেসব আয়াতের তিলাওয়াত মানসুখ হয়নি, কেবল সে আয়াতগুলোই ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়েছিল।

৬. এ পাণ্ডুলিপিটি এমন নির্ভুল ও বিশুদ্ধভাবে সকলের সর্বসম্মতি ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়, যাতে প্রয়োজনে সবাই এ মূল কপি থেকে নিজ নিজ নুসখা শুদ্ধ করে নিতে পারেন।
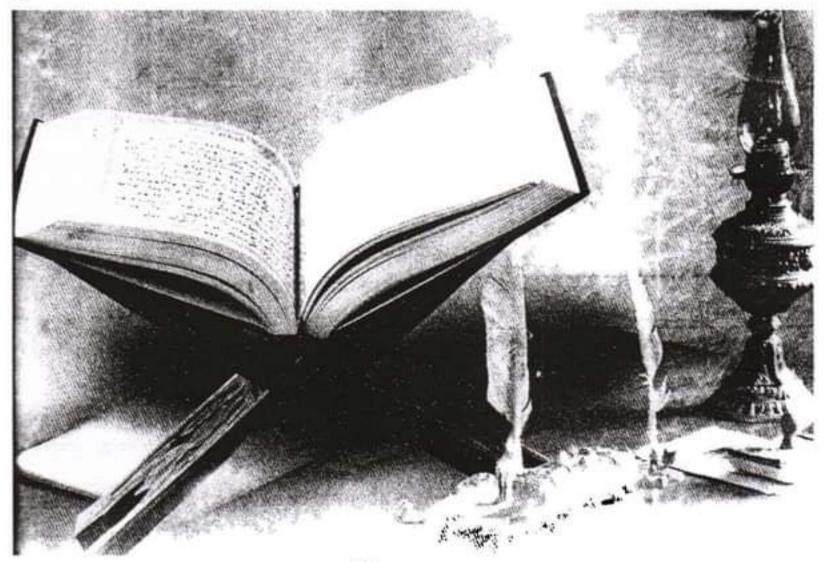
হাদীস সংরক্ষণে

এক বিবরণ মোতাবেক আবু বকর নিজে প্রায় পাঁচশ হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ -এর হাদীস সংগ্রহের ব্যাপারে কোনো রদবদলের জন্যে তিনি দায়ী হতে পারেন, এ আশঙ্কায় তিনি নিজেই ঐসব সংগৃহীত হাদীস বাতিল করেছেন। কিন্তু আল্লামা যাহবী এ বিবরণ ঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন। যা হোক, হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়েও তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন। বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে তার বর্ণিত হাদিস সংখ্যা সম্পর্কে ইমাম নববী ১৪২টি বলে উল্লেখ করেছেন।[১৬২]

---

১৬২ সুয়ূতী, তারীখুল খুলাফা, পৃ. ৩৪

তিনি সাহাবায়ে কিরামদের সমবেত করে বিশেষভাবে বলেন- "তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে এমনসব হাদীস বর্ণনা করছ যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের মধ্যেই মতভেদ রয়েছে। এ ধারা জারি রাখা হলে তোমাদের পরবর্তীগণ আরও বেশি বিতর্ক ও মতবৈষম্যে লিপ্ত হবে। এজন্যে তোমাদের নসিহত করছি যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কে কোনো কথাই বলো না। প্রশ্ন করা হলে বলে দেবে যে, "তোমাদের ও আমাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট। এ কিতাবের নির্ধারিত হালাল ও হারামকে মেনে চলবে।"[১৬৩]

কিন্তু এ উক্তি দ্বারা তিনি হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন বলে মনে করলে ভুল করা হবে; বরং তিনি যা বলেছেন তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, কোনো হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত না হয়ে তা বর্ণনা করা ঠিক নয়। তিনি নিজেও এ নিয়ম মেনে চলতেন। কোনো বর্ণনার বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হলে তিনি বিনা দ্বিধায় তা কবুল করে নিতেন। একবার দাদির উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না থাকায় রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ফায়সালা জানা দরকার হয়ে পড়ে। মুগীরা বিন শু'বা (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, "আমি ভালো করেই জানি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) দাদিকে এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন।" তিনি সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে প্রশ্ন করলেন, "কোনো সাক্ষী আছে?" মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ দাঁড়িয়ে এ উক্তির সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন। আবু বকর (রা.) তৎক্ষণাৎ ঐরূপ করার আদেশ জারি করেন। পরবর্তীকালে ওমর (রা.) এই নীতি মেনে চলেন। আবু বকর (রা.)-এর হাদীস যাচাই ও বিশুদ্ধ হাদীস গ্রহণ করা সম্পর্কে আরও অনেক বিবরণ পাওয়া যায়।

ফতোয়া দফতর

ফিকহ (ইসলামি ব্যবহারিক আইনশাস্ত্র) সম্পর্কে গবেষণা, পর্যালোচনা এবং জনসাধারণের সুবিধার্থে আবু বকর (রা.) একটি ফতোয়া দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। দীনী ইলম ও ইজতিহাদের জন্যে বিখ্যাত ওমর (রা.), উসমান (রা.), আলী (রা.), আব্দুর রহমান বিন আউফ (রা.), মায়াজ ইবনে জাবাল (রা.), আলী বিন কা'ব (রা.), যায়েদ বিন সাবিত (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামকে এ দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ কয়জন ব্যতীত অন্য কারো ফতোয়া দানের অনুমতি ছিল না। ওমর (সা.) তাঁর খিলাফতকালে এ ব্যবস্থা কায়েম রাখেন।

---

[১৬৩] ইমাম আয যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফফায, খ.১, পৃ. ৩।

রাসূলুল্লাহ -এর ওয়াদা পূরণ ও ঋণ শোধ

রাসূলুল্লাহ -এর ওয়াদা পূরণ ও তাঁর ঋণ শোধ করে দেওয়াও খিলাফতের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবু বকর প্রথম সুযোগেই এ দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভ করেন। বাহরাইন থেকে গনিমতের সম্পদ আসামাত্র তিনি ঘোষণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ -এর কাছে কারো কিছু পাওনা থাকলে অথবা তিনি কারো সাথে কোনো ওয়াদা করে থাকলে তারা যেন এসব বিষয় খলিফাকে জানান। এ ঘোষণার পর জাকের জানান যে, রাসূলুল্লাহ তাঁকে তিন আজলা দান করার ওয়াদা করেছিলেন। আবু বকর তাঁর উভয় হাতের তালু যুক্ত করে তাঁকে তিন আজলা দান করেন। অনুরূপভাবে আবু বশীর মাজনীর বর্ণনানুসারে তাঁকে চৌদ্দশত দিরহাম প্রদান করেন।

আহলে বাইত-এর দেখাশোনা

ফিদাক-এর বাগান ও খুমুছ সম্পর্কিত বিতর্কের দরুন রাসূলুল্লাহ -এর আত্মীয়-স্বজনদের অন্তরে আবু বকর সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষত ফাতিমা সেজন্যে ব্যথিত ছিলেন। তবুও প্রথম খলিফা তাঁর সাথে সর্বদাই স্নেহ ও ভালোবাসার সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। ইন্তিকালের পূর্বে তিনি ফাতিমা -এর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তাঁর অন্তর পরিষ্কার করে দেন।

উম্মুল মু'মিনীনদের সুযোগ-সুবিধা এবং রাসূলুল্লাহ -এর মান-সম্ভ্রমের প্রতি সর্বদাই তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। ইকরামা বিন আবু জাহল রাসূলুল্লাহ -এর জনৈকা বিবাহিতা স্ত্রী ক্বাতিলা বিনতে কায়েসকে বিয়ে করেছিল। আবু বকর উভয়কে আগুনে জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন; কিন্তু ওমর তাঁকে এ কথা জানিয়ে বিরত করেন যে, ক্বাতিলার সাথে রাসূলুল্লাহ -এর বিয়ে হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু সে কখনও রাসূলুল্লাহ -এর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেনি। এজন্যে ক্বাতিলা উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে শামিল হতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ যাঁদের সম্পর্কে বিশেষ অসিয়ত করে গিয়েছিলেন অথবা তিনি জীবদ্দশায় যাঁদের প্রতি বিশেষ স্নেহ ও মায়ামমতা দেখাতেন তাঁদের প্রতি আবু বকর অনুরূপ ব্যবহারই করতেন। রাসূলুল্লাহ প্রায়ই উম্মুল আয়মান -এর সাথে দেখা করতে স্বয়ং তার কাছে যেতেন। আবু বকর রীতিমতো এ কাজ করতেন। ছানদার নামীয় জনৈক গোলামকে রাসূলুল্লাহ মুক্ত করে দেবার সময় বলেন, "আমি প্রতিটি মুসলমানকে তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার

করার জন্যে অসিয়ত করছি।" আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের আসনে সমাসীন হয়ে তার জন্যে ভাতা নির্ধারণ করেন। এ ভাতা তার মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা

'ইসলামি সমাজ' বলতে যা বুঝানো হয় সে অর্থে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সমাজ ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামি সমাজ। বলাই বাহুল্য যে, ইসলাম যে আদর্শিক নির্দেশনাসমূহ উপস্থাপন করেছে, তা নিছক একটি আদর্শবাদের ব্যাপার নয়; বরং তা হলো পূর্ণমাত্রায় একটি বাস্তব জীবনব্যবস্থা ও সমাজ গঠনের সফল কার্যসূচি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের শিক্ষার আলোকে একটি আদর্শ সমাজ গঠন এবং এর মাধ্যমে জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন। তাঁর খিলাফতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো– তিনি ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী এমন একটি ভ্রাতৃপ্রতীম সমাজ গড়ে তুলতে সমর্থ হন, যেখানে প্রতিটি মানুষ সমান মর্যাদা ও অধিকারসম্পন্ন ভাই মাত্র। 'মুসলিম'ই এদের একমাত্র পরিচয় ছিল। খলিফা, গভর্নর ও সাধারণ মুসলিমদের জীবনযাপনের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। অমুসলিমদেরও পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল এবং মুসলিম ও তাদের মধ্যে অত্যন্ত সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। মহিলাদের পূর্ণাঙ্গ অধিকার ছিল। গোলাম ও দাসীদের প্রতিও অত্যন্ত ভদ্র ও মানবোচিত ব্যবহার করা হতো। তিনি লোকদের যাবতীয় পারস্পরিক বিরোধ ও বৈষম্য এবং সকল নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করে সমাজের সর্বত্র নিশ্ছিদ্র ঐক্য, অনাবিল শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বলতে গেলে তখন অপরাধের মাত্রা একেবারের শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত কালে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করতেন; কিন্তু দু'বছর পর্যন্ত তাঁর কাছে কোনো মামলাই দায়ের করা হয়নি। উপরন্তু, জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলো সে সমাজের লোকদের মধ্যে অধিকতর সমৃদ্ধশালী হয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসা, স্নেহ, মায়ামমতা, সহানুভূতি, মানবতা, মহানুভবতা, সততা, সরলতা, বিশ্বস্ততা, ন্যায়নিষ্ঠা, ভ্রাতৃত্ব, সৌন্দর্য ও পরোপকার প্রভৃতি মানবীয় গুণের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। ফলে সে সমাজের প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে যেমন এক একজন সৎ, আদর্শ, মহানুভব ও পূত-পবিত্র ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন, তেমনি তাঁদের সমাজও পরিণত হয়েছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও আদর্শ সোনালি সমাজে। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন বললেন,

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا عَهْدًا نَأْخُذُ بِهِ فِي الْإِمَارَةِ وَلٰكِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ مِنْ قَبْلُ أَنْفُسِنَا ثُمَّ اسْتَخْلَفَ أَبُوْ بَكْرٍ رَحِمَةُ اللهِ عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتَخْلَفَ عُمَرُ رَحِمَةُ اللهِ عَلَى عُمَرَ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتّٰى ضَرَبَ الدِّيْنُ بِجِرَانِهِ.

"খিলাফতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে কোনো অসিয়ত করে যাননি যে, আমরা তদনুযায়ী কাজ করবো; বরং তা এমন একটি বিষয় ছিল, যা আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে আমাদের ধারণায় বা সঙ্গত মনে হয়েছে তা-ই স্থির করেছি। সুতরাং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খলিফা নির্বাচিত হলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন! তিনি এ দীনকে অত্যন্ত সুদৃঢ় করেছেন এবং নিজেও সঠিক পতের ওপর অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খলিফা নির্বাচিত হলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিও রহমত বর্ষণ করুন! তিনিও এ দীনকে অত্যন্ত সুদৃঢ় করেছেন এবং নিজেও সঠিক পথের ওপর অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশেষে এ দীন একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়ালো।"[১৬৪]

১. জনগণের নৈতিক মান সংরক্ষণ : রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণের প্রতি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিশেষ মনোযোগ দেন। বস্তুত তিনি নিজে যেরূপ ইসলামি নৈতিকতার বাস্তব প্রতীক ছিলেন, সমষ্টিগতভাবে গোটা মুসলিম জাতিকে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মুসলিমকে অনুরূপভাবে গড়ে তোলার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাগিরি যাতে সমাজের কোনো স্তরেই দানা বাঁধতে না পারে সেদিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তৎকালে বংশীয় আভিজাত্যের গৌরব এবং ব্যক্তিগত অহংকার আরবদের হাড়-মজ্জায় মিশ্রিত ছিল; কিন্তু তিনি ইসলামি শিক্ষা ও নৈতিক ভাবধারার গতিপ্রবাহে এসবের কলঙ্ক ও আবর্জনারাশি ধুয়ে মুছে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া লোকদের মধ্যে হিংসাবিদ্বেষাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় প্রাসাদকে যাতে ভস্ম করে দিতে না পারে এবং জনসাধারণ যাতে জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে আয়েশ-আরাম, জাঁকজমক, বিলাসিতা ও ভোগসম্ভোগে লিপ্ত হয়ে না পড়ে, সেদিকে তাঁর বিশেষ নজর ছিল।

---

[১৬৪] আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদিস নং : ৮৭৭

মোটকথা, মুসলিমদেরকে সকল প্রকার নৈতিক পতনের হাত থেকে রক্ষা করে তাদেরকে নৈতিক চরিত্রে ভূষিত করার জন্যে তিনি বিশেষ যত্ন গ্রহণ করেছিলেন। সমাজের লোকদের মধ্যে পরিপূর্ণ সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন এবং তাঁদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ ও দায়িত্বজ্ঞান জাগ্রত করার জন্যে তিনি কখনো চেষ্টার ক্রুটি করেননি। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকেও এ সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক করতেন।

২. অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষায় : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাসনামলে বিধর্মী নাগরিকদের সাথে সম্পাদিত একটি চুক্তিপত্রে তাদের সকল অধিকার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐসব অধিকার শুধু বহালই রাখেননি; বরং তাঁর খিলাফতের মোহর ও স্বাক্ষর দ্বারা ঐ চুক্তিপত্রটি সত্যায়িত করেন। তাঁর শাসনামলেও যেসব রাজ্য ইসলামি খিলাফতের শাসনাধীনে এসেছিল, তিনি ঐসব রাজ্যেও অমুসলিমদের জন্যে চুক্তিপত্রে উল্লিখিত সকল অধিকারই বলবৎ রাখেন। হিরাবাসীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের ভাষা ছিল নিম্নরূপ :

"তাদের খানকাহ ও গির্জাগুলো ধ্বংস করা হবে না। প্রয়োজনের সময় শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে যেসব ইমারতে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে, সেগুলোও নষ্ট হবে না। নাকুশ ও ঘণ্টা বাজাতে নিষেধ করা হবে না। আর উৎসবের সময় ক্রুশ বের করার ওপরও কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে না।"

এ চুক্তিপত্রটি অত্যন্ত দীর্ঘ। এখানে শুধু মুসলমানদের পরমত সহিষ্ণুতার প্রমাণস্বরূপ চুক্তির সংশ্লিষ্ট বাক্যগুলো উদ্ধৃত করা হলো।

প্রথম খলিফার আমলে জিযিয়া করের হার ছিল নিতান্তই কম। আবার তাও শুধু সক্ষম ব্যক্তিদের প্রতিই ধার্য করা হতো। তাই হিরার সাত হাজার অমুসলিম বাসিন্দার মধ্যে এক হাজার জিযিয়ামুক্ত ছিল। অবশিষ্ট লোকদের প্রতি বার্ষিক মাত্র দশ দিরহাম হারে জিযিয়া ধার্য করা হয়েছিল। চুক্তিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, বুড়ো, পঙ্গু ও নিঃস্ব অমুসলিমদের জিযিয়া থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। উপরন্তু বায়তুল মাল থেকে তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। দুনিয়ার কোনো ব্যবস্থায়ই এ জাতীয় সমানাধিকার ও ন্যায্য ব্যবহারের নজির নেই।

৩. ইসলামের প্রচার ও প্রসার : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিনিধিত্বের মর্যাদাসম্পন্ন খলিফার অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল ইসলামি আদর্শের প্রচার ও প্রসার। এদিকে প্রথম থেকেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিশেষ লক্ষ্য ও দৃষ্টি ছিল। বলতে গেলে ইসলামের বিস্তার সাধন ছিল তাঁর জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য। প্রত্যেক কাজেই তাঁর দৃষ্টি থাকত ইসলামের সুনাম ও ঐতিহ্যের প্রতি। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামের প্রথম পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ মুসলিমগণের অনেকেই ছিলেন

আবু বকর -এর আপ্রাণ প্রচেষ্টার ফসল। তাই স্বাভাবিকভাবেই খিলাফতের গুরুভার অর্পিত হওয়ার পর এদিকেই তাঁর অধিক প্রবণতা ও তৎপরতা দেখা দেয়। ফলে সমস্ত আরবদেশ তাঁর সময়কালে ইসলাম প্রচারের বলিষ্ঠ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। চতুর্দিকে তাঁর প্রেরিত যুদ্ধাভিযানসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের প্রচার ও প্রসার। তিনি যখনই কোথাও কোনো সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন, তখন তাদেরকে উপদেশ দিতেন, যেন তারা শুধু তাওহীদের ঝাণ্ডা সমুন্নত রাখা এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। তাদেরকে এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা তাকিদ দেওয়া হতো যে, শত্রুসৈন্যরা সামনে এলেই সর্বপ্রথমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবে এবং নিজেদের চরিত্র ও কার্যকলাপ দ্বারা তাদের অন্তরে প্রভাববিস্তারের চেষ্টা করবে।

আবু বকর -এর এ সকল উপদেশের ফল এই হয়েছিল যে, তাঁর শাসনামলে 'আদী ইবনে হাতিম -এর প্রচেষ্টায় বনু তা'ই ধর্মচ্যুত হবার পর তওবাহ করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং সেনাপতি মুছান্না ইবনু হারিছাহ -এর দা'ওয়াতে বনু ওয়ায়িল ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেনাপতি খালিদ -এর প্রচেষ্টায় ইরাক ও শামের অধিকাংশ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। হিরার বহু খ্রিস্টান পাদরি নিজে থেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

তা ছাড়া তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত আরব গোত্রসমূহের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পৌছাবার জন্যে বিশেষ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। তাঁরা পূর্ণ একাগ্রতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে এ কাজ সম্পন্ন করতেন। এর ফলে দূর-নিকটের অসংখ্য মূর্তিপূজক ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ইসলামে দীক্ষিত হয়।

৪. ইসলামি শিক্ষার প্রসার : আবু বকর তাঁর সংক্ষিপ্ত খিলাফতকালে যদিও রাষ্ট্রের ধর্মদ্রোহীদের দমন ও বাইরের শত্রুদের মোকাবিলা করার কাজে প্রধানত ব্যস্ত ছিলেন; তবু তিনি মুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামের সঠিক শিক্ষা, তাহযীব ও তামাদ্দুন প্রসারের কাজের ব্যাপারেও পূর্ণ সচেষ্ট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ মদিনায় মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষা-দীক্ষার যে ব্যবস্থা গড়ে তোলেন, এর আদলে আবু বকর অন্যান্য অঞ্চলেও এ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করেন। তাঁর শাসনামলে বিজিত অঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন মসজিদ নির্মিত হয়। এখানে আঞ্চলিক প্রশাসকগণ সালাতের সময় ইমামতের দায়িত্ব পালন করতেন এবং অন্যান্য সময় দু'আল্লিম ও কারিগণ লোকদেরকে কুরআন ও অপরাপর জরুরি দীনী বিষয়ের শিক্ষা দিতেন। এভাবে গোটা আরবদেশে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবহ তৈরি হয়।

তা ছাড়া আবু বকর ইসলামকে তার প্রকৃত স্বরূপ ও অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং ভ্রান্ত চিন্তা ও বিদ'আতসমূহের মূলোৎপাটন করতে আপ্রাণ চেষ্টা

করেছেন। বলাই বাহুল্য, নবীগণের প্রচারিত 'আকীদা-বিশ্বাস ও জীবনব্যবস্থার উত্তরকালে বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার মূলে সবচেয়ে বড় কারণ হলো লোকদের মধ্যে ক্রমশ বিদ'আতের প্রচলন। এর ফলে বিদ'আতী ব্যবস্থাসমূহই মূল দীনের স্থান লাভ করে ও প্রকৃত দীন বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এটা ঠিক যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলে মুসলিম সমাজে বিদ'আতের কোনো বিশেষ সূচনা পরিলক্ষিত হয়নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও এদিকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রখর দৃষ্টি ছিল। কখনও এবং কোথাও তেমন কিছু দেখা গেলেই তা অনতিবিলম্বে দূর করতে চেষ্টা করতেন। একবার হজের সময় তিনি আহমাস গোত্রের যায়নাব নাম্নী এক মহিলাকে দেখতে পান যে, সে কারো সাথে কথা বলছে না। তখন তিনি সাথে সাথে তার কাছে যান এবং বলেন,

تَكَلَّمِيْ فَإِنَّ هٰذَا لَا يَحِلُّ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ.

"কথা বল। কেননা কথা না বলা বৈধ নয়। এটি জাহিলিয়াতের একটি রীতি।"[১৬৫]

তাঁর খিলাফতকালে কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। তাদের দাবি ছিল, যাকাতের বিধান কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলের জন্যে প্রযোজ্য ছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ফিতনাকে বাড়তে দেননি। তিনি তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন। যদি তিনি ঐ সময় তাদেরকে ছেড়ে দিতেন, তা হলে তাদের উক্ত দাবিই আজকে দীনের রূপ পরিগ্রহ করত।

বলাই বাহুল্য যে, দীনের মধ্যে কোনোরূপ বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন মোটেই কাম্য নয়। দীনের মধ্যে যে বিষয়কে যতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তাকে তার চেয়ে বেশি বা কম গুরুত্ব দেওয়া (যেমন নফল বা মুস্তাহাবকে ওয়াজিব বা ফরযে পরিণত করা, অনুরূপভাবে ফরয বা ওয়াজিবকে নফল বা মুস্তাহাবে পরিণত করা) বাড়াবাড়ির নামান্তর। এতে দীনের প্রকৃত রূপ বিকৃত হয়ে যায়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ. إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ. فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ.

---

[১৬৫] বুখারী, আস-সহীহ, কিতাবুল মানাকিব, হাদিস নং : ৩৫৪৭।

"হে মানবমণ্ডলী, খবরদার! তোমরা দীনের কোনো কাজে বাড়াবাড়ি কর না। কেননা এ বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে।"[১৬৬]

দীনকে বাড়াবাড়ি ও বিকৃতির কবল থেকে রক্ষা করা এবং তাকে তার প্রকৃত রূপের ওপর টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তিনি কোনো কোনো সুন্নতকে শুধু এ কারণেই ছেড়ে দিতেন, যাতে অজ্ঞ লোকেরা তাকে ফরয কিংবা ওয়াজিবে পরিণত করে না নেয়। হুযাইফাহ ইবনে আসীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَا يُضَحِّيَانِ خَشْيَةَ أَنْ يُسْتَنَّ بِهِمَا.

"আমি আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখেছি যে, (একবার) তাঁরা দু'জনেই কুরবানি করেননি, এ ভয়ে যে, লোকেরা একে বাধ্যতামূলক সুন্নতে পরিণত করে নেবে।"[১৬৭]

৫. জীবনমান উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে ও তাঁর পরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগেই আরবদের সামাজিক জীবনে উন্নয়ন ও আধুনিকতার পরশ লেগেছিল। পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-ব্যবহারে এবং চাল-চলনেও ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের আমেজ লাগে। পড়ালেখায় এতটুকু অগ্রগতি হয় যে, ব্যক্তিগত ও সরকারি পর্যায়ে প্রায় প্রতিটি লেনদেন, কাজ-কারবার ও চুক্তি লিখিত আকারে সমাধা হতো।

৬. প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ : শাসনপদ্ধতি নির্দিষ্ট করার পর উত্তম শাসনতন্ত্র কায়েম খুবই দরকার। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনকালে বহির্দেশে অভিযান শুরু হয়েছিল মাত্র, এজন্যে তাঁর সময়ে খিলাফত আরবদেশ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি আরবদেশকে কয়েকটি প্রদেশ ও জেলায় বিভক্ত করেন। মদিনা, মক্কা, তায়েফ, সানা, নজরান, হাজরা মাওত, বাহরাইন ও দুমাতুল জান্দাল– এ আটটির প্রত্যেকটি প্রদেশে তিনি একজন করে গভর্নর নিয়োগ করেন। তাঁরা নিজ নিজ প্রদেশে প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্যে সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিলেন।

রাজধানীতে প্রায় সকল বিভাগের জন্যই একজনকে পৃথক পৃথক দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার সেনাপতি নিযুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত

---

[১৬৬] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, হাদিস নং : ৩০২০

[১৬৭] আবদুর রাযযাক, আল-মুছান্নাফ, বাব : আদ-দাহায়া, হাদিস নং : ৮১৩৯।

কোষাগারের দায়িত্বে ছিলেন। ওমর রা. বিচার বিভাগের দায়িত্ব পালন করতেন এবং উসমান রা. এবং জায়েদ বিন সাবিত রা. দফতর সম্পাদক ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাসনকালে যেসব অফিসার বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, আবু বকর রা. তাদেরই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের নিজ নিজ পদে বহাল রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাসনামলে মক্কায় ইতাব বিন উসায়েদ রা., তায়েফে উসমান বিন আবিল আস রা., সানায়াতে মুহাজির বিন উমাইয়া রা., হাজরা মাওতে যিয়াদ বিন লুকাইদ রা. এবং বাহরাইনে লুকাইদ বিন আল হাজারমী রা. গভর্নর ছিলেন। আবু বকর রা. তাঁদেরকেই ঐসব পদে বহাল রাখেন। তিনি কোনো ব্যক্তিকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করার সময় তাঁকে ডেকে উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন এবং আকর্ষণীয় ভাষায় সরল জীবনযাত্রা ও আল্লাহ ভীতির নসিহত করতেন। ওমর ইবনুল আস রা. ও অলিদ বিন উরুবাকে ক্বাজা গোত্রের যাকাত আদায় করার উদ্দেশ্যে প্রেরণের আগে তিনি নিম্নরূপ নসিহত করেন-

"প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয় অবস্থায়ই আল্লাহকে ভয় করো। তিনি এমনসব পথে রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন যে, মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। যারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাদের মাফ করে দেন। তাদের প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার দেন। আল্লাহর বান্দাদের প্রতি শুভেচ্ছা পোষণ করা তাকওয়ার উত্তম নিদর্শন। তুমি এমন এক পথ অবলম্বন করেছ যেখানে দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র অবহেলা অথবা বাড়াবাড়ি করার কোনো অবকাশ নেই। যে দায়িত্ব পালনের সাথে জীবনবিধানের দায়িত্ব ও খিলাফত সংরক্ষণের প্রশ্ন জড়িত সেখানে সামান্যতম ত্রুটিরও অবকাশ নেই।"

অনুরূপভাবেই ইয়াযীদ বিন সুফিয়ানকে সিরিয়া অভিযানের দায়িত্ব অর্পণের সময় তিনি বলেন, "হে ইয়াযীদ! তোমার অনেক আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তুমি হয়ত তোমার সরকারি প্রভাব খাটিয়ে তাদের উপকার করতে পারবে। আমি এ বিষয়টিকেই সবসময় ভয় করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ মুসলমানদের শাসক নিযুক্ত হয়ে অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তিকে কোনো সরকারি পদে নিয়োগ করে, তাহলে তার ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেন। আল্লাহ তা'আলা এসব ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো ওযর অথবা বিনিময় কবুল করবেন না। সে ব্যক্তি অবশ্যই জাহান্নামে যাবে।"

৭. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাসনামলে পৃথক অর্থ বিভাগ কায়েম করা হয়নি। বিভিন্ন উৎস থেকে যা আয় হতো, তা সাথে সাথেই বিতরণ করে দেওয়া হতো। আবু বকর রা.-এর শাসনকালেও ঐ ব্যবস্থাই বলবৎ

থাকে। তাই তিনি খিলাফতের প্রথম বছর স্বাধীন ব্যক্তি, দাস, পুরুষ, স্ত্রীলোক, উচ্চ, নীচ নির্বিশেষে দশ দিরহাম হারে বিতরণ করেন। দ্বিতীয় বছরে আয় বেশি হয়। তাই সে বছর তিনি জনপ্রতি বিশ দিরহাম বিতরণ করেন। এ জাতীয় ভেদাভেদহীন সমান হার সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি আপত্তি উত্থাপন করায় তিনি বলেন, সামাজিক ও অন্যবিধ মর্যাদার তারতম্যকে অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে টেনে আনা অসঙ্গত। অবশ্য তাঁর খিলাফতের শেষাংশে তিনি একটি সাধারণ বায়তুল মাল গঠন করেন; কিন্তু ঐ তহবিলে কখনও মোটা অঙ্কের কোনো অর্থ জমা হয়নি। তাই বায়তুল মাল সংরক্ষণেরও কোনো ব্যবস্থা করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। একবার জনৈক ব্যক্তি বলেন, "হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলিফা! আপনি বায়তুল মাল সংরক্ষণের জন্যে লোক নিয়োগ করেন না কেন?" তিনি জবাবে বলেন, 'এজন্যে একটিমাত্র তালাই যথেষ্ট।'

প্রথম খলিফার ইন্তিকালের পর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুর রহমান বিন আওফ, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবাকে সাথে নিয়ে বায়তুল মালের হিসাব পরীক্ষা করে মাত্র এক দিরহাম পেয়েছিলেন। উপস্থিত জনতা খুশি হয়ে বললেন, "আল্লাহ তা'আলা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি দয়া করুন।" বায়তুল মালের কোষাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় যে, বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত সময়ে দু'লাখ দিনার জমা হয়েছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল অর্থই জনগণের কল্যাণার্থে খরচ করে দেন। সরকারি কোষাগারে অর্থ সঞ্চয় করে জনগণকে কষ্ট দেননি।"

৮. শূরাভিত্তিক শাসন পরিচালনা : সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী ও রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের পরামর্শসভায় পরামর্শদাতা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত হতো তখন মজলিশে শূরায় তার পরামর্শ নিতেন।

৯. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ : দুই বছর তিন মাসের শাসনামলে খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামি রাষ্ট্রকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করতে যথাযথ রাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মোটেও অমনোযোগী ছিলেন না। তিনি সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলায় বিভক্ত করেন এবং পৃথক পৃথক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

১০. রাষ্ট্রীয় পদে নির্বাচন : যোগ্য ব্যক্তিকে সঠিক পদে নিয়োগ করার ওপর রাষ্ট্রের উত্তম ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে। আর সেই ব্যক্তিই যোগ্য, যিনি লোকদের চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। সেই দূরদর্শী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসব গুণের অধিকারী ছিলেন।

১১. স্বজনপ্রীতি থেকে দূরে থাকা : সঠিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির পৃষ্ঠপোষকতা থেকে দূরে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আবু বকর এ নীতি কঠোরভাবে পালন করতেন। তিনি তাঁর প্রশাসকদেরকেও এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিতেন।

১২. প্রশাসকদের মনঃতুষ্টি ও মর্যাদার দিকে লক্ষ রাখা : একটি রাষ্ট্রের শিষ্টাচার ও সুশাসনের সবচেয়ে বড় কথা হলো সেখানকার প্রশাসকদের সম্মান ও মর্যাদা পূর্ণভাবে রক্ষা করা এবং তাদের সাথে স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবহার না করা। আবু বকর এ দুটি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তাছাড়া তিনি শাসনকর্তা নিয়োগকালে তাঁদের তীক্ষ্ণ প্রতিভার দিকটি বিবেচনা করতেন।

১৩. পরীক্ষামূলক নিয়োগ : বর্তমান যুগের সাধারণ নিয়মানুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত কারো দক্ষতা ও উত্তম কার্যাবলি সম্পর্কে বিশ্বাস না জন্মে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সংশ্লিষ্ট পদে অস্থায়িভাবে নিয়োগ করা হয়। স্থায়ী পদোন্নতির জন্যে শর্ত হলো উত্তম কার্যাবলি। আবু বকর এসব নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতেন।

১৪. পদচ্যুতি : নিয়োগের পর কেউ অযোগ্য প্রমাণিত হলে আবু বকর তাকে বিনা দ্বিধায় পদচ্যুত করতেন। এজন্যে একবার খালিদ ইবন সাউদকে পদচ্যুত করা হয়।

১৫. পুলিশ বিভাগ : তখনকার দিনে দৈনন্দিন নাগরিক জীবনে শৃঙ্খলা বিধানের জন্যে পুলিশ বিভাগের মতো পৃথক কোনো বিভাগ ছিল না এবং প্রকৃতপক্ষে এর বিশেষ কোনো প্রয়োজনও ছিল না। তবুও উপস্থিত চাহিদা মেটানোর জন্যে কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তিকে এই কাজে নিয়োগ করা হয়।

১৬. খলিফার ভাতা : প্রথমত তিনি সরকারি কোষাগার থেকে নিজে কোনো ভাতা গ্রহণ করতেন না। ব্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরে ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকলে শাসনতান্ত্রিক কাজ বিঘ্ন হওয়ার আশঙ্কায় মজলিসে শূরার পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ভাতা গ্রহণ করতেন। অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে তিনি তা ফেরত দিয়ে গেছেন।

১৭. সেনা বিভাগ : রাসূলুল্লাহ -এর সময় নিয়মতান্ত্রিক কোনো সেনাবিভাগ ছিল না। যখন প্রয়োজন হতো সাহাবিগণ নিজেরাই ইসলামি ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হতেন। খলিফার যামানায়ও সেই অবস্থা ছিল। যখন প্রয়োজন হতো মুসলমানগণ বীরত্বের সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতেন। তবে যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে যেতে হতো, তখন সেনাবাহিনীকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন কর্মকর্তা ঠিক করে দিতেন। সমগ্র সেনাবাহিনীর জন্যে একজন সিপাহসালার নিযুক্ত করতেন। আবু বকর -এর যামানায় গনিমতের সম্পদের নির্দিষ্ট একটি

অংশ প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্যে নির্ধারিত ছিল। খলিফা নিজে সেনাবাহিনীর দেখাশুনা করতেন। ত্রুটি সংশোধন করতেন এবং পরস্পর ভ্রাতৃত্ব, একতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিক্ষা দিতেন।

১৮. কর্মসংস্থান সৃষ্টি : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে এবং তাঁর পরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে মুহাজির ও আনসার এ দুই দলের দ্বারাই মূল ইসলামি সমাজ গঠিত হয়েছিল এবং তাদের প্রত্যেকেরই জীবিকা উপার্জনের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা ছিল। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

وَاِنَّ اِخْوَتِيْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغُلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ. وَاِنَّ اِخْوَتِيْ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ يَشْغُلُهُمْ عَمَلُ اَمْوَالِهِمْ. وَكُنْتُ اَمْرَاً مِسْكِيْنًا اَلْزَمُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى مِلْءِ بَطْنِيْ.

"আমার মুহাজির ভাইয়েরা ব্যবসায় বাণিজ্যের কাজে এবং আনসার ভাইয়েরা ক্ষেত-খামারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন, আর আমি সর্বদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত থাকতাম।"[১৬৮]

ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুখ্যাত ছিলেন আবু বকর আছ-সিদ্দিক, 'উসমান, 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ এবং সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ। মুহাজিরদের মূল পেশা যদিও ব্যবসা ছিল; কিন্তু মদিনায় আনসারগণের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবার কারণে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ক্ষেত-খামারের কাজও করতেন।

১৯. ব্যবসায়ের ওপর কর মওকুফ : ইসলাম পূর্বকালে আরবের প্রসিদ্ধ বাজার ছিল 'উকায, মাজান্নাহ ও যুলমাজায প্রভৃতি। ঐ সকল বাজারে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা তাদের পণ্যদ্রব্য নিয়ে যেত; কিন্তু তাদের ব্যবসা স্বাধীন ছিল না। তাদের কাছে কর আদায় করা হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় অপর একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। এর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সেখানে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোনোরূপ কর আদায় করা হতো না। তিনি যখন এ বাজার প্রতিষ্ঠা করেন তখন বলেন,

هٰذَا سُوْقُكُمْ. لَا خَرَاجَ عَلَيْكُمْ فِيْهِ.

"এটা তোমাদের বাজার, এখানে ব্যবসা করতে তোমাদের কোনো কর লাগবে না।"[১৬৯]

---

[১৬৮] বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল মুযারা'আহ, হাদিস নং : ২১৭৯।

অধ্যায়-৭

বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসার

ইরাক বিজয়

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু মুরতাদ ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করে সমগ্র আরববাসীকে পুনঃইসলামের সুশীতল ছায়াতলে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ করে ফেলেন। আল্লাহ তা'আলা আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু আনহু ধর্মীয় সাহসের ও উৎসাহের ভিত্তিতে আরববাসীদের মনে নিজের পবিত্র কালেমা দৃঢ় করে দিলেন। আরবের পার্শ্ববর্তী অমুসলিম রাষ্ট্রগুলো যথা : ইরান ও রোম নিজেদের প্রজাবৃন্দকে নিতান্ত হেয় ও তুচ্ছ এবং নিজেদেরকে তাদের চেয়ে উচ্চ স্তরের মনে করত। ফলে তাদের প্রতি নানা জাতীয় অত্যাচার-অবিচার ও নিষ্ঠুর আচরণ করত। প্রজাদেরকে ক্রীতদাসের চেয়েও অধিক নীচ মনে করত। এখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে ইসলাম বিস্তারের পর এ সমস্ত অত্যাচার, অবিচার, নিষ্ঠুরতা এবং মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করতে এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে মনোনিবেশ করলেন।

মুসান্না ইবনে হারেসা শায়বানীর অনুরোধক্রমে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে ইরাক অভিযানের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং মুসান্নাকে ইরাক অভিযানের নির্দেশ দিলেন।[১৭০] মুসান্না স্বগোত্রীয় লোকদেরকে নিয়ে তাইগ্রীস ও ফোরাত নদীর পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ একাদিক্রমে জয় করতে আরম্ভ করলেন। অবস্থাদৃষ্টে খলিফা খালিদকেও মুসান্নার পিছনে পিছনে ইরাকের দিকে পাঠালেন। আবার ইয়ায ইবনে গনমকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি দওমাতুল জন্দলে গিয়ে সেখানকার বিদ্রোহীদেরকে দমন করে হিরা চলে যাও। তোমার ও খালিদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে হিরা পৌছবে, হিরার যুদ্ধে সেনাপতি সেই থাকবে।[১৭১]

আরববাসীরা অনেকেই ইরাক অঞ্চলে বর্গা ভাগে কৃষিকার্য করত। জমির মালিকেরা এ সমস্ত মূর্খ আরবদেরকে নানা প্রকারে ঠকাত এবং তাদের সাথে অমানুষিক দুর্ব্যবহার করত। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সেনাপতিগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, এ সমস্ত কৃষকশ্রেণির আরবদের সাথে কোনো প্রকার দুর্ব্যবহার

---

১৬৯ বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, খ. ১, পৃ. ১৫।

১৭০ তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ.২, পৃ. ৫২৬

১৭১ তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ.২, পৃ. ৫৫৪

করবে না। তাদেরকে হত্যা বা বন্দি করবে না। এরা যেন বুঝতে পারে যে, ইসলামের আবির্ভাবের ফলে পূর্বের অত্যাচার ও উৎপীড়নের অবসান ঘটেছে। এখন হতে তারা তাদের স্বদেশীয় লোকদের কাছে সদ্ব্যবহার এবং সমান অধিকার পাবে। আবু বকরের রাঃ এই উদারনীতি ইসলামের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও বিস্তারের পথে বিশেষ সহায় হয়েছিল।

মুরতাদগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খালিদের বাহিনীর বহু সৈন্য শহীদ হওয়ায় বর্তমানে তাঁর সৈন্যসংখ্যা কমে গিয়ে দুই হাজারের সামান্য বেশি হয়েছিল। তদুপরি খালিদের প্রতি খলিফার নির্দেশ ছিল– কোনো সৈন্যকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইরাক অভিযানে অংশগ্রহণে বাধ্য করবে না। যারা মুরতাদ হয়েছিল এবং পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেছে এরূপ লোকদেরকে খলিফার নির্দেশ ব্যতীত ইরাক অভিযানে গ্রহণ করবে না।

ইরাকের দিকে যাত্রা করে খালিদ তাঁর সাহায্যার্থে মদিনা হতে আরও সৈন্য পাঠানোর জন্যে খলিফার কাছে আবেদন জানালেন। খলিফা খালিদের সাহায্যার্থে মাত্র কা'কাকে প্রেরণ করলেন। লোকে বলল, খালিদের সৈন্যসংখ্যা যখন খুবই কমে গিয়েছে, এমতাবস্থায় তাঁর সাহায্যার্থে মাত্র একজন লোক পাঠিয়েছেন? খলিফা বললেন, 'কা'কা' যে বাহিনীতে থাকবে, আল্লাহর ফযলে সেই বাহিনী কখনও পরাজিত হবে না।"[১৭২] কা'কা'র মারফতে তিনি খালিদকে নির্দেশনামা প্রদান করলেন যে, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর যাঁরা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, কেবল তাঁদেরকে সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ কর।"

খলিফার পত্র পেয়ে খালিদ মোযর ও রবী'আ গোত্রদ্বয় হতে আট হাজার সৈন্য নিজের সাথে নিলেন। এখন তাঁর বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াল দশ হাজার। এছাড়াও মুসান্নার বাহিনীতে ছিল আট হাজার সৈন্য। এই আঠার হাজার সৈন্য নিয়েই খালিদ পারস্য অভিযানের জন্যে অগ্রসর হলেন।

আয়লার যুদ্ধ জয়

খলিফার নির্দেশ ছিল পারস্য উপসাগরের সীমান্তবর্তী 'আয়লা' নামক স্থান থেকে ইরাকের অভিযান আরম্ভ করবে। খালিদ আয়লার নিকটবর্তী হয়ে সেনাবাহিনীকে তিন দলে বিভক্ত করে একটি বাহিনী মুসান্না ইবনে হারেস শায়বানীর, দ্বিতীয় বাহিনী আ'দী ইবনে হাতেম তাঈর এবং তৃতীয় দলটি নিজের অধীনে রাখলেন। মুসান্না ও আদীর বাহিনীদ্বয়কে আগে পাঠিয়ে নিজে তাদের পিছনে পিছনে

---

[১৭২] তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ.২, পৃ. ৫৫৩

চললেন। অগ্রবর্তী বাহিনীদ্বয়ের প্রতি নির্দেশ ছিল তারা হাযর নামক স্থানে পৌছে খালিদের জন্যে অপেক্ষা করবে।

পারস্য উপসাগরের সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলে পারস্য রাজ্যের গভর্নর ছিল হরমুয নামক একজন নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী লোক। আরব কৃষকদের প্রতি তার অত্যাচার ছিল অমানুষিক। ইরানি সরদারদের মধ্যে হরমুয ছিল মান-মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ। সে একলাখ দেরহাম মূল্যের টুপি পরিধান করত। যা সাধারণ আমির ও শাসনকর্তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই লোকটির অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরতা এত অধিক ছিল যে, লোকে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলত, এই ব্যক্তি হরমুযের মতো অত্যাচারী, হরমুযের মতো নিষ্ঠুর।

আরব কৃষকদের প্রতি হরমুযের অত্যাচারের কাহিনী আরবাসীরা সব সময়েই শুনে আসছিল। সুতরাং তারা সময় সময় হরমুযের এলাকায় প্রবেশ করে তাকে উত্যক্ত করত। আজ তার বিরুদ্ধের অভিযানেও আরববাসীদের মনে আরব কৃষকদের প্রতি হরমুযের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের আগুন জ্বলে উঠেছিল।

খালিদ হাযরের নিকটবর্তী হয়ে হরমুযকে পত্র লিখলেন, "তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, আমরা তোমাদের দেশে কোনো প্রকার অশান্তি ঘটাব না। অন্যথায় জিযিয়া কর দানে স্বীকৃত হয়ে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার কর। এর কোনো একটিতেও সম্মত না হলে তোমাকে দারুণ পরিতাপ করতে হবে। কিন্তু তখন পরিতাপ কোনো কাজে আসবে না। তখন কাউকেও দোষারোপ করতে পারবে না। কেননা, আমার সঙ্গের মুজাহিদগণ মৃত্যুর জন্যে ততটাই আগ্রহান্বিত যতটা তোমরা বেঁচে থাকার জন্যে আগ্রহশীল।"[১৭৩]

হরমুয খালিদের পত্র পেয়ে পারস্যরাজ আর্দেশীরকে সংবাদ দিয়ে সসৈন্যে খালিদের দিকে অগ্রসর হলো এবং হাফীরের পানির কূপটি নিজেদের অধিকারে রাখার জন্যে খালিদের আগেই হাফীরে পৌছল এবং কূপটি নিজের আয়ত্তে রেখে শিবির স্থাপন করল। সুতরাং খালিদকে পানির ব্যবস্থাবিহীন স্থানে শিবির স্থাপন করতে হলো। সঙ্গের মুজাহিদগণ তাঁকে পানির অব্যবস্থার কথা জানালে তিনি বললেন, "শত্রুদের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হও। প্রাণপণে যুদ্ধ করলে পানি তোমাদের অধিকারে আসতে বিশেষ বিলম্ব হবে না।"

হরমুয তার ডান ও বাম পার্শ্বে শাহী বংশের কুব্বাদ এবং আনুশজানকে নিযুক্ত করল। অতঃপর ধোঁকা দিয়ে খালিদকে শহীদ করার জন্যে নিজে ময়দানে নেমে খালিদকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্যে আহ্বান করল। উদ্দেশ্য– খালিদকে নিহত করতে

---

[১৭৩] তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ.২. পৃ. ৫৫৪

পারলে মুসলমানগণ আর যুদ্ধক্ষেত্রে টিকতে পারবে না। সে ময়দানে নেমে আসার পূর্বে তার কতিপয় শ্রেষ্ঠ ও বীর যোদ্ধাকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল যে, খালিদ আমার সম্মুখে আসা মাত্র তোমরা অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে।

খালিদ হরমুয কর্তৃক দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান পেয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে হরমুযের দিকে হেঁটে চললেন। কা'কা' পূর্বেই হরমুযের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিলেন। কেননা, দুরভিসন্ধি ছাড়া আল্লাহর তরবারিকে তথা সাক্ষাৎ যমদূতকে এত সহজে কেউই সম্মুখ-সমরে আহ্বান করতে পারে না। সুতরাং তিনিও যেকোনো আকস্মিক ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। যখনই তিনি পারসিক ধোঁকাবাজদেরকে গুপ্তস্থান হতে বের হতে দেখলেন, সাথে সাথে তিনি বিদ্যুৎবেগে কয়েকজন প্রখ্যাত মুজাহিদকে সাথে নিয়ে খালিদের পাশে এসে দাঁড়ালেন; কিন্তু তাঁরা আসার পূর্বে খালিদ তরবারির এক আঘাতে হরমুযের জীবন শেষ করে দিয়েছিলেন।[১৭৪]

এখন উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। সেনাপতিকে হারিয়ে পারসিক বাহিনী সাহসহারা হয়ে পড়েছিল। অতএব, তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকক্ষণ টিকে থাকতে পারল না, যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পালাতে লাগল। মুজাহিদ বাহিনী তাদের পিছনে ধাওয়া করে পলায়নরত সৈন্যদেরকে নিহত করতে করতে ফোরাত নদীর বড় পুল পর্যন্ত তাড়িয়ে দিল।

'আয়লা'র যুদ্ধে পূর্ণ বিজয় লাভের পর খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মা'কাল মাযেনীকে গনিমতের মাল এবং যুদ্ধবন্দিদেরকে একস্থানে একত্রিত করতে নির্দেশ দিলেন, আর মুসান্নাকে পলায়মান শত্রুসৈন্যদের অনুসন্ধানের জন্যে পাঠালেন। অনুসন্ধানরত অবস্থায় একটি দুর্গ দেখে অনুসন্ধানে তা ইরান সম্রাটের কন্যার বাসস্থান বলে জানতে পারলেন। তার অনতিদূরেই সম্রাটের জামাতার বাসস্থান। মুসান্না তাঁর ভাই মু'আন্নাকে সম্রাট-দুহিতার দুর্গ অবরোধ করে রাখতে আদেশ প্রদান করে নিজে জামাতার দুর্গ অবরোধপূর্বক তাকে নিহত করে ফেললেন। মুসান্না অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সম্রাট-দুহিতা মু'আন্নার সাথে সন্ধি করে তাকে স্বামিত্বে বরণ করে নিলেন।

আয়লার যুদ্ধের গনিমতের মাল মদিনায় পৌছলে দেখা গেল তার মধ্যে হরমুযের এক লাখ দেরহাম মূল্যের টুপিটি এবং একটি হাতি রয়েছে। আবরাহার হাতি ভিন্ন সমগ্র আরবের লোকেরা কোনো কালে হাতি দেখেনি। কাজেই চতুর্দিক হতে হাতি

---

১৭৪ তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ.২, পৃ. ৫৫৫

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাসনকালে যেসব অফিসার বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, আবু বকর رضي الله عنه তাদেরই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের নিজ নিজ পদে বহাল রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাসনামলে মক্কায় ইতাব বিন উসায়েদ رضي الله عنه, তায়েফে উসমান বিন আবিল আস رضي الله عنه, সানায়াতে মুহাজির বিন উমাইয়া رضي الله عنه, হাজরা মাওতে যিয়াদ বিন লুকাইদ رضي الله عنه এবং বাহরাইনে লুকাইদ বিন আল হাজারমী رضي الله عنه গভর্নর ছিলেন। আবু বকর رضي الله عنه তাঁদেরকেই ঐসব পদে বহাল রাখেন। তিনি কোনো ব্যক্তিকে কোনো দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করার সময় তাঁকে ডেকে উক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন এবং আকর্ষণীয় ভাষায় সরল জীবনযাত্রা ও আল্লাহ ভীতির নসিহত করতেন। ওমর ইবনুল আস رضي الله عنه ও অলিদ বিন উরুবাকে কুাজা গোত্রের যাকাত আদায় করার উদ্দেশ্যে প্রেরণের আগে তিনি নিম্নরূপ নসিহত করেন-

"প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয় অবস্থায়ই আল্লাহকে ভয় করো। তিনি এমনসব পথে রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন যে, মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। যারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাদের মাফ করে দেন। তাদের প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার দেন। আল্লাহর বান্দাদের প্রতি শুভেচ্ছা পোষণ করা তাকওয়ার উত্তম নিদর্শন। তুমি এমন এক পথ অবলম্বন করেছ যেখানে দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র অবহেলা অথবা বাড়াবাড়ি করার কোনো অবকাশ নেই। যে দায়িত্ব পালনের সাথে জীবনবিধানের দায়িত্ব ও খিলাফত সংরক্ষণের প্রশ্ন জড়িত সেখানে সামান্যতম ত্রুটিরও অবকাশ নেই।"

অনুরূপভাবেই ইয়াযীদ বিন সুফিয়ানকে সিরিয়া অভিযানের দায়িত্ব অর্পণের সময় তিনি বলেন, "হে ইয়াযীদ! তোমার অনেক আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তুমি হয়ত তোমার সরকারি প্রভাব খাটিয়ে তাদের উপকার করতে পারবে। আমি এ বিষয়টিকেই সবসময় ভয় করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ মুসলমানদের শাসক নিযুক্ত হয়ে অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তিকে কোনো সরকারি পদে নিয়োগ করে, তাহলে তার ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেন। আল্লাহ তা'আলা এসব ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো ওযর অথবা বিনিময় কবুল করবেন না। সে ব্যক্তি অবশ্যই জাহান্নামে যাবে।"

৭. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাসনামলে পৃথক অর্থ বিভাগ কায়েম করা হয়নি। বিভিন্ন উৎস থেকে যা আয় হতো, তা সাথে সাথেই বিতরণ করে দেওয়া হতো। আবু বকর رضي الله عنه-এর শাসনকালেও ঐ ব্যবস্থাই বলবৎ থাকে। তাই তিনি খিলাফতের প্রথম বছর স্বাধীন ব্যক্তি, দাস,

পুরুষ, স্ত্রীলোক, উচ্চ, নীচ নির্বিশেষে দশ দিরহাম হারে বিতরণ করেন। দ্বিতীয় বছরে আয় বেশি হয়। তাই সে বছর তিনি জনপ্রতি বিশ দিরহাম বিতরণ করেন। এ জাতীয় ভেদাভেদহীন সমান হার সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি আপত্তি উত্থাপন করায় তিনি বলেন, সামাজিক ও অন্যবিধ মর্যাদার তারতম্যকে অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে টেনে আনা অসঙ্গত। অবশ্য তাঁর খিলাফতের শেষাংশে তিনি একটি সাধারণ বায়তুল মাল গঠন করেন; কিন্তু ঐ তহবিলে কখনও মোটা অঙ্কের কোনো অর্থ জমা হয়নি। তাই বায়তুল মাল সংরক্ষণেরও কোনো ব্যবস্থা করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। একবার জনৈক ব্যক্তি বলেন, "হে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খলিফা! আপনি বায়তুল মাল সংরক্ষণের জন্যে লোক নিয়োগ করেন না কেন?" তিনি জবাবে বলেন, 'এজন্যে একটিমাত্র তালাই যথেষ্ট।'

প্রথম খলিফার ইন্তিকালের পর ওমর রা. আব্দুর রহমান বিন আওফ, উসমান রা. এবং অন্যান্য সাহাবাকে সাথে নিয়ে বায়তুল মালের হিসাব পরীক্ষা করে মাত্র এক দিরহাম পেয়েছিলেন। উপস্থিত জনতা খুশি হয়ে বললেন, "আল্লাহ তা'আলা আবু বকর রা.-এর প্রতি দয়া করুন।" বায়তুল মালের কোষাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় যে, বায়তুল মালের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে আবু বকর রা.-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত সময়ে দু'লাখ দিনার জমা হয়েছিল। আবু বকর রা. সকল অর্থই জনগণের কল্যাণার্থে খরচ করে দেন। সরকারি কোষাগারে অর্থ সঞ্চয় করে জনগণকে কষ্ট দেননি।"

৮. শূরাভিত্তিক শাসন পরিচালনা : সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী ও রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন আবু বকর রা. তাঁদের পরামর্শসভায় পরামর্শদাতা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত হতো তখন মজলিশে শূরায় তার পরামর্শ নিতেন।

৯. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ : দুই বছর তিন মাসের শাসনামলে খলিফা আবু বকর রা. ইসলামি রাষ্ট্রকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করতে যথাযথ রাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মোটেও অমনোযোগী ছিলেন না। তিনি সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলায় বিভক্ত করেন এবং পৃথক পৃথক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

১০. রাষ্ট্রীয় পদে নির্বাচন : যোগ্য ব্যক্তিকে সঠিক পদে নিয়োগ করার ওপর রাষ্ট্রের উত্তম ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে। আর সেই ব্যক্তিই যোগ্য, যিনি লোকদের চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। সেই দূরদর্শী আবু বকর রা. এসব গুণের অধিকারী ছিলেন।

১১. স্বজনপ্রীতি থেকে দূরে থাকা : সঠিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির পৃষ্ঠপোষকতা থেকে দূরে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ নীতি কঠোরভাবে পালন করতেন। তিনি তাঁর প্রশাসকদেরকেও এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিতেন।

১২. প্রশাসকদের মনঃতুষ্টি ও মর্যাদার দিকে লক্ষ রাখা : একটি রাষ্ট্রের শিষ্টাচার ও সুশাসনের সবচেয়ে বড় কথা হলো সেখানকার প্রশাসকদের সম্মান ও মর্যাদা পূর্ণভাবে রক্ষা করা এবং তাদের সাথে স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবহার না করা। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দুটি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তাছাড়া তিনি শাসনকর্তা নিয়োগকালে তাঁদের তীক্ষ্ণ প্রতিভার দিকটি বিবেচনা করতেন।

১৩. পরীক্ষামূলক নিয়োগ : বর্তমান যুগের সাধারণ নিয়মানুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত কারো দক্ষতা ও উত্তম কার্যাবলি সম্পর্কে বিশ্বাস না জন্মে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সংশ্লিষ্ট পদে অস্থায়িভাবে নিয়োগ করা হয়। স্থায়ী পদোন্নতির জন্যে শর্ত হলো উত্তম কার্যাবলি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসব নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতেন।

১৪. পদচ্যুতি : নিয়োগের পর কেউ অযোগ্য প্রমাণিত হলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বিনা দ্বিধায় পদচ্যুত করতেন। এজন্যে একবার খালিদ ইবন সাউদকে পদচ্যুত করা হয়।

১৫. পুলিশ বিভাগ : তখনকার দিনে দৈনন্দিন নাগরিক জীবনে শৃঙ্খলা বিধানের জন্যে পুলিশ বিভাগের মতো পৃথক কোনো বিভাগ ছিল না এবং প্রকৃতপক্ষে এর বিশেষ কোনো প্রয়োজনও ছিল না। তবুও উপস্থিত চাহিদা মেটানোর জন্যে কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তিকে এই কাজে নিয়োগ করা হয়।

১৬. খলিফার ভাতা : প্রথমত তিনি সরকারি কোষাগার থেকে নিজে কোনো ভাতা গ্রহণ করতেন না। ব্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরে ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকলে শাসনতান্ত্রিক কাজ বিঘ্ন হওয়ার আশঙ্কায় মজলিসে শূরার পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ভাতা গ্রহণ করতেন। অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে তিনি তা ফেরত দিয়ে গেছেন।

১৭. সেনা বিভাগ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় নিয়মতান্ত্রিক কোনো সেনাবিভাগ ছিল না। যখন প্রয়োজন হতো সাহাবিগণ নিজেরাই ইসলামি ঝাণ্ডার নিচে সমবেত হতেন। খলিফার যামানায়ও সেই অবস্থা ছিল। যখন প্রয়োজন হতো মুসলমানগণ বীরত্বের সাথে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতেন। তবে যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে যেতে হতো, তখন সেনাবাহিনীকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত

করে ভিন্ন ভিন্ন কর্মকর্তা ঠিক করে দিতেন। সমগ্র সেনাবাহিনীর জন্যে একজন সিপাহসালার নিযুক্ত করতেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যামানায় গনিমতের সম্পদের নির্দিষ্ট একটি অংশ প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্যে নির্ধারিত ছিল। খলিফা নিজে সেনাবাহিনীর দেখাশুনা করতেন। ক্রটি সংশোধন করতেন এবং পরস্পর ভ্রাতৃত্ব, একতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিক্ষা দিতেন।

১৮. কর্মসংস্থান সৃষ্টি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমলে এবং তাঁর পরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে মুহাজির ও আনসার এ দুই দলের দ্বারাই মূল ইসলামি সমাজ গঠিত হয়েছিল এবং তাদের প্রত্যেকেরই জীবিকা উপার্জনের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা ছিল। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي.

"আমার মুহাজির ভাইয়েরা ব্যবসায় বাণিজ্যের কাজে এবং আনসার ভাইয়েরা ক্ষেত-খামারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন, আর আমি সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত থাকতাম।"[১৬৮]

ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুখ্যাত ছিলেন আবু বকর আছ-সিদ্দিক, 'উসমান, 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ এবং সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ। মুহাজিরদের মূল পেশা যদিও ব্যবসা ছিল; কিন্তু মদিনায় আনসারগণের সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবার কারণে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ক্ষেত-খামারের কাজও করতেন।

১৯. ব্যবসায়ের ওপর কর মওকুফ : ইসলাম পূর্বকালে আরবের প্রসিদ্ধ বাজার ছিল 'উকায, মাজান্নাহ ও যুলমাজায প্রভৃতি। ঐ সকল বাজারে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা তাদের পণ্যদ্রব্য নিয়ে যেত; কিন্তু তাদের ব্যবসা স্বাধীন ছিল না। তাদের কাছে কর আদায় করা হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় অপর একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। এর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সেখানে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোনোরূপ কর আদায় করা হতো না। তিনি যখন এ বাজার প্রতিষ্ঠা করেন তখন বলেন,

هٰذَا سُوقُكُمْ، لَا خَرَاجَ عَلَيْكُمْ فِيهِ.

---

[১৬৮] বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল মুযারা'আহ, হাদিস নং : ২১৭৯।

"এটা তোমাদের বাজার, এখানে ব্যবসা করতে তোমাদের কোনো কর লাগবে না।"[১৬৯]

অধ্যায়-৭

বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসার

ইরাক বিজয়

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুরতাদ ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করে সমগ্র আরববাসীকে পুনঃইসলামের সুশীতল ছায়াতলে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ করে ফেলেন। আল্লাহ তা'আলা আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ধর্মীয় সাহসের ও উৎসাহের ভিত্তিতে আরববাসীদের মনে নিজের পবিত্র কালেমা দৃঢ় করে দিলেন। আরবের পার্শ্ববর্তী অমুসলিম রাষ্ট্রগুলো যথা : ইরান ও রোম নিজেদের প্রজাবৃন্দকে নিতান্ত হেয় ও তুচ্ছ এবং নিজেদেরকে তাদের চেয়ে উচ্চ স্তরের মনে করত। ফলে তাদের প্রতি নানা জাতীয় অত্যাচার-অবিচার ও নিষ্ঠুর আচরণ করত। প্রজাদেরকে ক্রীতদাসের চেয়েও অধিক নীচ মনে করত। এখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে ইসলাম বিস্তারের পর এ সমস্ত অত্যাচার, অবিচার, নিষ্ঠুরতা এবং মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করতে এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে মনোনিবেশ করলেন।

মুসান্না ইবনে হারেসা শায়বানীর অনুরোধক্রমে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রথমে ইরাক অভিযানের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং মুসান্নাকে ইরাক অভিযানের নির্দেশ দিলেন।[১৭০] মুসান্না স্বগোত্রীয় লোকদেরকে নিয়ে তাইগ্রীস ও ফোরাত নদীর পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ একাদিক্রমে জয় করতে আরম্ভ করলেন। অবস্থাদৃষ্টে খলিফা খালিদকেও মুসান্নার পিছনে পিছনে ইরাকের দিকে পাঠালেন। আবার ইয়ায ইবনে গনমকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি দওমাতুল জন্দলে গিয়ে সেখানকার বিদ্রোহীদেরকে দমন করে হিরা চলে যাও। তোমার ও খালিদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে হিরা পৌছবে, হিরার যুদ্ধে সেনাপতি সেই থাকবে।[১৭১]

আরববাসীরা অনেকেই ইরাক অঞ্চলে বর্গা ভাগে কৃষিকার্য করত। জমির মালিকেরা এ সমস্ত মূর্খ আরবদেরকে নানা প্রকারে ঠকাত এবং তাদের সাথে অমানুষিক দুর্ব্যবহার করত। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর সেনাপতিগণকে নির্দেশ

---

১৬৯ বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, খ. ১, পৃ. ১৫।

১৭০ তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ.২, পৃ. ৫২৬

১৭১ তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ.২, পৃ. ৫৫৪

দিয়েছিলেন যে, এ সমস্ত কৃষকশ্রেণির আরবদের সাথে কোনো প্রকার দুর্ব্যবহার করবে না। তাদেরকে হত্যা বা বন্দি করবে না। এরা যেন বুঝতে পারে যে, ইসলামের আবির্ভাবের ফলে পূর্বের অত্যাচার ও উৎপীড়নের অবসান ঘটেছে। এখন হতে তারা তাদের স্বদেশীয় লোকদের কাছে সদ্ব্যবহার এবং সমান অধিকার পাবে। আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু আনহু এই উদারনীতি ইসলামের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও বিস্তারের পথে বিশেষ সহায় হয়েছিল।

মুরতাদগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খালিদের বাহিনীর বহু সৈন্য শহীদ হওয়ায় বর্তমানে তাঁর সৈন্যসংখ্যা কমে গিয়ে দুই হাজারের সামান্য বেশি হয়েছিল। তদুপরি খালিদের প্রতি খলিফার নির্দেশ ছিল– কোনো সৈন্যকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইরাক অভিযানে অংশগ্রহণে বাধ্য করবে না। যারা মুরতাদ হয়েছিল এবং পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেছে এরূপ লোকদেরকে খলিফার নির্দেশ ব্যতীত ইরাক অভিযানে গ্রহণ করবে না।

ইরাকের দিকে যাত্রা করে খালিদ তাঁর সাহায্যার্থে মদিনা হতে আরও সৈন্য পাঠানোর জন্যে খলিফার কাছে আবেদন জানালেন। খলিফা খালিদের সাহায্যার্থে মাত্র কা'কাকে প্রেরণ করলেন। লোকে বলল, খালিদের সৈন্যসংখ্যা যখন খুবই কমে গিয়েছে, এমতাবস্থায় তাঁর সাহায্যার্থে মাত্র একজন লোক পাঠিয়েছেন? খলিফা বললেন, 'কা'কা' যে বাহিনীতে থাকবে, আল্লাহর ফযলে সেই বাহিনী কখনও পরাজিত হবে না।"[১৭২] কা'কা'র মারফতে তিনি খালিদকে নির্দেশনামা প্রদান করলেন যে, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর যাঁরা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, কেবল তাঁদেরকে সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ কর।"

খলিফার পত্র পেয়ে খালিদ মোযর ও রবী'আ গোত্রদ্বয় হতে আট হাজার সৈন্য নিজের সাথে নিলেন। এখন তাঁর বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াল দশ হাজার। এছাড়াও মুসান্নার বাহিনীতে ছিল আট হাজার সৈন্য। এই আঠার হাজার সৈন্য নিয়েই খালিদ পারস্য অভিযানের জন্যে অগ্রসর হলেন।

আয়লার যুদ্ধ জয়

খলিফার নির্দেশ ছিল পারস্য উপসাগরের সীমান্তবর্তী 'আয়লা' নামক স্থান থেকে ইরাকের অভিযান আরম্ভ করবে। খালিদ আয়লার নিকটবর্তী হয়ে সেনাবাহিনীকে তিন দলে বিভক্ত করে একটি বাহিনী মুসান্না ইবনে হারেস শায়বানীর, দ্বিতীয় বাহিনী আ'দী ইবনে হাতেম তাঈর এবং তৃতীয় দলটি নিজের

---

১৭২ তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ.২, পৃ. ৫৫৩

অধীনে রাখলেন। মুসান্না ও আদীর বাহিনীদ্বয়কে আগে পাঠিয়ে নিজে তাদের পিছনে পিছনে চললেন। অগ্রবর্তী বাহিনীদ্বয়ের প্রতি নির্দেশ ছিল তারা হাযর নামক স্থানে পৌছে খালিদের জন্যে অপেক্ষা করবে।

পারস্য উপসাগরের সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলে পারস্য রাজ্যের গভর্নর ছিল হরমুয নামক একজন নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী লোক। আরব কৃষকদের প্রতি তার অত্যাচার ছিল অমানুষিক। ইরানি সরদারদের মধ্যে হরমুয ছিল মান-মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ। সে একলাখ দেরহাম মূল্যের টুপি পরিধান করত। যা সাধারণ আমির ও শাসনকর্তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই লোকটির অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরতা এত অধিক ছিল যে, লোকে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলত, এই ব্যক্তি হরমুযের মতো অত্যাচারী, হরমুযের মতো নিষ্ঠুর।

আরব কৃষকদের প্রতি হরমুযের অত্যাচারের কাহিনী আরবাসীরা সব সময়েই শুনে আসছিল। সুতরাং তারা সময় সময় হরমুযের এলাকায় প্রবেশ করে তাকে উত্যক্ত করত। আজ তার বিরুদ্ধের অভিযানেও আরববাসীদের মনে আরব কৃষকদের প্রতি হরমুযের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের আগুন জ্বলে উঠেছিল।

খালিদ হাযরের নিকটবর্তী হয়ে হরমুযকে পত্র লিখলেন, "তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, আমরা তোমাদের দেশে কোনো প্রকার অশান্তি ঘটাব না। অন্যথায় জিযিয়া কর দানে স্বীকৃত হয়ে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার কর। এর কোনো একটিতেও সম্মত না হলে তোমাকে দারুণ পরিতাপ করতে হবে। কিন্তু তখন পরিতাপ কোনো কাজে আসবে না। তখন কাউকেও দোষারোপ করতে পারবে না। কেননা, আমার সঙ্গের মুজাহিদগণ মৃত্যুর জন্যে ততটাই আগ্রহান্বিত যতটা তোমরা বেঁচে থাকার জন্যে আগ্রহশীল।"[১৭৩]

হরমুয খালিদের পত্র পেয়ে পারস্যরাজ আর্দেশীরকে সংবাদ দিয়ে সসৈন্যে খালিদের দিকে অগ্রসর হলো এবং হাফীরের পানির কূপটি নিজেদের অধিকারে রাখার জন্যে খালিদের আগেই হাফীরে পৌছল এবং কূপটি নিজের আয়ত্তে রেখে শিবির স্থাপন করল। সুতরাং খালিদকে পানির ব্যবস্থাবিহীন স্থানে শিবির স্থাপন করতে হলো। সঙ্গের মুজাহিদগণ তাঁকে পানির অব্যবস্থার কথা জানালে তিনি বললেন, "শত্রুদের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত হও। প্রাণপণে যুদ্ধ করলে পানি তোমাদের অধিকারে আসতে বিশেষ বিলম্ব হবে না।"

---

১৭৩ তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ.২, পৃ. ৫৫৪

হরমুয তার ডান ও বাম পার্শ্বে শাহী বংশের কুব্বাদ এবং আনুশজানকে নিযুক্ত করল। অতঃপর ধোঁকা দিয়ে খালিদকে শহীদ করার জন্যে নিজে ময়দানে নেমে খালিদকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্যে আহ্বান করল। উদ্দেশ্য– খালিদকে নিহত করতে পারলে মুসলমানগণ আর যুদ্ধক্ষেত্রে টিকতে পারবে না। সে ময়দানে নেমে আসার পূর্বে তার কতিপয় শ্রেষ্ঠ ও বীর যোদ্ধাকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল যে, খালিদ আমার সম্মুখে আসা মাত্র তোমরা অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে।

খালিদ হরমুয কর্তৃক দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান পেয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে হরমুযের দিকে হেঁটে চললেন। কা'কা' পূর্বেই হরমুযের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিলেন। কেননা, দুরভিসন্ধি ছাড়া আল্লাহর তরবারিকে তথা সাক্ষাৎ যমদূতকে এত সহজে কেউই সম্মুখ-সমরে আহ্বান করতে পারে না। সুতরাং তিনিও যেকোনো আকস্মিক ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। যখনই তিনি পারসিক ধোঁকাবাজদেরকে গুপ্তস্থান হতে বের হতে দেখলেন, সাথে সাথে তিনি বিদ্যুৎবেগে কয়েকজন প্রখ্যাত মুজাহিদকে সাথে নিয়ে খালিদের পাশে এসে দাঁড়ালেন; কিন্তু তাঁরা আসার পূর্বে খালিদ তরবারির এক আঘাতে হরমুযের জীবন শেষ করে দিয়েছিলেন।[১৭৪]

এখন উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। সেনাপতিকে হারিয়ে পারসিক বাহিনী সাহসহারা হয়ে পড়েছিল। অতএব, তারা যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকক্ষণ টিকে থাকতে পারল না, যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে পালাতে লাগল। মুজাহিদ বাহিনী তাদের পিছনে ধাওয়া করে পলায়নরত সৈন্যদেরকে নিহত করতে করতে ফোরাত নদীর বড় পুল পর্যন্ত তাড়িয়ে দিল।

'আয়লা'র যুদ্ধে পূর্ণ বিজয় লাভের পর খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মা'কাল মাযেনীকে গনিমতের মাল এবং যুদ্ধবন্দিদেরকে একস্থানে একত্রিত করতে নির্দেশ দিলেন, আর মুসান্নাকে পলায়মান শত্রুসৈনদের অনুসন্ধানের জন্যে পাঠালেন। অনুসন্ধানরত অবস্থায় একটি দুর্গ দেখে অনুসন্ধানে তা ইরান সম্রাটের কন্যার বাসস্থান বলে জানতে পারলেন। তার অনতিদূরেই সম্রাটের জামাতার বাসস্থান। মুসান্না তাঁর ভাই মু'আন্নাকে সম্রাট-দুহিতার দুর্গ অবরোধ করে রাখতে আদেশ প্রদান করে নিজে জামাতার দুর্গ অবরোধপূর্বক তাকে নিহত করে ফেললেন। মুসান্না অতিশয় সুপুরুষ ছিলেন। স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সম্রাট-দুহিতা মু'আন্নার সাথে সন্ধি করে তাকে স্বামিত্বে বরণ করে নিলেন।

---

[১৭৪] তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ.২, পৃ. ৫৫৫

এরূপে পারস্যোপসাগর হতে উত্তরে হিরা পর্যন্ত এবং পশ্চিমে আরবদেশ হতে পূর্বে টাইগ্রীস পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা ইসলামি রাষ্ট্রের করতলগত হলো। এ সমস্ত দেশে তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার এবং খাজনা আদায়ের জন্যে কর্মচারী নিযুক্ত করে দিলেন। স্থানে স্থানে সেনানিবাস স্থাপন করে বিদ্রোহের সম্ভাবনাও দূর করে দিলেন।

এ সময় পারস্যের রাজধানীতে সিংহাসন নিয়ে গৃহবিবাদ আরম্ভ হলো। যে কেউ সিংহাসনে আরোহণ করলে শত্রু কর্তৃক নিহত হয়। এভাবে তারা ক্রমশ হীনবল হয়ে মুসলিম কর্তৃক অধিকৃত এলাকাগুলো পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ত্যাগকরত টাইগ্রীসের অপর পার রক্ষার ব্যবস্থা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। খালিদও ইরানের কোনো পরওয়াই করতো না। ইরানিদেরও খালিদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খালিদকে নির্দেশ দিয়েছিলেন– 'ইয়ায ইবনে গনম দওমাতুল জন্দল জয় করে তোমার সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি আর কোনো দিকে অগ্রসর হইও না। হিরায়ই অবস্থান করতে থাক। কিন্তু ইয়ায এক বছর পর্যন্ত দওয়াতুল জন্দল অবরোধ করে রেখেও জয় করতে পারছিলেন না। কাজেই খালিদকে এক বছর পর্যন্ত হিরায় বেকার বসে থাকতে হলো। তিনি ছটফট করতে লাগলেন। তাঁর মতে এ সময় ইরান জয় করা অপেক্ষা আর কোনো কাজই অধিক জরুরি নয়। কিন্তু খলিফার নির্দেশ অমান্য করতে পারলেন না।

তিনি ধৈর্যধারণ করতে না পেরে ইরানের সম্রাট ও তাঁর শাসনকর্তাদের কাছে পত্র লিখে তাদেরকে মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করতে নির্দেশ দিলেন। ইতঃপূর্বেই ইরানিরা আম্বারে এবং আইনুত্তামারে সৈন্য সমাবেশপূর্বক ছাউনি করেছিল। এত কাছে সৈন্য সমাবেশ মুসলমানদের পক্ষে বেশ ভয়ের কারণ ছিল। এ সময় কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে বিজিত এলাকাসমূহ মুসলমানদের হাতছাড়া হওয়ার প্রবল আশঙ্কা ছিল। সুতরাং কা'কাকে হিরার শাসনভার প্রদান করে তিনি সসৈন্যে আম্বার পৌঁছিলেন এবং আম্বার দুর্গ অবরোধ করে দুর্গের দিকে তীরবর্ষণের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু শহরের চতুর্দিকে পরিখা থাকার দরুন তীরবর্ষণে দুর্গবাসীদের কোনো ক্ষতি হলো না। অবশেষে খালিদ পর্যবেক্ষণ করে পরিখার একটি স্থান সঙ্কীর্ণ পরিসর দেখতে পেলেন। তিনি নিজেদের দুর্বল ও অকর্মণ্য উটগুলোকে যবেহ করে ঐ স্থানে ফেলে তাদের লাশের ওপর দিয়ে পরিখা পার হয়ে গেলেন। তৎপর প্রাচীর ডিঙিয়ে শহরে প্রবেশ করলেন।

এটা দেখে ইরানি সেনাপতি নিজের দলবলসহ নিরস্ত্র অবস্থায় শহর পরিত্যাগ করে যাবে বলে খালিদের কাছে প্রস্তাব পাঠাল, তিনি তা মেনে নিলেন। আম্বার দুর্গ অধিকৃত হলো। আশপাশের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে বশ্যতা স্বীকার করল।

খালিদ যবরকান 'ইবনে বদরকে' আম্বারে রেখে নিজে আইনুত্তামারের দিকে অগ্রসর হলেন। তিন দিনে তিনি সেখানে পৌছলেন। এখানে ইরানি শাসনকর্তা মেহরান ইরানি সৈন্যের এক বিরাট বাহিনীসহ অবস্থান করছিল। এছাড়াও স্থানীয় বনু তগলব, বনু নামের ও বনু আয়াদ গোত্রীয় যাযাবরগণ ওকাহ ইবনে আবিওয়াকাহ এবং হোযায়লের নেতৃত্বে মেহরানের সাহায্যার্থে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিল।

মেহরান ভেবেছিল, দুর্গের বাইরে অবস্থানকারী যাযাবররাই খালিদের গতি প্রতিহত করতে পারবে। কাজেই যাযাবরদেরকে খালিদের গতিরোধ করতে নির্দেশ দিয়ে সে দুর্গে অবস্থান করতে গেল। ওকাহ ইবনে আবিওয়াকাহ গতিরোধ করতে গিয়ে খালিদের নিক্ষিপ্ত ফাঁস গলায় পরে বন্দি হলো। এটা দেখে যাযাবর সৈন্যগণ পালাতে লাগল। মুসলমানগণ তাদেরকে দাওয়া করে হাজার হাজার সৈন্য বন্দি করে ফেললেন।

মেহরান যাযাবরদের পলায়ন করার ও বন্দি হওয়ার সংবাদ পেয়ে দুর্গের পিছনের দরজা খুলে সদলবলে পলায়ন করল। শুধু দুর্গরক্ষীরা দুর্গে রয়ে গেল। খালিদ তাদেরকেও বন্দি করলেন। কেবল ওকাহকে প্রকাশ্য ময়দানে হত্যা করা হলো।

অতঃপর বিজয় সংবাদ ও গনিমতের মাল নিয়ে ওলিদ ইবনে ওকবাকে মদিনায় পাঠানো হলো। তিনি মদিনায় পৌছে খলিফাকে জানালেন যে, ইরানি সেনাবাহিনী মুসলমানদের অতি কাছে আম্বারে এবং আইনুত্তামারে সৈন্য সমাবেশ করায় বাধ্য হয়ে খালিদ তাদেরকে আক্রমণ করেন। অন্যথায় তারা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানদের কাছ থেকে বিজিত এলাকা ছিনিয়ে নেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল।

মুসলিম বাহিনী এবার জনৈকা পারসিক রাজকুমারীর দ্বারা রক্ষিত একটি দুর্গ জয় করেন যাকে মহিলা দুর্গ বা (The Ladys Castle) বলা হয়। পারসিক সেনাপতি বাহমান মুসান্না ও খালিদের কাছে পরাজয় বরণ করে। এ যুদ্ধটি ওয়ালাজারা যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। অপর একটি যুদ্ধে পারস্য বাহিনী মহাবীর খালিদের কাছে পরাজয় বরণ করে। এ যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি হিরা দখল করেন। হিরার অধিবাসিগণ খলিফার বশ্যতা স্বীকার করে জিজিয়া প্রদানে সম্মত হয় এবং একটি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে। হিরা অধিকারের পর খালিদ উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে আনবার, আইনুত, তামুর ও দুমায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তার করেন।
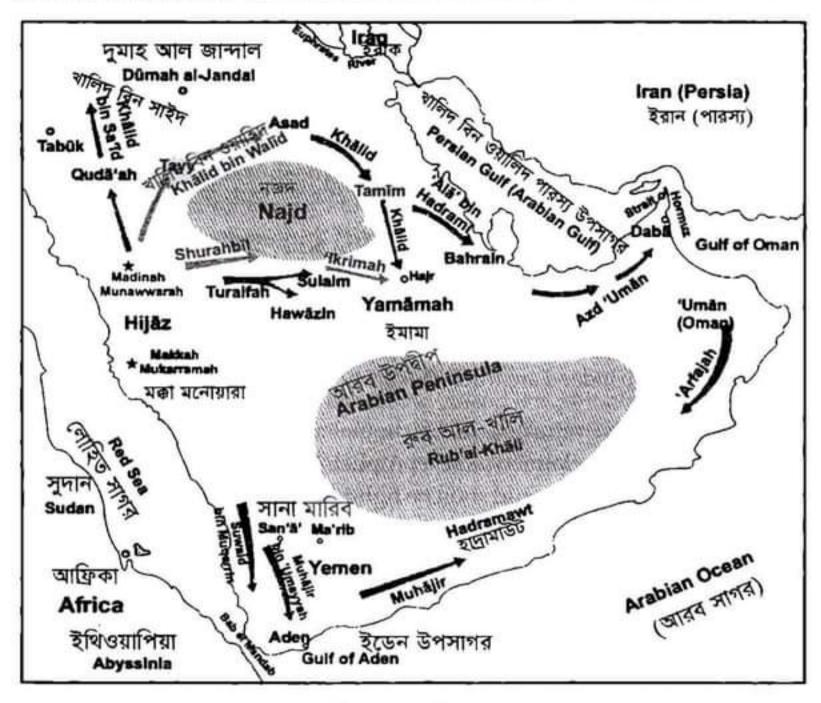
সিরিয়া অভিযান

সিরিয়া অভিযান আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের অন্যতম ঘটনা। নিচে সিরিয়া অভিযানের ঘটনাপ্রবাহ আলোচনা করা হলো—

১. সিরিয়া অভিযানের কারণ : মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর প্রেরিত দূতকে সম্মান করতেন; কিন্তু পরে তিনি মুসলিম রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত ও শঙ্কিত হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করেন। ১১ হিজরী ৬৩২ খ্রি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে জানিয়েছিলেন যে, ফিলিস্তিন ও বালকা অঞ্চলে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তিনি সেনা অভিযান পরিচালনা করার। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে প্রসিদ্ধ সাহাবারাও এ যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেন। এই অভিযানের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৭ বছর বয়সী তরুণ যুবক উসামা ইবনে যায়েদকে সেনাপতি নির্বাচিত করায় অনেক সাহাবা বিস্ময় প্রকাশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের দুই দিন পূর্বে শনিবার সৈন্যরা এই অভিযানের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুরুতর অসুস্থ হওয়ার পূর্বেই তারা যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। সর্বোপরি সফর মাসের শেষদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযানের নির্দেশ দেন।

চিত্র : প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের নিদর্শন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ডেকে বললেন, যেখানে তোমার পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল সেখানে যাও এবং শত্রুদেরকে তোমার ঘোড়া দ্বারা পিষ্ট করে দাও। আর আমি তোমাকে এ অভিযানের সেনাপতি নির্বাচিত করলাম।

কিছুলোক উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বের ব্যাপারে আপত্তি জানালেন। সে অল্পবয়স্ক, সে অন্যান্য সাহাবীদের তুলনায় অনভিজ্ঞ। যাহোক অবশেষে এমন অনেক সাহাবী এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন, যারা ইতোপূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যারা যুদ্ধক্ষেত্রে অধিক পরীক্ষিত। এমনকি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

অনেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রশ্ন করলেন কেন উসামাকে সৈন্যদলের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরে বললেন, যদি তোমরা তার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলো, তাহলে তা হবে তার বাবার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার শামিল; আল্লাহর ইচ্ছাই সে তোমাদের নেতা হয়েছে, সে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। যেহেতু যায়েদ মারা গেছেন সুতরাং তার ছেলে উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু এখন আমার কাছে অতি প্রিয়। ইতোমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হওয়ায় এ অভিযান বন্ধ হয়ে যায়।

মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর রোম সম্রাট সিরিয়ার আরব গোত্রগুলোকে বিদ্রোহের প্ররোচনা ও সাহায্য দান করে। তারা ইসলামকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চালায়। খ্রিস্টান শাসনকর্তা সুরাহবিল মূতায় মুসলিম দূতকে হত্যা করে। এতে মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। ফলে খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রোমানদের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করেন।

আবু বকর সাহাবিদের ডেকে একত্রিত করলেন এবং পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত মোতাবেক আবু বকর সিরিয়ায় অভিযান প্রেরণ করেন। রাসূল -এর ইন্তিকালের তিন দিন পর খলিফা উসামা বাহিনীকে যুদ্ধে গমনের আদেশ দিলেন। তিনি বললেন এ রাতে কেউ মদীনায় থাকবে না, খলিফার আদেশে সকলে উসামার নেতৃত্বে 'আল-জরুফ' নামক তাবুতে একত্রিত হলো। খলিফার আদেশে সৈন্যবাহিনীতে সকলে একত্রিত হয়ে রওনা শুরু করতে উদ্যত হলো। উমর ও তাদের সাথে একত্রিত হলেন। এদিকে উসামা বাহিনীর মদীনা ত্যাগের পূর্বক্ষণে রাসূলুল্লাহ -এর অসুস্থতা ও ইন্তিকালের খবরে মদীনায় কিছু চুক্তিভঙ্গ গোত্র মদীনার স্বীকৃতি অস্বীকার করে এবং অনেক নও মুসলিমের ইসলাম ত্যাগের সম্ভাবনা দেখা দেয়। সৈন্যবাহিনী ও উসামার মদীনা ত্যাগ মদীনা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ হয়ে উঠলো। উমর খলীফা আবু বকর -এর কাছে গিয়ে আরজ করলো, যদি আপনি এ অভিযান চালাতে চান তবে উসামা থেকে অভিজ্ঞ একজনকে সেনাপতির দায়িত্ব দিন। প্রতুত্তরে আবু বকর বললেন শান্ত এবং স্থির হও, যদি ইসলাম বিরোধিরা মদীনার বিরুদ্ধে দাঁড় কাকের ন্যায় ক্ষিপ্ত হয়ে আসে এবং আমি নিরাপত্তাহীন এবং একাকীও হই; তবু এ মুহূর্তে সৈন্য দলের যাত্রা করা উচিত, কারণ আমি চাই না রাসূলের একটি আদেশ অমান্য হোক।

"হে খাত্তাবের পুত্র! তোমার মা তোমার জন্য কুরবানী হোক। আবু বকর উমর -এর দাঁড়িতে হাত দিয়ে বললেন, "রাসূলুল্লাহ যাকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন, আমি কি তার স্থানে অন্য কাউকে সেনাপতি নিযুক্ত করবো?"

এভাবে উমর আবু বকর -এর কাছ থেকে ফিরে এলেন। যখন সাহাবীরা যাত্রা শুরুর প্রস্তুতি নিল, আবু বকর সেন্যদলের কাছে আসলেন এবং সৈন্যদলকে কিছু দূর এগিয়ে দিলেন। উসামা তাঁকে বললেন আপনি ঘোড়ায় চড়ুন নতুবা আমি পায়ে হেটে চলি। আবু বকর বললেন প্রয়োজন নেই, আমি পায়ে হেটে চলবো, আমার এক একটি পদক্ষেপ হবে আল্লাহর পথে পথ চলা। আবু বকর জানতেন তিনি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। কিন্তু যখন তিনি উসামা বাহিনীকে বিদায় দিচ্ছিলেন তখন একটি বিষয় তাকে খুব ভাবিয়ে তুললো, "উসামা বাহিনীর একজন সদস্য হলেন উমর বিন খাত্তাব । যে ছিলো খলিফা আবু বকর -এর আস্থাভাজন উপদেষ্টা। তিনি খুব কর্মঠ এবং সিদ্ধান্ত প্রদানে সক্ষম। অন্য যে কোনো সময়ের থেকে এসময়ে তিনি উমর -কে তার পাশে থাকার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন।

আবু বকর উসামা -কে বললেন যদি তুমি উমর -কে আমার সাথে শহরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দাও। যাতে সে আমাকে সাহস ও পরামর্শ দিবে। অতপর উসামা উমর -কে শহরে ফিরে আসার অনুমতি দেন।

এরপর সৈন্যবাহিনী খলিফার শেষ ভাষণ শুনতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা বিরতি করলো। আবু বকর সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়ালেন এবং বললেন, "হে মানুষ, দাঁড়াও, কারণ আমি তোমাদেরকে ১০টি উপদেশ দিব, তোমরা তা স্মরণে রেখো-

১. বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।
২. ন্যায়ের পথ থেকে সরে আসবে না।
৩. নারী, শিশু ও বৃদ্ধ লোকদের হত্যা করবে না।
৪. শস্য খেত (খেজুর বাগান) ধ্বংস অথবা আগুনে পোড়াবে না।
৫. ফলবান বৃক্ষ কাটবে না, যা থেকে মানুষ অথবা পশু-পাখি ফল খায়।
৬. কোনো সঙ্গত কারণ (খাবার) ব্যতীত পশু-পাখি হত্যা করবে না।
৭. খাবারের পূর্বে আল্লাহর নাম নিবে। (বিসমিল্লাহ পড়বে)
৮. এমন ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা তাদের ঘরে কিংবা উপাসনালয়ে আশ্রয় নিয়েছে।
৯. আশ্রয়প্রার্থীদেরকে আক্রমণ না করে একাকী থাকতে দাও।
১০. রাসূলুল্লাহ যা আদেশ করেছেন তার সাথে কিছু বাড়িয়ে বলবে না, অথবা কিছু কমিয়ে বলবে না।

এখন মহান আল্লাহর নামে যাত্রা শুরু কর, তিনিই তোমাদের নিরাপত্তা দিবেন।"

এরপর খলিফা আবু বকর উমর-কে সাথে নিয়ে মদীনায় আসলেন এবং উসমা তার বাহিনীকে নিয়ে রওয়ানা করলেন।

উসামা যখন নির্ধারিত স্থানে পৌছলেন, তখন তিনি কুযাআ এবং আবিল গোত্রের উপর আক্রমণ করলেন। তাদের অভিযান সফল হলো। উসামা এবং তার বাহিনী কোনরূপ ক্ষয়-ক্ষতি ব্যতীত যুদ্ধে বিজয়ী হলো। এ দুটি অভিযান হয়েছিলো সিরিয়ার দক্ষিণের উচ্চভূমিতে। এ বাহিনী ৪০ দিন পর বিপুল গণিমতসহ ফিরে এলো।

রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস রাসূলুল্লাহ-এর ইন্তিকাল ও উসামা বাহিনীর অভিযানের খবর শুনলো। হিরক্লিয়াস বললো তাদের কী হলো, তাদের নেতা মারা গেছে অথচ তারা আমাদের দেশ আক্রমণ করছে, তখন সভাসদের একজন বলে উঠলো। যদি তারা শক্তিশালী না হতো, তবে তারা আমাদের উপর আক্রমণের জন্য সৈন্য পাঠাতো না।

এভাবে আরবের খ্রিস্টানরা ও রোমানরা অনুধাবন করলো যে, মুসলমানরা খুবই শক্তিশালী, তারা দুর্বল নয়। আর এভাবেই রোমান সাম্রাজ্য মুসলমানদের অধিকারে আসে।

২. সিরিয়ার চারটি অংশে চারটি বাহিনী প্রেরণ : আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিম বাহিনীকে চার ভাগে বিভক্ত করেন। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে একটি অংশের নেতৃত্ব দিয়ে ফিলিস্তিনে যাওয়ার নির্দেশ দেন। আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে দ্বিতীয় অংশের নেতৃত্ব দিয়ে হেমসের দিকে পাঠান। ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তৃতীয় অংশের নেতৃত্ব দিয়ে দামেস্কে পাঠান এবং সুরাহবিল ইবনে হাসানাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে চতুর্থ অংশের নেতৃত্বের নির্দেশ দিয়ে জর্দানের দিকে যাওয়ার আদেশ দেন।

খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়া অভিযানে যাবার জন্যে মদিনায় জনসাধারণকে আহ্বান জানালেন। রোমকদের শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ করে প্রথমে অনেক মুসলমানই নীরব রইলেন। কেউ কোনো সাড়া দিলেন না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মনের ভয় কেটে গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই বহু লোক সিরিয়া অভিযানে যাত্রা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মদিনাবাসীদের পক্ষ হতে নিশ্চিন্ত হয়ে খলিফা ইয়ামনবাসীদেরকে পত্র লিখলেন :

"আল্লাহ মুসলমানদের ওপর জেহাদ ফরয করেছেন। সংখ্যার প্রাচুর্য এবং যুদ্ধ সরঞ্জামের আধিক্য থাকুক বা না থাকুক যেকোনো অবস্থায় ধর্মের শত্রুদের মোকাবিলা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, হে মু'মিনগণ! নিজেদের জান-মাল উৎসর্গ করে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কর, জেহাদ ফরয। এর সওয়াব যে কত বেশি তা কেউ অনুমান করতে পারে না। তোমাদের যে সমস্ত ভাই আমার সম্মুখে ছিল সিরিয়া জেহাদের আহ্বান জানাবার সাথে সাথে তারা জেহাদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরাও আমার আহ্বানে সাড়া দাও এবং আল্লাহ তা'আলার ফরযকৃত জেহাদের প্রতি আগ্রহ সহকারে অগ্রসর হও।"[১৮১]

খলিফার দূত ইয়ামনবাসীদের সম্মুখে খলিফার এই পত্র পাঠ করলে যুলকেলা মেহইয়ারী নিজের ও অন্যান্য গোত্রের বহুসংখ্যক লোক নিয়ে মদিনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। এটা দেখে কবীলায়ে আযদের জুনদুব ইবনে আমরুল লাদুসী, কবীলায়ে ময়াজ্জযের কায়স ইবনে হোযাইর মুরাদী এবং বনু তাই গোত্রের হাবস ইবনে সাঈদ স্ব স্ব গোত্রের বহুসংখ্যক লোককে সাথে নিয়ে মদিনায় যাত্রা করলেন।

এদিকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনার মুহাজের এবং আনসার, মক্কাবাসী এবং আশপাশের অন্যান্য গোত্রের লোকদেরকে জেহাদের প্রেরণা দিয়ে সিরিয়া অভিযানের জন্যে প্রস্তুত করতে লাগলেন। রোমীয়গণ নিশ্চেষ্ট বসে ছিল না। ইরাকে আরবদের অপ্রতিহত অগ্রগতির কথা এবং মুরতাদগণের পুনরায় ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তনের কথা রোমকগণ অবগত ছিল না। তাবুকের যুদ্ধে মুসলমানদের বল-বিক্রম শৌর্যবীর্যের কথা তারা আজও ভুলে নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং

[১৮১] ইবনুল আসাকির, তারীখু দিমাশক, খ.২, পৃ. ৬৫

সাহাবিগণকে নিয়ে এ যুদ্ধে এসে রোম সীমান্তে বসবাসকারী আরব গোত্রগুলোর সাথে সন্ধি করে নিয়েছিলেন। এখন তাঁর সেই সাহাবিগণই রোম সীমান্তে উপস্থিত। এটা তাদের পক্ষে ভুলবার কথা নয়।

রোম-সম্রাট সিরিয়া সীমান্তের বাসিন্দা গোত্রগুলোকে মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা প্রদানের জন্যে নির্দেশ প্রদান করলেন। সে অনুযায়ী সীমান্তের গোত্রগুলো এক বিরাট বাহিনী গঠন করে সীমান্ত পাহারায় নিযুক্ত থাকল।

মুজাহিদ বাহিনী ও রোমক বাহিনী সীমান্তের এপারে মুখোমুখি ছাউনি ফেলল। উভয় দলই স্ব স্ব কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাওয়ামাত্র বিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত।

ঠিক এমন সময় এই অঞ্চলে খালিদ ইবনে ওলিদের অপ্রতিহত অগ্রগতির সংবাদ রোমকগণ প্রতিদিন শুনে আসছিল। এতে তারা অত্যন্ত ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। রোমকরা এ আশঙ্কাও করছিল যে, সংঘর্ষ বাঁধলে 'তইমায়' অবস্থানকারী মুসলিম বাহিনীও তাদের ভাইদের সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হবে। অতএব, তারা যুদ্ধ প্রস্তুতিতে কোনো প্রকার ত্রুটি করেনি। আয়োজনের এই তোড়জোর দেখে খালিদ ইবনে সাঈদ খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে রোমকদের প্রতি আক্রমণ চালাবার অনুমতি চেয়ে পত্র লিখলেন। খলিফা তখন সিরিয়া অভিযানে সৈন্য পাঠানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি খালিদ ইবনে সাঈদকে লিখলেন :

তোমাকে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেওয়া গেল। কিন্তু খবরদার কখনও শত্রুপক্ষের ওপর আগে আক্রমণ করো না। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাক।[১৮২]

সিরিয়া বিজয়

'তইমায়' অবস্থানরত অবস্থায় খালিদ ইবনে সাঈদের সৈন্যসংখ্যা ছিল সামান্য, সাথে ছিল সীমান্তের বেদুঈন গোত্রসমূহের একটি দল। ওদিকে এদেরই মোকাবিলার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল রোমকদের একটি বিরাট বাহিনী। শত্রুর সংখ্যাধিক্য দেখে মুজাহিদগণ ভীত হননি; বরং শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠলেন। খালিদ ইবনে সাঈদ খলিফার নির্দেশ পাওয়ামাত্র কালবিলম্ব না করে সীমানা অতিক্রম করে গেলেন। সীমান্ত প্রহরী রোমক সৈন্যগণ মুজাহিদ বাহিনীকে সীমানা অতিক্রম করতে দেখে ভয়ে পলায়ন করল। খালিদের অগ্রসর হওয়া অব্যাহত রইল। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করতে দেখে রোমীয়গণ আরও অধিক আয়োজন এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগল।

---

[১৮২] তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ.২, পৃ. ৫৮৭

খলিফা খালিদ কর্তৃক এই সংবাদ পেয়ে তাঁকে নির্দেশ দিলেন : সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাক। কিন্তু আক্রান্ত না হলে আক্রমণ করো না। 'কামতান' নামক স্থানে রোমকগণ তাদেরকে বাধা দিল বটে, কিন্তু পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হলো। খালিদ আবার অগ্রসর হতে লাগলেন। সম্মুখে রোমকদের বিরাট বাহিনী অপেক্ষা করছে, সংবাদ পেয়ে খালিদ খলিফার কাছে সাহায্যকারী সৈন্য চেয়ে পাঠালেন। ইতোমধ্যে সাহায্যকারী বাহিনী মদিনা হতে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল।

আবু বকরের রাঃ বিশ্বাস ছিল, সিরিয়ার সীমান্তে বসবাসকারী খ্রিস্টান আরব কখনও রোমকদের সহায়তা করবে না। কেননা, তারা ছিল শাসিত আর রোমকরা ছিল শাসক, রোমকদের শাসনে তারা সন্তুষ্ট ছিল না। বিশেষত এক ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের মধ্যে ব্যবধান ছিল অনেক। সীমান্তবাসী আরবগণ ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট আর রোমকরা ছিল ক্যাথলিক। সীমান্তের আরবগণ যখন দেখল যে, রোমকগণ নিজেরা শত্রুর সম্মুখীন না হয়ে তাদেরকে শত্রুর তরবারির সম্মুখে রাখছে, তখন তারা যুদ্ধে নিরুৎসাহী হয়ে পড়ল। সুতরাং তারা মুসলমানদের রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়ে সরে দাঁড়াল। আবু বকর রাঃ-এর ধারণা সত্যে পরিণত হলো।

আবু বকর রাঃ খালিদ রাঃ-এর সাহায্যার্থে আমর ইবনে আ'স এবং ওলিদ ইবনে ওকবাকে পাঠালেন। ওলিদ আমরের পূর্বে খালিদ রাঃ-এর কাছে পৌছে মদিনা হতে আরও সৈন্য তাঁর সাহায্যার্থে আসছে বলে সংবাদ দিলেন। এ সংবাদ পেয়ে খালিদের আনন্দের সীমা রইল না। নিজে একাকী রোমীয়দেরকে পরাজিত করার গৌরব অর্জনের জন্যে ওলিদকে সাথে নিয়ে রোমক সেনাপতি 'সাহানের' বিরাট বাহিনীকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। খালিদ ইবনে সাঈদ নিজেকে খালিদ ইবনে ওলিদ মনে করেছিলেন। খালিদ ইবনে ওলিদ যেমন মুষ্টিমেয় মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে ইরাকে ইরানিদের বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করেছেন, তদ্রূপ তিনিও সামান্যসংখ্যক সৈন্য নিয়ে রোমীয়দের বিরাট বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দিবেন এবং সিরিয়া বিজয়ের গৌরব একাই অর্জন করবেন বলে মনে করলেন।

রোমীয় সেনাপতি খালিদের অভিপ্রায় বুঝতে পারল। সে খালিদকে বাধা না দিয়ে দামেশকের দিকে চলল। কিন্তু দামেশকের দিকে যাওয়া সাহানের একটি চাল মাত্র। খালিদ পিছনে পিছনে চললেন। অথচ এ জাতীয় বিপদ সম্বন্ধে আবু বকর রাঃ তাকে পুনঃপুন সাবধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু গৌরব অর্জনের মোহে তিনি খলিফার উপদেশ ভুলে বসলেন। 'মারজোস সফর' নামক স্থানে পৌছিয়েই সাহান

রুখে দাঁড়াল। খালিদের বাহিনীকে চতুর্দিক হতে বেষ্টন করে পেছনের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। খালিদের পুত্র সাঈদ পিতার দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সাহান তাদেরকে আক্রমণ করে সাঈদসহ সকলকেই হত্যা করে ফেলল। পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে এবং নিজেকে শত্রু কর্তৃক বেষ্টিত দেখে ইকরামার হাতে সৈন্যদেরকে ছেড়ে দিলেন এবং নিজে বাহিনী ত্যাগ করে মদিনার নিকটবর্তী 'যুল মারওয়াহ' নামক স্থানে এসে পৌছলেন। খলিফা এ সংবাদ পেয়ে তাঁকে মদিনায় প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন, যাতে তাঁর দলত্যাগের সংবাদ শ্রবণ করে সিরিয়া অভিযানে গমনেচ্ছু মুজাহিদীনের মনোবল হ্রাস না পায়।[১৮৩]

এদিকে ইকরামা ও যুলকেলা সুকৌশলে মুজাহিদ বাহিনীকে অক্ষত অবস্থায় সিরিয়ার সীমান্তে পৌছিয়ে মদিনা হতে সাহায্য আসার অপেক্ষা করতে লাগলেন। খলিফা এটা জানতে পেরে তাঁদের সাহায্যার্থে বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে শোরাহবীল ইবনে হাসানাহ মালে গনিমত এবং যুদ্ধবন্দি নিয়ে মদিনায় এসে পৌছলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সংগৃহীত সৈন্যদেরকে চারভাগে বিভক্ত করলেন। প্রথম দলের নেতৃত্ব আমর ইবনে আসকে দান করে তাঁকে সিরিয়ার দক্ষিণে প্যালেস্টাইনের দিকে পাঠালেন। দ্বিতীয় দলের সেনাপতিত্ব শোরাহবীল ইবনে হাসানের হাতে সোপর্দ করে তাঁকে তবরিয়া উপসাগরের অন্যতম শাখা জর্দান নদীর উপকূলস্থ জর্দান নগর অভিমুখে পাঠালেন। তৃতীয় দলটির ওপর ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ানকে সেনাপতি করে আমির মুআবিয়াকে সাথে দিয়ে দামেস্কের দিকে পাঠালেন। আর চতুর্থ দলটিকে আমীনুল উম্মত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহর নেতৃত্বে 'হেমস' অভিমুখে পাঠালেন। চারজন সেনাপতিই নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানের দিকে যাত্রা করলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও তাঁদের সাথে সাথে পায়ে হেঁটে বহুদূর পর্যন্ত চলতে চলতে তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলজনক উপদেশ দিতে থাকলেন-

"স্মরণ রেখো, যে নিজ কর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সজাগ থাকে আল্লাহ তাকে উক্ত কাজে সফলতা দান করেন। আল্লাহকে খুশি করার জন্যে যে ব্যক্তি কাজ করে, সে কাজের যিম্মাদারী আল্লাহ নিজের হাতে গ্রহণ করেন। আপ্রাণ চেষ্টা ব্যতীত কোনো কাজে সফলতা লাভ করা যায় না। বেঈমান ব্যক্তি মুসলমান নয়। কাজের প্রারম্ভে সওয়াবের নিয়ত না থাকলে তাতে কোনো সওয়াব পাওয়া যায় না এবং তা নেক কাজ বলেও গণ্য হয় না। কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা মুজাহিদগণের জন্যে অশেষ সওয়াবের খোশখবর দান করেছেন; কিন্তু কেউ

---

[১৮৩] তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, খ.২, পৃ. ৫৮৯

নিজেকে একা সেই সওয়াবের অধিকারী বলে মনে করা উচিত নয়। জেহাদ মুসলমানদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার প্রচলিত একটি অতি লাভজনক ব্যবসা। মুজাহিদগণ ইহলোকে ও পরলোকে অনুশোচনা ও অপমান হতে রক্ষিত থাকেন এবং মহা সম্মানে সম্মানিত হন।"

ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ানের যাত্রাকালে তাঁকে আবু বকর রা. যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা সর্বকালের সকল জাতির সকল নেতাই নিজেদের জন্যে মহামূল্যবান আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পারেন। তিনি বলেছেন-

"নিজের অধীনস্থ সৈন্যদের সাথে সর্বদা সরল ও সদ্ব্যবহার করবে, তাদেরকে প্রত্যেক উপদেশ সংক্ষিপ্ত বাক্যে প্রদান করবে। উপদেশ দীর্ঘ হলে অনেক কথা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কোনো বিষয়ে অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে সে বিষয়ে নিজেকে সংশোধন করে নিবে। শত্রু পক্ষের দূতকে সম্মান করবে। তাকে বেশিক্ষণ বিলম্ব করার সুযোগ না দিয়ে সসম্মানে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিবে, সে যেন তোমাদের যুদ্ধপ্রস্তুতি এবং গোপনীয় বিষয়ের কিছুই জানতে না পারে সে সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করবে। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নিজে সত্য কথা বললে অপরের কাছ থেকে সৎ পরামর্শ পাবে। তোমার বাহিনীর মধ্যে রাতে তুমি সজাগ অবস্থায় থাকবে, তা হলে সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান রাখতে পারবে। রাতে সৈন্যদের শিবিরে পালাক্রমে প্রহরার ব্যবস্থা রাখবে। শাস্তির উপযুক্ত ব্যক্তিকে সমুচিত শাস্তি দিতে ত্রুটি করবে না। হিতকামীদের সাথে সর্বদা মেলামেশা রাখবে, সাহসিকতার সাথে জয়ের দৃঢ় আশা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করবে। কখনও কাপুরুষতা দেখাবে না।"

এ চারটি বাহিনীকে প্রেরণ করে আবু বকর রা. কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হলেন। কেননা, এদের মধ্যে এক হাজারেরও অধিক মুহাজের এবং আনসার সাহাবি রয়েছেন, যাঁরা নবী করীম সা.-এর সাথে থেকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। তাঁদের জন্যে রাসূল সা. আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করেছেন, ইয়া আল্লাহ! আজ আপনি এ সামান্য কয়েকজন মুসলমানকে যদি এখানে ধ্বংস করে ফেলেন, তবে কিয়ামত পর্যন্ত আর কেউ আপনার ইবাদত-বন্দেগি করবে না। এমনকি আপনার নামও নিবে না। আর এই মুহাজের ও আনসারদের সাহায্যার্থেই আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে ফেরেশতা বাহিনী নাযিল করেছিলেন। এদের সম্বন্ধেই আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে বলেছেন-

"বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল আল্লাহ তা'আলার আদেশে বহু বিরাট বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করে দিয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা সফরকারীদের সাথেই রয়েছেন।"

এ সমস্ত বিষয় চিন্তা করে আবু বকর রা. মুজাহিদ বাহিনীর বিজয় সম্বন্ধে খুবই আশান্বিত হলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে হাওয়ালাহ এবং আরও কতিপয় সাহাবি খলিফার দরবারে আরয করেছিলেন, "অভাব-অভিযোগ এবং দারিদ্র্য আমাদের জন্যে অস্থিরতার কারণ

হয়ে দাঁড়িয়েছে।" এর উত্তরে খলিফা বলেছিলেন, তোমাদের বর্তমান দুরবস্থা এবং অভাব-অভিযোগের তত চিন্তা করে না, তোমাদের ভবিষ্যতের সচ্ছল অবস্থার জন্যে যত অধিক চিন্তিত আছি। আল্লাহর শপথ! যেই পর্যন্ত রোমী, হেমইয়ারী এবং ইরানিদের রাজ্য মুসলমানদের করতলগত না হয়, আর এই দেশত্রয়ে মুসলমানদের তিনটি বিরাটকায় সেনানিবাস নির্মিত না হয় এবং মুসলমানদের প্রত্যেকের অবস্থা এত সচ্ছল না হয় যে, এক একজন লোক একশত দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) পেয়েও সন্তুষ্ট হবে না, সেই পর্যন্ত ইসলাম নিঃসন্দেহে কায়েম থাকবে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক সিরিয়া অভিযানের সাহায্যার্থে প্রেরিত এই চারটি বাহিনী সিরিয়ায় পৌঁছে আমর ইবনে আ'স ফিলিস্তিনের 'আরবা' নামক স্থানে গিয়ে শিবির স্থাপন করলেন। শোরাহবীল ইবনে হাসানা জর্দানে অবস্থান করতে লাগলেন। ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান বলকায় এবং আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু জাবিয়াহ্ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুজাহিদ বাহিনীগুলোর আগমন-সংবাদ পেয়ে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নেওয়াই ভালো হবে বলে মনে করি। আল্লাহর শপথ! তোমরা সিরিয়া প্রদেশের আয়ের অর্ধাংশ মুসলমানদেরকে দিয়েও যদি তাদের আক্রমণ হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পার, তবু সিরিয়ার অর্ধেকসহ গোটা রোম সাম্রাজ্য তোমাদের হাতে থেকে যাবে। গোটা সিরিয়া প্রদেশ হস্তচ্যুত হওয়ার চেয়ে এটা উত্তম নয় কি? কিন্তু কেউ তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলো না। অগত্যা কায়সরে রোম হিরাক্লিয়াস রোম হতে হেমসে গিয়ে অবস্থান করলেন। এ শহরটি সিরিয়ার অন্তর্গত হাসী নদীর তীরে অবস্থিত অতি মনোরম শহর। কায়সর এখানে এসে সৈন্য সমাবেশের নির্দেশ প্রদান করলেন। সাথে সাথে রোম থেকে এক বিরাট সেনাবাহিনী এসে সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে গেল। পরাজিত করা সহজ হবে মনে করে রোমকগণ বিভিন্ন অবস্থানে পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন বাহিনীর ওপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল; কিন্তু এর পূর্বেই যখন মুসলিম সেনাবাহিনী আমর ইবনে আসের পরামর্শে একস্থানে সমবেত হতে লাগল, তখন রোমকদের বিজয় লাভের স্বপ্ন ছুটে গেল। মুজাহিদ বাহিনীর পৃথক পৃথক নেতাগণ প্রথমে আমর ইবনে আসের পরামর্শ মানতে ইতস্তত করে খলিফার কাছে নির্দেশ চাইলেন। খলিফা আমর ইবনে আসের সিদ্ধান্তকে পছন্দ করে লিখে পাঠালেন যে, "রোমকরা সংখ্যা অধিক হতে পারে বটে; কিন্তু তোমাদের ন্যায় পূত-পবিত্র, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং আল্লাহর দীনের সহায়ক তাদের দলে একটিও নেই। তারা সংখ্যায় যত অধিকই হউক না কেন, তাদের সকলেই পাপের পরিপূর্ণ। তবে তোমরা পরহেযগারী অবলম্বন করে পাপ হতে আত্মরক্ষা করে চলবে; ইনশাআল্লাহ আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং অনিবার্যরূপে যুদ্ধে জয়লাভ করবে।"

ইয়ারমুকের যুদ্ধ

মুজাহিদ বাহিনীগুলো ইয়ারমুক নামক ময়দানে এসে সমবেত হলো। এ ময়দানটি সিরিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। রোমক বাহিনী মুজাহিদ বাহিনীগুলোকে একত্রিত হতে দেখে পূর্বাহ্নেই এ ময়দানে এসে শিবির স্থাপন করেছিল। তাদের ডানে, বামে ছিল পর্বতের সারি আর পিছনের দিকে ছিল একটি মরু গিরিপথের প্রান্তভাগে একটি অতল গহ্বর। সুতরাং শিবিরের স্থান নির্ণয়ে তারা যথেষ্ট ভুল করে ফেলল। মুজাহিদ বাহিনীগুলো চতুর্দিক মুক্ত উক্ত ময়দানের সম্মুখের দিকে শত্রুদের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়ে শিবির স্থাপন করল।

মুজাহিদ বাহিনীর সম্মুখের দিকে একটু অসুবিধাও ছিল। কেননা, উভয় দলের মধ্যস্থলে একটি পরিখার মতো ছিল। রোমানরা মুজাহিদ বাহিনীর ওপর ছিটাফোঁটা আক্রমণ চালিয়ে আবার পরিখার অপর পারে চলে যেত। মুজাহিদগণ প্রতি-আক্রমণের সুযোগ করে উঠতে পারতেন না। এভাবে ১২ হিজরির সফর, রবিউল আউয়াল ও রবিউস সানীর কিছু অংশ পার হয়ে গেল। জয়-পরাজয়ের কোনো মীমাংসা হলো না। আবু বকরের রাদিয়াল্লাহু আনহু কাছে সাহায্যের আবেদন করা হলো। তিনি ইরাকের যুদ্ধক্ষেত্রে খালিদ ইবনে ওলিদকে লিখলেন, আপনি সেখানকার নেতৃত্ব মুসান্নার হাতে সোপর্দ করে নিজের বাহিনীর অর্ধেক সৈন্য নিয়ে সিরিয়া চলে যান।[১৮৪]

খালিদ ইরাকের মুজাহিদ বাহিনী থেকে বেছে বেছে শুধু অর্ধেক সাহাবি সৈন্য নিয়ে সিরিয়া যাত্রা করলেন। তিনি খুব দ্রুত ভ্রমণ করে রবিউসসানী মাসের মধ্যেই সিরিয়ার মুজাহিদ বাহিনীর সাথে মিলিত হলেন।

খালিদ দেখলেন যে, মুজাহিদ বাহিনীগুলোর নেতৃবৃন্দ কেউ অপর কোনো নেতার অধীনতা স্বীকার করতে সম্মত নয়। প্রত্যেকেই নিজের বাহিনী নিয়ে পৃথকভাবে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন। রণকৌশলী খালিদ দেখলেন যে, শত্রুরা সংখ্যায় মুজাহিদগণের চেয়ে বহুগুণে অধিক। কেননা, তাদের সংখ্যা ছিল দুই লাখেরও অধিক আর মুজাহিদগণের সংখ্যা ছিল সর্বমোট মাত্র চল্লিশ হাজারের মতো। এ অবস্থায় পৃথক পৃথকভাবে আক্রমণ করলে শত্রুর দল মুজাহিদ বাহিনীগুলোর ভিতরে প্রবেশ করে এক দলকে অন্য দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এবং চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে নিঃশেষ করে দেওয়ার সুযোগ পাবে। অতএব, তিনি সেনাপতিগণকে একত্রিত করে পরামর্শ দিলেন :

অদ্যকার দিনটি আল্লাহ তা'আলার দিনসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। আজ একে অন্যের অবাধ্য হওয়ার দিনও নয়, নেতৃত্বের গর্বে গর্বিত হওয়ার দিনও নয়। প্রত্যেক মুজাহিদেরই উচিত একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার জন্যে খাঁটি

---

[১৮৪] ওয়াকিদী, ফুতূহুশ শাম, খ.১, পৃ. ১৫

নিয়তে জেহাদ করা। স্মরণ রাখতে হবে যে, আজকের দিনটি এত কঠিন দিন যে, এর পরে এত কঠিন দিন আর আসবে না। আর আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিতেছি, এরূপভাবে পৃথক পৃথক থেকে তোমরা কোনোদিন কোনো শত্রু বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করো না। এটা জায়েযও নয়, সঙ্গতও নয়। কেননা, তোমাদের এই পার্থক্যের কথা শত্রুপক্ষ জানতে পারলে তোমাদের ভেতরে প্রবেশ করে প্রত্যেকটি দলকে পৃথক পৃথকভাবে বেষ্টন করে ফেলবে। খলিফা তোমাদেরকে একত্রিত হয়ে এক নায়কের অধীনে থেকে যুদ্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা সেই নির্দেশের বিরোধিতা করো না।[১৮৫]

সেনাপতিগণ সমবেত কণ্ঠে খালিদকে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন! আপনার কি মত? তিনি পরামর্শ দিলেন, শুধু একজন নেতা হবেন। আর অবশিষ্ট সকল নেতাগণ তাঁর নির্দেশ মেনে চলবেন। সেই প্রধান সেনাপতির সেনাপতিত্ব শুধু আজকের জন্যেই থাকবে। একথার ওপর আজকের যুদ্ধের জন্যে সকলে খালিদকে প্রধান সেনাপতি মেনে নিলেন।

খালিদ মুজাহিদগণকে বৃত্তাকারে সাজিয়ে শত্রুবাহিনীর দিকে অগ্রসর হলেন। বৃত্তাকারে যুদ্ধ করতে আরবগণ অভ্যস্ত ছিলেন না; কিন্তু খালিদের যুক্তি শুনে সকলেই এর সুবিধা বুঝতে পারলেন এবং সেভাবে প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

একটি হলকা প্রস্তুত করলেন কেন্দ্রস্থলের জন্যে, আর একটি ডান দিকের ও একটি বাম দিকের জন্যে। আবু ওবায়দা কেন্দ্রীয় হলকার, সোরাহবীল ও ইয়াযীদ ডান দিকের হলকার এবং আমর ইবনে আস বাম দিকের হলকার পরিচালক নিয়োজিত হলেন। প্রত্যেক হলকার মধ্যেই কিছুসংখ্যক প্রখ্যাত বীর মুজাহিদ রাখলেন।

অতঃপর কা'কা' ইবনে আমর এবং ইকরামা ইবনে আবু জাহলকে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে বীর মুজাহিদগণ কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে রোমীয়গণ টিকে থাকতে না পেরে পিছু হটতে আরম্ভ করল। ইতোমধ্যে রোমীয়দের একটি দলের সেনাপতি জর্জিয়া খালিদের সাথে গোপন আলাপে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তার নিজস্ব বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে গেলেন। জর্জিয়ার ইসলাম গ্রহণে রোমীয়গণ হতাশ হয়ে পড়ল।[১৮৬]

রোমক বাহিনীকে পিছনে হটতে দেখে খালিদ তাঁর বাহিনীকেও সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন। ইকরামার বাহিনীর চাপ সহ্য করতে না পেরে রোমকরা পশ্চাদপসরণ করতে আরম্ভ করল। এখন খালিদের বাহিনীর আক্রমণে পরাজয় এবং মৃত্যুর ছায়া তাদের চোখের সামনে ভাসতে লাগল। পলায়নের পথ তাদের জন্যে আগে হতেই রুদ্ধ ছিল। তাদের পেছনের

---

[১৮৫] তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক, খ.২, পৃ. ২০৫

[১৮৬] ইবনে কাছীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ৭, পৃ. ১৬

দিকে অতলস্পর্শী গিরিগহ্বর। সম্মুখের দিক হতে মুজাহিদ বাহিনী তাদেরকে কচুগাছের ন্যায় কুচি কুচি করে কেটে আসছিলেন। সকলের আগে আগে উন্মুক্ত তরবারি হাতে ছিলেন খালিদ।

ইয়ারমুক যুদ্ধে মুসলিম মহিলাগণও খুব সাহসিকতা এবং তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরা পুরুষদের পাশে থেকে পুরুষদের ন্যায় তরবারি চালাচ্ছিলেন।

রোমকরাও দেশের স্বাধীনতা এবং নিজেদের জান, মাল ও মান ইজ্জত রক্ষার্থে প্রাণপণে যুদ্ধ করছিল। কোনো মুজাহিদ একান্ত মৃত্যুর টানে তাদের সামনে এসে পড়লে তারা তাকে হত্যা করে ফেলত। আজই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটাবার উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষই প্রাণ হাতে রেখে যুদ্ধ করছিলেন। সূর্য অস্তমিত হলো; কিন্তু জয়-পরাজয়ের কোনো মীমাংসা হলো না। সূর্যাস্তের পর রোমকদের মধ্যে পরাজয়ের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠল। তারা ক্রমশ ক্লান্ত ও নিরাশ হয়ে পড়তে লাগল; কিন্তু পলায়ন করার চেষ্টা করেও পালানোর সুযোগ দিলে মুজাহিদগণের বলবিক্রম দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে, শত্রুদের অবশিষ্ট সৈন্যগণ একেবারে হতাশ হয়ে পড়বে। সুতরাং তিনি তাঁদের বাহিনীকে এক পাশে সরিয়ে রোমানদের জন্যে পলায়নের রাস্তা করে দিতে আদেশ করলেন। রাস্তা খোলাসা হয়েছে দেখতে পেয়ে রোমান বাহিনীর অশ্বারোহিগণ ঘোড়া ছুটিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করল। ময়দান এখন অশ্বারোহী শূন্য। খালিদ এ সুযোগে তাঁর পদাতিক বাহিনীকে গোটা শত্রু বাহিনীর ওপর মহাবিক্রমের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে আদেশ দিলেন। আদেশ পাওয়ামাত্র মুজাহিদ বাহিনী ক্ষুধার্ত বাঘের ন্যায় রোমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং অকাতরে তাদেরকে নিহত করে চলল। রোমকদের পালানোর আর কোনো পথ নেই। কাজেই তারা বীর মুজাহিদগণের তরবারি ও বর্শার আঘাত সহ্য করতে না পেরে পেছনের গহ্বরে গিয়ে পতিত হতে লাগল এবং স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগল। ওদিকে তাদের একটি বাহিনী, যাতে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করতে না পারে; বরং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়, নিজেদের পায়ে বেড়ি লাগিয়ে নিয়েছিল। এ বাহিনীটি সমূলে ধ্বংস হলো। ঐতিহাসিকগণের মতে ইয়ারমুকের যুদ্ধে শত্রুপক্ষে নিহতের সংখ্যা এক লাখ বিশ হাজার। হিরাক্লিয়াসের ভাই থিওডর এবং আরও বহু সেনানায়ক ইয়ারমুকের ময়দানে নিহত হয়।

যে ময়দানে আজ সকালে দুই লক্ষাধিক রোমক শত্রুসৈন্যে পরিপূর্ণ ছিল, চব্বিশ ঘণ্টা শেষ না হতেই তা সম্পূর্ণরূপে শত্রুশূন্য। এটা দেখে আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতায় খালিদ (রাঃ)-এর দুই চোখে অশ্রু প্লাবিত হয়ে উঠল। তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করতে লাগলেন।

এ যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনীর শহিদগণের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন তিন হাজার আবার কেউ কেউ বলেছেন বারো হাজার। এদের মধ্যে মুহাজির ও আনসার শ্রেণির প্রধান প্রধান সাহাবায়ে কেরাম

এবং বহু বীর মুজাহিদও ছিলেন। যুদ্ধ শেষে খালিদ ﷺ ইকরামা ও তাঁর পুত্র আমরকে আহত দেহে অন্তিম অবস্থায় পেয়ে তিনি নিজ জানুর ওপর তাঁদের মাথা রেখে নিজের হাতে তাঁদের মুখের ধূলিবালি মুছে তাঁদেরকে পানি পান করালেন এবং সাথে সাথে তাঁরা শহীদ হয়ে গেলেন।[১৮৭]

বুসরা বিজয়

মুজাহিদগণ অতঃপর বুসরা হয়ে দামেশকের দিকে যাত্রা করলেন। বুসরার গভর্নর 'রুমানুস' মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁর সম্প্রদায়কে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন; কিন্তু সেনানায়ক ও রাজ্যের প্রধানগণ তাঁর পরামর্শ না মেনে তাঁকে বন্দি করে রাখল এবং তাঁর স্থলে অন্য শাসনকর্তা নির্বাচন করে নিল। এ নবনির্বাচিত শাসনকর্তা ছিল অত্যন্ত তেজস্বী। সে নিজেই অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দুর্গের বাইরে এসে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসল; কিন্তু আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রোমক সৈন্যদের মধ্যে সসৈন্যে ঢুকে পড়লেন এবং তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগল। অপরদিকে খালিদ ইবনে ওলিদ নিজের বাহিনী নিয়ে রোমীয়দেরকে অকাতরে নিহত করতে লাগলেন। এই বিপদসঙ্কুল অবস্থা দেখে বুসরা নগরীতে কান্নার রোল পড়ে গেল। গির্জাসমূহে ঘণ্টা ধ্বনি করে লোক সংগ্রহপূর্বক প্রার্থনা করা হতে লাগল। ঘরে ঘরে স্ত্রীলোক, শিশু এবং বৃদ্ধেরা রোদন জুড়ে দিল। রোমক সৈন্যগণ মুজাহিদগণের সম্মুখে টিকতে না পেরে পলায়ন আরম্ভ করল। বিশৃঙ্খলভাবে পলায়নরত অবস্থায় দলে দলে নিহত হতে লাগল। অবশিষ্ট যারা ছিল পুনরায় দৌড়িয়ে দুর্গে প্রবেশ করে দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিল।

মুসলমানগণ বাইরের দিক হতে দুর্গ তোরণের ওপর ইসলামি ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিলেন এবং দুর্গের পাদদেশে একটি মুজাহিদ বাহিনী মোতায়েন করে দিলেন। রুমানুসকে রোমকগণ দুর্গের প্রাচীর সংলগ্ন একটি কামরায় আবদ্ধ করে রেখেছিল। তিনি রাতে দুর্গপ্রাচীরে একটি ছিদ্র করে উক্ত ছিদ্রপথে খালিদের শিবিরে পৌঁছলেন এবং বললেন, আমার সাথে কিছুসংখ্যক বীর মুজাহিদকে যেতে দিন। তাঁরা আমার সাথে ছিদ্রপথে দুর্গে প্রবেশ করে দুর্গের দরজা খুলে দিতে পারবেন। সেনাপতির অনুমতিক্রমে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ﷺ বীর মুজাহিদগণের একটি ক্ষুদ্র বাহিনীসহ রুমানুসের সাথে দুর্গে প্রবেশ করে তকবির ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে দুর্গের দরজা খুলে দিলেন। সাথে সাথে মুজাহিদগণ বন্যার স্রোতের ন্যায় দুর্গে প্রবেশ করলেন। দুর্গবাসিগণ ভয়ে আত্মসমর্পণ করল। রুমানুস স্বেচ্ছায়

---

[১৮৭] ইবনে কাছীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ৭, পৃ. ১৫

ইসলাম গ্রহণ করলেন। খালিদ ইবনে ওলিদ বুসরা শহর মুসলমানদের হাতে সোপর্দ করলেন। সমগ্র বুসরা মুসলমানদের অধিকারে এসে গেল।

খালিদ ইবনে ওলিদ রোমকদের সাথে অতিশয় নম্র ও সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি কাউকেও হত্যা করলেন না, সকলকেই ক্ষমা করে দিলেন। মুসলিম সেনাপতির এই নম্র ও সদ্ব্যবহার রোমকদেরকে আকৃষ্ট করে ফেলল। তাদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করল। খালিদ রুমানুসকে তাঁর মর্যাদার প্রেক্ষিতে অর্থ দফতরের সর্বোচ্চ কর্মচারীরূপে নিযুক্ত করলেন।[১৮৮]

চিত্র : রোমান সাম্রাজ্যের রাজপ্রাসাদ

দামেশক অভিযান

বুসরা বিজয়ের পর খালিদ ইবনে ওলিদ চল্লিশ হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী নিয়ে দামেশকের দিকে অগ্রসর হলেন। দামেশক অঞ্চলটি অত্যন্ত উর্বরা তথা সুজলা-সুফলা ও শস্য-শ্যামলা ছিল। এমন বৃক্ষলতায় সুশোভিত, নানা জাতীয় উদ্ভিদে পরিপূর্ণ সবুজ ভূমিতে মুজাহিদগণের এই প্রথম পদক্ষেপ। তাঁরা দামেশকের দিকে অগ্রসর হতেই দেখতে পেলেন যে, দুইজন রোমীয় সেনানায়ক দুইটি বিরাট বাহিনী নিয়ে তাঁদেরকে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। বীর মুজাহিদগণ মৃত্যুকে উপেক্ষা করে শহীদ বা গাজী হওয়ার লোভে এমন প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন যে, খ্রিস্টানগণ সেই

[১৮৮] আবদুল হালিম, সিদ্দীকে আকবর আবু বকর (রা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

আক্রমণের তীব্রতায় যুদ্ধক্ষেত্রে টিকতে পারল না। ইযরাঈল এবং কায়কূস নামক উভয় সেনাপতিকে বন্দি করা হলো। রোমীয় সৈন্যদের অধিকাংশ নিহত হলো এবং অবশিষ্ট সকলেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করল। খালিদ উভয় সেনাপতিকে ইসলাম গ্রহণ করতে বললেন। তারা এতে অসম্মতি জ্ঞাপন করামাত্র তাদের হত্যা করা হলো। মুসলিম সেনাপতি নির্দেশ প্রদান করলেন, এদের উভয়ের মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে শহরপ্রাচীরের উপরে ঝুলিয়ে দাও।" আদেশ পাওয়ামাত্র তা কার্যকরী করা হলো। অতঃপর ইসলামি ফৌজ শহরটিকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করে ফেলল।
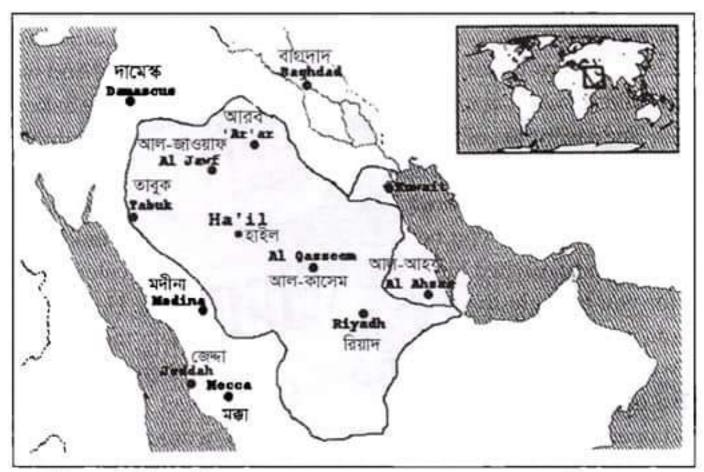
মুজাহিদ বাহিনী কর্তৃক দামেশক শহর অবরুদ্ধ হওয়ায় রোমীয়গণ অত্যন্ত ঘাবড়িয়ে গেল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকা, রসদপত্রের অভাব এবং বহু পরিমাণে রোমান সৈন্য নিহত হওয়ার কারণে তারা নিজেদের মৃত্যু সুনিশ্চিত মনে করতে লাগল। কতিপয় খ্রিস্টান দুর্গপ্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে খালিদের কাছে এ প্রস্তাব পেশ করল যে, "আমরা আপনাকে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণমুদ্রা এবং রেশমি বস্ত্রের থান উপহার দিব, আপনি আমাদের ওপর হতে অবরোধ উঠিয়ে নিন।" খালিদ বললেন, "মুজাহিদগণকে টাকার বিনিময়ে খরিদ করা যায় না। তোমাদের কাছে আমাদের একটিমাত্র কথা– ইসলাম কবুল কর নতুবা জিযিয়া কর প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হও।" খ্রিস্টানগণ নীরব হয়ে গেল; কিন্তু আর ধৈর্য ধরে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারা তখন মৃত্যু ভিন্ন কোনোকিছুই কল্পনা করতে পারছিল না। ঠিক সেই সময় সম্রাট হিরাক্লিয়াস খ্রিস্টানদের উপর্যুপরি পরাজয় এবং দামেশক দুর্গে তাদের অস্থিরতা দেখে হেমসের গভর্নরের অধীনে

একলাখ রোমীয় সৈন্যের একটি বাহিনী পাঠিয়ে দামেশকের খ্রিস্টানদেরকে উদ্ধার করার জন্যে দামেশকের দিকে রওয়ানা করে দিলেন। খালিদ এ সংবাদ পাওয়ামাত্র যেরার ইবনে আযওয়ার রাঃ-কে একটি ক্ষুদ্র বাহিনীর অধিনায়ক করে রোমকদের এই বিরাট বাহিনীকে পথিমধ্যে কিছু সময়ের জন্যে বাধা দিয়ে রাখার চেষ্টা করার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে খালিদ তাদের বিরুদ্ধে দস্তুরমতো যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন। যেরার ইবনে আযওয়ার অতিশয় তেজস্বী এবং অত্যন্ত সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি নিজের এক হাজার মুজাহিদসহ সামনের দিকে অগ্রসর হলেন; কিন্তু তিনি যুদ্ধের উন্মাদনায় এত উন্মত্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, সাময়িকভাবে বাধা প্রদান করতে গিয়ে তিনি রোমকদের সাথে রীতিমতো যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে রোমক বাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন। যেরার রাঃ সামান্য কয়েকজন বীর মুজাহিদ নিয়ে প্রবল বিক্রমের সাথে যুদ্ধ করতে করতে রোমীয় সৈন্যদের পতাকাবাহীর কাছে পৌছে তার হাত থেকে ক্রসচিহ্নিত পতাকা ছিনিয়ে নিলেন। এতে খ্রিস্টানগণ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ল এবং এমনভাবে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যে, মুজাহিদগণ অসাধারণ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেও রোমকদের সম্মুখে টিকতে পারলেন না। যেরারের বর্শা ভেঙে গেল। খ্রিস্টানরা সাথে সাথে তাঁকে বন্দি করে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় হেমসে পাঠানোর ব্যবস্থা করল। মুজাহিদগণ তখন রোমান বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত, যেরারের সাথি রাফে' যেরারের বন্দিদশা বরদাশত করতে পারলেন না, তিনি মুষ্টিমেয় মুজাহিদগণকে নিয়ে পুনরায় ক্ষিপ্ত বাঘের ন্যায় রোমকদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং অকাতরে রোমীয়দেরকে কেটে চললেন। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে খালিদও বহুসংখ্যক মুজাহিদসহ এসে রোমীয়দের ওপর আক্রমণ করলেন। খালিদের বিশ সহস্র সঙ্গী মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা বদলিয়ে দিলেন। এখন খ্রিস্টান সৈন্যগণ মুসলমানদের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। এ সময় রাফে' অগ্রসর হয়ে যেরারকে মুক্ত করে নিলেন। খালিদ, রাফে' এবং যেরার একত্রিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা সম্বন্ধে ক্ষণিকের জন্যে চিন্তা করে তিন সেনাপতি তিন দিক হতে রোমীয় বাহিনীর ওপর প্রবল বেগে আক্রমণ চালালেন। রোমীয় বাহিনীর অধিনায়ক ওয়ার্দান মুজাহিদগণের তীব্র আক্রমণ সহ্য করতে অক্ষম হয়ে পালিয়ে গেল। রোমক বাহিনীর ন্যূনাধিক পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিহত হলো। অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করল, যুদ্ধক্ষেত্র এখন পরিষ্কার। খালিদ ইবনে ওলিদ অসংখ্য যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং গনিমতের মাল নিয়ে দামেশক অবরোধকারীদের কাছে ফিরে আসলেন।

পরাজিত ও পলাতক ওয়ার্দন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পৌছলে খ্রিস্টান বাহিনীর পরাজয় সংবাদে সম্রাট অতিশয় চিন্তান্বিত হলেন। কিন্তু তিনি সাহস হারালেন না,

পুনরায় সেই ওয়ার্দানেরই অধীনে সত্তর হাজার সৈন্যের একটি নতুন বাহিনী দামেশকের দিকে পাঠালেন।

রোমকদের এ নতুন বাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়ে খালিদ ইবনে ওলিদ এবং আবু ওবায়দা পরামর্শ করলেন যে, এই অল্পসংখ্যক মুসলমানগণের দ্বারা যুগপৎ নতুন সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করা এবং দামেশক অবরোধ করে রাখা সম্ভব হবে না। সুতরাং তাঁরা আপাতত অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে নবাগত খ্রিস্টান বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। অবরোধ উঠিয়ে নেওয়ার সাথে সাথেই খ্রিস্টান সৈন্যদের ওপর আক্রমণ করে বসলেন।

এদিকে দুর্গবাসীরা এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে দুর্গ থেকে বের হয়ে আসল এবং মুসলিম শিবিরের অবশিষ্ট মুজাহিদগণকে হত্যা করতে আরম্ভ করল, সমস্ত রসদ আসবাবপত্র লুণ্ঠন করতে লাগল। মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দি করে দুর্গের ভিতরে নিয়ে গেল। বন্দিনী মহিলাদের মধ্যে যেরারের বোন বীরাঙ্গনা খাওলা বিনতে আযওয়ারও ছিলেন। ইনিও ভাই যেরারের মতো তেজস্বিনী এবং অসাধারণ সাহসী ছিলেন। তিনি সাথের বন্দিনী মহিলাদেরকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, "ভগ্নিগণ! খ্রিস্টান পাপিষ্ঠদের হাতে মান ইজ্জত নষ্ট করার চেয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যাওয়াই আমাদের জন্যে উত্তম।"[১৮৯] খাওলার এই কথায় বন্দিনী মুসলিম মহিলাগণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং ইট, পাথর, লাঠি ও লাকড়ি যিনি যা সম্মুখে পেলেন হাতে নিয়ে রোমকদের ওপর প্রবলবেগে আক্রমণ করলেন। জনৈক রোমীয় সরদার রণরঙ্গিনী মহিলাগণকে তরবারির আঘাতে শিরশ্ছেদ করে ফেলার আদেশ দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে আবদুর রহমান এবং রাফে' একদল সৈন্য নিয়ে দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করলে এতে বন্দিনী মহিলাগণের সাহস ও বিক্রম দ্বিগুণ বেড়ে গেল। মুজাহিদ মহিলা ও পুরুষদের যৌথ আক্রমণের প্রচণ্ড চাপে খ্রিস্টানগণ দুর্গ ছেড়ে বের হতে বাধ্য হলো। আর যায় কোথায়? মুজাহিদগণ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে অকাতরে হত্যা করতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ছয় হাজার খ্রিস্টান নিহত হলো। অবশিষ্ট খ্রিস্টানগণ পুনরায় দুর্গে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিল। মুসলমানগণ পুনরায় দুর্গদ্বারে প্রহরী সৈন্য মোতায়েন করে রাখলেন।

আজনাদাইনের যুদ্ধ

আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু জাবিয়ায়, সুরাহবিল ইবনে হাসানা রাদিয়াল্লাহু আনহু বসরায় এবং আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরবায় তাঁদের সৈন্যবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন। আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন এ অভিযানের সর্বাধিনায়ক। খলিফা পরে হিরা থেকে মহাবীর খালিদ

---

[১৮৯] ওয়াকিদী, ফুতূহুশ শাম, খ.১, পৃ. ৪৭-৪৮

বিন ওয়ালিদকেও মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগদানের নির্দেশ দেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ভাই থিওডোরাসের নেতৃত্বে ২,৪০,০০০ সৈন্যের এক শক্তিশালী বাহিনী গঠন করা হয়। এ বিশাল সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলায় মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। আজনাদাইনের প্রান্তরে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে মুসলিম বাহিনীর কাছে থিওডোরাস পরাজিত হয়। সম্রাট হিরাক্লিয়াস এন্টিয়াকে পলায়ন করেন। ১৩ হিজরী ১৮ জুমাদাল উলা সোমবার, মতান্তরে জুমাদিউস ছানী মাসের ২৮ তারিখ এ যুদ্ধ সংঘঠিত হয়।[১৯০]

দামেশক বিজয়

মুজাহিদ বাহিনী আজনাদাইনে রোমীয় বাহিনীকে পরাজিত করে প্রচুর গনিমতের মাল ও তাদের পরিত্যক্ত যুদ্ধসরঞ্জামসহ দামেশকে ফিরে আসলেন। যেহেতু এ সময়ে নূতন করে বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। সুতরাং মুজাহিদীন দুর্গে ফিরে আসার সাথে সাথে তারা দুর্গ-প্রাচীরের ওপর হতে মেশিনের সাহায্যে তাঁদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল এবং পরক্ষণেই উত্তেজিত হয়ে হিরাক্লিয়াসের জামাতা টমাস এক বিরাট বাহিনীসহ দুর্গের দরজা খুলে ময়দানে নেমে পড়ল। এটাই ছিল দামেশকের ভাগ্য নির্ণয়ে সর্বশেষ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। চতুর্দিকে নিহত সৈন্যদের লাশের স্তূপ জমে গেল। টমাসের এক তীরের আঘাতে আব্বান ইবনে যায়েদ শহীদ হয়ে গেলেন। আব্বানের স্ত্রী কাছেই ছিলেন। টমাসের তীরের আঘাতে তাঁর স্বামীকে শাহাদত বরণ করতে দেখে তিনি টমাসের প্রতি এক তীর নিক্ষেপ করলেন, এটা টমাসের চোখে আঘাত করতেই টমাস দুর্গের দিকে পালিয়ে গেল। সাথে সাথে তার অবশিষ্ট সৈন্যগণও রণে ভঙ্গ দিয়ে দুর্গে আশ্রয় নিল। অতঃপর তারা সুযোগমতো দুর্গ হতে বাইরে এসে কিংবা দুর্গ প্রাচীরের উপর হতে মুজাহিদ বাহিনীর প্রতি তীর ছুঁড়তে থাকল। দুই মাস পর্যন্ত এভাবে যুদ্ধ চলল। এরপর রোমক বাহিনীর সাহস ও বলবিক্রম লোপ পেল। সুতরাং তারা সন্ধির চেষ্টা করতে লাগল। প্রথমে তারা খালিদ ইবনে ওলিদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাল। সেখান থেকে নেতিবাচক উত্তর পেয়ে অবশেষে তারা আবু ওবায়দার শরণাপন্ন হলো। কোমলহৃদয় আবু ওবায়দা দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করতে করতে মুজাহিদ বাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে মনে করে সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করে নিলেন। উভয়পক্ষের ক্লান্তির প্রতি লক্ষ করে তিনি এত কোমল হয়ে পড়েছিলেন যে, খালিদ ইবনে ওলিদের সাথে

---

[১৯০] বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ১৩৬

যোগাযোগ না করেই তিনি সন্ধিপত্র লিখে ফেললেন। সন্ধির শর্তাবলি ছিল নিম্নরূপ :

"দামেশক মুসলমানদের অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হলো। উভয় পক্ষ বিরোধিতামূলক যাবতীয় কার্যকলাপ পরিহার করবে। স্বেচ্ছায় যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে মুসলিম জাতির সাথে তার ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যে ইসলাম গ্রহণ করবে না, সে মুসলিম রাষ্ট্রকে জিযিয়া কর প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। যারা দামেশক ত্যাগ করে চলে যেতে চাইবে, তারা নির্বিঘ্নে চলে যেতে পারবে। আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে তাদের অপসারণ কার্য সমাধা করতে হবে। তিন দিনের পর তাদের এই স্বাধীনতা থাকবে না।"

সন্ধিপত্রে উভয় পক্ষের স্বাক্ষর না হতেই আবু ওবায়দা শহর অধিকার করার জন্যে আনন্দিত চিত্তে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

খালিদ ইবনে ওলিদ আবু ওবায়দার এই সন্ধিপত্র সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। তিনি ওদিকে শহর দখল করার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত ছিলেন। ইয়াসূ নামক জনৈক পাদরির সহযোগিতায় কয়েকজন বীর মুজাহিদ এক গুপ্তপথে দুর্গে প্রবেশপূর্বক দুর্গের পূর্ব দিকের দরজা খুলে দিলেন। সাথে সাথে খালিদ ইবনে ওলিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং খ্রিস্টানদের ওপর এমন প্রবল আক্রমণ করলেন যে, খ্রিস্টানগণ দিশেহারা হয়ে ইতস্তত ছুটাছুটি করে মুজাহিদ বাহিনীর হাতে পঙ্গপালের ন্যায় মারা পড়তে লাগল। খালিদ খ্রিস্টানদেরকে অকাতরে হত্যা করতে করতে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন, ধীর ও শান্তভাবে আবু ওবায়দা তরবারি কোষবদ্ধ অবস্থায় সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আর তাঁর চতুর্দিকে খ্রিস্টান রমণী, শিশু ও অক্ষম বৃদ্ধগণ তাঁকে সামনে ঘিরে রয়েছে। তিনি তাদের সাথে সদয় ও নম্র ব্যবহার করছেন। এটা দেখে খালিদ বিস্মিত হয়ে গেলেন।[১৯১]

আবু ওবায়দাও খালিদের রণমূর্তি দেখে কম বিস্মিত হননি। অবশেষে তিনি অগ্রসর হয়ে ক্রোধভরে খালিদের তরবারি ধরে ফেললেন এবং বলতে লাগলেন, হত্যা বন্ধ কর। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ শহর সন্ধির দ্বারা দান করেছেন। যেহেতু সন্ধি সম্বন্ধে খালিদ ইবনে ওলিদ কিছুই জানতেন না, তাই তিনি কিছুক্ষণ পর্যন্ত আবু ওবায়দার সাথে তর্ক-বিতর্ক করলেন। কিন্তু অবশেষে যখন তিনিও দেখলেন যে, আবু ওবায়দা যাকিছু করেছেন ইসলামের মঙ্গলের জন্যই করেছেন, তখন তিনিও সন্ধি মেনে নিলেন। অতঃপর তাঁরা উভয়ে ঘোষণা করে দিলেন যে,

---

[১৯১] ওয়াকিদী, ফুতূহুশ শাম, খ.১, পৃ. ৭৩

"যারা ইসলাম গ্রহণ করতে কিংবা জিযিয়া কর প্রদান করতে সম্মত নয়, তারা তিন দিনের মধ্যে শহর ত্যাগ করে চলে যাবে।"[১৯২] এ ঘোষণার পর টমাস, তার স্ত্রী এবং বহু সেনানায়ক নিজ সৈন্যদের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে দামেশক হতে আনতাকিয়ার দিকে যাত্রা করল। মুসলমানগণ দামেশক শহর সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে নিলেন।

খালিদ ইবনে ওলিদ, রাফে', আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর এবং যেরার এতে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না যে, মুজাহিদগণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করার পরও তাঁদেরই সামনে থেকে খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের এত ক্ষতি করা সত্ত্বেও সশরীরে, নিরাপদে ও অক্ষত অবস্থায় সমস্ত মূল্যবান মালমাত্তাসহ দুর্গ হতে বের হয়ে গেল; কিন্তু তাঁরা আবু ওবায়দার সন্ধি মেনে নিয়েছেন, এখন আরকি করতে পারেন? কিন্তু সন্ধির শর্তানুযায়ী তিন দিন পার হওয়ার পর তাঁরা টমাসের পেছনে ধাওয়া করলেন। সংবাদ পেয়ে টমাস তার পাঁচ সহস্রাধিক সৈন্যসহ ফিরে দাঁড়াল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হলো। মুজাহিদ বাহিনীর প্রবল আক্রমণে খ্রিস্টানগণ পরাজিত হলো। টমাস এবং তার বহু সেনানায়ক নিহত হলো। অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যই প্রাণ নিয়ে পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিল। টমাসের পত্নী সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কন্যা বন্দি হয়ে খালিদের শিবিরে নীত হলো। কিন্তু জনৈক বৃদ্ধ পাদরির অনুরোধক্রমে তাকে মুক্তি দেওয়া হলো।

---

[১৯২] ওয়াকিদী, ফুতূহুশ শাম, খ.১, পৃ. ৭৫

অধ্যায়-৮

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চারিত্রিক মাধুর্য ও মর্যাদা

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জীবন সকল সৎগুণ ও চারিত্রিক মাধুর্যে পরিপূর্ণ ছিল। উম্মতের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার চেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। বলাই বাহুল্য যে, ইসলামপূর্ব-কালে বহু পাপকাজ মহাগুণ ও কৃতিত্বরূপে বিবেচিত হতো। অনেক গুনাহের কাজ তখন জীবনের নিত্য-নৈমত্তিক সাধারণ কর্মে পরিণত হয়ে পড়েছিল। পাপ-পঙ্কিলতার এহেন প্রবল স্রোত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পবিত্রতার চাদরে কোনো প্রকার দাগ কাটতে পারেনি। তাঁর সততা, নিষ্ঠা, আমানতদারী, সত্যবাদিতা, দানশীলতা, বিপদে সহায়তা, গরিব ও অভাবগ্রস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদাচার এবং আর্ত ও বিপন্ন মানবতার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন প্রভৃতি গুণের কথা মক্কার মুশরিকরাও দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করত।

১. নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। জীবনের শুরু থেকেই তাঁর চরিত্রে নানা গুণ ও মহত্ত্বের আভাস দেখা যাচ্ছিল। মক্কার কুরাইশ সমাজের সর্বত্র উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরিত্রহীনতার যে স্রোত বইছিল, তা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কোনো দিনই স্পর্শ করতে পারেনি। ইমাম সুয়ূতী (রহ.) বলেন, "জাহিলী যুগে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পবিত্রতম ব্যক্তি ছিলেন।" জাহিলী যুগের পাপ-পঙ্কিল সমাজে অবস্থান করেও তিনি বাল্যকাল থেকেই যাবতীয় অসৎকর্ম, পাপাচার ও অমানবিক কার্যক্রমকে ঘৃণা করতেন। তাঁর অন্তরে আল্লাহর ভয় ও সৎকাজের প্রেরণা সবসময় বিরাজমান ছিল। নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও মদ্যপান প্রভৃতি নিকৃষ্টতম কাজসমূহকে তিনি বাল্যকাল থেকেই এতোই ঘৃণা করতেন যে, কেউ তাঁকে এসব কাজের দিকে আহ্বান করলে তিনি পরিষ্কার জবাব দিতেন যে, এ সমস্ত কাজকে আমি নিজের মান-সম্ভ্রম বিনাশকারী বলে মনে করি। কাজেই এসব অপকর্মে আমি অংশগ্রহণ করব বলে কেউ কখনো আশা পোষণ করো না।

২. আতিথেয়তা

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। অতিথিদের ডেকে এনে তাদের খাওয়াতে পারলে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করতেন। ঘরে কোনো সময় খাদ্যদ্রব্য

কম থাকলে তিনি নিজে বাইরে চলে যেতেন এবং ছেলেকে নির্দেশ দিয়ে যেতেন যে, সে যেন তাঁর ফিরে আসার পূর্বেই তাদেরকে খাইয়ে দেয়।

৩. সহজ সরল জীবনাচার

আবু বকর কখনো কারো কোনো কাজ করে দিতে লজ্জাবোধ করতেন না। অপরের দ্বারা কোনো কাজ করানোকে তিনি খুব লজ্জাবোধ করতেন। আবু বকর সরল ও সাদাসিধা জীবন-যাপন করতেন। তিনি মোটা কাপড় পরতেন এবং অতি সাধারণ মানের খাবার খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। খলীফা নির্বাচিত হবার পর তাঁর জীবনযাত্রা আরও বেশি সরল হয়ে যায়। ওফাতের সময় তিনি আয়েশা সিদ্দীকা -কে বলেন, "খিলাফতের বোঝা আমার উপর রেখে যাবার পর থেকে আমি সাধারণ খাবার ও মোটা কাপড় পরিধান করেই দিন কাটিয়েছি। আমার কাছে মুসলমানদের তিনটি বিষয় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে একজন হাবশী গোলাম, একটি উট এবং একখানা পুরাতন চাদর; আমার মৃত্যুর পর ওগুলো উমর ইবনে খাত্তাব -এর কাছে পৌছে দিয়ে আমাকে দায়মুক্ত করবে।"

তাঁর নিজের সকল ধন-সম্পদ ইসলামের জন্য খরচ করে ফেলার দরুন বহুবার তাঁকে দু'তিন দিন পর্যন্ত উপোস থাকতে হয়েছে। একদিন রাসূলুল্লাহ আবু বকর এবং উমর -কে মসজিদে ক্ষুধায় কাতর অবস্থায় দেখতে পেয়ে বলেন, "আমিও তোমাদেরই মতো উপোস করছি।" আবু হাতিম আনসারী এ কথা শুনতে পেয়ে এ তিনজনকে নিজ বাড়িতে দাওয়াত করে খাওয়ান।

আল্লাহভীতি বা তাকওয়া

আবু বকর সিদ্দীক -এর চরিত্রে আল্লাহভীতিই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য দিক। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে একটি অজানা পথে নিয়ে যাবার সময় বলেছিল, "এদিকে এমন সব দুশ্চরিত্র ও বদমায়েশ লোকদের আবাস যে, এ পথ ধরে চলাও লজ্জাজনক ব্যাপার।" এ কথা শোনামাত্র তিনি থেমে গেলেন এবং এ কথা বলে ফিরে চললেন, 'এমন লজ্জাজনক পথে আমি হাঁটতে পারি না।'

একবার তাঁর জনৈক গোলাম তাঁকে কিছু খাবার এনে দেয়। তিনি তা খেয়ে শেষ করার পর গোলাম জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি জানেন, এ খাবার আমি কীভাবে পেয়েছি?' তিনি বললেন, 'বল'। গোলাম বলল, "জাহিলিয়াতের যুগে আমি এক ব্যক্তির ভাগ্য গণনা করেছিলাম। অবশ্য আমি কিছুই জানি না, তবু তাকে ধোঁকা দিয়েছিলাম। আজ তার সঙ্গে দেখা হলে সে ভাগ্য গণনার প্রতিদান স্বরূপ এ খাবার আমাকে দিয়েছে।"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বিবরণ শোনার পর গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করে দেন। তিনি বললেন, 'হারাম খাদ্যে যে শরীর গড়ে ওঠে, জাহান্নামই তার প্রকৃত ঠিকানা।'

৪. বীরত্ব ও সাহসিকতা

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিনয়ী ও নম্র হওয়ার পাশাপাশি একজন সৎসাহসী লোকও ছিলেন। একবার আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খুতবা দেওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন শ্রেষ্ঠ বীর কে? লোকেরা জবাব দিল, আমীরুল মু'মিনীন, আপনিই। তিনি বললেন, না! আমি তো কেবল সামনে যে মোকাবিলার জন্যে এসেছে, তার সাথে লড়েছি। প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ বীর হলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আমরা বদর যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থানের জন্যে একটি তাঁবু তৈরি করেছিলাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এই তাঁবুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কে অবস্থান করবে? এবং কে তাঁকে পাহারা দিতে প্রস্তুত আছে। আল্লাহর কসম তখন কেউ অগ্রসর হলো না। একমাত্র আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অগ্রসর হন এবং হাতে খোলা তলোয়ার নিয়ে এমনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাহারায় নিয়োজিত থাকেন, যেন কোনো শত্রু তাঁর দিকে আসলেই সাথে সাথে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শানে বিভিন্ন আয়াত নাযিল হয়েছে।

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নবুয়তপূর্ব সম্পর্ক ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দুআর বর্ণনা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নবুয়তের পূর্বেও যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল পবিত্র কুরআনে সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰى وَالِدَيَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ

"... অবশেষে যে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার রব, আমাকে এরূপ তাওফীক দান করুন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি, যা আপনি দান

করেছেন আমাকে ও আমার মাতাপিতাকে এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় নেক কাজ করি। আমার সন্তানদের সৎকর্মপরায়ণ করুন। ..."[১৯৩]

এ আয়াতে সবগুলো ক্রিয়ার অতীত পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, এটি কোনো বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ ব্যক্তির বর্ণনা, যা আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। বিশিষ্ট মুফাসসিরগণের মতে, এ আয়াতটি আবু বকর রাঃ-এর শানে অবতীর্ণ হয়।[১৯৪] এতে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই আবু বকর রাঃ-এর অবস্থা। এগুলোই ব্যাপক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে অন্য মুসলিমগণও এতে উদ্বুদ্ধ হয়।

২. আল্লাহর পথে আবু বকর রাঃ-এর ধন-সম্পদ ব্যয় করার বর্ণনা : ইসলাম গ্রহণের পর আবু বকর রাঃ তাঁর ধন-সম্পদ অত্যন্ত ঔদার্যের সাথে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁর এ ঔদার্যের সাক্ষ্য দিচ্ছেন–

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও লড়াই করেছে, তারা সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বিশাল ঐসব লোকের চেয়ে, যারা মক্কা বিজয়ের পর ব্যয় করেছে এবং লড়াই করেছে। তবে আল্লাহ তা'আলা উভয় দলের সাথে কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।"[১৯৫]

৩. আবু বকর রাঃ-এর গোলাম আযাদ করার বর্ণনা : ইসলাম গ্রহণের পর আবু বকর রাঃ নয়জন ঈমানদার গোলামকে যারা কাফিরদের হাতে নির্যাতিত হতো, ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ কাজের প্রশংসা করে বলেন,

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.

---

[১৯৩] সূরা আল-আহকাফ : ১৫

[১৯৪] আলূসী, রূহুল মা'আনী, খ. ১৯, পৃ. ৬৫।

[১৯৫] সূরা হাদিদ : ১০

"অতএব যে দান করে, আল্লাহকে ভয় করে চলে এবং কল্যাণকর বিষয়কে সত্য বলে বিশ্বাস করে, আমি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের পথকে তাঁর জন্যে সুগম করে দেব।"[১৯৬]

এ আয়াতগুলো নাযিলের কারণ হলো– আবু বকর রা. কাফিরদের হাতে নির্যাতিত গোলামদের ক্রয় করে আযাদ করে দিতেন। ওদের অধিকাংশই ছিল দুর্বল ও অসহায়।[১৯৭]

৪. আবু বকর রা.-এর কথায় মক্কার বিশিষ্টজনের ইসলাম গ্রহণের বিবরণ : আবু বকর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর একান্ত দাওয়াতেই মক্কার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন। পবিত্র কুরআনে এ ঘটনাকে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতেও আবু বকর রা.-এর প্রশংসার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন–

فَبَشِّرْ عِبَادِ. الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

"অতঃপর সুসংবাদ দাও আমার বান্দাহদেরকে, যারা মনোযোগের সাথে কথা শোনে, অতঃপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। অধিকন্তু, তাঁরাই বুদ্ধিমান।"[১৯৮]

ইবনুল আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বকর রা. যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনলেন এবং তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করলেন, তখন উসমান, আবদুর রহমান ইবনু আওফ, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, তালহা, যুবাইর ও সা'ঈদ ইবনু যায়িদ রা. প্রমুখ তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি ঈমান এনেছেন? আবু বকর রা. তখন তাঁদেরকে তাঁর ঈমান সম্পর্কে অবহিত করলেন। এরপর তাঁরা সকলেই ঈমান আনলেন। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাযিল হয়।[১৯৯]

৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাওর গুহার সাথি : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরতের সময় আবু বকর রা.ই ছিলেন তাঁর একান্ত সাথি। সাওর গুহায় তাঁর সাথে

---

[১৯৬] সূরা আল-লায়ল : ৫-৭

[১৯৭] ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, খ. ৮, পৃ. ৪২০।

[১৯৮] সূরা আয-যুমার : ১৭-১৮

[১৯৯] কুরতুবী, আল-জামি' ..., খ. ১৫, পৃ. ২৪৪।

আবু বকর রা. আত্মগোপন করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ

"সে (আবু বকর) ছিল দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল।"[২০০]

এ আয়াতটি আবু বকর রা.-এর উচ্চ মর্যাদা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে আত্মোৎসর্গের একটি বিরাট প্রমাণ। এটি কেবল আবু বকর রা.-এরই বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনো সাহাবি এ মর্যাদা লাভ করতে পারেননি।

৬. আবু বকর রা.-এর রাত জাগরণের বর্ণনা : আবু বকর রা. রাত জেগে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতেন। পবিত্র কুরআনে তাঁর এ আমলের সাক্ষ্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ.

"যে ব্যক্তি রাতে সিজদায় অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না?"[২০১]

'আবদুল্লাহ ইবনুল 'আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতটি আবু বকর রা.-এর শানে নাযিল হয়।[২০২]

৭. আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠ শোকরগুযার বান্দাহ : আবু বকর রা. আল্লাহ তা'আলার বেশি বেশি শোকর আদায় করতেন। পবিত্র কুরআনে কৃতজ্ঞ বান্দাহ বলে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অচিরেই আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞ বান্দাদের উত্তম প্রতিদান দেবেন।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪৪)

আলী রা. বলেন, এ আয়াতে দৃঢ় ঈমানের অধিকারী আবু বকর রা. ও তাঁর সাথিদের বুঝানো হয়েছে।[২০৩]

---

২০০ সূরা আত-তাওবাহ : ৪০

২০১ সূরা আয-যুমার : ৯

২০২ বাগাভী, মা'আলিমুত তানযীল, খ. ৭, পৃ. ১১০।

২০৩ তাবারী, জামি'উল বায়ান, খ. ৭, পৃ. ২৫২।

হাদিসে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহুসংখ্যক হাদীসে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিশিষ্ট মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ বহন করে চলবে।

১. সিদ্দিক (মহা সত্যপরায়ণ) : আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সর্বশ্রেষ্ঠ ফযীলত ও মর্যাদা, যা অন্যান্য সকল মর্যাদার উর্ধ্বে, তা হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আছ 'সিদ্দিক' উপাধি প্রদান করেছিলেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ পাহাড়ের উপর আরোহণ করেছিলেন। তাঁর সাথে আবু বকর, ওমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ ছিলেন। এ সময় পাহাড় কেঁপে ওঠেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "উহুদ, স্থির হও! তোমার উপরে রয়েছে একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ।"[২০৪]

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘনিষ্ঠতম সাথি ও শ্রেষ্ঠতম সহযোগী : আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বাপেক্ষা বড় সহযোগী ও অন্তরঙ্গ সাথি। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইসলাম ও মুসলিমদের জন্যে তাঁর জীবন, সকল অর্থ-সম্পদ, বিবেক-বুদ্ধি, আরাম-আয়েশ সবকিছু উজাড় করে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিজের সঙ্গ ও সম্পদ দ্বারা যিনি আমার প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক অবদান রেখেছেন, তিনি হলেন আবু বকর। আমি যদি আমার উম্মতের মধ্যে কাউকেও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকেই করতাম। কিন্তু ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। সুতরাং মসজিদের মধ্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গৃহ-দ্বার ছাড়া অন্য কারো গৃহ-দ্বার উন্মুক্ত না থাকা চাই।"[২০৫]

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় সাহাবি : আবদুল্লাহ ইবনু শাকীক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করলাম, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় সাহাবি কে ছিলেন?" তিনি জবাব দিলেন, আবু বকর।'[২০৬]

৪. নবী-রাসূলগণের পর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি : আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন নবী-রাসূলগণের পর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। আবুদ দারদা থেকে বর্ণিত। তিনি

---

[২০৪] বুখারী, হাদিস নং : ৩৩৯৯

[২০৫] বুখারী, হা. নং: ৪৪৬, ৪৪৭

[২০৬] তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৫৯০

বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আবু বকর ؓ-এর সামনে হাঁটতে দেখলেন। এমন সময় তিনি আমাকে বললেন, "আবুদ দারদা! তুমি কি এমন ব্যক্তির আগে আগে চলছ, যিনি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার চেয়ে উত্তম। নবী-রাসূলগণকে বাদ দিলে আবু বকর অপেক্ষা অন্য কোনো শ্রেষ্ঠতর মানুষের ওপর সূর্য উদিতও হয়নি এবং অস্তও যায়নি।" [২০৭]

৫. উম্মতের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ালু : আনাস ইবনু মালিক ؓ থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে আমার উম্মতের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ালু ব্যক্তি হলেন আবু বকর।"[২০৮]

৬. জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত প্রথম ব্যক্তি : হাদীসে আবু বকর ؓ জান্নাতবাসী হবার কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আবু মূসা আল-আশ'আরী ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বাগানে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে বাগানের দরজা পাহারা দিতে নির্দেশ দিলেন। এ সময় আবু বকর ؓ এসে বাগানে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাঁকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও।" এরপর ওমর ؓ এসে অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাঁকেও অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও।" অতঃপর আসলেন উসমান ؓ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাঁকেও অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও।"[২০৯]

৭. কিয়ামতের দিন জমি ভেদ করে উত্থিত উম্মতের প্রথম ব্যক্তি : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ؓ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "(কিয়ামতের দিন) আমিই হবো জমি ভেদ করে উত্থিত প্রথম ব্যক্তি। এরপর আবু বকর ؓ, তারপর ওমর ؓ জমি ভেদ করে উঠবেন। এরপর আমি জান্নাতুল বাকীর বাসিন্দাদের কাছে আসব। তাঁরা সকলেই আমার সাথে একত্রিত হবেন। তারপর আমি মক্কাবাসীদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকব। এভাবে দু হারামের মধ্যবর্তী স্থানে আমরা একত্রিত হব।"[২১০]

৮. বৃদ্ধ জান্নাতিগণের সর্দার : আনাস ইবনু মালিক ؓ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ও ওমর ؓ-এর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "এরা দুজন

---

[২০৭] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং : ১৩৫

[২০৮] তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৭২৩

[২০৯] বুখারী, হাদিস নং : ৩৩৯৮

[২১০] তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৬২৫

নবী-রাসূলগণ ছাড়া পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগসমূহের সকল প্রৌঢ় জান্নাতবাসীর সর্দার হবেন।"[২১১]

৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাওযে কাউসারের সাথি : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর رضي الله عنه-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তুমি হাওযে কাউসারের পাড়ে আমার সাথি হবে, যেমন তুমি সাওর গুহায় আমার সাথি ছিলে।"[২১২]

১০. আবু বকর رضي الله عنه-এর প্রশংসা শুনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগ্রহ : হাবীব ইবনে আবী হাবীব رضي الله عنه বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সভাকবি হাসসান ইবনে ছাবিত رضي الله عنه-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তুমি কী আবু বকর رضي الله عنه-এর প্রশংসায় কোনো কবিতা লিখেছ?" হাসসান رضي الله عنه জবাব দিলেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তা হলে বল, আমি শুনি।" এরপর হাসসান رضي الله عنه আবৃত্তি করলেন, "ইনিই সে সিদ্দিক, যিনি সুমহান গুহার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। যখন তিনি পাহাড়ের উপর আরোহণ করেছিলেন, তখন শত্রুরা তাঁকে ঘিরে ফেলেছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়জন ছিলেন। সকলেই এ কথা জানে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তাঁর সমকক্ষ গণ্য করতেন না।" এ কবিতা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আনন্দিত হয়ে এমনভাবে মুচকি হাসেন যে, তাঁর পবিত্র দাঁত দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হ্যাঁ, হাসসান! তুমি সত্যই বলেছ। নিঃসন্দেহে আবু বকর رضي الله عنه এরূপই।[২১৩]

---

[২১১] তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৫৯৭

[২১২] তিরমিযি, হাদিস নং : ৩৬০৩

[২১৩] আল মুসতাদরাক আল হাকেম, হাদীস নং : ৪৩৮৭

অধ্যায়-৯

পরবর্তী খলিফা মনোনয়ন ও ইন্তিকাল

পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্যে পরামর্শ গ্রহণ

আবু বকর رضي الله عنه প্রচণ্ড অসুস্থ অবস্থায়ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলি ও খিলাফতের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এসেছে, তখন ভাবতে লাগলেন যে, বর্তমানে প্রতিবেশী প্রচণ্ড ক্ষমতাধর দুইটি প্রধান রাষ্ট্র পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য মুসলিম রাজ্যের প্রতি খড়গহস্ত; আর তিনি অন্তিম শয্যায়। এ সময় যদি তাঁর ওফাত হয় এবং তাঁর পরে মুসলিমদের মধ্যে খিলাফত নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয় এবং তাঁরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তবে এ দুর্বলতার সুযোগে রোমান ও পারসিকগণ ইসলামি রাষ্ট্র তথা মুসলিম জাতির অস্তিত্ব পর্যন্ত মুছে ফেলার চেষ্টা করবে। ভাবলেন, যদি তিনি সকলের মতামত নিয়ে কাউকে খলিফা হিসেবে নির্ধারণ করা যেতে পারে, তা হলে তাঁর পরে খিলাফত নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ হবে না এবং তাঁদের ঐক্য ও সংহতি অটুট থাকবে। অবশেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তিনি জীবিত থাকতেই পরবর্তী খলিফা নির্বাচিত করে যাবেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ঘরে সভা ডেকে লোকদের বললেন,

إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِيْ مَا قَدْ تَرَوْنَ. وَلَا أَظُنُّنِيْ إِلَّا مَيِّتٌ لِمَا بِيْ. وَقَدْ أَطْلَقَ اللهُ أَيْمَانَكُمْ مِنْ بَيْعَتِيْ. وَحَلَّ عَنْكُمْ عُقْدَتِيْ. وَرَدَّ عَلَيْكُمْ أَمْرَكُمْ. فَأَمِّرُوْا عَلَيْكُمْ مَنْ أَحْبَبْتُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ أَمَّرْتُمْ فِيْ حَيَاةٍ مِنِّيْ كَانَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَخْتَلِفُوْا بَعْدِيْ.

"তোমরা তো আমার অবস্থা দেখতে পাচ্ছ! আমার মনে হয় না যে, আর বাঁচব! আল্লাহ তা'আলা আমার বাই'আত থেকে তোমাদের মুক্ত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের দায়িত্ব থেকে আমাকেও রেহাই দান করেছেন। উপরন্তু তোমাদের নেতৃত্বভার তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। এখন তোমরা তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী তোমাদের আমির নিযুক্ত কর। যদি তোমরা আমার জীবিত

অবস্থায় আমির নিযুক্ত করতে পার, তবে তা-ই সবচেয়ে ভালো হবে। তা হলে আমার পরে তোমাদের মতবিরোধে জড়িয়ে পড়তে হবে না।"[২১৪]

অতঃপর সভার সকলের সম্মতি পেয়ে তিনি নিজেই পরবর্তী খলিফা নির্বাচিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর গোটা ইসলামি জিন্দেগী ও খলিফা জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পরে খলিফা হবার উপযুক্ত ব্যক্তি সমগ্র জাতির মধ্যে ওমর রা. অপেক্ষা দ্বিতীয় কেউ বর্তমান নেই। তথাপি তিনি ভাবলেন যে, লোকদের সাথে পরামর্শ না করে আমি নিজে একাই খলিফা মনোনীত করলে জনসাধারণ হয়ত তাঁকে গ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যে এগিয়ে আসবে না। তাই তিনি প্রথমে সকলের সাথে খোলাখুলি পরামর্শ করতে শুরু করলেন। দেখা গেল, কেউ নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি হলো না; বরং প্রত্যেকেই নিজের চেয়ে অন্যকে অধিকতর সৎ ও যোগ্য মনে করছেন। সর্বশেষ তাঁরা সকলে মিলে খলিফা মনোনয়নের দায়িত্বভার আবু বকর রা.-এর হাতে অর্পণ করে বললেন, "হে রাসূলুল্লাহ সা.-এর খলিফা, আপনার রায়ই হলো আমাদের রায়।" আবু বকর রা. বললেন, "তা হলে কি আল্লাহর নামে অঙ্গীকার রইল যে, তোমরা আমার মতের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে?" তাঁরা বলল, হ্যাঁ। এরপর আবু বকর রা. বললেন, "তা হলে আমাকে একটু ভাবার সুযোগ দাও। আমি দেখি, কে আল্লাহ, তাঁর দীন ও বান্দাহদের জন্যে অধিকতর উপযুক্ত হন!"[২১৫]

এরপর তিনি 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ রা.-কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার পরবর্তী খলিফা ওমর হলে তুমি কেমন মনে কর?" 'আবদুর রহমান ইবনু আওফ রা. জবাব দিলেন, "আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, যে সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন।" আবু বকর রা. বললেন, "তবুও তোমার মতামত চাই।" আবদুর রহমান রা. বললেন, "আল্লাহর কসম, তিনিতো অনেক ভালো লোক।" এরপর আবু বকর রা. আবদুর রহমান রা.-কে বললেন, "আমি তোমার সাথে যে বিষয়ে আলাপ করলাম, এ ব্যাপারে তুমি অন্য কাউকে কিছু বলো না।"

অতঃপর আবু বকর রা. উসমান রা.-কে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার পর ওমর খলিফা হলে তুমি কেমন মনে কর?" উসমান রা. বললেন, "আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, যে সম্পর্কে আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন।" আবু বকর রা. বললেন, "তবুও তোমার মত জানতে চাই।"

---

[২১৪] নুমাইরী, তারীখুল মাদীনাহ, খ. ২, পৃ. ৬৬৫

[২১৫] নুমাইরী, তারীখুল মাদীনাহ, খ. ২, পৃ. ৬৬৫।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমি এতটুকু জানি যে, তাঁর ভেতরের দিক বাইরের দিকের চেয়ে উত্তম এবং আমাদের মধ্যে তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। তিনি তো অনেক ভালো লোক।" আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "উসমান, আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত করুন! আমি শপথ করে বলতে পারি যে, আমি ওমরকে আমার পরবর্তী খলিফা মনোনীত করে গেলে সে তোমাদের প্রতি কোনো প্রকার অন্যায়-অবিচার করবে না।" এরপর তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "আমি তোমার সাথে যে বিষয়ে আলাপ করলাম, এ ব্যাপারে তুমি অন্য কাউকে কিছু বলো না।"

অতঃপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ডেকে এ ব্যাপারে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, "আমি আপনার পরেই ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কেই উত্তম বলে মনে করি। তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি দুটিই হক। যথার্থ কারণেই তিনি সন্তুষ্ট হন, আবার যথার্থ কারণেই তিনি অসন্তুষ্ট হন। তাঁর অন্তর বাহ্যিক অবস্থার চেয়ে উত্তম। আপনার পর খিলাফতের যোগ্য তাঁর চেয়ে অধিক আর কেউ হতে পারে না।"[২১৬]

এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সা'ঈদ ইবনু যায়িদ এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় মুহাজির ও আনসারগণের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। সকলেই ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে প্রায় একইরূপ মত পেশ করেন। ইতোমধ্যে সাধারণ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। তখন তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর রোগ শয্যার পাশে এসে আরয করলেন, "আপনি অবগত আছেন যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মেজাজ অত্যন্ত কঠোর। তা সত্ত্বেও যদি আপনি তাঁকে আমাদের খলিফা নিযুক্ত করে যান, তা হলে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে কী উত্তর দেবেন?"

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সময় শায়িত অবস্থায় ছিলেন। তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এ কথা শুনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং বললেন, "আমাকে বসিয়ে দাও।" (লোকজন তাঁকে বসিয়ে দিল। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা আমাকে আল্লাহর ভয় দেখাচ্ছ! অন্যায়ভাবে যে কেউ তোমাদের নেতৃত্ব লাভ করলে সে বিফল হবে। আমি যখন আমার রবের সাথে মিলিত হব এবং তিনি আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন, তখন আমি বলব, হে আল্লাহ, আমি আপনার বান্দাহদের জন্যে একজন সর্বোত্তম ব্যক্তিকেই খলিফা নির্বাচিত করেছি।"[২১৭] এরপর তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু লজ্জিত হয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

---

[২১৬] ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, খ.২, পৃ. ৩২৬।

[২১৭] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৩, পৃ. ১৯৯।

উপরন্তু যে-ই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কঠোরতা সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন, তিনি এ বলে জবাব দেন,

ذَٰلِكَ لِأَنَّهُ يَرَانِي رَقِيقًا. وَلَوْ أُفْضِيَ الأَمْرُ إِلَيْهِ لَتَرَكَ كَثِيرًا مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ وَيَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَدْ رَمَقْتُهُ. فَرَأَيْتُنِي إِذَا غَضِبْتُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الشَّيْءِ أَرَانِي الرِّضَا عَنْهُ. وَإِذَا لِنْتُ لَهُ أَرَانِي الشِّدَّةَ عَلَيْهِ.

"আমার নম্র ব্যবহার দেখেই তিনি কঠোরতা করতেন। খিলাফতের দায়িত্ব মাথায় চাপলে তাঁর কঠোর প্রকৃতির অনেকাংশই চলে যাবে। আমি স্বয়ং লক্ষ করেছি যে, আমি যেখানে নম্র ও কোমল ব্যবহার করেছি, তিনি সেখানে কঠোরতা প্রদর্শন করেছেন, আর আমি যেখানে কঠোর হয়েছি, তিনি সেখানে কোমল স্বভাব দেখিয়েছেন।[২১৮]

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সম্মতকরণ

এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ডেকে আনেন। প্রথমে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অবস্থা তুলে ধরেন, অতঃপর পরবর্তী খলিফার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তের কথা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জানালেন; কিন্তু ওমর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে কোনোভাবেই রাজি হচ্ছিলেন না, নিজের অপারগতার কথা বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করলেন; কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নাছোড়বান্দা! তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কঠোর ভাষায় ধমক দিলেন। অবশেষে যখন দেখলেন যে, খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়া তাঁর বাঁচার কোনো পথ নেই, তখন তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হন।[২১৯]

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে চুক্তিনামা লিখন ও খলিফারূপে নাম ঘোষণা

লোকেরা চলে যাবার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে একান্তে ডেকে বললেন, এ চুক্তিনামাটি লিখ–

هَذَا مَا عَهِدَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ فِي آخِرِ عَهْدِهِ بِالدُّنْيَا خَارِجًا مِنْهَا. وَعِنْدَ أَوَّلِ عَهْدِهِ بِالآخِرَةِ دَاخِلًا فِيهَا. حَيْثُ يُؤْمِنُ الْكَافِرُ. وَيُوْقِنُ الْفَاجِرُ. وَيَصْدُقُ الْكَاذِبُ. إِنِّي اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

---

[২১৮] তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, খ. ৬, পৃ. ৬১৮।

[২১৯] সাল্লাবী, আবু বকর আস-সিদ্দীক (রা.), পৃ. ৪২২।

فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. وإِنِّيْ لَمْ آلُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَدِيْنَهُ وَنَفْسِي وَإِيَّاكُمْ خَيْرًا. فَإِنْ عَدَلَ فَذَلِكَ ظَنِّيْ بِهِ وَعِلْمِيْ فِيْهِ. وَإِنْ بَدَّلَ فَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا اكْتَسَبَ . وَالْخَيْرَ أَرَدْتُ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُوْنَ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটি ইহলোক ত্যাগ করে পরপারের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়ার সময় আবু বকর ইবনু কুহাফার অসিয়ত। এ অন্তিম মুহূর্তটি এমন কঠিন যে, এ সময় কাফিরও স্বেচ্ছায় ঈমান আনয়ন করে, পাপিষ্ঠ লোকও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মিথ্যুক ব্যক্তিও সত্য কথা বলে। আমার পরে আমি ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কেই তোমাদের খলিফা মনোনীত করে যাচ্ছি। অতএব, তোমরা সকলেই তাঁর কথা শুনবে ও মেনে চলবে। আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও দীন এবং নিজের ও তোমাদের কল্যাণ কামনা করতে আমি কোনোরূপ ত্রুটি করিনি। আমার ধারণা ও বিশ্বাস, সে ন্যায়বিচার করবে। যদি সে অন্যায় করে, তবে প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের জন্যে জবাবদিহি করতে হবে। আমি আমার বিবেক অনুযায়ী তোমাদের কল্যাণ সাধন করতে চেষ্টা করেছি। তবে আমি গায়ব জানি না। অচিরেই যালিমরা জানতে পারবে তাদের পরিণাম কীরূপ! আস-সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।"[২২০]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তিকাল

অবশেষে শেষ সময় উপস্থিত হলো। তিনি মৃত্যুর লক্ষণ টের পেয়ে অবিরতভাবে এ দোয়া পাঠ করতে লাগলেন—

تَوَفَّنِيْ مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ.

"হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে মুসলিমরূপে মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"[২২১]

অবশেষে মাগরিবের পর ইশার আগেই চিরবিদায় নেন। এ দিনটি ছিল হিজরি ত্রয়োদশ সনের ২২শে জুমাদাছ ছানিয়াহ/৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে আগস্ট,

---

২২০ ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৩, পৃ. ২০০।

২২১ ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ. ১, পৃ. ৩৯৫।

সোমবার। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর এবং খিলাফতকাল ছিল দু'বছর তিন মাস দশ দিন, মতান্তরে দু বছর তিন মাস ছাব্বিশ দিন।[২২২]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অসিয়ত অনুযায়ী সে রাতেই তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতু উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে গোসল দেন এবং সে রাতেই মসজিদে নববীর মধ্যে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জানাযার নামায পড়ান।[২২৩]

অতঃপর ওমর, উসমান, তালহা ও আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ তাঁকে কবরে নামালেন। তাঁরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এমনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে শোয়ালেন যে, তাঁর মাথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র কাঁধ পর্যন্ত এসেছিল।[২২৪]

---

২২২ ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৩, পৃ. ২০১-২।

২২৩ ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৩, পৃ. ২০৪-৭।

২২৪ ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, খ. ৩, পৃ. ২০৮-৯)

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

[খিলাফত কাল : ১৩ হিজরী, ২২ জমাদিউস্‌সানী থেকে ২৩ হিজরী, ২৭ জিলহজ্জ]

[আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার জানামতে প্রত্যেকেই গোপনে হিজরত করেছেন। একমাত্র ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-ই এমন ব্যক্তি যিনি প্রকাশ্যে হিজরত করেছেন। তিনি যখন হিজরত করার ইচ্ছা করলেন তখন নিজের তরবারি গলায় বাঁধলেন, ধনুক কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন এবং কয়েকটি তীর হাতে নিয়ে বায়তুল্লাহর নিকট আসলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বায়তুল্লাহর সাত চক্কর তওয়াফ করে মাকামে ইবরাহীমের নিকট এসে দু রাকাত নামায আদায় করে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে বললেন "যে ব্যক্তি চায় যে, তার মা পুত্রহারা হোক, তার সন্তানগণ এতিম হোক আর তার স্ত্রী বিধবা হোক সে যেন এ ময়দানের অপর প্রান্তে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে।" অতঃপর তিনি সেখান থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।]

অধ্যায়-১

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মাক্কী জীবন

১. নাম ও বংশ পরিচয়

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তাঁর কন্যা উম্মুল-মু'মিনীনন হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নামানুসারে তার কুনিয়া আবু হাফস। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পিতার নাম খাত্তাব ও মাতার নাম খাত্‌মা। বংশ-পরিচয়ের ধারা নিম্নরূপ :

ওমর ইবনে খাত্তাব ইবনে নাফিল ইবনে আবদুল ওজ্জা ইবনে রাবাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কারাত ইবনে রাজাহ্ ইবনে আদ্দী ইবনে ক্বাব ইবনে লাবী ইবনে ফাহির ইবনে মালিক।

ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহু আদী গোত্রের অন্তর্গত ছিলেন। আদীর মোররা নামক এক ভাই ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সপ্তম উর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন। এ হিসাবে ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অষ্টম পূর্বপুরুষে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশের সাথে মিলিত হয়েছে।

কুরাইশগণ পবিত্র খানায়ে কা'বার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এজন্যই পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তির সাথে ধর্মীয় প্রভাবও তাঁদের যথেষ্ট ছিল। এ সমস্ত কারণে তাঁদের কর্মক্ষেত্র বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং প্রত্যেক বিভাগের কাজ পৃথক পৃথকভাবে সম্পাদিত হতে থাকে। যথা– পবিত্র কা'বা শরীফের তত্ত্বাবধান, হাজিদের খোঁজখবর নেওয়া, দৌত্য-কার্য, দলপতি নির্বাচন, বিচার-আচার, মন্ত্রণাসভা ইত্যাদি।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পূর্বপুরুষ 'আদী দৌত্য-কাজের নেতা ছিলেন। কুরাইশদের অন্য কোনো বংশের সাথে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হলে তিনি দূত হিসেবে গমন করতেন। এতদ্ব্যতীত পরস্পরের কলহ-বিবাদ মিটাবার জন্য তিনি শালিসও নিযুক্ত হতেন। উভয় দলই তাঁর নিকট আপন আপন দাবি-দাওয়া ও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করত। অনেক সময় আরবদের গোত্রীয় কলহ-বিবাদ যুদ্ধের আকার ধারণ করে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলতে থাকত। এ সমগ্র মীমাংসার জন্য যাঁরা শালিস নিযুক্ত হতেন, তাঁদের মধ্যে বিচারশক্তি ছাড়া স্পষ্টবাদিতা এবং বাগ্মিতারও প্রয়োজন হতো। এ সম্মানজনক কাজটি বংশপরম্পরায় আদী গোত্রের মধ্যেই চলে আসছিল।

ওমর রাঃ-এর নসবনামা
ফিহর (কুরাইশ)
গালিব
কাব
মূররাহ
আদী
কিলাব
যিরাঅ
কুসাই
ফার্ত
আবদে মানাফ
রিবাহ
আব্দুল উজ্জাহ
হাশিম
মুত্তালিব
নাওফিল
আব্দুশ শামস
নুফাইল
আব্দুল মুত্তালিব
খাত্তাব
ওমর
আব্দুল্লাহ
আবু তালিব
আব্বাস
মুহাম্মাদ
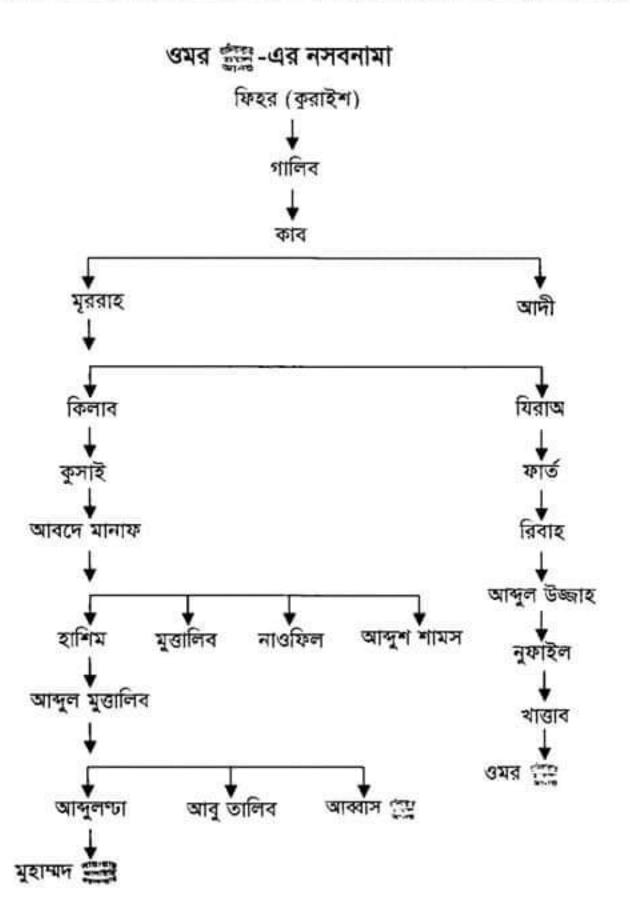
২. জন্ম ও বাল্যকাল

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ ছিলেন মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় খলিফা, মক্কার কুরাইশ বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মক্কা মুকার্‌রমার শাখা বনু আদী গোত্রে জন্মগ্রহণ করার কারণে তাঁকে আদাবী বলা হতো; কিন্তু তাঁর মাতা হানতামা বিনতে হাশিম [ইবনিল মুগীরা ইবন আবদিল্লাহ ইবন ওমর] মাখযূমী ছিলেন। ইবন আবদিল বারর (আল-ইসতীআব) মাতামহের নাম সম্পর্কে ভুল ধারণা দূরীভূত করেন।[১]

অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে, হিজরতের ৪০ বছর পূর্বে ওমর ফারুকের জন্ম হয়। তাঁর জন্ম ও বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে হাফেজ ইবনে আসাকের আমর ইবনে আস রাঃ হতে একটি বর্ণনা তৎপ্রণীত 'তারিখে দামেশকে' লিপিবদ্ধ করেছেন। তা হতে জানা যায় যে, একদা আমর ইবনে আস রাঃ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবসহ বসে আছেন, এমন সময় একটি হৈ চৈ শব্দ শুনতে পেলেন। সংবাদ নিয়ে জানা গেল, খাত্তাবের এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এ ঘটনার ওপর ভিত্তি করে মনে হয় যে, ফারুকের জন্মের সময় বেশ একটা আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কৈশোর ও যৌবন

বাল্যকালে ওমর রাঃ-এর পিতা তাঁকে উটচারণ কাজে নিযুক্ত করেন। কিন্তু ওমরের পিতা এ ব্যাপারে তাঁর ওপর বড় নিষ্ঠুর আচরণ করতেন। তাঁকে সারাদিন কাজে লাগিয়ে রাখা হতো। কোনো সময় সামান্য বিশ্রাম গ্রহণের জন্য আসলেও তাঁকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। যে মাঠে তিনি এ অমানুষিক পরিশ্রম করতেন, সেটির নাম ছিল 'যাজযান'। সেটি মক্কার নিকটবর্তী 'কাদীদ' নামক স্থান হতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত। ওমর রাঃ-এর খেলাফতকালে একদা তিনি এ মাঠ অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর বাল্যকালের স্মৃতি মনে পড়ল। তিনি অশ্রুভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে লাগলেন– 'আল্লাহু আকবর'! এমন এক সময় ছিল যখন আমি পশমি জামা পরে এ মাঠে প্রখর রৌদ্রতাপে উট চরাতাম। যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ক্ষণিকের জন্য বসতে যেতাম, তখন পিতার হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হতাম। কিন্তু আজ আমার পক্ষে এমন দিন এসেছে যে, আমার ওপর এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো মালিক নেই।[২] সকল ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, কৌশরেই উমর রাঃ ছিলেন কুরাইশদের নিযুক্ত দূত ছিলেন। এ দায়িত্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা, বাগ্মিতা এবং বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে বুঝানোর দক্ষতা বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।[৩]

---

[১] ইবনে হাযম, জামহারাতু আনসাবিল আরাব,পৃ:১৪৪, জাওয়ামিউস সীরা,পৃ: ৩৫৪

[২] ইবনে আসাকীর ৫২/২৬৮

[3] আল ফারুক, পৃ. ৪৭

৩. দৈহিক কাঠামো ও পারদর্শিতা

তিনি গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায় এবং স্থূলদেহী ছিলেন। তাঁর মুখাবয়ব ছিল শ্বেত-লোহিত বর্ণের। তাঁর গাল, নাক, চোখ ছিল মায়াবী এবং হাত ও পায়ের পাতা ছিল সুদীর্ঘ। তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ, লম্বা এবং লোমহীন। তিনি ছিলেন শক্তিশালী ও সাহসী। যখন তিন হাঁটতেন দ্রুত হাঁটতেন, যখন কথা বলতেন স্পষ্টভাবে বলতেন। বাম হাত দ্বারা তিনি ডান হাতের ন্যায়ই কাজ করতে পারতেন। যৌবনের প্রারম্ভেই ওমর রাঃ তদানীন্তন অভিজাত আরবদের অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলো যথা– যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা ও বংশ তালিকা শিক্ষা প্রভৃতি খুব মনোযোগ সহকারেই আয়ত্ত করেছিলেন। বংশতালিকা (নসবনামা) শিক্ষা ওমর রাঃ-এর পূর্বপুরুষদের উত্তরাধিকারের ন্যায় ছিল। আল্লামা জাহেয তাঁর 'কিতাবুল বয়ান ওয়াতইতবীয়ান' নামক কিতাবে বিস্তৃতভাবে লিখেছেন– "ওমর রাঃ তাঁর পিতা খাত্তাব এবং দাদা নুফাইল, তিনজনই নসবনামা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।" আমরা ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ওমর রাঃ-এর পূর্বপুরুষগণ বিচার-আচার এবং দৌত্য-কাজ নির্বাহ করতেন। সম্ভবত উক্ত কর্মগুলো সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে নসবনামার বিশেষ প্রয়োজন হয় বলেই তাঁরা উক্ত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হতেন।

ওমর রাঃ কাব্যে খুব উন্নত ধরনের রুচি রাখতেন এবং তদানীন্তন খ্যাতনামা কবিদের প্রায় সমস্ত কবিতাই তাঁর মুখস্থ ছিল। এতে বোঝা যায় যে, কবিতাও তিনি যৌবনে ওকাজের মেলায়ই শিক্ষা করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ধর্মীয় কাজে এমনভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েন যে, তখন কবিতা চর্চার অবসর বা রুচিই তাঁর আর রইল না।

যৌবনে ওমর রাঃ কিছু লেখাপড়াও শিক্ষা করেছিলেন। তা ঐ সময়কার কথা যখন গোটা আরব দেশে খুব কম লোক লেখাপড়া জানত। আল্লামা বালাযুরী লিখেছেন : "রাসূলে করীম সাঃ-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় সমস্ত কুরাইশ বংশে মাত্র সতেরোজন মানুষ লেখাপড়া জানতেন। এদের মধ্যে ওমরও ছিলেন একজন।"

তিনি ধাবমান ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়ে আরোহণ করতে পরতেন। তিনি জাহিলী যুগে উকাজ মেলায় মল্লাভূমিতে তিনি কুস্তিগীর হিসেবেও লড়তেন।[৪] ইবন আবদ রাব্বিহ (আল-ইকদুল ফারীদ) মক্কায় নাগরিক ব্যবস্থাপনায় প্রবর্তিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ হিসেবে তাঁর নাম উল্লেখ করেন। অন্য গোত্রের সঙ্গে শান্তি অথবা

[৪] তবকাতু ইবনে সাদ, পৃ. ২৩৫

যুদ্ধের আলোচনা আবশ্যক হলে নগরের পক্ষ হতে তিনি যেতেন এবং কোনো গোত্রের সঙ্গে পারস্পরিক গৌরব ও মর্যাদার বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলেও তাকে প্রেরণ করা হতো। আল-মাসউদী (মুরুজুয-যার)-এর মতে জাহেলি যুগে তিনি ইরাক ও সিরিয়ায় অনেকবার ভ্রমণ করেন এবং তথাকার শাসকদের ও আরবের আঞ্চলিক শাসকদের সাথেও সাক্ষাৎ করেন।

৪. পারিবারিক জীবন

ছয় স্ত্রী (এক সঙ্গে নয়) এবং তিন দাসীর গর্ভে তাঁর নয় ছেলে এবং চার মেয়ে জন্ম লাভ করেন[৫]। তন্মধ্যে আব্দুল্লাহ সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও আল্লাহভীরু ছিলেন। তাঁর স্ত্রীগণের পরিচয় হলো নিম্নরূপ-

১. যয়নব : ওসমান ইবনে মাযউন-এর বোন। ইনি মক্কায় মুসলমান হয়ে মারা যান।

২. কবীরা বিনতে মাইতাল মাখদুমী : মুশরিক হবার কারণে ওমর এ স্ত্রীকে তালাক দেন।

৩. মালিকা বিনতে জুরুল : মুশরিক হবার কারণে ওমর এ স্ত্রীকেও তালাক দেন।

৪. জামীলা : ওমর কোনো এক কারণে এ স্ত্রীকে তালাক দেন।

৫. আতেকা বিনতে যায়েদ : তাঁর বিয়ে হয় প্রথমে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু বকরের সাথে। অতঃপর ওমর-এর সাথে বিয়ে হয়। উমর নিহত হওয়ার পর জুবাইর বিন আওয়াম তাকে বিবাহ করেন।[৬]

---

[৫] ইবনে সাদ।

৬. **উম্মে কুলসুম** : তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ -এর দৌহিত্রী এবং ফাতেমা -এর কন্যা। ১৭ হিজরিতে উম্মে কুলসুম -এর সাথে ওমর -এর বিয়ে হয়। এ বিয়েতে ৪০ হাজার দিরহাম মোহর প্রদান করা হয়।

সন্তানাদি : তাঁর মোট তেরো সন্তান ছিল, এদের মধ্যে নয়জন পুত্র ও চারজন কন্যা। ওমর -এর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে হাফসা ছিলেন রাসূলুল্লাহ -এর সহধর্মিণীদের অন্তর্ভুক্ত। এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। মেয়ে হাফসার নামের সাথে মিলিয়ে ওমর -এর ডাকনাম ছিল উম্মে হাফস।

ছেলেদের নাম হলো-আব্দুল্লাহ্, উবায়দুল্লাহ্, আসেম, আবু শাহমা, আবদুর রহমান, যায়েদ ও মুজীর। এঁদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্, উবায়দুল্লাহ্ ও আসেম নিজেদের জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা ও বিশিষ্ট গুণাবলির জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন।
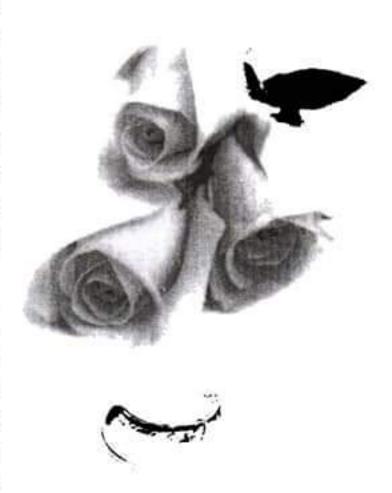
৫. ইসলামের বিরোধী ওমর

ইসলামের আহ্বান যতই ছড়িয়ে পড়তে লাগল ওমরের মধ্যেও ততই তার প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে লাগল। পৌত্তলিক ধর্মের বিরোধী এ ধর্ম ছড়িয়ে পড়তে দেখে আরবের আরো অনেকের ন্যায় ওমরও ইসলামের ঘোর শত্রু হয়ে গেলেন। যেমন দ্রুতগতিতে ইসলামের শক্তি বাড়তে লাগল ঠিক তেমনই দ্রুততার সাথে তাকে রোধ করার চেষ্টা হতে লাগল। এভাবে ইসলামের গতি বাধাপ্রাপ্ত হতে লাগল। ওমর এতে সমানভাবে অংশগ্রহণ করলেন।

এর কারণ এই ছিল না যে, ইসলাম তাঁর পদ-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনো রকমের বাধা সৃষ্টি করেছিল; বরং এর কারণ এই ছিল যে, তিনি কুরাইশ গোত্রের শক্তিমত্তাকে খর্ব হতে দিতে চাননি। তাকে সর্বদাই শক্তিশালী রাখতে

---

[6] বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭/১৪৪

চেয়েছিলেন। ওমরের এ বিরোধিতার কারণও ছিল খুব স্পষ্ট। তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে একথা খুব ভালো করেই জানতেন যে, মক্কায় তাঁর মতো শ্রেষ্ঠ, সৎ, ঈমানদার ও আমানতদার ব্যক্তি আর কেউ নেই। তাই তিনি মনে করতেন, জনসাধারণ তাঁর কথা মেনে নিলে এবং তাঁর অনুসারী হয়ে পড়লে ইসলাম দিক হতে দিগন্তরে, দূর হতে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়বে, আর মক্কার সমাজব্যবস্থাও যুগ যুগ ধরে চলে আসা রীতিনীতি ও সামাজিক আচারবিচার ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে। তিনি মক্কার এ অবস্থার পরিবর্তন চাইতেন না, তিনি মনে-প্রাণে আকাঙ্ক্ষা করতেন যে, মক্কার এ ব্যবস্থা অটুট থাকুক। কুরাইশরা পরস্পরের মধ্যে একই সূত্রে গেঁথে থাকুক। তাঁর কাছে ইসলামের প্রচার-প্রসারের অর্থ ছিল কুরাইশদের ঐক্য বিনাশ হওয়া, মক্কার 'মানমর্যাদা' ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া, আর কুরাইশ বংশ দুর্বল হয়ে অন্য শক্তিশালী গোত্রগুলোর অধীনস্থ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। যেমন আজকের যুগের পরিভাষায় বলা যায় যে, ওমর ঘোর 'জাতীয়তাবাদী' ছিলেন এবং তিনি রাষ্ট্রের ওপর ধর্মের প্রভাব স্বীকার করতে পছন্দ করতেন না; বরং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে ধর্মনাশের পক্ষপাতী ছিলেন।

৬. ওমর (রাঃ)-এর জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়া ও ইসলাম গ্রহণ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আবু জেহেল ইবনে হেশামের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করুন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সাঃ)-এর দোয়া ওমর (রাঃ)-এর পক্ষে কবুল করলেন। আল্লাহ তা'আলা ওমর (রাঃ)-এর দ্বারা ইসলামের বুনিয়াদকে মজবুত ও মূর্তিপূজার মহলকে ধ্বংস করলেন। ইবন সাদ-এর মতে "হারবুল-ফিজার আল-আজম"-এর চার বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৭] ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে দুটি বিখ্যাত ঘটনা,

এক. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তিলাওয়াত শুনে বিমোহিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ

এক রাতে তাঁকে বাড়ির বাইরে অবস্থানের মধ্য দিয়ে রাত কাটাতে হয়। তিনি হারামে আগমন করেন। কা'বা গৃহের পর্দার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। নবী করীম (সাঃ) সে সময় নামাযে রত ছিলেন। নামাযে তিনি সূরা 'আল-হাক্কা' তিলাওয়াত করছিলেন। ওমর (রাঃ) নীরবে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিলাওয়াত শোনেন। তিনি কুরআনের অমীয় ঝংকার, বাক্যবিন্যাস ও সুর-মাধুর্যে বিমুগ্ধ, চমৎকৃত ও বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনা সূত্রে এটা এভাবে জানা যায় : "আমি মনে মনে বললাম,

---

[৭] তাবাকাত ১ম খণ্ড,পৃঃ১৯৩

আল্লাহর কসম, কুরাইশরা যেমনটি বলে থাকে, তিনি হচ্ছেন একজন কবি। কিন্তু এ সময় নবী (সা) এ আয়াত পাঠ করেন-

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ـ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ

"এ কুরআন হচ্ছে একজন দূত কর্তৃক আনীত বাণী। এটা কোনো কবির কথা নয়; কিন্তু এতে তোমরা খুব কমই বিশ্বাস স্থাপন করো।"

ওমর (রা) বললেন: "আমি মনে মনে বললাম, আরে এত হচ্ছে আমারই মনের কথা! তিনি কী করে তার কথা জানলেন? নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) হচ্ছেন একজন গণক। আমার মনে এ ভাবের উদয় হওয়ার পরপরই মুহাম্মদ (সা) তিলাওয়াত করলেন-

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ـ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

"এটা কোনো গণকের উক্তিও নয়, তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নাযিলকৃত বাণী।"

রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযে সূরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন। ওমর (রা) তা শোনেন। এ ব্যাপারে ওমর (রা) বলেন : "সে সময় ইসলাম আমার অন্তর রাজ্যে স্থান অধিকার করে নিয়েছিল।"[১]

ওমর (রা)-এর অন্তর-রাজ্যে এটাই ছিল ইসলামের বীজ বপনের প্রথম সময়। কিন্তু তখনো তাঁর চেতনায় অজ্ঞতাপ্রসূত আবেগ, আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং পূর্ব-পুরুষগণের ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসের ঐতিহ্যগত প্রভাব জগদ্দল পাথরের ন্যায় তাঁর মন-মস্তিষ্ককে এতই প্রভাবিত করে রেখেছিল। সেটা ছিল এতই প্রবল যে, ইসলামের প্রাথমিক অনুভূতির কার্যকারিতা তাঁর মধ্যে তেমন একটা ছিল না বললেই চলে। কাজেই, বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা সংস্কারকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ ছিল ঐকান্তিক।

দুই. মহানবী (সা)কে হত্যার উদ্দেশ্যে বের হওয়া; অতঃপর ইসলাম গ্রহণ

তিনি ছিলেন খুবই কঠোর প্রকৃতির লোক। তাঁর স্বভাবগত কঠোরতার কারণেই তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) এবং মুসলমানদের বিপজ্জনক দুশমনদের মধ্যে একজন। তিনি এতই বিপজ্জনক ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে একদিন তিনি খোলা তরবারি হাতে নিয়ে বের হন। তাঁর মেজাজ ছিল

[১] ইবনে জওযী, তারীখে ওমর বিন খাত্তাব, পৃ. ৬।

রুক্ষ পথচলার এক পর্যায়ে হঠাৎ করে নঈম বিন আব্দুল্লাহ নাহহাম আদভী[৯] কিংবা বনু যুহরা[১০] কিংবা বনু মাখযুমের[১১] কোনো এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত অবস্থায় দেখে সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, "হে ওমর! কী উদ্দেশ্যে কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন, "মুহাম্মদ ﷺকে হত্যা করার জন্য যাচ্ছি।"

লোকটি বলল, "মুহাম্মদ ﷺকে হত্যা করে বনু হাশিম ও বনু যুহরা থেকে কীভাবে রক্ষা পাবে? ওমর বললেন : "মনে হচ্ছে তোমরাও পূর্ব-পুরুষগণের ধর্ম ত্যাগ করে বেদীন হয়ে গেছ?"

লোকটি বলল: "ওমর! একটি অবাক হবার কথা তোমাকে শোনাব না-কি? তোমার বোন এবং বোন-জামাই তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করে বেদীন হয়ে গেছে।"

একথা শুনে ওমর প্রজ্বলিত আগুনে ঘি ঢালার মতো রাগে-ক্ষোভে দপ করে জ্বলে উঠলেন। আর সোজা বোন ও বোন-জামাইর বাড়িতে গিয়ে উঠলেন। সেখানে খাব্বাব একটি সহীফার সাহায্যে সূরায়ে ত্বাহার অংশবিশেষ স্বামী-স্ত্রীকে তা'লীম দিচ্ছিলেন। খাব্বাব رضي الله عنه তাঁদের তালীম দেওয়ার জন্য নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করতেন। খাব্বাব رضي الله عنه যখন ওমর رضي الله عنه-এর আসার শব্দ শোনলেন তখন তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। ওমরের বোন ফাতেমা সহীফাখানা লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু ওমর বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে খাব্বাব رضي الله عنه-এর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন : "কার যেন গলায় মৃদু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম?"

তাঁর বোন উত্তর করলেন : "না তেমন কিছুই না। আমরাই পরস্পর কথাবার্তা বলছিলাম।"

ওমর رضي الله عنه বললেন : "সম্ভবত তোমরা উভয়েই বেদীন হয়ে গেছ?"

বোন-জামাই সা'ঈদ বললেন : "আচ্ছা ওমর! বলতো, তোমাদের ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে যদি সত্য থাকে তবে করণীয় কী হবে?

একথা শোনামাত্র ওমর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বোন-জামাইকে নির্মমভাবে মারতে শুরু করলেন। নিরুপায় বোন জোর করে ভাইকে স্বামী থেকে পৃথক করে দিলেন। এতে আরও রাগান্বিত হয়ে ওমর رضي الله عنه তাঁর বোনের গালে এমন এক আঘাত করলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে যায়। ইবনে ইসহাকের

---

[৯] এ বর্ণনা হচ্ছে ইবনে ইসহাকের দ্রষ্টব্য ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, ৩৪৪ পৃ.।

[১০] এ বর্ণনা আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত দ্রষ্টব্য ইবনে জওযী তারীখে ওমর বিন খাত্তাব رضي الله عنه, পৃ. ১০ এবং মোখতাসারুস সীরাহ আব্দুল্লাহ রচিত ১০৩ পৃ.।

[১১] এ বিষয়টি ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত হয়েছে, দ্রষ্টব্য মোখতাসারুস সীরাহ, ১০২ পৃ.।

বর্ণনায় আছে যে, তিনি মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। বোন ক্রোধ ও আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন : "ওমর! তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম যদি সত্য হয়- এ বলে তিনি কালিমা শাহাদাত পাঠ করলেন-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

"আমি সাক্ষ্য দান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আর মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

শাহাদাতের এ বাণী শোনামাত্র ওমর -এর ভাবান্তর শুরু হয়ে যায়। তিনি তাঁর বোনের রক্তাক্ত মুখমণ্ডল দেখে খুবই লজ্জিত হলেন। অতঃপর তিনি বোনকে আদরমাখা কণ্ঠে বললেন : "তোমাদের নিকট যে বইখানা আছে; তা আমাকে একবার পড়তে দাও তো দেখি।"

বোন বললেন : "তুমি অপবিত্র রয়েছ। অপবিত্র অবস্থায় এ বই স্পর্শ করা চলে না। শুধু পবিত্র লোকেরাই এ বই স্পর্শ করতে পারবে। তুমি গোসল করে এসো; তবেই বই স্পর্শ করতে পারবে। ওমর গোসল করে পাক-পবিত্র হলেন। তারপর সহীফাখানা হাতে নিলেন। 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়লেন। বলতে লাগলেন, এতো বড়ই পবিত্র নাম! অতঃপর সূরায়ে ত্বাহা হতে-

إِنَّنِيْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ.

"আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। অতএব তুমি আমার বন্দেগি করো এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম করো।"

পর্যন্ত পাঠ করলেন। বললেন : "এটা বড়ই উত্তম ও বড়ই মহিমাময় কথা। আমাকে মুহাম্মদ -এর কাছে নিয়ে চল।"

ওমর -এর একথা শুনে খাব্বাব তাঁর গোপনীয় অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে বললেন : "ওমর! খুশি হয়ে যাও। আমার আশা যে, রাসূলুল্লাহ গত বৃহস্পতিবার রাতে তোমার ব্যাপারে যে প্রার্থনা করেছিলেন (হে আল্লাহ! ওমর বিন খাত্তাব অথবা আবু জেহেল বিন হিশাম-এর দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দিন) তা কবুল হয়েছে।" এ সময় রাসূলুল্লাহ সাফা পর্বতের নিকটস্থ বাসভবনে অবস্থান করছিলেন।

খাব্বাব -এর মুখ থেকে একথা শুনে ওমর তাঁর তরবারিখানা কোষে ঢুকিয়ে নিয়ে রাসূলুল্লাহ -এর বাসভবনের দিকে চলতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বাড়ির বাইরে উপস্থিত হয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ব্যক্তি উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন যে, কোষবদ্ধ তলোয়ারসহ ওমর

দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঝটপট রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তা জানানো হলো। উপস্থিত লোকজন যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি অবস্থায় সংঘবদ্ধ হয়ে গেলেন। সকলের মধ্যে এ সন্ত্রস্ত ভাব দেখে হামযা রা. জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার, কী এমন হয়েছে?" সবাই উত্তর দিলেন, "ওমর বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।"

হামযা রা. বললেন : "ঠিক আছে। ওমর এসেছে, দরজা খুলে দাও। যদি সে সদিচ্ছা নিয়ে এসে থাকে, তাহলে আমাদের তরফ থেকেও ইনশা আল্লাহ সদিচ্ছার কোনই অভাব হবে না। আর যদি সে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এসে থাকে, তাহলে আমরা তাকে তার তলোয়ার দ্বারাই শেষ করব।" এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরের ভেতরে অবস্থান করছিলেন। তখন তাঁর ওপর অহী নাযিল হচ্ছিল। অহী নাযিল শেষ হলে তিনি ওমরের কাছে আসলেন। তিনি তাঁর কাপড় ও তরবারির কোষ ধরে শক্তভাবে টান দিয়ে বললেন : "ওমর! যেমনটি ওয়ালিদ বিন মুগীরার ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল, সেরূপ আল্লাহর তরফ থেকে যতক্ষণ না তোমার ওপর লাঞ্ছনা, অবমাননা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি অবতীর্ণ হচ্ছে, ততক্ষণ কি তুমি পাপাচার থেকে ফিরে আসবে না"?

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, "হে সর্বশক্তিমান প্রভু! তোমার ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছাই হচ্ছে চূড়ান্ত। এ ওমর বিন খাত্তাবের দ্বারা ইসলামের শক্তি এবং সম্মান বাড়িয়ে দাও।" রাসূলের ﷺ এ প্রার্থনা শুনে ওমর রা.-এর হৃদয়ে এমনি এক স্পন্দনের সৃষ্টি হতে থাকল যে, তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং পাঠ করলেন-

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ۔

"আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। আর সত্যই আপনি আল্লাহর রাসূল।"

ওমর রা.-এর মুখ থেকে তাওহীদের এ বাণী শোনামাত্র ঘরের ভেতর থেকে সাহাবায়ে কিরাম এত জোরে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে, মসজিদুল হারামে অবস্থানকারী লোকেরাও তা স্পষ্টভাবে শুনতে পেলেন।[১২]

সকলেই এতে একমত যে, তিনি কুরআন পাঠ করে অথবা শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর সমস্ত জীবনে এ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চরম রোষের সময়ও যদি কেউ তাঁর সম্মুখে কুরআনের আয়াত পাঠ করত তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তার ক্রোধ

---

[১২] তারীখে ইবনে ওমর পৃ. ৭. ১০ ও ১১। শাইখ আব্দুল ও ফাহহাব. মোখতাসারুস সীরাহ পৃ. ১০২ ও ১০৩। সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড. পৃ. ৩৪৩-৩৪৬।

দূরীভূত হতো এবং তিনি শান্তভাবে কথা আরম্ভ করতেন। ইবনে সাদ-এর মতানুসারে তিনি পঁয়তাল্লিশ জন পুরুষ এবং এগারোজন মহিলার পরে মুসলমান হন। তাঁর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ না করায় তিনি কুরআনের নির্দেশানুসারে মুশরিক স্ত্রীকে তালাক দেন।

৮. মুশরিকদের কাছে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম প্রচার

গোটা আরবে এটা সর্বজনবিদিত বিষয় ছিল যে, ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন খুবই প্রতাপশালী ও প্রভাবশালী। তিনি এতই প্রতাপশালী ছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো সাহস সে সমাজে কারোরই ছিল না। এ কারণে তাঁর মুসলমান হয়ে যাওয়ার কথা প্রচার হওয়ামাত্র মুশরিক মহলে কান্না ও বিলাপ শুরু হয়ে গেল। তারা বড়ই লাঞ্ছিত ও অপমানিত বোধ করতে লাগল। এ দিকে তার ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মুসলমানদের শক্তি, সাহস ও মান-মর্যাদা বহুগুণ বেড়ে গেল। তাঁদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার প্রবাহিত হতে থাকল। ইবনে ইসহাক (রহ.) ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উদ্ধৃতি থেকে বর্ণনা করেন যে, "যখন আমি মুসলমান হলাম তখন চিন্তা-ভাবনা করতে থাকলাম যে, মক্কার কোন্ কোন্ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচাইতে প্রভাবশালী শত্রু হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। অতঃপর মনে মনে বললাম: আবু জেহেলেই হচ্ছে তাঁর সবচাইতে বড় শত্রু। তখনই তার ঘরে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলাম। সে বের হয়ে এসে (খোশ আমদেদ, খোশ আমদেদ) বলে আমাকে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাগত জানাল। সে বলল, "কীভাবে এ অভাগার কথাটা আজ মনে পড়ে গেল?"

উত্তরে কোনো ভূমিকা না বলেই আমি সরাসরি বললাম: "তোমাকে আমি একথা বলতে এসেছি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীনে আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। যা কিছু আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তার ওপরও বিশ্বাস স্থাপন করেছি।" আমার কথা শোনামাত্রই সে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল : "আল্লাহ তোমায় ধ্বংস করুন এবং যা কিছু আমার নিকট নিয়ে এসেছ সে সবেরও মন্দ করুন[১৩]।

৯. কুরাইশদের অত্যাচার থেকে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও রক্ষা পায়নি

ইমাম ইবনে জাওযী ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, যখনই কোনো ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যেত; তখনই লোক তাঁর পিছু ধাওয়া করত, তাকে মারধর করত, সেও তাদের পাল্টা জবাব দিত। এজন্য যখন আমি মুসলমান হয়ে গেলাম, তখন আমার মামা আসী বিন হাশিমের কাছে গেলাম। তাঁকে আমার

---

[১৩] ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯ ও ৩৫০।

মুসলমান হয়ে যাওয়ার খবর জানালাম। আমার কথা শোনামাত্রই সে ঘরের ভেতর চলে গেল। তারপর কুরাইশদের একজন বড় নেতার বাড়িতে গেলাম (সম্ভবত আবু জেহেলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে) এবং তাকে বিষয়টি সম্পর্কে জানালাম; কিন্তু সেও গিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল[১৪]।

ইবনে হিশাম ও ইবনে জাওযী বর্ণনা করেছেন যে, যখন ওমর মুসলমান হলেন, তখন তিনি জামীল বিন মা'মার জুমাহির কাছে গেলেন। কোনো কথা বা তথ্য প্রচার করা কিংবা ঢোল-শোহরত করার ব্যাপারে সে কুরাইশদের মধ্যে বিখ্যাত ছিল। ওমর তাকে বললেন : তিনি মুসলমান হয়ে গেছেন। একথা শোনামাত্র খুব উচ্চ কণ্ঠে সে ঘোষণা করতে থাকল : খাত্তাবের পুত্র ওমর বেদীন হয়ে গেছে। ওমর তার পেছনেই ছিলেন। সাথে সাথে তিনি এ বলে উত্তর দিলেন যে, " সে মিথ্যা বলছে, আমি বেদীন হইনি বরং মুসলমান হয়েছি।"

সবাই তাঁর ওপর চড়াও হলো এবং মারপিট শুরু হয়ে গেল। এক পক্ষে জনতা এবং অন্য পক্ষে ওমর। এত সময় ধরে মারপিট চলতে থাকল যে, সে অবস্থায় সূর্য প্রায় মাথার উপর এসে পড়ল। ওমর ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। লোকজন তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। ওমর বললেন : "যা খুশি করো। আল্লাহর শপথ! আমরা যদি সংখ্যায় তিনশত হতাম, তাহলে মক্কায় তোমরা অবস্থান করতে, না আমরা অবস্থান করতাম একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যেত।"[১৫]

এ ঘটনার পর মুশরিকগণ আরও রাগান্বিত ও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠল এবং ওমর-এর বাড়ি আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। যেমনটি সহীহ্ বুখারী শরীফের মধ্যে ইবনে ওমর হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন যে, মক্কার পৌত্তলিকদের আক্রমণের আশঙ্কায় ওমর ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘরের মধ্যেই অবস্থান করছিলেন। এমন সময় আবু আমর আস বিন ওয়ায়েল সাহমী সেখানে আসলেন। সে ইয়েমেন দেশের তৈরি নকশাদার জোড়া চাদর ও রেশম দ্বারা সুসজ্জিত চমকদার জামা পরিহিত অবস্থায় ছিল। তাঁর সম্পর্ক ছিল সাহম গোত্রের সঙ্গে। জাহেলিয়াত যুগে এ গোত্র বিপদ-আপদে আমাদের সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল।

সে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার'?

ওমর বললেন : "আমি মুসলমান হয়ে গেছি এবং এজন্যই আপনার জাতি আমাকে হত্যা করতে চাচ্ছে। আস বলল : "তা সম্ভব নয়"। আস-এর একথা

---

১৪ তারীখ ওমর বিন খাত্তাব পৃ. ৮।

১৫ তারীখ ওমর বিন খাত্তাব পৃ. ৮ ও ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮ ও ৩৪৯।

শুনে আমি মনে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম, কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলাম। তারপর আস সেখান থেকে ফিরে গিয়ে লোকজনদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। তখন জনতার ভিড়ে সমস্ত উপত্যকা ভরে গিয়েছিল।

সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞেস করল : "তোমরা কোথায় চলেছ?" উত্তরে তারা বলল : "আমরা চলেছি খাত্তাবের ছেলেকে শায়েস্তা করতে। কারণ সে বেদীন (বিধর্মী) হয়ে গেছে।" আস বলল : "না সেদিকে যাবার কোনো পথ নেই।" একথা শোনামাত্রই জনতা আর অগ্রসর না হয়ে, তাদের আগের স্থানের দিকে ফিরে গেল।[১৬]

ইবনে ইস্‌হাক (রহ.)-এর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে- "আল্লাহর শপথ, তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, যেন তারা সমস্ত লোকজন একখানা কাপড় ছিল, যাকে উপর হতে প্রচণ্ড বেগে টান দিয়ে নিক্ষেপ করা হয়েছে।[১৭]

১০. প্রকাশ্যে নামায আদায় ও কা'বা যিয়ারত

ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণে কাফেরদের এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যা ইতপূর্বে আলোচিত হয়েছে। অপরপক্ষে মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে জানা যাবে পরের ঘটনাটি থেকে। ইবনে আব্বাস (রা.) হতে মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন- "আমি ওমর বিন খাত্তাব (রা.)কে জিজ্ঞেস করলাম : কী কারণে আপনার উপাধি 'ফারূক' হয়েছে? তখন তিনি আমাকে বললেন : "আমার তিনদিন আগে হামযা (রা.) মুসলমান হয়েছিলেন"। অতঃপর তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করে শেষে বললেন যে, "আমি যখন মুসলমান হলাম তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমরা কী সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই, যদিও জীবিত থাকি কিংবা মরে যাই?"

রাসূল (সা.) ইরশাদ করলেন : "অবশ্যই! সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমরা যদিও জীবিত থাক কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হও– তোমরা হক বা সত্যের ওপরই তোমরা রয়েছ।"

ওমর (রা.) বললেন : "তখন আমি সকলকে লক্ষ করে বললাম : গোপনীয়তার আর কী প্রয়োজন? সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন, আমরা অবশ্যই গোপনীয়তা পরিহার করে বাইরে যাব। অতঃপর আমরা দুটি সারি বেঁধে রাসূলুল্লাহ (সা.)কে দুসারির মধ্যে নিয়ে বাইরে এলাম। এক সারির সামনে ছিলেন হামযা (রা.) আর অন্য সারির সামনে ছিলাম আমি। আমাদের চলার কারণে রাস্তায় চাক্কীর আটার মতো হালকা হালকা ধূলিকণা উড়ে

---

[১৬] সহীহ বুখারী, ওমর বিন খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়, প্রথম খণ্ড ৫৪৫ পৃ.।

[১৭] ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড ৩৪০ পৃষ্ঠা।

যাচ্ছিল। এভাবে যেতে যেতে আমরা মসজিদুল হারামে গিয়ে প্রবেশ করলাম। "কুরাইশগণ যখন আমাকে এবং হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মুসলমানদের সঙ্গে দেখল, তখন মনে মনে তারা এত আঘাত পেল যে, এমন আঘাত ইতঃপূর্বে আর কখনও পায়নি। সে দিনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উপাধি দিয়েছিলেন 'ফারূক'।"[১৮]

"ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেননি; ততদিন পর্যন্ত আমরা কা'বাগৃহের কাছে নামায আদায় করতে সাহস করিনি। সুহাইব বিন সিনান রুমী বর্ণনা করেছেন যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যেদিন ইসলাম গ্রহণ করলেন সেদিন থেকে ইসলাম তার গোপন কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল বাইরের জগতে। সেদিন থেকে প্রকাশ্যে প্রচার এবং মানুষকে প্রকাশ্যে দীনের প্রতি আহ্বান জানানো সম্ভব হলো।

আমরা গোলাকার হয়ে আল্লাহর ঘরের পাশে বৈঠক করলাম, আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করলাম। যারা আমাদের ওপর অন্যায়-অত্যাচার করল আমরা তার প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং তাদের কোনো কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদও করলাম।[১৯]

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেন : "যখন থেকে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান হয়েছিলেন, তখন থেকে আমরা সমানভাবে শক্তিশালী হয়েছিলাম এবং মান-সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পেরেছিলাম।"[২০]

[১৮] ইবনে জাওযী-তারীখে ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ৬-৭ পৃ.।

[১৯] ইবনে জাওযী, তারীখে ওমর বিন খাত্তাব পৃ. ১৩।

[২০] সহীহ বুখারী, ওমর বিন খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অধ্যায় ১ম খ. ৫৪৫ পৃ.।

১১. আল-ফারূক উপাধি লাভ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আল-ফারুক উপাধি দেন। ওমর ইসলাম প্রচারের জন্য জনগণকে ডাকার জন্য আগ্রহী ছিলেন। মুসলিম হওয়ার পর তিনি প্রকাশ্যে কা'বাগৃহে নামায পড়তে আহ্বান করেন। তিনি বলেন, হে রাসূল ﷺ ইসলাম কী সত্য ধর্ম নয়! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অবশ্যই। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এমন কথা শুনে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺকে কা'বাঘরে প্রকাশ্যে নামায পড়তে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, এখন থেকে আমরা আর গোপনে ইসলাম প্রচার করব না।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতেন এমনকি নিজেদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদও গোপন রাখতেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের অনুমতি দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলাম প্রচারের জন্য সাহাবিদেরকে দুটি দলে বিভক্ত করেন। এক দলের দলপতি হলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যটির দলপতি হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম পবিত্র কা'বাঘরে প্রবেশ করলেন সাহাবিদেরকে কা'বাঘরে নামায পড়তে আহ্বান করলেন। তাঁর আহ্বানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নেতৃত্বে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম প্রকাশ্যে সালাত অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ দেখতে পেল তাদের সাথে হামযা ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা রয়েছে। তখন ব্যাপারটি তাদের কাছে আরও পীড়াদায়ক মনে হলো। বিগত সময়ে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল এটা তাঁর চেয়েও বেশি কিছু ছিল। আর ঐদিনই ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এ উৎসাহী ও সাহসিকতার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আল-ফারূক উপাধি দেন; যার অর্থ 'সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী'।[21] ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুসলমানগণ কা'বাগৃহের কাছে প্রার্থনা করতে যেতে পারত না। তিনি কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন, যতক্ষণ না তারা মুসলমানদেরকে সেখানে যেতে দেয় এবং নামায পড়তে দেয়।

---

[21] হায়াতুল আওলিয়া : ১-৪০, সিফাতুস সাদওয়া :১/১০৩, ১০৪

অধ্যায়-২

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মাদানী জীবন

১. মদিনায় হিজরত

যখন ইসলাম দিন দিন জনসাধারণের মধ্যে বেশ দানা বেঁধে উঠতে লাগল, তখন তারা শক্তি প্রয়োগ করে তার অস্তিত্ব দুনিয়া হতে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হলো। আবু তালেবের জীবদ্দশায় যদিও তারা কোনোকিছু করতে সক্ষম হয়নি, তাঁর ইন্তেকালের পর চতুর্দিক হতে কাফেররা আক্রমণ চালাতে আরম্ভ করল। মুসলমানদের মধ্যে যার ওপর তাদের ক্ষমতা চলত তাকে ভীষণভাবে উৎপীড়িত করতে আরম্ভ করল। যদি তখনকার মুসলমানদের ঈমানের তেজ ও ইসলামের প্রতি প্রবল আকর্ষণ না থাকত, তবে হয়ত ইসলাম তখনই দুনিয়ার বুক হতে মুছে যেত। মুসলমানদের ওপর ক্রমাগত চার-পাঁচ বছর অমানুষিক অত্যাচার চলছিল। এটা মানব ইতিহাসের এক মর্মান্তিক অধ্যায়। ইতোমধ্যে মহান আল্লাহর নির্দেশে সাহাবারা গোপনে মদিনায় হিজরত করতে শুরু করে। উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন হিজরত করতে চাইলেন, তখন তিনি গোপনে দেশ ত্যাগের পরিবর্তে কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে তিনি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন, পারলে যেন তাকে বাধা দেয়। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, একদা আলী বিন আবী তালিব তাঁকে বলেছিলেন, আমি যতদূর জানি মক্কার সকলেই গোপনে দেশ ত্যাগ করেছিল একমাত্র উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছাড়া। হিজরতের সময় তিনি তলোয়ার কোমরবদ্ধ করলেন, ধনুক প্রস্তুত করলেন, হাতে কিছু তীর নিলেন এবং 'আনাযাহ' নামক একটি ছোট ছড়ি[22] হাতে নিলেন তিনি এ সকল প্রস্তুতি শেষ করে কাবার দিকে রওয়ানা দিলেন। ইতোমধ্যে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ কাবা প্রান্তরে জমায়েত হলো।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলতে লাগলেন- উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাওয়াফ শেষ করে মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি কুরাইশদের জমায়েতের দিকে গেলেন, এবং তাদের সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, তোমাদের চেহারা ধূলিমলিন হোক! তোমাদের কেউ যদি চায় তার মা সন্তানের জন্য দুঃখ বোধ করুক, অথবা যদি চায় তার সন্তানেরা এতিম হোক অথবা যদি চায় তার স্ত্রী বিধবা হোক সে

---

[22] আনাযাহ হচ্ছে লম্বায় বর্শার অর্ধেক, সাধারণ আকারের ছড়ি থেকে কিছুটা লম্বা এবং বর্শার চেয়ে বেশি মজবুত এক প্রকার ছড়ি

যেন এ উপত্যকার পেছনে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু পরবর্তীতে ঘটনাটি স্মরণ করে বলেন। কুরাইশদের একজন লোকও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বের হয়ে আসার সাহস করেনি।

অতঃপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশজন আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবসহ মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। এ বিশজনের মধ্যে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সহোদর যায়েদ, ভ্রাতুষ্পুত্র সাঈদ এবং জামাতা খুনাইসও ছিলেন।

ঐ সময়ে যারা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাদের মধ্যবর্তী দলের সদস্য। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হিজরাতের আগে মুসআব ইবনে উম্মে মাকতুম, বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আরও কিছু সাহাবি মদিনায় পৌছে ছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পূর্বে হিজরত করেছিলেন। তাঁদের এ হিজরতই পরবর্তীদের মদিনায় হিজরাতের পথ সুগম করেছিল।[২৩]

২. আযান প্রবর্তনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতামত

মক্কায় বসবাসকালে সাহাবিরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করত; তবে প্রকাশ্যে নামায পড়ার সুযোগ না থাকায় নামাযের জন্য আহ্বানের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। মদিনায় হিজরতের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য আহ্বানের ইচ্ছা পোষণ করলেন। সেই যুগে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপাসনালয়ে আহ্বানের জন্য শঙ্খধ্বনি ও ঘন্টার ব্যবস্থা ছিল। এজন্য অনেক সাহাবি নামাযের জন্য আহ্বানের উপায় হিসেবে শঙ্খধ্বনি ও ঘন্টার সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। কোনো সাহাবির নিকট এটা অন্য ধর্মের অনুকরণ বলে আপত্তি ছিল। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ ব্যাপারে সকলের পরামর্শ চাইলেন। এমতাবস্থায় ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, নামাযের আহ্বানের জন্য একজনকে নিযুক্ত করলে কেমন হয়? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আযানের নির্দেশ দেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য এর এটি অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে, তার প্রস্তাব ইসলামের একটি বিধানে প্রবর্তিত হয়।
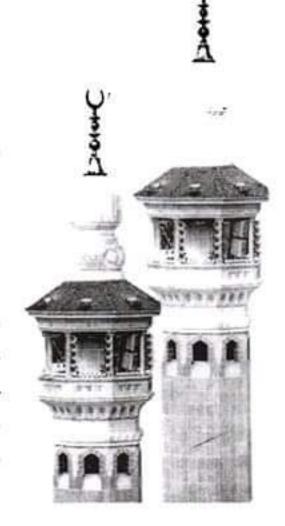
[23] আত তাওহীদ ফী সিরাতিল ফারুক : ৩০

৩. মদিনায় রাসূলুল্লাহ -এর পাশে ওমর

হিজরি প্রথম বর্ষ হতে রাসূলে করীম -এর তিরোধান পর্যন্ত ওমর -এর কর্ম-জীবন প্রকৃতপক্ষে রাসূলে করীম -এর কর্মময় জীবনেরই একটা অংশবিশেষ। রাসূল কে যে সমস্ত যুদ্ধ করতে হয়েছিল, ভিন্ন জাতির সাথে যে সমস্ত চুক্তি করতে হয়েছিল কিংবা সময় সময় যে সমস্ত বিধি-বিধান প্রবর্তন করতে হয়েছিল এবং ইসলাম প্রচারের জন্য যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল, তন্মধ্যে এমন একটি ঘটনাও নেই, যা ওমর -এর সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত সম্পাদিত হয়েছে। এজন্যই এ সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিখতে গেলে তা ওমর -এর জীবনী না হয়ে রাসূলে করীম -এর জীবনীতে পরিণত হয়ে যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ -এর সাথে সকল যুদ্ধাভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

বদর যুদ্ধে ওমর

দ্বিতীয় হিজরি ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত বদর যুদ্ধে পরামর্শদান ও সৈন্য চালনা হতে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই ওমর রাসূলুল্লাহ -এর সাথে দৃঢ়ভাবে কাজ করেন। তাঁর ১২ জন আত্মীয় মুসলমানদের পক্ষে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কোনো আত্মীয় বা বংশের লোক কুরাইশদের পক্ষ হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি। তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের কারণে কুরাইশ বংশের প্রত্যেক শাখা হতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও ওমর -এর বনু আদী গোত্রের কোনো লোক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যোগদান করেনি। ওমর তাঁর আপন মামা আসী ইবন হিশামকে হত্যা করে সর্বপ্রথম প্রমাণ করলেন সত্যের সাথে আত্মীয় ও প্রিয়জনের প্রভাব প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। এ যুদ্ধে প্রথম শহিদ হলেন ওমর -এর গোলাম মাহ্জা । বদর যুদ্ধে ৭০ জন কাফের বন্দি সম্পর্কে ওমর -এর পরামর্শই আল্লাহ তা'আলার পছন্দ হয়েছিল।

আর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ঘোষণা করেন, "এখন তোমাদের যা ইচ্ছে হয় কর, তোমাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে।" ওমর একথা শুনে অশ্রুসিক্ত হলেন এবং বললেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল ই ভালো জানেন।

উহুদ যুদ্ধে ওমর রাঃ

তৃতীয় হিজরি ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত উহুদ যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-সহ মুসলমানরা একত্র হয়ে পাহাড়ের উপর আশ্রয় নিলেন, তখন কাফেরদের একটি দল পাহাড়ে উঠার উদ্যোগ নিলে ওমর রাঃ একদল মুহাজির নিয়ে মোকাবিলা করে তাদের বিতাড়িত করেন। উহুদ যুদ্ধে বিপর্যয় মুহূর্তেও তিনি নিজের স্থানে অটল ছিলেন।

→ মুসলমানদের বিপদ মুহূর্তে কাফের নেতা আবু সুফিয়ান চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে কী মুহাম্মদ জীবিত আছে?

→ রাসূলুল্লাহ ﷺ কৌশলগত কারণে সাহাবিগণকে উত্তর দিতে নিষেধ করলেন।

→ আবু সুফিয়ান আবার জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মাঝে কী আবু বকর, ওমর জীবিত রয়েছে? কোনো উত্তর না পাওয়ায় সে বুঝে নিল যে, তাদের কেউই বেঁচে নেই।

→ ওমর রাঃ চুপ থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন- "হে আল্লাহর দুশমন! আমরা সবাই জীবিত আছি।"

→ আবু সুফিয়ান এ জবাব শুনে বলে উঠল- "জয় হুবলের, জয় হুবলের।"

→ রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমর রাঃ-কে বললেন এর জবাবে বলো- "আল্লাহই সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন।"

→ আবু সুফিয়ান এ জবাব শুনে বলল- "আমাদের উজ্জা দেবী রয়েছে, তোমাদের কোনো উজ্জা দেবী নেই।"

→ রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমর ﵁কে বললেন এর জবাবে বলো- "আল্লাহ আমাদের পৃষ্ঠপোষক, তোমাদের কোনো পৃষ্ঠপোষক নেই।"

→ আবু সুফিয়ান আগামী বছর আবার যুদ্ধের কথা বললে রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করলেন, বলে দাও- "হ্যাঁ, এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম।"

এভাবে আবু সুফিয়ান ওমর ﵁-এর দৃঢ় জবাব শুনে হতবাক হয়ে স্থান ত্যাগ করল এবং সকল কাফের উহুদ প্রান্তর ছেড়ে মক্কায় চলে গেল। তখন আবু সুফিয়ান বলল, তুমি ইবনে কিয়ামাহ থেকে বেশি সত্যবাদী ও বিশ্বাসযোগ্য। (অর্থাৎ আমি বিশ্বাস করি তুমি সত্য বলছ)[২৪]
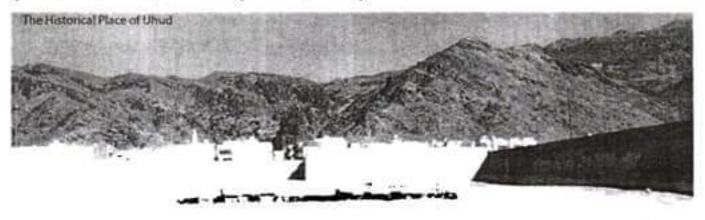
খন্দক যুদ্ধে ওমর ﵁

পঞ্চম হিজরি ৬২৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধে ওমর ﵁ অসীম বীরত্ব এবং সমর-কুশলতার পরিচয় দান করেন। তিনি নিজেই পরিখা খননের কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবির মতো রাসূলুল্লাহ ﷺ ওমর ﵁কে এক জায়গায় মোতায়েন করেছিলেন। একদিন কাফেররা প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করতে উদ্যত হলে ওমর ﵁ অপর সাহাবি যুবাইর ﵁-সহ একত্রে অগ্রসর হয়ে প্রচণ্ডভাবে তীর নিক্ষেপ করলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে শত্রু-সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। শত্রুপক্ষ পেছনে হটে গেল। আরেক দিন কাফেররা অধিক তৎপর ও মরিয়া হয়ে মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হলে, ওমর ﵁-ও প্রাণপণে তাদেরকে আক্রমণ করলেন। শেষ পর্যন্ত শত্রুরা পালাতে বাধ্য হলো। তাদেরকে দমন করতে গিয়ে আসরের নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হবার উপক্রম হয়। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺকে অবগত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহর কসম! আমিও আজ এ নামায

[২৪] সীরাতুন্নবীয়াহ আস সহীহাহ : ২/৩৯২

আদায় করতে পারিনি। বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি সূর্যাস্তের পর প্রথমে আসরের নামায এবং পরে মাগরিবের নামায আদায় করলেন।

ওমর খন্দকের (পরিখা) যে দিকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, সেখানে আজও তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদ স্মৃতি ধারণ করে আছে। উল্লেখ্য যে, এ যুদ্ধে আলী কাফেরদের বিশিষ্ট নামকরা বীর আমর ইবন আবদকে হত্যা করলে তাদের মনোবল ভেঙে পড়ে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! আপনি কাফেরদেরকে পরাজিত করুন এবং তাদেরকে ভীত ও কম্পিত করে দিন।" অতঃপর অবরোধের ২৭ দিন পর রাতেরবেলা প্রচণ্ড ঝড় হলে তাদের তাঁবু, চুলা, ডেকছি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ-এর ওপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন, "এবং আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেছিলাম এবং এমন এক বাহিনী, যা তোমরা দেখতে পাওনি।"

বনু মুস্তালিক যুদ্ধে ওমর

বনু মুস্তালিক যুদ্ধে ওমর অগ্রবর্তী বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি কাফেরদের এক গুপ্তচরকে গ্রেফতার করে তার কাছ থেকে কাফেরদের সার্বিক অবস্থা জেনে তাকে হত্যা করেন। ফলে কাফেরদের অন্তরে অত্যন্ত ভীতিকর প্রভাব সৃষ্টি হয়। ওমর-এর ওপর এ দায়িত্বও ছিল যে, তিনি সৈন্যদের মাঝে ঘোষণা করে দিবেন, "যারা কালেমা পাঠ করবে, তাদের ওপর যেন কোনো মুসলমান হামলা না করে।" তিনি যুদ্ধে সৈন্যদের মাঝে তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন।

বানু মুস্তালিক অভিযানে আনসার ও মুহাজরিদের মাঝে একজন ব্যক্তির লাথি মারাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই বলতে লাগল, তারা কি সত্যিই এরূপ আচরণ করেছে। দেখ, আল্লাহর কসম, মদিনায় ফেরার পর আমরা আমাদের সম্মানীত (অর্থাৎ মদিনার নিজস্ব অধিবাসী) ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অসম্মানীত ব্যক্তিদেরকে (অর্থাৎ যারা মদিনায় হিজরত করে এসেছে) বের করে দিব। উক্ত সংবাদ আল্লাহর রাসূলের কানে পৌছল এবং উমর তখন তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে অনুমতি দিন আমি উক্ত মুনাফিকের মাথা উড়িয়ে দেই। রাসূল বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, তা না হলে লোকেরাই বলাবলি করবে মুহাম্মাদ তাঁর সাথিদেরকে মেরে ফেলছে।[২৫]

[25] সীরাতুন্নববীয়াহ আস সহীহাহ : ২/৪০৯

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে ওমর (রা)

ষষ্ঠ হিজরিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় চৌদ্দ শত সাহাবিকে সাথে নিয়ে মক্কায় ওমরা করতে রওনা হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে অস্ত্র নিতে নিষেধ করলেন। কারণ, যাতে কুরাইশরা মনে করতে না পারে যে, মুসলমানগণ ওমরার অজুহাতে যুদ্ধ করতে এসেছে। ওমর (রা)-ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশে নিরস্ত্র অবস্থায় এসেছিলেন। তাঁরা যখন যুল হুলাইফা নামক স্থানে পৌছলেন তখন ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রুদের মধ্যে মক্কায় প্রবেশ করা আমাদের উচিত হবে না। বে-দীনদের কোনো ধর্ম নেই। তারা হঠাৎ আমাদেরকে আক্রমণ করে জীবন শেষ করে দিতেও তো পারে। তখন আত্মরক্ষা করার মতো আমাদের তো কোনো উপায় থাকবে না।

ওমর (রা)-এর পরামর্শে অস্ত্র আনা হলে কাফেলা আবার যাত্রা শুরু করল। মক্কা হতে কয়েক মঞ্জিল দূরে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে অবস্থান করতে লাগলেন। অতঃপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এ স্থান হতে দূত পাঠিয়ে কুরাইশদেরকে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানাবেন যে, তাঁরা যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আসেননি, শুধু ওমরা পালনের উদ্দেশ্যেই এসেছেন। দূত হিসেবে প্রথমে ওমর (রা)-কেই নির্বাচন করা হলো। শুনে ওমর (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! মক্কার লোক আমার প্রতি ক্ষিপ্ত। তাছাড়া সেখানে আমার কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই। আমার সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না। আমার পরিবর্তে উসমান (রা)-কে পাঠানো হোক, মক্কার লোক তাঁকে খুব শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। সেখানে তাঁর বহু আত্মীয়-স্বজনও রয়েছে, আমার মতে তাঁকেই এ কাজে পাঠানো উচিত। প্রস্তাবটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পছন্দ হলো। তিনি উসমান (রা)-কে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। মক্কায় পৌছার সাথে সাথেই কুরাইশরা ওসমানকে আটক করে। এদিকে মুসলমানদের মধ্যে গুজব রটল যে, কুরাইশরা উসমান (রা)-কে হত্যা করেছে। এ খবরে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব ব্যথিত হলেন। সাহাবাগণ উসমান (রা)-এর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরি হলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত লোককে একটি বৃক্ষের নিচে সমবেত করে শপথ গ্রহণ করালেন। এদিকে ওমর (রা) যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। জনৈক আনসারীর নিকট হতে একটা ঘোড়া আনার জন্য তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ (রা)-কে তাঁবুর বাইরে পাঠালেন। আব্দুল্লাহ (রা) বাইরে এসে দেখতে পেলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের যুদ্ধের জন্য শপথ করাচ্ছেন। আব্দুল্লাহ (রা) তাঁর পিতার নিকট

ফিরে এসে শপথের কথা জানালেন। ওমর তাড়াতাড়ি নবীজীর নিকট আসলেন এবং তাঁর হাতে হাত রেখে যুদ্ধের শপথ নিলেন। এ খবর তড়িৎ গতিতে কুরাইশদের কানে যাওয়ায় তারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। মুসলমানদের বীরত্ব তারা কয়েকবারই পরীক্ষা করেছে। এখন যদি তাদেরকে শান্ত করা না যায়, তাহলে মহাবিপদ। এ বিবেচনায় তারা উসমান -কে ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই নবীজীর নিকট দূত পাঠাল। বেশ কয়েকবার দূত মাধ্যমে আলাপ-আলোচনার পর রাসূলুল্লাহ অবশেষে তাদের সাথে সন্ধি করতে রাজি হলেন।

ষষ্ঠ হিজরি ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলো বাহ্যদৃষ্টিতে মুসলমানদের প্রতি অপমানজনক মনে হলে ওমর এর কঠোর বিরোধিতা করে তীব্র প্রতিবাদ করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ -কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কী সত্য রাসূল নন? তিনি বললেন : কেন নই? আমরা কী মুসলমান নই? তিনি বললেন : কেন নও? আরজ করলেন, তা হলে আমরা দীনের ব্যাপারে কেন নত হবো? রাসূলুল্লাহ আল্লাহর নির্দেশের কথা উল্লেখ করে বলেন : আমি আল্লাহর নবী। তাঁর আদেশ ব্যতীত আমি কোনো কাজ করি না। এ উক্তি শুনে ওমর একেবারেই চুপ হয়ে গেলেন। ওমর যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, তখন খুবই লজ্জিত হলেন। এ ব্যাপারে তাঁর নিজের বর্ণনা হচ্ছে এই যে, "আমি সেদিন যে ভুল করেছিলাম এবং যে কথা বলেছিলাম, এতে ভীত হয়ে আমি অনেক আমল করেছি, প্রচুর দান খয়রাত করে আসছি, রোযা রেখে আসছি এবং দাস মুক্ত করে আসছি। এত শত করার পর এখন আমার মঙ্গলের আশা করছি।[২৬] পরবর্তীকালে হুদায়বিয়ার সন্ধি মুসলমানদের সাফল্যের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতাহ নাযিল করেন।
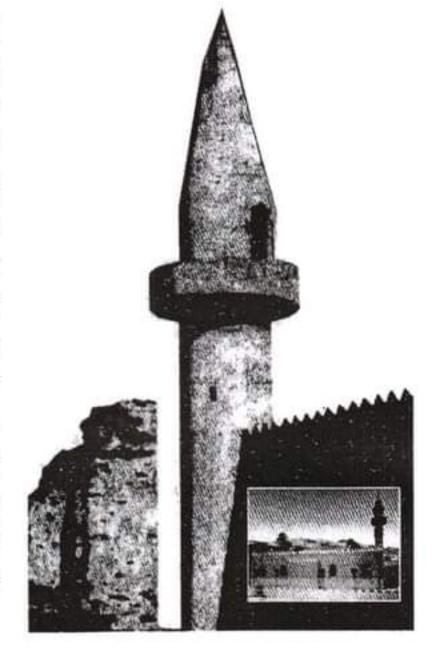
[২৬] ফতহুল বারী ৭ম খ. পৃ. ৪৩৯-৪৫৮, ইবনে হিশাম ২য় খ. ৩০৮-৩২২ পৃ.।

খায়বারের যুদ্ধে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

সপ্তম হিজরি ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত খায়বারের যুদ্ধ ছিল ইহুদিদের বিরুদ্ধে। ইহুদিরা মদিনা আক্রমণের জন্য বেদুইনদের সহায়তায় ৪,০০০ সৈন্য নিয়ে খায়বারে অবস্থান করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৬০০ সাহাবি নিয়ে খায়বারের উদ্দেশে রওনা হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং পরে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সেনাপতি করে পাঠালেন। তিনি উপর্যুপরি দু'দিন যুদ্ধ করেন, তৃতীয় দিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ইসলামের পতাকা দিয়ে বললেন : "যাও যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাকে বিজয়ী করেন।" ইহুদিরা পরাজিত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ) উপাধি এবং বিখ্যাত 'জুলফিকার' তরবারি উপহার দিলেন। উল্লেখ্য যে, এ যুদ্ধে নৈশপ্রহরার দায়িত্বে পরপর এক এক সাহাবি নিযুক্ত হতেন। যে রাতে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দায়িত্ব পালন করেন, তিনি সে রাতে এক ইহুদিকে গ্রেফতার করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছ থেকে খায়বার সম্পর্কে যে সকল তথ্য পেলেন, তা খায়বার বিজয়কে সহজতর করে দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে মুসলমানদের সাথে চুক্তিসাপেক্ষে ইহুদিদেরকে কৃষিজমি ও বাগানের অর্ধেক ফসল খাজনা (খারাজ) দেওয়ার শর্তে প্রজা হিসেবে তাদের ভূ-সম্পত্তি দখলে রাখতে ও বসবাস করতে দেওয়া হয়। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতকালের শেষ সময় পর্যন্ত খায়বারে তারা বসবাস করে।

বিদ্রোহী 'হাওয়াযিন' গোত্র দমনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

সপ্তম হিজরি ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী 'হাওয়াযিন' গোত্রকে দমন করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩০ জন সৈন্যসহ ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে প্রেরণ করেন। বিদ্রোহীরা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আগমনের কথা শোনামাত্রই পলায়ন করে এবং কোনো যুদ্ধ না করেই তিনি ফিরে আসেন।

মক্কা বিজয় ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

অষ্টম হিজরি ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা বিজয়ের সময় ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছায়ার মতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সঙ্গ দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতেরবেলা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নেতৃত্বে একদল টহল সেনা নিয়োগ করেন, যাতে ঘুমন্ত অবস্থায় শত্রুপক্ষ অতর্কিত আক্রমণ করতে না পারে। ইসলামের ঘোরশত্রু আবু সুফিয়ান আত্মসমর্পণ করতে এলে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে বন্দি করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাকে হত্যা করার অনুরোধ করে বলেন, "অনুমতি দিন এখনই ওর দফা রফা করে দেই।" কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ক্ষমা করে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দেন। উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন আবু সুফিয়ানকে দেখলেন, তখনই মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র শত্রুতার কথা মনে পড়ল। সাথে সাথে এটাও মনে পড়ল যে, এ আবু সুফিয়ান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিগণের কত ধ্বংস সাধন করেছে। উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর রাগ সবসময়ই ন্যায়ানুগ ছিল। কারণ তিনি কখনই কারও ব্যক্তি শত্রুতাঁর কারণে রাগ করেন নাই; করেছেন শুধুমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। যদিও উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবু সুফিয়ানদের ওপর রাগ করেছেন, তাকে হত্যা করতে চেয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর নতি স্বীকারের মাধ্যমে তাঁর কল্যাণ কামনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দিতে চেয়েছেন এবং তাঁর রক্ত, জীবন ও সম্মানকে পূতঃপবিত্র করতে চেয়েছেন।[২৭] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবির মর্যাদা লাভ করেন। মক্কা বিজয়ের পর পুরুষেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে এবং মহিলারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। বিনা রক্তপাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয় করলেন।

হুনায়নের যুদ্ধে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

অষ্টম হিজরি ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হুনায়ন অভিযানেও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অসীম বীরত্বসহকারে যুদ্ধরত ছিলেন। আরবের হাওয়াযিন গোত্রটি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও খ্যাতিমান ছিল। মুসলমানদের ক্রমোন্নতি দেখে তারা অত্যন্ত শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত

---

27 আল ফারুক মাআন নবী, ড. আতিক মায়াদাহ, পৃ. ৪২

হয়ে পড়ল। তারা যখন দেখল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয় করেছেন, তারা এ মক্কাকে মুসলমানদের কবল হতে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য 'হুনায়ন' নামক স্থানে শিবির স্থাপন করল। এ সংবাদ জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ১২ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে হুনায়েন অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। মুসলমান সৈন্যদের প্রথম আঘাতেই হাওয়াযিন বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। তারা চারদিকে পালাতে শুরু করল। এমন অবস্থায় মুসলিম সৈন্যরা তাদের পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী আহরণে মগ্ন হলেন। এ সুযোগে হাওয়াযিন সৈন্যরা পুনরায় একত্র হয়ে প্রচণ্ডবেগে মুসলমানদেরকে আক্রমণ করল।

কাফেরদের ৬ হাজার সৈন্যের তীব্র আক্রমণে ১২ হাজার মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। সাহাবিগণের মাত্র কয়েকজন বীর এ বিপদকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবু বকর, ওমর, আলী, ফযল ইবন হাইয়ান, ইবনুল হারেছ ও আব্বাস (রা.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[28] রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সময় 'দুলদুল' নামক সাদা খচ্চরের উপর উপবেশন অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে বললেন :

"আমি আল্লাহর নবী–একথা মিথ্যা নয়।

আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর জানবে নিশ্চয়।"

এরূপ দৃঢ় ও বীরত্বপূর্ণ উক্তি মুসলমানদের হিম্মত অনেক গুণ বাড়িয়ে দিল। মুসলমানরা 'নারায়ে তাকবীর' দিয়ে শত্রুদের ওপর তীব্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মুসলমানরাই জয়লাভ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহ্বানে বিক্ষিপ্ত সৈন্যরা পুনরায় একত্র হয়ে শত্রু বাহিনীকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করলে তাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য নিহত এবং ৬ হাজার লোক বন্দি হয়।

তাবুক অভিযানে ওমর (রা.)

নবম হিজরি ৬৩১ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত তাবুক অভিযানে মূলত কোনো যুদ্ধ হয়নি। ওমর (রা.) তাঁর অর্থ-সম্পদ ইসলামের জন্য ব্যয় করেন। তাবুক অভিযানের সময় আরবে ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলছিল। এ অভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিগণের নিকট সাহায্যের আবেদন করলে ওমর (রা.) বাড়িতে যা কিছু ছিল তাঁর সঞ্চিত অর্থ-সম্পদের অর্ধেক যুদ্ধ তহবিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে তুলে দেন, আর অবশিষ্ট অর্ধেক পরিবার-পরিজনের জন্য রাখলেন। খায়বারের বিজিত ভূমি মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হলে ওমর (রা.) তাঁর ভাগের অংশটুকু আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিলেন। ওয়াকফের শর্ত হিসেবে তিনি বলেন- এটাকে বিক্রি

---

[28] সীরাতুন্নবীয়াহ, ইবনে হিশাম : ২/২৮৯; আখবারুল উমর : পৃ. ৪১

করা যাবে না, উপহার হিসেবে দেয়া যাবে না অথবা এর ওপর উত্তরাধিকার চলবে না। (অর্থাৎ বিরতিহীনভাবে এটা দরিদ্রদের কাজে ব্যবহৃত হবে)। তিনি আরও শর্তারোপ করলেন যে, এর উৎপাদিত ফসলাদি নিম্নোক্ত শ্রেণির লোকদের মধ্যে দান করা হবে:

(১) দরিদ্রদের মাঝে।

(২) যিনি এ জমি ওয়াকফ করেছেন তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে।

(৩) দাসদের মধ্যে। যারা দাসত্ব চুক্তি করে রেখেছে তাদের মুক্তির জন্য এর উৎপাদিত ফসল ব্যয় করা যাবে।

(৪) যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছে তাদের মধ্যে।

(৫) অতিথি অথবা শহরে নতুন কোনো আগন্তুক যার সেবাযত্ন প্রয়োজন অথবা এমন মুসাফির যার অর্থকড়ি ফুরিয়ে গেছে অথবা এমন ব্যক্তি যে অর্থাভাবে তাঁর ভ্রমণ শেষ করতে পারছে না তাদের প্রয়োজনে এ অর্থ ব্যয় করা যাবে।

পূর্বোক্ত বর্ণনার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও কিছু ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, উক্ত সম্পত্তি / বাগান যে দেখাশুনা করবে সে যদি সমাজের প্রথা অনুযায়ী কোনো রূপ সঞ্চয় না করে ফসলের কিছু আহার করে, এতে অন্যায় হবে না (গুনাহ হবে না)। এমনকি সে যদি তাঁর বন্ধুকেও আহার করায় তাতেও কোনো গুনাহ হবে না। (অথবা উক্ত সম্পদের মালিকানা দাবি না করে আহার করলে গুনাহ হবে না)।[২৯] এভাবে ইসলামের ইতিহাসে ওয়াকফের প্রচলন হয়।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালে শোকাহত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু

প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু-সংবাদ শোনামাত্র ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হুঁশ-বুদ্ধি লোপ পেতে থাকে। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করেন, কিছুসংখ্যক মুনাফেক মনে করেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেননি; বরং আপন প্রতিপালকের নিকট গমন করেছেন। যেমন মূসা বিন ইমরান (আ.) গমন করেছিলেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে ৪০ রাত অনুপস্থিত থাকার পর তাদের নিকট পুনরায় ফিরে এসেছিলেন। অথচ প্রত্যাবর্তনের পূর্বে বলা হতো যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহর

---

[29] সহীহ আল বোখারী: ২৭৭৩

কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺও অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং ঐ সকল লোকের হাত-পা কেটে দেবেন যারা মনে করছে যে, প্রকৃতই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।"[৩০]

এদিকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সানাহতে অবস্থিত নিজ বাড়ি হতে ঘোড়ায় চড়ে আগমনের পর মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। এরপর লোকদের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা না বলে সরাসরি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট গমন করলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌছালেন। নবী করীম ﷺ-এর দেহ মুবারক তখন জরীদার ইয়েমেনী চাদর দ্বারা ঢাকা ছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে চাদর সরিয়ে তা চুম্বন করলেন এবং অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। আর বললেন, 'আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হোক। আল্লাহ আপনার ওপর দুবার মৃত্যু একত্রিত করবেন না, যে মৃত্যু আপনার ভাগ্যলিপিতে ছিল সেটা এসে গিয়েছে। এরপর তিনি সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। সে সময় ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন ওমর বস। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বসতে অস্বীকার করলেন। এদিকে সাহাবায়েকেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ছেড়ে দিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি অধিক মনোযোগী হলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন-

أَمَّا بَعْدُ. مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا (ص) فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ. قَالَ اللهُ: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِيْنَ.

"আল্লাহর প্রশংসার পর- তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর পূজা করছিলে, তারা জেনে নিক যে, মুহাম্মদ ﷺ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করছিল- অবশ্যই আল্লাহ সর্বদাই জীবিত থাকবেন, কখনোই মৃত্যুবরণ করবেন না। আল্লাহ বলেছেন, 'মুহাম্মদ ﷺ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বের অনেক রাসূল গত হয়ে গিয়েছেন। তবে কি যদি নবী ﷺ মৃত্যুবরণ করেন কিংবা তাঁকে হত্যা করা হয়, তোমরা কি তোমাদের আগের গোমরাহি অবস্থার দিকে ফিরে যাবে? স্মরণ রেখো, যারা আগের অবস্থায় ফিরে

[৩০] ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ৬৫৫ পৃ.।

যাবে তারা আল্লাহর কোনোই ক্ষতিই করতে পারবে না এবং অতি শীঘ্রই আল্লাহর শোকরগোজারদের প্রতিদান দেওয়া হবে।'[৩১]

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম যাঁরা এতক্ষণ পর্যন্ত সীমাহীন শোক-বেদনায় কাতর অবস্থায় নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এ ভাষণ শোনার পর তাঁরা সুনিশ্চিত হলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতই ওফাত লাভ করেছেন। এমতাবস্থায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, 'আল্লাহর কসম! এ বাপারে এমনটি মনে হচ্ছিল, লোকজন যেন জানতই না যে, আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এ আয়াত পাঠ করেন, তখন সকলেই এ আয়াত সম্পর্কে যেন নতুনভাবে জানতে পারলেন। সকলকেই এ আয়াত তিলাওয়াত করতে দেখা গেল।"

সাঈদ বিন মুসাইয়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আল্লাহর কসম! আমি যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ আয়াত পাঠ করতে শুনলাম, তখন আমি নিজেকে খুবই লজ্জিত বোধ করলাম। (অথবা আমার পিঠ ভেঙে পড়ল) এমনকি আমার দ্বারা আমার পা উঠানো সম্ভব হচ্ছিল না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আলাইহিস সালামকে এ আয়াত পাঠ করতে শুনে আমি মাটির দিকে গড়িয়ে পড়লাম। কারণ, আমি তখন বুঝতে সক্ষম হলাম যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকৃতই ইন্তেকাল করেছেন।"[৩২]

---
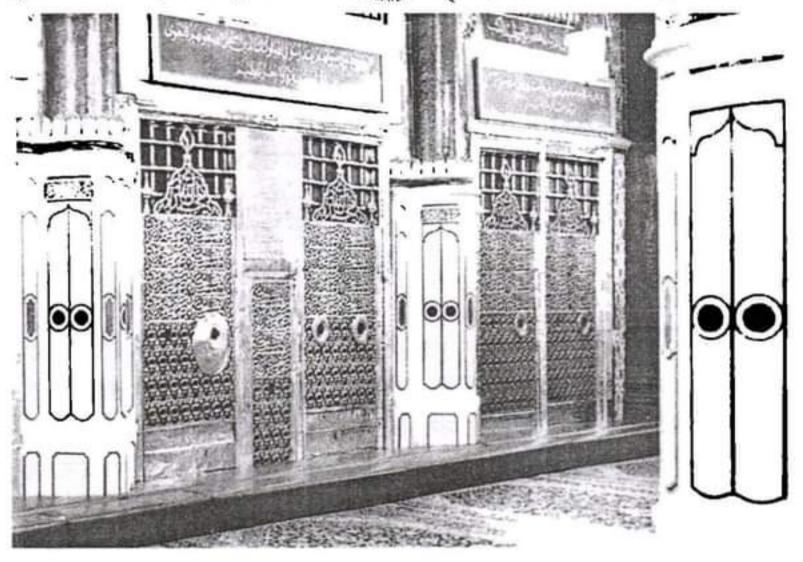
[৩১] আল-কুরআন ৩:১৪৪

[৩২] সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড ৬৪০ পৃ.।

৫. আবু বকর -এর শাসনামলে ওমর

মহানবী -এর ইন্তেকালের পর ছাকীফা-ই বানী সা'ইদা-এর সমাবেশে আবু বকর সিদ্দীক প্রস্তাব করেন যে, ওমর অথবা আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ -এর মধ্য হতে যেকোনো একজনকে খলিফা নির্বাচন করা হোক; কিন্তু উভয়েই তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং সম্মিলিতভাবে আবু বকর -এর আনুগত্য স্বীকার করেন।

আবু বকর সিদ্দীক -এর খিলাফতামলে ধর্ম ত্যাগের গোলযোগের সময় ওমর যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের সঙ্গে আপাতত যুদ্ধ না করার পরামর্শ দেন; কিন্তু আবু বকর ইসলামের মৌলিক বিষয়ের ওপর প্রাধান্য প্রদান করে বলেন যে, পবিত্র কুরআনে সালাত ও যাকাতের হুকুম একই সঙ্গে এসেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি যাকাত ফরয নয় বলে মনে করে, সে ধর্মত্যাগীদের অন্তর্ভুক্ত এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্তব্য। তিনি আরও বলেন– এ বিষয়ে যদি কোনো মুসলমান আমার সহযোগিতা না করে তবে আমি একাই তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। একথার পর মতানৈক্যের নিরসন হয়।

আবু বকর সিদ্দীক -এর খিলাফতকালে ওমর মদিনায় অতিক্রম করে যেতের কিন্তু একটি মোকাদ্দমাও আসত না।[৩৩] তিনি আবু বকর -এর ডান হাত এবং প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। কখনও মতানৈক্য হলে পরস্পর পরস্পরকে এত সম্মান করতেন যে, তাকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করা যেত। এ কারণেই আবু বকর মৃত্যুশয্যায় নির্দ্বিধায় তাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং উসমান কে ডেকে একটি ওসিয়তনামা লিপিবদ্ধ করান, "আমার মৃত্যু হলে আমার স্থলবর্তী" এতটুকু উচ্চারণের পর তিনি সংজ্ঞা হারান এবং উসমান চরম স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিয়ে বাক্যটি পূর্ণ করবার জন্য "ওমর ইবনুল খাত্তাব হবেন" যোগ করে দেন। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি পুনরায় সংজ্ঞা ফিরে পান তখন জিজ্ঞেস করেন, "লিখেছেন কি?" ওমর -এর নাম তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে শুনে আবু বকর তার প্রশংসা করেন এবং বলেন, "তুমি অত্যধিক কল্যাণের মালিক।"[৩৪] অতঃপর ওসিয়তনামা পূর্ণ করান এবং তাঁর ভৃত্য শাদীদকে, যিনি পুলিশ কমিশনার সদৃশ ছিলেন, নির্দেশ দেন, "ওসিয়তনামাটি বাইরে নিয়ে যাও এবং লোকদেরকে একত্র করে বলে দাও যে, এটি আবু বকর -এর ওসিয়ত এবং এতে লিখিত ব্যক্তির জন্য খিলাফতের উত্তরাধিকার হিসেবে আনুগত্য প্রকাশ

[৩৩] ইবনে আবদিল বারর, আল ইসতীআব, আত তাবারী, তারীখ : আল-মাসউদী, তারীখ।
[৩৪] ইবনে সাদ আত তাবাকাত, ১৩ খণ্ড, পৃ: ২০০, বৈরুত : সাং।

কর।"[৩৫] সকলে আনন্দের সঙ্গে ঐ অজ্ঞাত ব্যক্তির জন্য আনুগত্য প্রকাশ করে। কিছুক্ষণ পর আলী ও অন্যান্য কয়েক ব্যক্তি আবু বকর -এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন সে, ওসিয়তনামায় সম্ভবত ওমর -এর নামই আছে। বলা হলো : হ্যাঁ তিনিই খলিফা হয়েছেন। এতে তারা ওমর -এর কঠোর স্বভাবের অভিযোগ করে বলেন, "প্রভুকে কি উত্তর দিবেন?" আবু বকর ক্রোধান্বিত হয়ে উঠে বসেন এবং বলেন, "আল্লাহর কাছে বলব, তোমার সৃষ্টির সর্বোত্তম ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত করেছি।" আবু বকর -এর মৃত্যুর পরে ওসিয়তনামার খামটি খোলা হয় এবং দ্বিতীয়বার বিনা বাক্যে ওমর -এর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা হয় এবং শপথের নির্দিষ্ট বাক্য ছিল : "আল-বায়তাতলিল্লাহি ওয়াত-তা'লাতু লিল-হাক্কি" অর্থাৎ "আল্লাহর উদ্দেশ্যে শপথ এবং সত্যের জন্য আনুগত্য।" ওসিয়তনামা এরূপ ছিল : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটি আবু বকর ইবন আবি কুহাফা -এর চুক্তি, যা তিনি পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ এবং পারলৌকিক জগতে প্রবেশ করার সময় সম্পাদন করেন। এটি ঐ সময়, যখন কাফেরগণ ঈমান আনে এবং ফাজির (বিপথগামী)-গণেরও বিশ্বাস আসে, আমি তোমাদের জন্য আমার পরে ওমর ইবনুল খাত্তাবকে -কে খলিফা নিযুক্ত করেছি; তাঁর কথা শ্রবণ কর এবং তাঁকে অনুসরণ কর। আমি (এতে) আল্লাহ, তাঁর রাসূল তাঁর দীন, আমার অস্তিত্ব এবং তোমাদের সকলের মঙ্গলের প্রতিও লক্ষ রেখেছি। যদি তিনি সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন তা হলে তা হতে আমার আকাঙ্ক্ষা ও তাঁর সম্পর্কে আমার বিশ্বাস এতটুকুই; কিন্তু তিনি যদি স্বীয় কর্তব্য পালন না করেন তা হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর কৃত অপরাধের শাস্তি ভোগ করতে হবে। আমি তো কল্যাণের চেষ্টা করেছি; কিন্তু অদৃশ্যের জ্ঞান আমার নেই এবং অত্যাচারিগণ অনতিবিলম্বেই অবগত হবে যে, তাদের কোথায় প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ওয়াস-সালামু 'আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।"[৩৬]

---

[৩৫] ইবনে হাম্বল, মুসনাদ, পৃ: ২৭।

[৩৬] মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ, আল ওয়াসাইকুছ ছিয়াছিয়্যাহ, সংখ্যা ৩০২ (পরিশিষ্ট). পৃ: ৩৯৩, আয যাহাবী. তা'রীখ ইসলাম, ১ম খণ্ড, পৃ : ৩৮৮।

অধ্যায়-৩

খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

১. ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর খিলাফত লাভ

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু জীবদ্দশায় তাঁর উত্তরাধিকারী ইসলামি রাষ্ট্রের পরবর্তী খলিফা মনোনীত করে যাবার জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠলেন। পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে এর জন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে খিলাফতের একটি মীমাংসা করে যেতে চাইলেন। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে খিলাফতের গুরুদায়িত্বের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করতেন। কেননা কঠোরতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও জাগতিক কর্তব্য সম্বন্ধে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সাহাবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তবু তাঁর নির্বাচনের স্বপক্ষে জনমত যাচাই করার জন্য অন্যান্য সাহাবার পরামর্শ নিতে চাইলেন। সর্বপ্রথম তিনি আবদুর রহমান বিন আউফের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর যোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তাঁর স্বভাব বড় কঠোর প্রকৃতির। এর উত্তরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, তাঁর নিজের ওপর দায়িত্ব আসলে আপনা হতেই তিনি উদার হয়ে উঠবেন। এরপর তিনি ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর পক্ষে মত ব্যক্ত করলেন। এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অন্যান্য আনসার ও মুহাজিরদের মতামত নিলেন। তাঁরা সকলেই ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর মনোনয়নকে সমর্থন করেন। তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মনোনয়নের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বললেন যে, তাঁর মতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সাহাবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" এরপর তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে ডেকে এনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর পক্ষে একটি মনোনয়নপত্র লিখে নিলেন। মনোনয়নপত্র সম্পাদনের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, "ভাইসব! আমি আমার

কোনো আত্মীয়-স্বজনকে খলিফা মনোনীত করিনি; বরং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মনোনীত করেছি যাতে আপনারা এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হন।" একথা শুনে উপস্থিত জনতা সমবেত কণ্ঠে বলে ওঠল, "আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং মনোনয়ন মেনে নিলাম।" অতঃপর খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকালের পর ১৩ই হিজরী, ২২ জমাদিউস্‌সানি (৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে) ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের দ্বিতীয় খলিফারূপে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন।[৩৭]

২. খিলাফত লাভের পর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রথম ভাষণ

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দাফন কাজ সমাধা করার পর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত জনগণকে সম্বোধন করে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, তোমাদের দ্বারা যেমন আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে, তেমনি আমার দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমি আমার পূর্ববর্তী দুজন মহান ব্যক্তিত্বের পরে তোমাদের মধ্যে স্থলাভিষিক্ত হয়েছি। এ মদিনায় আমাদের সম্মুখে যা কিছু ঘটবে তা আমরা নিজেরাই সমাধা করব; আর যা মদিনার বহিঃদেশে ঘটবে তা সমাধা করার জন্য উপযুক্ত, শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত লোকদেরকে নিযুক্ত করব। যিনি সুষ্ঠুভাবে স্বীয় কর্তব্য পালন করবেন তাকে পুরস্কৃত করা হবে; আর যে অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করবে তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন।[৩৮]

৩. ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাসনামলে পারস্য বিজয়

আরবের পূর্বদিকে পারস্য সাম্রাজ্য অবস্থিত। ইরাক (মেসোপটেমিয়া) থেকে আমুদরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বর্তমান ইরান নিয়ে পারস্য সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামলে ইরাক ও সিরিয়ার বিরুদ্ধে মুসলিম অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। মুসলমানগণ যখন যুদ্ধরত তখন খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন। নতুন খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সকল অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্য বিশেষভাবে তৎপর হন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনকালে কতিপয় কারণে পারস্যবাসীর সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এ সংঘর্ষের গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো হলো :

১. ইসলামের সমৃদ্ধিতে পারসিকদের ঈর্ষা : মুসলমানদের কোনো প্রকার উন্নতি এবং ইসলামের সমৃদ্ধি পারস্যবাসী কোনোভাবেই সহ্য করতে পারত না এবং সর্বপ্রকারে তাঁদের ধ্বংস সাধনের চেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

---

[৩৭] (বিদায়া ওয়ান নেহায়া : ৭/১৮; তারিখ তাবারী: ৪/২৩৮; তারিখ ইসলামী: ৯/২৫৮; তাবাকাত ইবনে সা'দ: ৩/১৯৯ এবং তারিখ মদিনা, ইবনে সুব্বাহ : ২/৬৬৫-৬৬৯)

[৩৮] ইবনে সা'দ, আত-তাবাকাত, ৩/১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৩, বৈরুত।

২. মুসলিম দূতকে অপমান : মহানবী ﷺ কর্তৃক প্রেরিত মুসলিম দূতকে অপমানিত করায় পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খসরু পারভেজ মুসলমানদের বিরাগভাজন হন। এভাবে আন্তর্জাতিক নীতির অবমাননা করায় এর প্রতিশোধ ব্যবস্থাস্বরূপ পারস্য বিজয় মুসলমানদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

৩. বিদ্রোহীদের সহায়তা : রিদ্দা যুদ্ধের সময় বাহরাইনে যখন বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তখন পারস্যবাসী বিদ্রোহীদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য প্রদান করেন। পারস্যবাসীদের বিদ্বেষপূর্ণ ও শত্রুতামূলক আচরণের জন্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মুসলমানগণ বাধ্য হন। এতে বোঝা যায় যে, খলিফা ওমর রা. সাম্রাজ্যবাদী নীতি দ্বারা পারস্য বিজয়ে উদ্বুদ্ধ হননি, পারস্যবাসীর শত্রুতা তাঁকে অস্ত্রধারণে বাধ্য করেছিল।

৪. আরবদের ব্যবসায়ে বাধা : ইরাকের ওপর দিয়ে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদী প্রবাহিত হওয়ার ফলে এটা অত্যন্ত উর্বর এবং সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়। ইরাকের সাথে আরববাসীদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল; কিন্তু পারস্যবাসীরা আরব মুসলিম বণিকদের অব্যাহতভাবে তাদের দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে দিতে রাজি ছিল না। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও আরবগণ পারস্য বিজয়ে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন।

৫. রাজনৈতিক নিরাপত্তা : ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে পারস্য সাম্রাজ্যের ইরাক প্রদেশ ছিল আরব ভূখণ্ডের সংলগ্ন। এজন্য আরববাসীর সাথে তাদের প্রায়ই সংঘর্ষ লেগে থাকত। কাজেই রাজনৈতিক দিক দিয়ে নিরাপত্তার জন্যই এতদাঞ্চলে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা নেহায়েত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। অধ্যাপক পি. কে. হিট্টি বলেন, "অন্য কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা ছাড়া তৎক্ষণাৎ ঘটিত ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর ইসলামি সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়।" এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরববাসী মুসলমানগণ কখনও পারস্যদেশ জয় করেনি। পারস্যবাসীদের শত্রুতা সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয়ে মুসলমানদেরকে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল।

৬. শিক্ষা ও সভ্যতার লীলাভূমি : অতি প্রাচীনকাল থেকে পারস্য সভ্যতা বিশ্বে পরিচিত ছিল। সভ্যতার লীলাভূমি মেসোপটেমিয়া (ইরাক) ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। এছাড়া সমসাময়িক যুগে সমগ্র বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের হেলেনিক সভ্যতার সুস্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হতো। কাব্য ও সংস্কৃতিপ্রিয় আরববাসী এ শিক্ষা ও সভ্যতার উত্তরাধিকারী হতে আশা পোষণ করত। সুতরাং রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি তারা এ উদ্দেশ্য দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়।

ইসলামের সমৃদ্ধিতে পারসিকদের ঈর্ষা ও বিদ্রোহীদেরকে সহায়তা করার জন্য পারস্য সাম্রাজ্য ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে পড়ে। ফলে ওমর পারস্য অভিযান পরিচালনা করেন।

নামারিকের যুদ্ধ

ইতিহাস প্রমাণ করে যে, ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে নামারিক নামক স্থানে পারসিকগণের সাথে মুসলমানদের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাই নামারিকের যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধ-জয়ের ফলে হীরারাজ্য মুসলমানদের অধিকারে আসে।

ওমর ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ আগস্ট খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে আবু বকর -এর বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করতে লাগলেন। খলিফা আবু বকর -এর শাসনকালে মুসান্না ও খালিদের নেতৃত্বে পারস্য সাম্রাজ্যাধীন হীরারাজ্য আরবদের অধিকারে আসে এবং হীরাবাসী মুসলমানদেরকে বার্ষিক কর দানে রাজি হয়ে সন্ধি করেছিল; কিন্তু হীরারাজ্য হারিয়ে পারস্যবাসী উন্মাদ হয়ে ওঠে এবং হীরারাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তৎপর হয়। অতঃপর ওমর মুসান্না -এর সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য আবু ওবায়দার নেতৃত্বে অন্য একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। পারসিকগণ সেনাপতি রুস্তমের নেতৃত্বে নামারিক নামক স্থানে মুসলিম বাহিনীর সম্মুখীন হয়। ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সংঘটিত এ যুদ্ধে বিজয় লাভ করে মুসলমানগণ হীরারাজ্য পুনর্দখল করে।

নামারিকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হয় এবং হীরা মুসলমানদের দখলে আসে, অপরদিকে পারসিকগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।
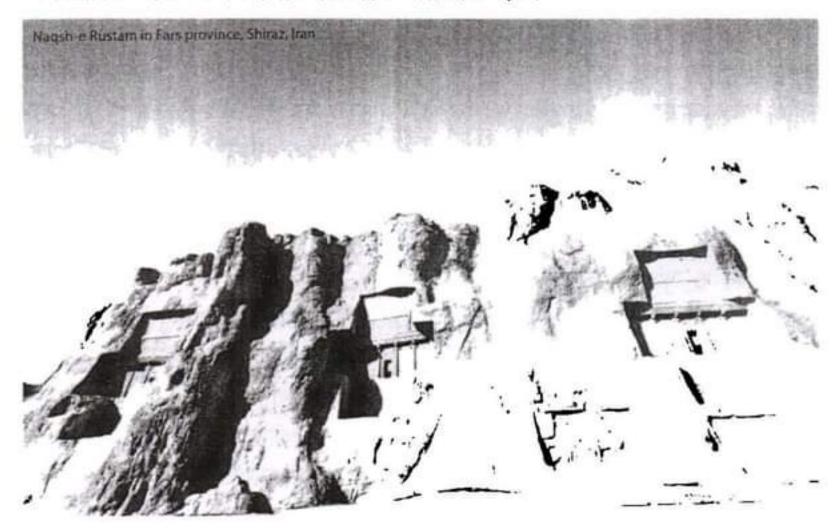
জসর বা সেতুর যুদ্ধ

জসরের বা সেতুর যুদ্ধে পারসিক রণহস্তী মুসলিম বাহিনীর জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায় এবং বহু মুসলিম সৈন্য শাহাদত বরণ করেন। এ যুদ্ধে জয়ের ফলে মুসলমানদের পারস্য বিজয়ের পথ সুগম হয়।

নামারিকের যুদ্ধে পরাজয়ে অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে রুস্তম আরও অধিক সৈন্য সংগ্রহ করে এবং বাহমান নামক জনৈক ব্যক্তিকে উক্ত সৈন্যদলের নেতৃত্বে নিয়োগ করলেন। মৃত ও লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তিনি আবু ওবায়দার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে দুপক্ষীয় সৈন্যবাহিনী সেতু (জসর)-এর যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। এ যুদ্ধে পারসিকদের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর ভাই এবং আরও সুযোগ্য মুসলিম সেনানায়ক পরাজিত ও নিহত হন। এ যুদ্ধে ছয় হাজার মুসলিম যোদ্ধা শহিদ হন। যুদ্ধের পূর্বে ও পরে মুসলিম বাহিনী নৌকা দ্বারা সেতু নির্মাণ করে ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করেছিল বলে একে 'সেতুর যুদ্ধ' বলা হয়। সেনাপতি আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু-র মৃত্যুর পর মুসান্না রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। পারসিক সেনাপতি বাহমান যখন বিজয় লাভের আনন্দে উন্মাদ হয়ে উঠলেন, তখন তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েনে বিদ্রোহের সংবাদ পেলেন। সুতরাং তিনি মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবন পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে বিশৃঙ্খল রাজধানী রক্ষার্থে দ্রুত অগ্রসর হলেন। এ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় মুসান্না রাদিয়াল্লাহু আনহু উলিসে তার রাজধানী স্থাপন করে পূর্ববিজিত স্থানসমূহ রক্ষা করতে লাগলেন।

জসরের বা সেতুর যুদ্ধ পারসিকদের নামারিকের যুদ্ধের প্রতিশোধ হিসেবে পরিচালিত করে এবং তারা ৬,০০০ মুসলমান হত্যা করে।

বুওয়ায়েবের যুদ্ধ

সেতুর বা জসরের যুদ্ধে বিপর্যয়ের সংবাদ শুনে খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত ব্যথিত হন। পরবর্তীতে বিপুল সৈন্য প্রেরণের মাধ্যমে বুওয়ায়েব নামক স্থানে পারসিকদের দাঁতভাঙা জবাব দেন।

জসর যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং প্রতিশোধের জন্য নতুন সেনাবাহিনী গঠন করতে লাগলেন। বহু মুসলিম ও খ্রিস্টান তাঁর বলিষ্ঠ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামি পতাকাতলে সমবেত হলো। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে কুফার অদূরে 'বুওয়ায়েব' নামক স্থানে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হলো। সেনাপতি মুসান্না রাদিয়াল্লাহু আনহু শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করেন। পরাজিত পারস্যবাহিনী আত্মরক্ষার জন্য পলায়নের চেষ্টা করল; কিন্তু পলায়নের পথ না পেয়ে তাদের অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিল। তাদের সেনানায়ক মিহরান যুদ্ধে

নিহত হলে এ বিজয় দ্বারা মুসলিম আধিপত্যের সীমারেখা মাদায়েন পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং মুসলমানগণ মেসোপটেমিয়ার নিম্নাঞ্চল ও বদ্বীপ অঞ্চলেও তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিজয়ের কিছুদিন পরেই ইসলামের বীরসেনানী মুসান্না রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রাণ ত্যাগ করেন (এপ্রিল, ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে)। ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে সেনাপতি হিসেবে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

বুওয়ায়েবের যুদ্ধে মুসলমানদের গৌরবময় বিজয় অর্জিত হয় এবং পারসিকদের শোচনীয় পরাজয় হয়।

কাদেসিয়ার যুদ্ধ

পারস্য ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত ভাগ্য নির্ধারণকারী যুদ্ধগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হলো কাদেসিয়া যুদ্ধ। কাদেসিয়া প্রান্তরে ৬৩৫ সালে সংঘটিত এ যুদ্ধে মুসলমানরা চূড়ান্তভাবে বিজয়ী হলে পারসিক শক্তি একেবারে ভেঙ্গে যায় এবং ইরাক ও কাদেসিয়া মুসলিম শাসনাধীনে চলে যায়।

পারসিকগণ বুওয়ায়েবের যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয় ভুলতে পারল না। তারা আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করল। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়ে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। সাদ ইবনে আবি-ওয়াক্কাসকে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি মনোনীত করা হলো। তাঁকে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে কাদেসিয়ার প্রান্তরে তাঁবু ফেলে দূত মারফত পারস্যের দরবারে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হলো। ইসলামের পয়গামসহ পারস্যের দরবারে মুসলিম দূত প্রেরিত হলো; কিন্তু পারস্যরাজ ইয়াজদিগার্দ দূতকে অপমান করে দরবার থেকে তাড়িয়ে দিল।[৩৯] পারস্যরাজের এ অশোভন আচরণের ফলে যুদ্ধ ত্বরান্বিত হলো। মহাবীর রুস্তমের নেতৃত্বে পারস্যের ফৌজ মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য প্রেরিত হলো। সেনাপতি রুস্তমকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব করা হলে তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সমগ্র আরবকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করার সংকল্প ঘোষণা করল। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কাদেসিয়া প্রান্তরে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো। এ যুদ্ধ তিন দিন স্থায়ী ছিল। পারস্যবাহিনী বীরত্বসহকারে যুদ্ধ করেও অবশেষে পরাজিত হলো। রুস্তম নিজে লড়াইয়ের ময়দান থেকে পলায়ন করতে গিয়ে নিহত হলো। রুস্তমের মৃত্যুতে পারস্যবাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল এবং মুসলিম বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।[৪০]

---

[৩৯] আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া: ৭/৪৩
[৪০] আত তারীখ আল ইসলামী: ১০/৩৪৭

ইসলামের ইতিহাসে কাদেসিয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী। এ যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর হতেই পারসিকদের যুদ্ধস্পৃহা প্রশমিত হতে থাকে। অতঃপর (ক) টাইগ্রিস নদীর পশ্চিম দিকের উর্বর ভূমি মুসলিম কর্তৃত্বাধীনে আসে। এখান থেকে তারা উন্নত উর্বর ভূমির মালিক হয়। ইতঃপূর্বে তারা এ ধরনের ভূমির একান্ত অভাব অনুভব করেছিল। ফলে তাদের আর্থিক অবস্থারও অভাবিত উন্নতি সাধিত হয়। (খ) ইরাকের কৃষককুল মুসলমানদের বিজয়কে অভিনন্দন জানিয়েছিল কারণ, পারস্য শাসনাধীনে উক্ত এলাকার কৃষককুল উচ্চ করভারে জর্জরিত হচ্ছিল এবং সামন্ত রাজা কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছিল। রাজনৈতিক দিক দিয়ে ইরাকের কৃষককুল মুসলমানদের পক্ষাবলম্বন করার ফলে পারসিক শক্তির মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। মুসলমানগণ কর্তৃক উন্নততর শাসন প্রবর্তনের ফলে এখানে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সর্বোপরি কাদেসিয়ার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মুসলমানদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস এতই দৃঢ় হয়েছিল ও বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, তারা পরবর্তী বৃহত্তর সংগ্রামে অজেয় হয়ে ওঠে।

কাদেসিয়ার যুদ্ধ পারস্যবাসী ও মুসলমানদের মধ্যকার চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী যুদ্ধ। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সময় মুসলিম সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার জন্য পারস্য সম্রাট বিদ্রোহীদের যে সাহায্য করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এ যুদ্ধে জয়লাভ করে মুসলমানগণ তার প্রতিশোধ নিলেন।

মাদাইন বিজয়

মাদাইন বিজয় ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানদের এক গৌরবময় রক্তপাতহীন বিজয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সেনাপতি সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে মুসলমানরা মাদাইন বিজয় করে এখানে ইরাকের রাজধানী স্থাপন করেন।

আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলিউকাসের বংশধরগণ কর্তৃক নির্মিত পশ্চিমাংশ সেলুসিয়া ও পারস্য রাজগণ কর্তৃক নির্মিত পূর্বাংশ টেসিফোন নামে পরিচিত নগরীদ্বয়কে 'মাদাইন' (দুই শহর) বলা হতো। দজলা ও ফোরাত নদীর সঙ্গমস্থল থেকে ১৫ মাইল উজানে দজলার উভয় ভূখণ্ডব্যাপী এ নগরী অবস্থিত। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্দেশক্রমে সেনাপতি সাদ ইবনে আবি-ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মাদাইনের দিকে যাত্রা করলেন। প্রথমে তিনি নগরীর পশ্চিমাংশের দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে পারসিকগণ মুসলিম সেনাবাহিনীকে বাধা দিয়ে পরাজিত হয়। সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবার সেনাবাহিনীসহ নদী অতিক্রম করে পূর্বতীরে পৌছলেন। এখানকার জনগণ পূর্বেই পালিয়ে গিয়েছিল। ফলে একরকম বিনা বাধাতেই মুসলমানগণ মাদাইন দখল করেন। পারসিকদের সঞ্চিত বিপুল ধন-

সম্পদ মুসলমাদের হস্তগত হলো। সেনাপতি সাদ রা. মাদাইনকে ইরাকের রাজধানীতে পরিণত করেন।

মহানবী সা. ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, মাদাইন মুসলমানদের দখলে আসবে এবং যেটি হবে বিনা রক্তপাতের একটি বিজয়।

জালুলার যুদ্ধ

৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জালুলা নামক স্থানে মুসলমান ও পারসিকদের যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় তা ইতিহাসে জালুলার যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত। এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে মুসলমানরা পারস্য বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। অবশেষে মুসলমানরা পারস্য সাম্রাজ্য বিজয়ে সক্ষম হয়।

কাদেসিয়ার রণক্ষেত্রে পরাজয়বরণ করে পারস্য সাম্রাজ্যের শেষ সাসানী-বংশী সম্রাট ইয়াজদিগার্দ তার বিধ্বস্ত এবং বিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনীসহ পারস্যের পার্বত্য প্রদেশ হুলওয়ানে পলায়ন করেন। পারসিকগণ হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার ও পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার মানসে মাদাইনের একশত মাইল উত্তরে হুলওয়ান নামক স্থানে বিপুল সংখ্যায় ইয়াজদিগার্দ-এর সাথে মিলিত হলো। সেখান থেকে জালুনা নামক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গের দিকে তারা অগ্রসর হলো। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সেনাপতি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.-এর অনুমতিক্রমে সেনাপতি কা'কা'কে বারো হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে জালুলা নামক প্রান্তরে পারসিকদের মোকাবিলা করতে নির্দেশ দেন। আটদিন অবরোধের পর জালুলার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করলে হুলওয়ান তাদের দখলে আসে। অতঃপর ট্রাইগিস নদীর তীরবর্তী টাকরিট দুর্গ এবং ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত হিত ও কিরকিসিয়া দুর্গগুলো মুসলমানদের অধিকারে আসে। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সমগ্র মেসোপটেমিয়া (ইরাক) মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। জালুলার যুদ্ধের গুরুত্বের দিকগুলো হলো-

১. খলিফার ক্রন্দন : কথিত আছে যে, যখন জালুলা ও মাদাইনের গনিমতের দ্রব্যসামগ্রী মদিনায় খলিফা ওমর রা.-এর নিকট প্রেরণ করা হয় তখন তিনি কাঁদতে আরম্ভ করেন। খলিফাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তখন তিনি উত্তরে বলেন যে, 'এ সমস্ত গনিমতের দ্রব্যের মধ্যে তিনি তাঁর লোকজনের ভবিষ্যৎ ধ্বংস দেখতে পাচ্ছেন।' এ উক্তি মিথ্যা হয়নি। পারসিকগণের সংস্পর্শে এসে মুসলমানগণ তাঁদের মিতব্যয়িতা, কঠোরতা ও আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি গুণাবলি হারাতে থাকে এবং পরে ধ্বংসের মুখে পতিত হতে থাকে।

২. দুর্গ বিজয় : ইতোমধ্যে টাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী টাকরিট দুর্গ এবং ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত হিত ও কিরকিসিয়া দুর্গদ্বয় মুসলমানদের অধিকারে আসে।

৩. সন্ধির স্বাক্ষর : এরপর পারস্য সম্রাট ইয়াজদিগার্দ সন্ধির জন্য প্রস্তাব করলে মহামতি ওমর রাঃ তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন। সন্ধি অনুসারে পারস্য পর্বতমালা দুই সাম্রাজ্যের সীমানা নির্ধারিত হলো। নববিজিত রাজ্যে মুসলমানগণের শাসন সংস্কারে স্পেনকার বাসিন্দাগণ সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। তাদেরকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতাও প্রদান করা হলো।

৪. পারসিকগণ কর্তৃক সন্ধি ভঙ্গ : খলিফার অসাধারণ ধৈর্য থাকা সত্ত্বেও আবার সংঘর্ষ বাধার সম্ভাবনা দেখা দিল। হতভাগ্য সম্রাটের পরামর্শে আহওয়াজের শাসনকর্তা হুরমুজান পুনঃপুন আরব উপনিবেশগুলোতে আক্রমণ চালাতে লাগল। প্রতিবারই পরাজিত হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করত এবং সুযোগ পেলেই আবার সে সন্ধি ভঙ্গ করত।

৫. ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে কুফা ও বসরা প্রতিষ্ঠিত হয় : এ সময় ইরাকে দুটি নগর নির্মিত হয়। সেনাপতি ওতবা শাততুল আরবে বসরা এবং ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে কুফা নগর নির্মাণ করেন। এ দুটি শহর স্বাস্থ্যকর ছিল। এ দুই শহরে সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত করা হলে সামরিক দিক দিয়ে এগুলো পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান করে। পরবর্তীকালে কুফা ও বসরা মুসলিম জগতের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

জালুলার যুদ্ধে পারসিকরা পরাজয় বরণ করে এবং মুসলমানগণ জালুলাতে একটি শক্তিশালী সেনানিবাস স্থাপন করে।

নিহাওয়ানদের যুদ্ধ

৬৪১ খ্রিস্টাব্দে আলবুর্জ পর্বতের পাদদেশে নিহাওয়ান্দে মুসলিম বাহিনী ও পারসিক সৈন্যদের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইসলামের ইতিহাসে তা নিহাওয়ান্দের যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত।

হূলওয়ান বিজিত হলে পারস্য সম্রাট ইয়াজদিগার্দ খলিফা ওমর রাঃ-এর নিকট সন্ধির প্রস্তাব করেন এবং যথারীতি মুসলমান ও পারসিকদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির শর্তানুযায়ী পারস্য পর্বতমালা দুই সাম্রাজ্যের সীমানা নির্ধারিত হলো; কিন্তু ঘটনাচক্রে শিগগির মুসলিম সৈন্যগণ পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করতে বাধ্য হন। এদিকে পারস্য সম্রাট ইয়াজদিগার্দও সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তিনি জুবজান, রাই, ইস্পাহান ও হামাদান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সৈন্যবাহিনী সংঘবদ্ধ করে ফিরোজানের নেতৃত্বে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার পারসিক সৈন্যের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী আলবুর্জ পাহাড়ের পাদদেশে প্রেরণ করলেন। খলিফা ওমর রাঃ

পারস্য বাহিনীর মোকাবিলার জন্য প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে নুমান বিন মুকরানকে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন। প্রথমে অবশ্য খলিফা স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পারসিক বাহিনীর সাথে ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে সেনাপতি নুমান রাদিয়াল্লাহু আনহু পারস্য বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন এবং মুসলিম বিজয় সুনিশ্চিত হয়। যুদ্ধে নোমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত বরণ করেন।

নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে পারসিক বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় হয় এবং সেনাপতি নুমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মুসলমানদের গৌরবময় বিজয় অর্জিত হয়।

পারস্য বিজয়ের ফলাফল

ইসলামি খিলাফতের দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি বিভিন্ন রাজ্য বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। তাঁর এসব বিজয়-অভিযানের মধ্যে পারস্য বিজয় অন্যতম। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পারস্য বিজয়ের ফলাফল নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. ইসলামের প্রসার : পারসিকদের ওপর আরবগণের (মুসলমানগণের) বিজয় লাভ হলো আর্যদের ওপর সেমেটিকদের বিজয়ের অনুরূপ। এতে জোরাস্ট্রীয় ধর্মের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্য সূচিত হলো। অচিরেই পারস্যের অগ্নি উপাসকগণ ইসলামের প্রাণশক্তি ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল।

২. সামরিক সাফল্য : তৎকালে পারস্য ছিল সুশৃঙ্খল ও সুসংহত সামরিক শক্তির মধ্যে অন্যতম। পারসিকগণের সংস্পর্শে এসে মুসলমানগণ তাদের সামরিক কৌশল আয়ত্ত করে নিল। পারস্য বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তি হিসেবে খ্যাত পারস্যের শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকে পরাজিত করে মুসলমানগণ সমগ্র বিশ্ব বিজয়ে সক্ষম বলে নিজেদের প্রমাণ করে।

৩. অর্থনৈতিক সাফল্য : পারস্য বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ ইরাকের উর্বর ভূখণ্ড লাভ করে। ফলে তারা প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী হয়। এ বিজয়ের ফলে মুসলমানদের অর্থনৈতিক দৈন্যের অবসান ঘটে।

৪. ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি : এ বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ ইরাকে (মেসোপটেমিয়া) এবং অকসা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়ে দাঁড়ায়। পারস্য বিজয় দ্বারা মুসলমানগণ উক্ত দেশের সহজাত ও গৌরবময় ঐতিহ্যের সংস্পর্শে এসেছিল। এ বিজয়ে মুসলমানগণ উক্ত দেশের

অগণিত ও অপরিমিত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও ধন-সম্পদের অধিকারী হয় এবং আরবগণ তাদের বিজয় অভিযান সিন্ধু নদ পর্যন্ত প্রসারিত করতে প্রেরণা লাভ করে।

৫. শিক্ষা-সংস্কৃতির বিনিময় : শিল্প, সাহিত্য, দর্শন এবং ভেষজবিজ্ঞান প্রভৃতিতে পারসিকগণ চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। তাদের সংস্পর্শে এসে আরবগণ এসব বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানার্জন করে। অতি প্রাচীনকাল থেকে ইরাক ছিল সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ও লীলাভূমি। প্রথম তিন শতাব্দীতে যে সমস্ত পণ্ডিতগণ ইসলামের জ্ঞানভাণ্ডারে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন তাদের অনেকেই ছিলেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী পারসিক।

৬. পারস্য বিজয়ের কুফল : কথিত আছে যে, পারস্য বিজয়ের পর বিপুল ধন-সম্পদ ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দরবারে উপস্থিত করা হলে তিনি তা দেখে কাঁদতে থাকেন। এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ সকল ধন-সম্পদের মধ্যে তিনি পরবর্তী উম্মতের ধ্বংস দেখতে পাচ্ছেন। বস্তুত পারস্য বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন ও বিলাসিতার সংস্পর্শে এসে তাঁদের সরলতা ও অন্যান্য গুণাবলি বিসর্জন দিতে থাকে। যার ফলে তাদের আদর্শিক পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তাছাড়া শিয়া মতবাদের উৎপত্তিস্থল হিসেবে পরবর্তীকালে পারস্য মুসলমানদের দ্বিধা-বিভক্তিতে সাহায্য করে।

পারস্য বিজয় ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে মুসলমানরা পারসিক সংস্পর্শে আসে, ফলে অতি অল্প সময়ে মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভাবনীয় অবদান রাখেন।
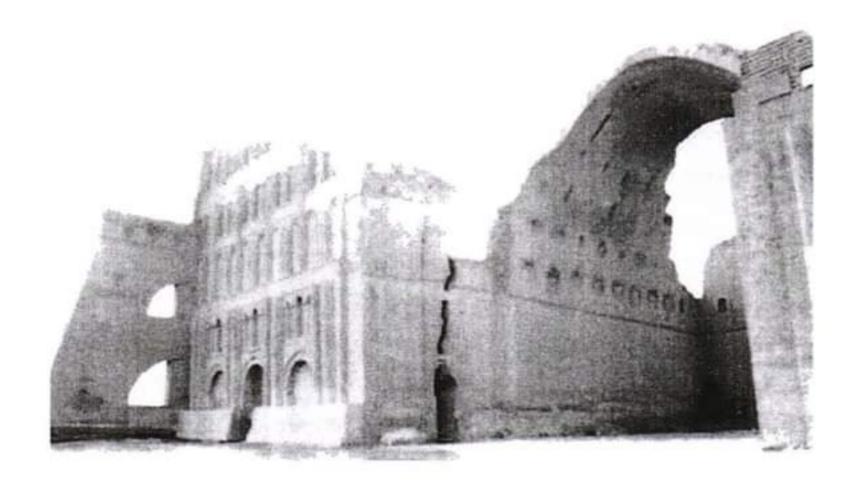
৪. ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর শাসনামলে রোম সাম্রাজ্য বিজয়

রোমান সাম্রাজ্যে বসবাসকারী আরবীয় গোত্রসমূহ মুসলমানদের বারবার আক্রমণ করে উত্যক্ত করত। বাইজান্টাইনীয় কর্তৃক মুসলিম দূত হত্যাসহ বেশকিছু কারণে মুসলমানগণকে বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছিল।

আরবদেশের উত্তর-পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্য অবস্থিত। পূর্বে রোমান সাম্রাজ্যকে 'বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য' বলা হতো। এ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, জর্ডান ও মিশর নিয়ে গঠিত ছিল। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে আরবের অধিবাসীরা বসতি স্থাপন করেছিল। অতি প্রাচীনকাল থেকে আরবদের সাথে এ অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে মুসলমানদের সঙ্গে এ সাম্রাজ্যের সম্পর্ক খুবই সৌহার্দপূর্ণ ছিল; কিন্তু পরবর্তীকালে নানা কারণে এ সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং মুসলমানগণ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে বাধ্য হন। নিচে এ সমস্ত কারণ উল্লেখ করা হলো :

১. রাজনৈতিক কারণ : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায়ই রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে দূত প্রেরণ করেছিলেন। রোমান সম্রাট তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন; কিন্তু ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। অনুরূপভাবে সিরিয়ার বনু গাচ্ছান গোত্রীয় খ্রিস্টান শাসনকর্তার নিকটও মুসলিম দূত প্রেরিত হয়; কিন্তু সেই দূত সিরিয়া যাবার পথে মুতার খ্রিস্টান দলপতি সোরাহবিল কর্তৃক নির্মমভাবে নিহত হয়। সুরাহবিল এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক নীতিবোধ সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেয়। এ হত্যাকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে এ সময় মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর খিলাফতকালে প্রতিহিংসা নিবারণার্থে সিরিয়া সীমান্তে ওসামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়। উপরন্তু রিদ্দা যুদ্ধের সময় খ্রিস্টান মহিলা ভণ্ডনবী সাজাহকে সাহায্য করায় মুসলমানদের সাথে বাইজান্টাইনদের সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং উভয় শক্তির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আসন্ন হয়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে রাজনৈতিক দিক দিয়ে ইসলামের নিরাপত্তা এবং ইসলামি সাম্রাজ্য সুদৃঢ়করণের জন্য রোমান সাম্রাজ্য মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়াই একান্ত বিধেয় ছিল এবং পরবর্তীকালে বাস্তবিকই এর প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়।

২. অর্থনৈতিক কারণ : বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ভূমির উর্বরতা, ঐশ্বর্য ও বৈভব প্রাচীনকাল থেকেই অনুর্বর আরব ভূখণ্ডের অধিবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আরবদের সঙ্গে এ সকল অঞ্চলের বাণিজ্যিক লেনদেনও দীর্ঘকালের। কালক্রমে রোমানদের সাথে মুসলমানদের বিরোধ দেখা দিলে তারা বাণিজ্যিক কার্যকলাপে

অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাই নিজেদের স্বার্থে মুসলমানদের পক্ষে রোমান বিজয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক কারণেও আরবগণকে রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে বাধ্য করে এবং এ আক্রমণের ফলে আরবদের সাথে বাইজান্টাইনগণের সংঘর্ষ বাধে। পরিণামে এ সংঘর্ষ বৃহদাকার সংগ্রামে পরিণত হয়।

৩. ভৌগোলিক কারণ : ভৌগোলিক দিক দিয়ে সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইন প্রকৃতপক্ষে আরবের অন্তর্গত। এ দুই দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতিসমূহ বৃহত্তর আরব জাতিরই একাংশ। সীমান্তে বসবাসকারী আরবীয় গোত্রসমূহ মুহাম্মদ সা.-এর ইন্তেকালের পর আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ আরববাসীদেরকে ইসলাম ত্যাগ করতে যথাসাধ্য প্ররোচিত করত এবং প্রায়ই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে আক্রমণ চালাত। বাইজান্টাইন সম্রাট এ সমস্ত আক্রমণকারীদের পক্ষ সমর্থন করতেন। সীমান্ত সংঘর্ষ প্রতিহত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বকে বিপদমুক্ত ও সুদৃঢ় করার জন্যই মুসলমানদেরকে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়।

৪. সামরিক কারণ : সামরিক দিক দিয়ে কিলিসমা বর্তমান সুয়েজ শহরে রোমানদের নৌ-ঘাঁটি ছিল। কিলিসমা হেজাজ প্রদেশের অতি সন্নিকটে অবস্থিত বিধায় শত্রুগণকে হেজাজের এত নিকটে অবস্থান করতে দেওয়া যেতে পারে না। কারণ, এতে মুসলমানদের সমূহ বিপদ দেখা দিতে পারে। তাই কিলিসমা থেকে শত্রু বিতাড়ন করে নিজেদের অবস্থা সুরক্ষিত করতে মুসলমানগণের পক্ষে মিশর অধিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিল।

মুসলমানগণ কাউকে প্রথমে আক্রমণ করে না, কেবল আক্রান্ত হলেই তার জবাব দেয়; বাইজান্টাইন যুদ্ধেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

দামেস্ক বিজয়

খলিফা আবু বকর রা.-এর খিলাফতকালে সিরিয়ায় একটি সুপরিকল্পিত যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৬৩৪ খ্রি. আজনাদাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস এন্টিওকে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য একটি নতুন সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করেন। মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. দ্রুত আজনাদাইন থেকে দামেস্ক রওয়ানা হন। দামেস্ক ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সিরিয়া প্রদেশের রাজধানী। বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবেও এ নগরীর যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও সুদৃঢ় ছিল। খালিদ রা. প্রায় ৬ মাস দামেস্ক অবরোধ করে রাখলে নগরীর অধিবাসীরা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। সম্রাট হিরাক্লিয়াস প্রাণপণ চেষ্টা করেও এ অবস্থার কোনো উন্নতি বিধান করতে

পারেননি। অবশেষে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু একদল দুঃসাহসী মুসলিম যোদ্ধার সাহায্যে রাতের অন্ধকারে প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং দ্বাররক্ষীদের হত্যা করে দামেস্ক নগরী মুসলমানদের নিকট উন্মুক্ত করে দেন। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে দামেস্ক সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের করতলগত হয়। এ বিজয়ে আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু, আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও সুরাহবিল রাদিয়াল্লাহু আনহু সেনাপতি খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

ফিহলের যুদ্ধ

দামেস্ক বিজয়ের পর মুসলমানগণ জর্দান অভিমুখে অগ্রসর হলে সম্রাট হিরাক্লিয়াস এন্টিওক থেকে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী দামেস্ক পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন; কিন্তু খালিদ বিন ওয়ালিদের সতর্কতার ফলে তারা দামেস্কে প্রবেশ করতে অসমর্থ হয়ে জর্দানে অবস্থান করতে থাকে। মুসলিম বাহিনী "ফিহল" নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করেন। মুসলমানদের দৃঢ়সংকল্প ও মনোবল দেখে রোমানগণ বিচলিত হয়ে ওঠে। তারা মুসলমানদের সাথে সন্ধির প্রস্তাব দেয়; কিন্তু রোমানদের অযৌক্তিক প্রস্তাবসম্বলিত সন্ধির শর্ত মুসলমানগণ প্রত্যাখ্যান করলে ফিহলে উভয়পক্ষের তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে রোমানগণ পরাজিত হয়। মুসলমানগণ রোমানদের জীবন, সম্পত্তি ও গির্জার হিফাজতের নিশ্চয়তা দেন। উল্লেখ্য যে, উইলিয়াম মুইরের বর্ণনা মতে, দামেস্ক বিজয়ের পূর্বে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

হিমস বিজয়

জর্দান অধিকার করার পরে মুসলিম বাহিনী সিরিয়ার বিখ্যাত ও প্রাচীন নগরী হিমসের দিকে অগ্রসর হয়। সামান্য বাধার সম্মুখীন হওয়ার পর মুসলমানগণ প্রচণ্ডভাবে হিমস আক্রমণ করলে নগরীর অধিবাসীগণ আত্মসমর্পণ করে। হিমস অধিকৃত হলে খলিফা ওমর মুসলিম সেনাপতিদেরকে আরো সম্মুখে অগ্রসর হতে না দিয়ে বিজিত অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠন করার নির্দেশ দেন। তিনি আবু ওবায়দাকে হিমসের, আমর ইবন আল আস কে জর্দানের এবং খালিদ বিন ওয়ালিদ কে দামেস্কের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

সিরিয়া অভিযানের মাধ্যমে মুসলমানরা দামেস্ক, ফিহলো ও হিমসে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এ সকল অঞ্চলে মুসলিম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানরা বাইজান্টাইন যুদ্ধের দিকে অনুপ্রাণিত হন।

আজনাদাইনের যুদ্ধ

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে আজনাদাইন নামক স্থানে মুসলমানগণ এবং রোমানদের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাকে আজনাদাইনের যুদ্ধ বলে।

মুসলমানদের সমরায়োজনের কথা জানতে পেরে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস ২,৪০,০০০ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী তাঁর ভাই থিওডোরের নেতৃত্বে প্রস্তুত রাখেন। মুসলমানদের মোট সৈন্যসংখ্যা মাত্র ৪০,০০০ ছিল। অবশেষে এ দুই বাহিনী আজনাদাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের মোকাবিলা করে। এ যুদ্ধে রোমান বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে গাজা, নিউপলিস, জাভা প্রভৃতি স্থানসমূহ মুসলমানদের দখলে আসে। প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া দখলের সূচনার সুসংবাদ শুনে প্রথম খলিফা আবু বকর পরলোকগমন করেন (৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ আগস্ট)। এ যুদ্ধ পর্যন্ত আমর বিন আল আস মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে কাজ করেন। খলিফা ওমর প্যালেস্টাইন বিজয় সম্পন্ন করার জন্য আমর কে সেখানে থাকতে নির্দেশ দেন। খালিদকে সিরিয়া বিজয় সম্পন্ন করার কাজে অগ্রসর হতে আদেশ করেন।

আজনাদাইনের যুদ্ধে রোমানদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে– ফলে গাজা, নিউপলিস, জাভা প্রভৃতি স্থানসমূহ মুসলমানদের দখলে আসে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ

ইয়ারমুকের যুদ্ধ সিরিয়ার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কাদিসিয়ার যুদ্ধ যেমন পারস্যের ভাগ্য নির্ধারণ করে, ঠিক তেমনিভাবে এটাও সিরিয়ার ভাগ্য নির্ধারণ করে। এ যুদ্ধের ফলে কিন্নাসরিন, আলপ্পো, এন্টিয়ক প্রভৃতি স্থান মুসলমানদের অধিকারে আসে।

দামেস্ক, জর্দান ও হিমসের ন্যায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের পতনে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে আর্মেনীয়, সিরীয়, রোমীও আরব গোত্রীয় খ্রিস্টানদের নিয়ে গঠিত দুই লাখ চল্লিশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী ভাই থিওডোরাসের নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। অপরপক্ষে মাত্র পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক মুসলিম বাহিনী আবু ওবায়দার অধিনায়কত্বে ইয়ারমুকের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করে। আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সাথে মিলিত হন। ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ইয়ারমুকে এক সর্বাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে রোমীয়দের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ঐতিহাসিক বালাজুরীর মতে– ইয়ারমুকের যুদ্ধে সত্তর হাজার এবং ঐতিহাসিক তাবারীর মতে এক লাখের অধিক রোমান সৈন্য নিহত অথবা আহত হয়। মুসলমানদের পক্ষে তিন হাজার সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন। রোমানদের বিপর্যয়ের সংবাদে সম্রাট হিরাক্লিয়াস কনস্টান্টিনোপলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী যুদ্ধ। কাদেসিয়ার যুদ্ধ যেমন চিরকালের জন্য পারস্যের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়, ইয়ারমুকের যুদ্ধ ঠিক তেমনি সিরিয়ার ভাগ্য নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে। এ যুদ্ধের পর সমৃদ্ধশালী সিরিয়া চিরদিনের জন্য রোমানদের হস্তচ্যুত হয়। ইয়ারমুকের যুদ্ধ রোমানদের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দেয়। তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে পড়ে। তারা বিভিন্ন শর্তে মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ যুদ্ধের সাফল্য মুসলমানদের পরবর্তী যুদ্ধসমূহের বিজয়ের পথ প্রশস্ত ও সুগম করে।

সেনাপতি খালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পদচ্যুতি ও সমগ্র সিরিয়া বিজয়

ইয়ারমুকের যুদ্ধের অব্যবহিত পর খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেন এবং সেই পদে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিযুক্ত করেন। তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তা খলিফার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে উত্তর সিরিয়ার উদ্দেশে অগ্রসর হন। তিনি সুরাহবিল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জর্দান, ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লেবানন এবং আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্যালেস্টাইন ও জেরুজালেম অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি দ্রুতগতিতে বালবেক, এডেসা, এন্টিওক, আলেপ্পো, কিন্নিসিরিন প্রভৃতি স্থান দখল করে সমগ্র সিরিয়া অঞ্চলে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখেছিলেন, আসলে আমি খালিদের উপর রাগান্বিত হয়ে বা সে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে তাকে তার পদ থেকে অপসারণ করিনি বরং আমি তাকে অপসারণ করেছি এজন্য যে, জনগণ তাকে খুব বেশি মুহাব্বত করে ফেলছে; তাই আমি তাদের জানাতে চাইছি যে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই আমাদের সৈন্যবাহিনীর বিজয়দানকারী।"[৪১]

জেরুজালেম বিজয়

৬৩৭ খ্রিস্টব্দের জানুয়ারি মাসে রোমান শাসনকর্তা আর-তাবিনকে পরাজিত করে মুসলমানগণ জেরুজালেম অবরোধ করার মাধ্যমে তা অধিকারভুক্ত করেন। এর মাধ্যমে মুসলমানরা জেরুজালেমে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন বিজয়ের ধারাবাহিকতায় জেরুজালেমের পতন এবং মুসলমানগণ কর্তৃক এর কর্তৃত্ব লাভ ইসলামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ইয়ারমুক যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আমর ইবনে আল আস কর্তৃক প্যালেস্টাইনের রাজধানী জেরুজালেম অবরোধের সংবাদ পেয়ে রোমান শাসনকর্তা আরতাবুন পালিয়ে যান। রোমানগণ শত চেষ্টা করেও তাদের পবিত্র

---

[৪১] আল বিদায়াহ ওয়ান নেহায়াহ, ৭/৮২

শহর রক্ষা করতে ব্যর্থ হলো (এটি মুসলমানদেরও পবিত্র শহর) । অবশেষে অবরুদ্ধ নগরীর অধিবাসীবৃন্দ মুসলিম সেনাপতির নিকট এ শর্তে আত্মসমর্পণ করতে স্বীকৃত হলো যে, খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং জেরুজালেম এসে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করবেন। সেনাপতি আবু ওবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সংবাদ খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জানান। তিনি সকলের সাথে পরামর্শ করে একজন ভৃত্য সহকারে উটে চড়ে জেরুজালেম রওয়ানা হন। পালাক্রমে খলিফা ও ভৃত্যটি উটের পিঠে চড়তে চড়তে জেরুজালেম শহরে উপস্থিত হলেন। শহরে প্রবেশকালে পালানুযায়ী তখন খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উটের রশি টানছিলেন আর ভৃত্য উটের পিঠে বসা। এ দৃশ্য দেখে খ্রিস্টানগণ বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়েন। অতঃপর খ্রিস্টানদের সাথে সন্ধি স্বাক্ষর করে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নগরীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে তাদের ধর্মগুরু সাফ্রোনিয়াস সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। জিজিয়া করদানের প্রতিশ্রুতিতে জেরুজালেমবাসিগণ তাদের ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও জান-মালের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ফিরে পায়। এ শহরের পতনের ফলে সমগ্র প্যালেস্টাইনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হয়, তাতে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সাক্ষী ছিলেন।

আমর বীরত্বের সাথে রোমান শাসনকর্তাকে পরাজিত করে মুসলমানদের পবিত্র শহর জেরুজালেম নিজেদের অধিকারভুক্ত করেন।

মিশর অভিযান

মুসলমানদের মিশর বিজয়ের পেছনে আত্মরক্ষার কারণ ও অর্থনৈতিক কারণসহ বেশকিছু কারণ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে মুসলমানদের আবাসস্থলের নিরাপত্তা এবং একটি সার্বভৌম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য মিশর বিজয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে মিশর ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্যালেস্টাইন বিজয়ের পর আরবদের মিশর অভিযান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কেননা রোমানগণ সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত হলেও মিশর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তখনও তাদের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন ছিল। তাই মিশর থেকে রোমানদের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের অভিযানের আশঙ্কা ছিল। সুতরাং আত্মরক্ষার্থে মুসলমানদের মিশর জয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল।

মিশর ইসলামি রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু হেজাজের কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় ইসলামি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থেই মিশর দখল করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মিশরে রোমানদের শক্তিশালী নৌঘাটি, সেনানিবাস ও দুর্গ অবস্থিত থাকায় সুয়েজ ও আলেকজান্দ্রিয়া অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাই শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্য গঠনের জন্য মিশর বিজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

নীলনদের দেশ বলে মিশর ছিল কৃষি সম্পদে সমৃদ্ধ। নীলনদের প্রচুর পলিযুক্ত পানির প্রবাহ মিশর ভূমিকে উর্বরতা দান করে। এজন্য মিশরকে "নীলনদের দান" বলা হয়। অনুর্বর আরবদেশের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় তারা প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি, বাণিজ্য কেন্দ্র এবং কৃষি সম্পদে ভরপুর মিশর হস্তগত করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করেন।

উল্লিখিত কারণ ছাড়াও রোম সম্রাটের আচরণ মুসলমানদের মিশর বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল। রোমান সম্রাট জাযিরার জনগণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্ররোচনা দান করেছিলেন এবং মিশরের মধ্য দিয়ে সিরিয়া আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এসব কারণে খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কালবিলম্ব না করে আমর ইবনে আল-আসকে মিশরের দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মিশর বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সুষ্ঠু শাসন পরিচালনা নিশ্চিত করেছে। মিশর বিজয়ে হেলিওপলিসের যুদ্ধ, আলেকজান্দ্রিয়া দখলসহ বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হয়।

মুসলমানদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে মিশর বিজয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলমানগণ উত্তর আফ্রিকায় অভিযানকালে মিশরকে সামরিক ঘাঁটি ও নৌবাহিনীর প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তাছাড়া আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু মিশরের বাসিন্দাদের অবস্থার উন্নতি সাধন, রাজস্ব নির্ধারণ, ব্যবসা-

বাণিজ্যে উৎসাহ দান এবং মিশরের অমুসলিম প্রজাদের সাথে উদার ও সদয় ব্যবহার দ্বারা মিশরীয়দের জীবনে অভূতপূর্ব সুখ ও সমৃদ্ধি এনেছিলেন। মিশরবাসী ইতঃপূর্বে আর কখনও এরূপ শান্তি ও সমৃদ্ধিতে জীবনযাপন করতে পারেনি। উপরন্তু মিশর বিজয়ের পর আমর ইবনে আল আস খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্দেশে খাল খনন করে নীলনদ ও লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করেন ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে; ফলে মিশর থেকে আরবের সামুদ্রিক বন্দর ইয়ানবু পর্যন্ত যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়। মুসলমানদের অর্থনৈতিক ভিত্তিও সুদৃঢ় হয়।

মিশর বিজয় মুসলমানদের বাস্তব জীবনকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী করে তোলে, তাই ইসলামের ইতিহাসে এ বিজয় স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রয়েছে।

হেলিওপলিসের যুদ্ধ

আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর চার হাজার সৈন্যসহ মিশরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং ওয়াদি আল আরিশ নামক স্থান দখল করেন। এরপর তিনি ফারামা, বিলবিল এবং আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর জয় করে ব্যাবিলন নামক দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। এ সময় খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জুবাইর ইবনে আল আওয়ামের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্য আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাহায্যার্থে মিশরে পাঠালেন। ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীকে হেলিওপলিসের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। যুদ্ধে পরাজিত রোমান সেনাপতি থিওডোরাস আলেকজান্দ্রিয়ায় আত্মগোপন করেন এবং মিশরের শাসনকর্তা সাইরাস ব্যাবিলন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ এপ্রিল মুসলমানগণ দুর্গপ্রাচীর অতিক্রম করে ব্যাবিলন দখল করে নেয়।

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়

মিশর অভিযানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো আলেকজান্দ্রিয়ার পতন। সেনাপতি আমর ইবনে আল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইজান্টাইনের সামরিক ঘাঁটি আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করলেন। বাইজান্টাইন সেনাপতি থিওডোরাস মুসলিম আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এবার মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল বিশ হাজার আর শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার। নতুন রোমান সম্রাট কনস্টানস দুর্গ থেকে বহু ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেও মুসলিম সেনাবাহিনীর গতিরোধ করতে পারলেন না। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে ৮ নভেম্বর আলেকজান্দ্রিয়া মুসলমানদের হস্তগত হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার পতনের পর উভয়পক্ষে সন্ধি হলো। সন্ধির শর্তানুসারে রোমান সম্রাট মুসলমানদের বার্ষিক

১৩,০০০ দিনার দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। চুক্তি অনুযায়ী জিজিয়ার বিনিময়ে তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা হয়।

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আলেকজান্দ্রিয়ার পতনের সাথে সাথেই রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রদেশ মিশর চিরকালের জন্য তাদের হস্তচ্যুত এবং মুসলিম রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। উপরন্তু মুসলমানদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। আলেকজান্দ্রিয়াকে মুসলমানগণ উত্তর আফ্রিকার বিরুদ্ধে সামরিক ঘাঁটি ও নৌবহরের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার সাধন করেছিল। অনেকগুলো জনকল্যাণমূলক সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ায় সেখানকার কৃষি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়।

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর আমর ইবনে আল আস রা. ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে ব্যাবিলনের নিকট একটি সুন্দর শহর নির্মাণ করেন। এটাই বিখ্যাত ফুস্তাত শহর। বর্তমান কায়রো (আর-কাহিরা) প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত ফুস্তাত নগরী মিশরের রাজধানী ছিল।

রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের ফলাফল

আরব দেশের উত্তর-পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্য অবস্থিত। পূর্বে রোমান সাম্রাজ্যকে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য বলা হতো। সিরিয়া, জর্দান, প্যালেস্টাইন ও মিশর পূর্বে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মূলত রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের ফলাফল হলো–

১. **নৌবাহিনী গঠন :** প্রাচ্যে রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্তী হয়। ফলে বাধ্য হয়ে তাদের নৌবাহিনী গঠন করতে

হয়েছিল। সুতরাং প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ প্রবল নৌ-শক্তির অধিকারী হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

২. মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমারেখা চিহ্নিত : সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইন বিজয় মুসলমানদেরকে এশিয়া মাইনরের উত্তরাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। তবে প্রাকৃতিক বাধার জন্য উক্ত অঞ্চলের অধিক দূর পর্যন্ত তারা অগ্রসর হতে পারেনি। উত্তর দিকে টরাস পর্বত পর্যন্ত তারা আপাতত উপনীত হয়েছিল। সুতরাং বহুদিন পর্যন্ত উক্ত পর্বত রোমান এবং মুসলমান সাম্রাজ্যদ্বয়ের সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত ছিল।

৩. শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়ন : প্রাচীনকাল থেকে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং মিশর সমৃদ্ধিশালী ও উর্বর ভূমিখণ্ড হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। প্রাচ্যে রোমান সাম্রাজ্য অধিকার করে মুসলমানগণ আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল হয়ে উঠেছিল। এভাবে মুসলমানগণ আর্থিক দৈন্য ও অভাব-অনটনমুক্ত হলো এবং তারা তাদের জীবনযাত্রা, শিক্ষা-সংস্কৃতির মান উন্নয়ন করতে সমর্থ হয়েছিল।

৪. অর্থনৈতিক সাফল্য : রাজনৈতিক দিক দিয়ে মুসলমানগণ সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং মিশর অধিকার করে রোমান সাম্রাজ্যের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছিল। রোমানগণ তিনটি সুন্দর ও উর্বর প্রদেশ মুসলমানদের নিকট হারিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল।

৫. সামরিক সাফল্য : রোমানদের সান্নিধ্য লাভের ফলে মুসলমানগণ তাদের উন্নত সামরিক কলাকৌশল আয়ত্ত করতে সক্ষম হন এবং এ লব্ধ জ্ঞান যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা পরবর্তীকালের বিজয়াভিযানসমূহে সাফল্য ছিনিয়ে আনেন।

৬. বিশ্ব-সভ্যতার সাথে ইসলামি সভ্যতার সংস্পর্শ : মুসলমানদের এ বিজয় তাদেরকে গ্রিক ও রোমান সভ্যতার সংস্পর্শে নিয়ে আসে। প্রাচীনকাল থেকে এ সমস্ত দেশ ছিল সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ও লীলাভূমি। এ বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ গ্রিক এবং রোমানদের জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী হয়েছিল। মুসলমানরা এর সাথে ইসলামি সভ্যতার সংযোগসাধন করে বিশ্ব-সভ্যতার গতিকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল।

রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে যেসব ইসলামি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়, তেমনি ইসলামি রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটে। রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে। আবার রোমান সভ্যতার সংমিশ্রণে ইসলামি সভ্যতার সমৃদ্ধি ঘটে।

অধ্যায়-৪

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাসনব্যবস্থা ও কৃতিত্ব

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শাসনব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করে সুষ্ঠু শাসনের ব্যবস্থা করেন। খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খিলাফতের সময়ে মুসলিম সাম্রাজ্য ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। শাসনকাজের সুবিধার জন্য খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সমগ্র সাম্রাজ্যকে চৌদ্দটি প্রদেশে বিভক্ত করেন (১) মক্কা, (২) মদিনা, (৩) সিরিয়া, (৪) আল-জাজিরা, (৫) আল-বসরা, (৬) আল-কুফা, (৭) আল-মিশর, (৮) প্যালেস্টাইন, (৯) ফারস, (১) কিরমান, (১১) খোরাসান, (১২) মাকরান, (১৩) সিজিস্থান, (১৪) আজারবাইজান।

প্রত্যেকটি প্রদেশের শাসনভার একজন ওয়ালীর (গভর্নর) ওপর ন্যস্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনের ব্যাপারে ওয়ালিগণ খলিফার নিকট দায়বদ্ধ থেকে তার নির্দেশ পালন করতেন। নিয়োগের সময় ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকে তাদের নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করতেন। জনসাধারণের সুবিধার্থে খলিফা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব সংবলিত সনদটি প্রকাশ্যে পাঠ করে শুনাতেন। প্রাদেশিক রাজ্যে দায়িত্ব পাওয়ার পরেই প্রত্যেক ওয়ালীকে তার সম্পত্তির একটি তালিকা পেশ করতে হতো এবং আয়ের অনুপাতে আকস্মিক ও অস্বাভাবিকভাবে সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রাদেশিক শাসনকর্তার অতিরিক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে সাধারণ লোকেরা অভিযোগ করলে অভিযোগ অনুসারে শাসনকর্তাগণের নিকট থেকে কৈফিয়ত তলব করতেন। শাসনকর্তাগণ জনগণের সেবক মাত্র, এ আদর্শ থেকে সামান্য বিচ্যুত হলে খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দণ্ড থেকে কারও নিস্তার ছিল না। জনস্বার্থ সংরক্ষণ এবং আপামর প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নিমিত্তে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সদা-সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শাসনকর্তাদেরকে নির্দিষ্ট বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। ওয়ালীগণ শুধু যে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন তা নয়, শুক্রবার স্ব স্ব রাজধানীর মসজিদে জুমার নামাযে ইমামতি করতেন। খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার অধীনে আমিল (জেলা প্রশাসক), কাজি (বিচারক) ও সাহিব আল-বায়তুলমাল (কোষাধ্যক্ষ) তাদের স্ব স্ব কাজ সম্পাদন ও কর্তব্য পালন করতেন। তাদের

বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে, এর সত্যতা যাচাই করার জন্য নির্দিষ্ট কর্মচারী নিযুক্ত ছিল এবং খলিফার নিকট তার পেশকৃত তথ্যাবলির ভিত্তিতে তিনি অভিযোগের যথাযথ প্রতিকার করতেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাম্রাজ্যের বিশালতার কারণে সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত করে সুষ্ঠু শাসন নিশ্চিত করেন। কোনো অঞ্চলের প্রতিনিধি প্রেরণের পূর্বে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নিতেন।[৪২]

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজেতাদের অন্যতমই ছিলেন না, সুযোগ্য প্রশাসক হিসেবেও তাঁর অক্ষয় কীর্তি ইসলামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। প্রশাসনিক কৃতিত্বের জন্য ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিঃসন্দেহে ইসলামের শাসনব্যবস্থার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। ঐতিহাসিক ইমামুদ্দিন যথার্থই বলেছেন, " ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শুধু মহান বিজেতাই নন, তিনি ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক এবং নিরঙ্কুশ সফলকামী জাতীয় নেতাদের অন্যতম।" গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ছিল খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গণতন্ত্রের যে বীজ বপন করেন, তা খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সময় বিকশিত হয়ে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। পরামর্শসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো গঠন এবং কার্যক্রম গ্রহণ তাঁর শাসনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। খলিফার নীতি ও কাজ সম্পর্কে জনগণের গঠনমূলক সমালোচনা করার অধিকার তাঁর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সাম্য, স্বাধীনতা, একতা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে জনকল্যাণকর ব্যবস্থা প্রচলন করেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলীর মতে, "ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতে গণতন্ত্রের আদর্শ যতদূর পালন করা হয়েছিল, সেই আদর্শ অর্জন করতে বিশ্বের আরও অধিক সময় লাগবে।

খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসন নীতি ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যে গণতন্ত্রের বীজ বপন করেন তা তাঁর শাসনকালে পূর্ণ বিকাশ ও রূপায়ণ লাভ করে। তিনি কুরআন ও হাদিসের নির্দেশ এবং জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী খেলাফত পরিচালনা করতেন। তাঁর শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক নর-নারীর পূর্ণ নাগরিক অধিকার ছিল। তাঁর সামনে এবং আইনের চোখে সবাই সমান ছিল। সকল মানুষকে সমান মর্যাদা দেবার জন্য তিনি সমাজ থেকে দাসত্ব প্রথা নিশ্চিহ্ন করে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাঁর মতে আইনের

[৪২] আল উলাইয়্যাহ আলাল বুলদান : ১/১৪২

চোখে খলিফা ছিলেন জনসাধারণেরই একজন এবং তাদের মতোই সমান মর্যাদা এবং সমান সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। তাঁর খেয়াল-প্রসূত কোনো কিছু করার অধিকার নেই। তাঁর অনুশাসন আত্মা-পর-নির্বিশেষে সকলের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য হতো। সরকারের কার্যাদির সমালোচনা করতে ওমর জনসাধারণকে উৎসাহিত করতেন। এর ফলে যেকোনো শাসনগত ত্রুটি সঙ্গে সঙ্গেই সংশোধিত হতো।

ওমর ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বিজেতা, তিনি তার শাসনকালে প্রায় অর্ধ পৃথিবী জয় করেন। তিনি তার সমগ্র বিজিত এলাকায় ইসলামি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

মসলিস-উশ-শূরা (পরামর্শ সভা)

খলিফা ওমর মজলিশ-উশ-শূরার পরামর্শক্রমে খিলাফত পরিচালনা করতেন। এটি ছিল তাঁর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তিনি দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "পরামর্শ ছাড়া কোনো খিলাফত চলতে পারে না।" এজন্য তিনি যেকোনো সমস্যা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদিসের আলোকে শূরার সাহায্যে সমাধান করতেন। এ শাসন পরিষদ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা– মজলিশ আল-আম এবং মজলিশ আল-খাস। মুহাম্মদ -এর জ্ঞানীগুণী সাহাবা এবং মদিনার গণ্যমান্য নাগরিক ও বিশিষ্ট বেদুইন প্রধানগণকে নিয়ে মজলিশ আল-আম গঠিত ছিল। এককথায় মুহাজিরিন এবং আনসারদেরকে নিয়েই এটি গঠিত ছিল।

'শূরা' আরবি শব্দ, এর আভিধানিক অর্থ পরামর্শ। প্রাক-ইসলামি যুগে গোত্রপ্রধানরা গণ্যমান্য সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে সমস্যা সমাধান করতেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনেও পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। মহানবী প্রাক-ইসলামি নীতি ও কুরআনের নির্দেশ অনুসরণ করে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদন করতেন। এই পরামর্শ সভাকে 'মজলিশ উশ-শূরা বলা হয়। ওমর শূরা অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন।

খলিফা ওমর মজলিশ-উশ-শূরার পরামর্শক্রমে খিলাফত পরিচালনা করতেন। এটি ছিল তাঁর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তিনি দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "পরামর্শ ছাড়া কোনো খিলাফত চলতে পারে না।" এজন্য তিনি যেকোনো সমস্যা মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও হাদিসের আলোকে শূরার সাহায্যে সমাধান করতেন। এ শাসন পরিষদ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। যথা– মজলিশ আল-আম এবং মজলিশ আল-খাস। মুহাম্মদ -এর জ্ঞানী-গুণী সাহাবা এবং মদিনার গণ্যমান্য নাগরিক ও বিশিষ্ট বেদুইন প্রধানগণকে নিয়ে

মজলিশ আল-আম গঠিত ছিল। এককথায় মুহাজিরিন এবং আনসারদেরকে নিয়েই এটি গঠিত ছিল।

মদিনা মসজিদে শাসন পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতো। এছাড়া কতিপয় নির্দিষ্ট মুহাজিরিন নিয়ে মজলিস আল-খাস গঠিত ছিল। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দৈনন্দিন শাসনকাজে মজলিস আল-খাসের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু, জুবায়ের প্রমুখ সাহাবাগণের সমন্বয়ে এটি গঠিত ছিল। রাজ্য শাসনের সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার বিশেষ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হতো। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনগণকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করতেন। তাঁর খিলাফতে শাসনক্ষেত্রের সর্বত্রই গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের নীতি অনুসৃত হতো। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতে গণতন্ত্রের আদর্শ যতদূর পালন করা হয়েছিল, সে আদর্শ অর্জন করতে বিশ্বের আরও অধিক সময় লাগবে।

মহান আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ অনুসারে কাজ পরিচালনার নীতি হলো পরামর্শভিত্তিক। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। তিনি সকল কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে মজলিসে শূরার সাথে পরামর্শ করতেন।

নিয়মিত সামরিক বাহিনী গঠন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় সামরিক অভিযানের জন্য প্রথমদিকে স্বেচ্ছাসেবকদেরকে প্রয়োজনানুযায়ী ভর্তি করা হতো; কিন্তু পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। আহলুস-সুফফা (সুফ্ফার শিক্ষার্থিগণ) এর ভিত্তিস্বরূপ গণ্য হন। সুফ্ফায় অবস্থানকারীদের শিক্ষাদীক্ষা, আহার ও বাসস্থান রাষ্ট্রের দায়িত্বে ছিল এবং আকস্মিক প্রয়োজনে এক মিনিটের নোটিশে দিন-রাত যেকোনো সময়ে তাদের পরিচালকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয়সংখ্যক সিপাহি নির্বাচিত করে প্রেরণ করা হতো। পরবর্তীকালে এর আরও সম্প্রসারণ করা হয়। ইমাম মুহাম্মদ শায়বানী এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন (দ্র. আস-সারাখসী, শারহুস-সিয়ারিল-কাবীর, অধ্যায় ১০৫ সম্পা, আল-মুনাজ্জিদ, ১৯৭৮ খি.)। সিপাহি নিয়োগের এ পদ্ধতি একমাত্র রাজধানী মদিনায় সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর আমলে প্রতিটি প্রদেশে মুসলিম সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং বায়তুল মাল হতে ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। এতে প্রত্যেক সিপাহি নিশ্চয়তা লাভ করেছিল যে, যদি সে স্বকীয় কাজকর্ম ও উপার্জন বন্ধ করে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে তা হলে তার পরিবার-পরিজন খাদ্যাভাবে মরবে না। বায়তুল মাল হতে অমুসলিমদেরকে ভাতা দেওয়া হতো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূত-পবিত্র পত্নিগণকে ভাতা দেওয়া হতো এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে অন্যদের তুলনায় অধিক দেওয়া হতো। কিন্তু তিনি স্বয়ং তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এমনিভাবেই

জুয়ায়রিয়া ও সাফিয়্যা কে একই ভিত্তিতে অন্যদের তুলনায় স্বল্প দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। কেননা তারা ছিলেন মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসী; কিন্তু এতে অন্যান্য উম্মুহাতুল-মু'মিনীনন বলেন : রাসূলুল্লাহ কখনও আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না। এতে ওমর সকলকে সমানভাবে ভাতা বিতরণ করতে থাকেন (আত-তাবারী, ৫/১খণ্ড, ২৪১৩)। তিনি আব্বাস কে সর্বাপেক্ষা বেশি ভাতা প্রদান করতেন; অতঃপর বদরের যুদ্ধে বিজয়ীদেরকে। তিনি ইসলামের সেবকদের প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখতেন। তিনি নবজাত শিশুদেরকে ভাতা প্রদান করতেন এবং তা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি করা হতো। [ভাতার পরিমাণ নির্ধারণ করার সময় রাসূলুল্লাহ -এর প্রতি ভালোবাসা ও সম্পর্কের প্রতি লক্ষ রাখা হতো। উদাহরণস্বরূপ উসামা ইবন যায়দ -এর জন্য তিনি পাঁচ হাজার দিরহাম নির্ধারণ করেন এবং স্বীয় পুত্র আব্দুল্লাহ ইবন ওমর -এর জন্য দুই হাজার দিরহাম।[৪০]

সামরিক ব্যবস্থাপনা

ওমর সাম্রাজ্য শাসনের সুবিধার্থে রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখার জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে নয়টি সামরিক জেলায় বিভক্ত করেন। ওমর -এর সামরিক বিভাগ ছিল–

[৪০] আস-সাফাদী, আল-ওয়াফী বিল-ওয়াফায়াত, ৮খণ্ড, ৩৭৪

১. সামরিক সেক্টর গঠন : মুসলিম সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতির প্রেক্ষিতে একটি সুসংবদ্ধ সামরিক ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে খলিফা ওমর রাযি. সামরিক বাহিনীকে সুসংহত করার জন্য একটি প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করেন। সাম্রাজ্য শাসনের সুবিধার্থে তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে নয়টি সামরিক জেলায় বিভক্ত করেন। যথা– মদিনা, কুফা, বসরা, ফুসতাত, মিশর, দামেস্ক, হিমস, প্যালেস্টাইন ও মসুল। জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য প্রত্যেকটি জেলায় ৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের একটি বাহিনী সর্বদা প্রস্তুত থাকত। সেনা দপ্তরের সকল সৈন্যের নামের একটি তালিকা রাখা হতো। সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন খলিফা নিজেই। প্রত্যেক বাহিনীর অবশ্য নিজস্ব অধিনায়ক ছিল এবং যুদ্ধনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ তারাই করতেন।

২. সৈনিকদের বেতন : তাঁর আমলে সৈন্যগণ প্রত্যেকে প্রথম বছরে ২০০ দিরহাম ও পরে ৩০০ দিরহাম বেতন পেত। তাদের খোরাক ও পোশাক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হতো। তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণ সরকার হতে ভাতা পেত। তা ছাড়াও তারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত ধনের $\frac{৪}{৫}$ অংশ নিজেদের মধ্য বণ্টন করে নিত। 'আল-আরিফ' নামক কর্মচারী তাদেরকে নিয়মিত বেতন দিতেন। 'আহরা' নামক সংস্থার মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে রসদ সরবরাহ করা হতো।

৩. সামরিক বাহিনীর শ্রেণিবিভাগ : সৈন্যবাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ, বাহক, সেবক প্রভৃতি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। রণক্ষেত্রে তারা অগ্র, মধ্য, পশ্চাৎ ও দুই পার্শ্ব এরূপ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করত। 'আহরা' নামক সংস্থার মাধ্যমে সৈন্যদের রসদ সরবরাহ করা হতো। যুদ্ধে সৈন্যরা তরবারি, বর্শা, বল্লম, তীর, ধনুক, ঢাল, বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করতেন।

৪. সৈন্য বিগ্রেড গঠন : প্রতি একশত জনের ওপর একজন করে 'কায়েদ' এবং প্রতি দশজন কায়েদের ওপর একজন সেনাপতি বা 'আমির' নিযুক্ত থাকতেন। 'আহরা' নামক সংস্থার মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে রসদ সরবরাহ করা হতো।

৫. সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষা : সৈন্যবাহিনীর নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও আনুগত্যশীলতার প্রতি কড়া নজর রাখা হতো। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তারা নিয়মিত শাস্তি ভোগ করত।

সামরিক বিভাগ বিষয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গৃহীত পদক্ষেপগুলো সমগ্র সাম্রাজ্যকে শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

বিচার বিভাগ

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিচার বিভাগ ছিল খুবই মজবুত। তিনি প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন করে প্রধান কাজি নিযুক্ত করেন এবং প্রতি জেলায় একজন সাধারণ কাজি নিযুক্ত করেন। বিচার বিভাগের সংস্কারসাধন খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। তিনিই সর্বপ্রথম শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। প্রত্যেক প্রদেশের বিচার বিভাগের ভার প্রাদেশিক গভর্নরের (ওয়ালি) পরিবর্তে কাজীর ওপর ন্যস্ত করা হয়। ফলে ওয়ালির কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে কাজিগণ স্বাধীনভাবে বিচার কাজ সম্পন্ন করতেন। কুরআন ও হাদিসে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী

এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমানদের মধ্য থেকে কাজী নিযুক্ত করা হতো। প্রত্যেক প্রদেশ ও জেলায় একজন করে কাজী নিযুক্ত থাকতেন। অবশ্য বিচার বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন খলিফা নিজেই। তিনি কাজীদের বেতন নির্দিষ্ট করে দেন।

কাজিগণ উঁচু-নিচু, ছোট-বড় ভেদাভেদ না করে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচারকাজ পরিচালনা করতেন। মুসলিম আইনের বাইরে অমুসলমানগণ তাদের নিজস্ব আইন-কানুনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারত এবং সেসব ক্ষেত্রে তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় প্রধানগণ তাদের বিচার করতেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিচারকাজ পরিচালনার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সতর্কতার সাথে একমাত্র কুরআন ও হাদিস অনুসারে রায় দিতেন এবং নিযুক্তকারীদের এ মর্মে নির্দেশনা দিতেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "যে ব্যক্তির মধ্যে চারটি গুণাবলি রয়েছে। একমাত্র তারই বিচারক হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে। সে হবে নম্র-ভদ্র কিন্তু দুর্বল নয়, কঠোর কিন্তু কর্কশ নয়, মিতব্যয়ী কিন্তু কৃপণ নয় এবং ক্ষমাশীল কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রার নয়।" একজন সম্পদশালী ও ভালো বংশের লোককে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দাও। কেননা একজন সম্পদশালী ব্যক্তি কখনো অন্যের সম্পদের আশা করবে না এবং একজন ভালো বংশের লোক বিচার করে কখনো ভয় পাবে না।[৪৪]

জনহিতকর কার্যাবলি

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাজ্য বিজয় ও শাসনসংস্কারের সাথে নানাবিধ জনহিতকর ও উন্নয়নমূলক কাজে মনোনিবেশ করেন। নাজরাত-ই-নাফিয়ার তত্ত্বাবধানে তার খিলাফতকালে অসংখ্য সরকারি ভবন, মসজিদ, খাল, সড়ক, পুল, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মিত হয়। পানির কষ্ট নিবারণ ও ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি বসরায় আবু মুসা খাল, পারস্যের সাদ খাল, ইরাকে মাকাল খাল এবং মিশরে আমিরুল মু'মিনীনন খাল খনন করেন। তিনি কা'বাগৃহের পুনঃনির্মাণ ও মদিনা মসজিদের সম্প্রসারণ করেন। তাঁর সময় হাজার হাজার নতুন মসজিদ, অসংখ্য দুর্গ ও সেনানিবাস, সরকারি কার্যালয়, ভবনসমূহ, দিওয়ান, বায়তুল মাল, অতিথি ভবন ইত্যাদি স্থাপিত হয়। প্রশস্ত ও দীর্ঘ রাস্তা দ্বারা রাজধানী মদিনাকে দূরবর্তী প্রদেশগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হয়। এছাড়া তিনি কুফা, বসরা, ফুস্তাত, মসুল প্রভৃতি শহর নির্মাণ করেন। একজন আদর্শিক ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে যে সকল জনহিতকর কাজ করা দরকার ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সব করেছেন।

---

[৪৪] মাউসুয়াহ ফিকহ উমর ইবনে আল-খাত্তাব, পৃ. ৭২৪

বিজিত ভূখণ্ডে মালিকানার প্রশ্ন সমাধান

প্রাথমিক বিজয়ের অব্যবহিত পরেই যখন এ বিষয় অনুভূত হলো যে, এখন মুসলিমদের আরবে প্রত্যাবর্তন করার প্রয়োজন নেই, এ সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে : কুরআন মাজীদে যুদ্ধলব্ধ মাল সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে যে, এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্র, চার-পঞ্চমাংশ বিজয়ী সৈনিকদেরকে দেওয়া হোক। অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোনো জটিলতার উদ্ভব হয়নি; কিন্তু বিজিত ভূখণ্ডের ব্যাপারটা ছিল অন্যরূপ (অর্থাৎ কীভাবে তা বণ্টন করা যায়)। ওমর রাঃ তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দ্বারা অনুধাবন করলেন যে, যদি মুসলিম বাহিনীর সৈনিকদেরকে হাজার হাজার বর্গমাইল ভূখণ্ড দেওয়া হয় তা হলে একদিকে সম্পদ মাত্র

কিছুসংখ্যক লোকের কুক্ষিগত হবে যা কুরআন মাজীদ-এর নির্দেশের পরিপন্থি।[৪৫] অন্যদিকে রাষ্ট্রের প্রয়োজন মাত্র এক-পঞ্চমাংশ ভূখণ্ড ও মুসলিমগণের দেওয়া যাকাত দ্বারা পূর্ণ হতে পারে না। এছাড়া এ আশঙ্কাও ছিল যে, যদি মুসলিম মুজাহিদদের মধ্যে বিভিন্ন এলাকার ভূখণ্ডসমূহ বন্টন করে দেওয়া হয়, তা হলে তাদের লক্ষ্য সঠিক উদ্দেশ্য হতে বিচ্যুত হবে এবং তাদের সম্মিলিত শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। তদুপরি বিজিতদের সঙ্গে সদাচরণেরও প্রশ্ন ওঠে। এ সম্পর্কে কতিপয় সাহাবির মধ্যে মতবিরোধ ছিল এবং এ বিষয়ে দীর্ঘ এক মাস ধরে বিতর্ক চলতে থাকে। অবশেষে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন মাজীদ দ্বারা প্রমাণ করেন যে[৪৬], বিজিত ভূখণ্ড কেবল উপস্থিত লোকদের জন্যই নয়; বরং "ওয়াল্লাযীনা মিম কাদিহিম" অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে, তারাও এর মালিক হবে। এজন্য সমস্ত ভূখণ্ড ওয়াকফের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে থাকবে। এখন কারও মতবিরোধ রইল না এবং সাধারণসভার এ সম্মিলিত রায়কে সকল মুসলিম সেনাপতিদেরকে অবগত করা হয়।[৪৭] ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এ বিচক্ষণতা ইসলাম ও কুরআন মাজীদকে বাস্তবমুখী প্রমাণ করে এবং তা শুধু শাসিত ও নিপীড়িত হওয়ার সময়ই নয়; বরং বিজয়ী ও তিনটি মহাদেশের ওপর শাসনকালেও তা প্রমাণিত হয়।

রাষ্ট্রীয় ভূমি রক্ষায় ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিচক্ষণতা

বিদ্যুৎ গতিতে বিজয়ের ফলে সকল বিজিত জনগণ তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেনি। সম্ভবত একজন মুসলিম সিপাহীর ভাগে একশত বর্গমাইল পড়ত। অতএব তাদেরকে ভূমির মালিকানা হতে বিরত রাখা কর্তব্য ছিল। যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার ফলে বিজয়ী সৈনিকরা কৃষক শ্রেণিতে পরিণত হলে কিছু খারাবী দেখা দিত। তারা সহজেই ভূমি ক্রয় করতে পারত। কিন্তু এতে স্বদেশবাসীদের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ তিক্ত হয়ে পড়ত এবং তাদের মধ্যে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেত। আরও একটি কারণ এই ছিল যে, সেকালে ইরানে এমন শ্রমিক নিয়োগের প্রথাও ছিল যারা ভূমির স্থানান্তরের সাথে স্থানান্তরিত হতো। এ ধরনের আধা-গোলামি ইসলাম স্বীকার করে না। তাদেরকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করা হলে অমুসলিম জমিদারগণ মুসলিমদের শত্রুতে পরিণত হতো, কারণ সেক্ষেত্রে শ্রমিক পাওয়া দুষ্কর হতো। অতএব, এ প্রাথমিক যুগে অমুসলিমদের মধ্যেই ভূমির মালিকানা বজায় রাখা হয়েছিল। আরও একটি কারণ এই ছিল যে, আরবে ভূমির উৎপাদিত শস্যের ওপর উশর-এর প্রচলন ছিল অর্থাৎ কৃষক উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ

---

[৪৫] আল-কুরআন-৫৭:৭।

[৪৬] আল-কুরআন, ৫৭:৭-১০।

[৪৭] আল ওয়াছাইকুস সিয়াসিয়্যা নং ৩৫৪-৫৫, ৩৬৫, ৫-৭।

রাজস্ব প্রদান করত। ইরাকের কোনো কোনো স্থানে এক-তৃতীয়াংশ এবং কোনো কোনো স্থানে এক-ষষ্ঠাংশের প্রচলন ছিল। এ সমস্ত ভূমির স্বত্বাধিকারী মুসলমান হলে তারা উশর প্রদান করতে জিদ করত; এতে রাষ্ট্রের আয় হ্রাস পেত। সুতরাং মুসলমান ভূমির মালিক না হলে এ প্রশ্ন উঠত না। যদি কোনো সাহাবি প্রচলিত স্থানীয় খারাজ (রাজস্ব) প্রদান করতে সম্মত হতেন তা হলে তাকে ভূমির মালিক করা হতো, যেমন আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা.-কে দেওয়া হয়েছিল।[৪৮]

এভাবে অনুমিত হয় যে, রাষ্ট্রীয় ভূমি, পূর্ববর্তী শাসকদের খাস ভূমি এবং পলাতক অথবা নিহত জমিদারদের ভূমি ওমর রা. বেকার চাষিদের মধ্যে বিতরণ করে তাদেরকে মালিকানাস্বত্ব দান করেন। আর এভাবেই ওমর রা. মুসলিম বিশ্বকে দ্রুতগতিকে সম্প্রসারিত করেন। উসমান ইবন হুনায়ফ কর্তৃক জরিপ করানো হলে দেখা যায় যে, একমাত্র সওয়াদ-ই-ইরাকে'ই ৩৬ মিলিয়ন জারীর আবাদি ভূমি পাওয়া গিয়েছিল অমুসলিমদের সঙ্গে নির্দিষ্ট অর্থে ভূমি-করের চুক্তি হয়েছিল এবং তা আদায়ের জন্য অমুসলিমদেরকেই কর আদায়কারী (আরীফ) রূপে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কোনো উত্তরাধিকারহীনের মৃত্যু হলে তার ভূ-সম্পত্তি তার স্বধর্মীয়গণই ক্রয়ে প্রাধান্য পেত। এভাবে ক্ষুদ্র ও দুর্বল সম্প্রদায়সমূহের সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ রাখা হতো।

রাজস্ব আদায়ে ওমর রা.-এর পদক্ষেপ

মুসলিমদের জন্য সামরিক কর্তব্য ছিল বাধ্যতামূলক। অমুসলিমকে এতে বাধা প্রদান করা হতো না; কিন্তু বাধ্যও করা হতো না। মুসলিম শাসনামলে এ অমুসলিম প্রজাগণ শান্তিতে উপার্জনে রত থাকত। সামরিক ব্যয়ে তাদের অংশগ্রহণ করা ছিল যুক্তিসম্মত, আর এ হলো জিযিয়া। নবী ﷺ-এর কালে সীমিত ব্যবস্থাধীনে প্রত্যেক অমুসলিমের ওপর সমান জিযিয়া ছিল; কিন্তু ওমর রা. একে তিনটি স্তরে বিন্যাস করেন : দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী। বলা যেতে পারে যে, এর বার্ষিক পরিমাণ ছিল একটি পরিবারের একদিনের খাদ্যব্যয়ের সমপরিমাণ। মহিলা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গ, সন্ন্যাসী, অধিকন্তু ঐ সমস্ত অমুসলিম ব্যক্তি যারা কোনো বছর কোনো একটি যুদ্ধে সামরিক কাজে অংশগ্রহণ করেছিল তাদেরকে তা হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল।

অমুসলিম দক্ষ কর্মচারীবৃন্দ স্থানীয় ভাষায় রাজস্ব ও জিযিয়া হিসাব লিপিবদ্ধ করে মদিনা মুনাওয়ারায় প্রেরণ করত। উদাহরণস্বরূপ ওমর রা. সিরিয়ার শাসনকর্তাকে লিখেছিলেন : ইবাছ ইলায়না বি-রূমিয়্যি ইয়ুকীমু লানা হিসাবা

[৪৮] ইয়াহয়া ইবনে আদাম, আল-খারাজ, পৃ: ১৬৭, ১৭৯।

ফারা'ইদিনা' অর্থাৎ "রাজস্বের যথার্থ হিসাব রক্ষণে পারদর্শী একজন রুমী (অর্থাৎ গ্রিক) কর্মচারীকে আমাদের নিকট প্রেরণ কর।" প্রতিবছর রাজস্ব আদায়ের পর প্রতিটি প্রদেশ হতে সেই স্থানের রাজস্ব প্রদানকারীদের একটি প্রতিনিধিদলকে মদিনায় ডাকা হতো যাদের মাধ্যমে জানা যেত যে, রাজস্ব আদায়ে কোনো অবিচার করা হয়নি।

অমুসলিম বিদেশিগণকে শতকরা দশ ভাগ নগর-শুল্ক দিতে হতো, কিন্তু একটি বিধি এও ছিল যে, দেশীয় মুসলিমদের সঙ্গে যেভাবে আচরণ করা হয় ঠিক সেভাবে অমুসলিম বিদেশিগণের সঙ্গেও আচরণ করতে হবে। মানবাজ-এর নগর শুল্ক প্রধানকে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ উপদেশ দিয়েছিলেন।[৪৯]
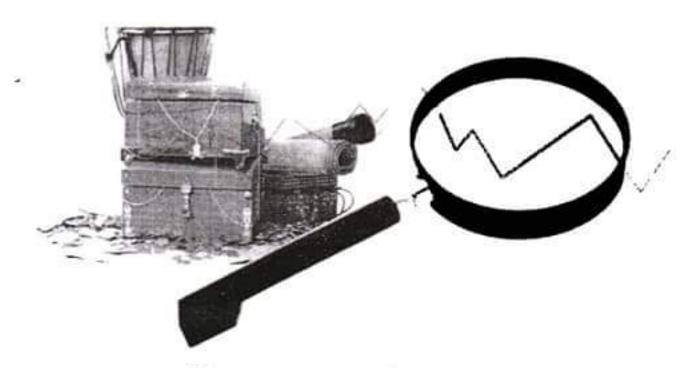
অমুসলিমদের সাথে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আচরণ

অমুসলিমদের সঙ্গে তিনি ন্যায় ও উদার আচরণ করতেন। তাঁর খিলাফত কালের একজন নেস্টোরীয় খ্রিস্টানের পত্র সংরক্ষিত আছে, যিনি তার বন্ধুকে লিখেছেন, "এ তা'ঈ (অর্থাৎ আরব), যাকে আল্লাহ বর্তমানে শাসন ক্ষমতা দিয়েছেন, তিনি আমাদেরও মালিক বা শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি খ্রিস্ট ধর্মের বিরোধিতা করেন না; বরং তিনি আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন এবং আমাদেরকে অন্য গোত্রের উৎপীড়ন হতেও রক্ষা করছেন। তিনি আমাদের পাদরি ও ধর্মীয় লোকদেরকে সম্মান করছেন এবং আমাদের গির্জা ও পুরোহিতালয়ে সাহায্য প্রদান করছেন।"[৫০] একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনায় এক ইহুদিকে ভিক্ষা করতে দেখে নিম্নলিখিত আয়াত পড়লেন, "ইন্নামাস সাদাকতু লিল ফুকারা

---

[৪৯] আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারজ, বুরাক, পৃ: ৭৮।

[৫০]. De Goeje, বরাত Bible, Or ২/৩য় Assemani Xcvi.

ওয়াল-মাসাকীন" এবং বলেন, ফুকুরা তো মুসলিমগণের অন্তর্গত এবং মাসাকীন বলতে অমুসলিম দরিদ্র ব্যক্তিকেও বোঝায়। এ মিসকীন আহলে কিতাব-এর অন্তর্গত। সুতরাং তার ভাতার ব্যবস্থা করে দিন। এমনিভাবে সিরিয়া ভ্রমণকালে তিনি সেখানকার খ্রিস্টান দরিদ্রদেরকেও 'সাদাকাত' অর্থাৎ যাকাত দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দেন । সিরিয়ায় মুসলিমগণ জনৈক ইহুদির কিছু ভূমি দখল করে সেই স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল। যেইমাত্র ওমর এ সংবাদ পেলেন তৎক্ষণাৎ মসজিদ ভেঙে প্রকৃত মালিককে ঐ ভূমি প্রত্যর্পণ করেন।[৫১] লেবাননের জনৈক খ্রিস্টান অধ্যাপক শুকরী কিরদাহী লিখেছেন, এ ইহুদির বাড়ি অদ্যাপি বিদ্যমান রয়েছে । ওমর (রা) একদা কা'বার হারাম শরীফে জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় জনৈক তাগলিব খ্রিস্টান ব্যবসায়ী নগর-শুল্ক আদায়কারীদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করে। তিনি খুতবা বন্ধ করে অভিযোগটি শুনে উত্তর দিলেন, "না, এ রকম হতে পারে না।" অতঃপর তিনি খুতবা আরম্ভ করেন। ব্যবসায়ী নিরাশ হয়ে সীমান্ত প্রত্যাবর্তন করে যে, দ্বিগুণ নগর-শুল্ক প্রদান করেই স্বীয় আসবাবপত্র লাভ করবে। কিন্তু সে দেখল যে, তার সেখানে উপস্থিত হবার পূর্বেই ওমর (রা)-এর পক্ষ হতে পূর্ব হুকুম রদ করে নতুন নির্দেশ জারি করা হয়েছে।[৫২] প্রাচীনকালে নীলনদ হতে বাহর-ই-কুলযুম (লোহিত সাগর) পর্যন্ত সংযুক্তকারী খাল ছিল, যার মাধ্যমে ফুসতাত শহর হতে সোজা আরবে জাহাজ গমন করত। জনৈক ইহুদি এ খালের সন্ধান দিয়েছিল। ওমর (রা) পুরস্কারস্বরূপ সারা জীবনের জন্য তার জিযিয়া মাফ করে দেন। ওমর (রা) উক্ত ভরাট খালটি পুনঃখনন করান। এ "নাহর আমীরিল-মু'মিনীনন"-এর মাধ্যমে মিশরীয় শস্য সরাসরি মদিনায় (বন্দর) প্রেরিত হতে থাকে এবং দুর্ভিক্ষের সময় তা বিশেষ উপকারে আসে। রাজস্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর যখন তিনি সামরিক ভাতার প্রবর্তন করেন তখন অমুসলিমগণ তা হতে বহির্ভূত ছিল না; বরং এতে অনেক উচ্চ বেতনভোগী পারসিকদের নামও দেখা যায়।[৫৩] Walker লিখেছেন, "প্রাথমিক আরব বিজয়িগণ অশিক্ষিত ও যাযাবর হওয়ার দরুন নিঃসন্দেহে তাদেরকে কেউ হয়ত সভ্য মনে করতে পারে, কিন্তু তারা এ যুদ্ধক্ষেত্রে পৃথিবীর উন্নততর জাতিসমূহ অপেক্ষা অনেক উন্নত প্রমাণিত হয়েছে।"[৫৪]

---

৫১. Choukri Cardahi La conception et la pratoque de droit iternaional prive dans l'Islam, in la Hayer Recuil des cours de 1' Academic du doit International de. ১৯৩৭ খৃ: ২য় খন্ড, ৫ম প্রবন্ধ।

৫২ আবু ইউসুফ,পৃ

৫৩ আল-বালাযুরী, ফুতুহী,পৃ: ৪৫৭।

৫৪ History of the law if Nation, ক্যাম্ব্রিজ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৫-৪৬।

এটি সত্য যে, নগর-শুল্কের ক্ষেত্রে মুসলিম ও যিম্মী ব্যবসায়ীদের মধ্যে পার্থক্য ছিল : একজন শতকরা আড়াই ভাগ নগর-শুল্ক দিলে অন্যজন দিত শতকরা পাঁচ ভাগ। এ পার্থক্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল হতেই চলে আসছে এবং এটি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আবিষ্কার নয়, কিন্তু একে কোনোমতেই যুলুম বলা হয় না। অমুসলিমগণ ধন-সম্পদের যাকাত দিত না, তদুপরি সুদ খাওয়া হতেও তারা বিরত থাকত না। এভাবে তারা দ্রুত সম্পদশালী হয়। তাদের নিকট হতে অতিরিক্ত নগর-শুল্ক আদায় করা মাত্র একটি পরিভাষাগত পার্থক্য বা হিসাবের হেরফের ছাড়া আর কিছু নয়। বাস্তবিক পক্ষে এটি মোটেই যুলুম ছিল না; বরং অমুসলিমগণ অপেক্ষাকৃত স্বল্প রাজস্ব প্রদান করত এবং নিশ্চিন্তে ও স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করত।

'মু'আল্লাফাতুল-কুলূব' (হৃদয় আকর্ষণ) সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। দু'-একটি ঘটনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নও-মুসলিমদেরকে পুরস্কার ও উপঢৌকন প্রদান বন্ধ করে দেন তা দ্বারা অমুসলিমদের পূর্ণ স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করাই আসল অভিপ্রায় বলে অনুমিত হয়; কিন্তু এ ব্যাখ্যা অমূলক যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআনের সেই আয়াতটিকে রহিত (মানসুখ) করেন যার ওপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই নয়; বরং খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আজীবন আমল করেছিলেন। প্রকৃত ঘটনা এই যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কয়েকজন নির্দিষ্ট নও-মুসলিমকে গনিমতের মাল দিতে অস্বীকার করেন; কিন্তু সাধারণভাবে তিনি তা'লীফুল কুলূব-এর হুকুম বন্ধ করার নির্দেশ দেননি। এছাড়াও এ ঘটনায় উয়ায়না ইবন হিসন রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখের উল্লেখ আছে, যাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতের মাল দিতেন, কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তা দেননি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে হাওয়াযিন-এর যুদ্ধলব্ধ মাল হতে সামান্য কিছু দিয়েছিলেন; কিন্তু তা যাকাতের অর্থ হতে নয়, যে ব্যাপারে কুরআন মাজীদের আত-তাওবার ৬০ নং আয়াতে নির্দেশ হয়েছে। একটি বর্ণনা আছে যে, যখন মদিনা মুনাওয়ারায় জনৈক রোমান ইসলাম গ্রহণ করে (সম্ভবত উপরিউক্ত ব্যক্তি বেতনভুক্ত কর্মকর্তা ছিলেন) এবং জনসাধারণ তার হৃদয় আকৃষ্ট করার জন্য সামান্য মাল প্রদানের জন্য সুপারিশ করে তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "ইসলাম গ্রহণকারী ইসলামের সত্যতার ভিত্তিতেই ইসলাম গ্রহণ করবে, মাল পাওয়ার জন্য নয়।" এ ঘটনাটি একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। কেননা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং যখন কতক সম্ভ্রান্ত পারসিকদের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করেন তখন এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : "কাওম আ'আজিম, আশরাফ, আহবাবতু 'আন আতাআল্লিফা বিহিম গায়রাহুম মান হুয়া দুনাহুম" অর্থাৎ "এরা আজামী

সম্প্রদায়ের শরীফ ব্যক্তি, আমি তাদের মাধ্যমে অন্য যারা তাদেরও আপনজন তাদের হৃদয় আকর্ষণ করতে চেয়েছি।"[৫৫]

শিক্ষার প্রসার

রাষ্ট্র মুসলিমদের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল এতে ছিল তাফসীর, হাদিস, ফিকহ ও সীরাতুন-নাবী। কুরআন পাঠের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ওমর ছাত্রদেরকে বৃত্তি প্রদান করতেন।[৫৬] তখন পৃথক বিদ্যালয় ছিল না; সাধারণত মসজিদসমূহে শিক্ষা দান করা হতো। কুফা নগরী প্রতিষ্ঠিত করা হলে পরে তথায় একটি সেনানিবাস স্থাপন করা হয়। তখন গভর্নর ভবনের সম্মুখে একটি জামি' মসজিদ নির্মাণ করা হয়। সেখানে শিক্ষা প্রদানের জন্য ওমর আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ -এর ন্যায় সম্মানিত সাহাবিকে প্রেরণ করেন।[৫৭] ইবনুল জাওযী বলেন যে, সেখানে একজন শিক্ষক যথেষ্ট ছিল না।[৫৮] ওমর -এর খিলাফত কালে কুফার জামি' মসজিদে একমাত্র ফিকহ শিক্ষা দানের জন্য একশত শিক্ষক পাঠ দান করতেন। আন-নাবাবী-এর মতে আকীল ইবন আবু তালিব মসজিদে নবাবীতে কুলজীবিদ্যা (আনসাব) এবং জাহেলে যুগের আরবদের যুদ্ধ বিবরণ শিক্ষা দিতেন।[৫৯] ওমর আরবি ভাষার ব্যাকরণগত ভুলত্রুটি অপছন্দ করতেন।[৬০] তিনি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ কে হুযাইলী পাঠ-রীতি (কিরাআত) পরিত্যাগ করত কুরাশী পাঠরীতি অবলম্বন করতে তাকীদ করেন।[৬১] কুরআন মাজীদের সঠিক ভাব অনুধাবন করার জন্য তিনি জাহেলে যুগের আরবি কাব্য চর্চার প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করতেন। তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন।[৬২] বিশুদ্ধ আরবি ভাষার প্রচলন ও প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আবুল-আসওয়াদ আদ-দুআলী-কে আরবি ব্যাকরণ রচনার জন্য নির্দেশ দেন।[৬৩]

ওমর চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখতেন এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে দোভাষীর ন্যায় চিকিৎসকও প্রেরণ করতেন।[৬৪] ঘোড়ার বংশ বৃদ্ধির জন্যও তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করতেন।[৬৫]

---

[৫৫] ইবনে যানজারিয়া, কিতাবু আহওয়াল, বারদূও, তুরস্ক।
[৫৬] আল-ওয়াছাইকুস সিয়্যাসিয়্যা, পৃ. ৩৬৮
[৫৭] আল-ওয়াছাইকুস সিয়্যাসিয়্যা, পৃ. ৩১৪
[৫৮] আল-মুনতাজাম, ২খণ্ড, ৩২৬।
[৫৯] তাহযীবুল-আসমা, পৃ. ৪২৬।
[৬০] ইবন সাদ ১/৩খণ্ড, ২০৪।
[৬১] ইযালাতুল-খিফা, ১খণ্ড, ১৯৭।
[৬২] ইবন সাদ, ১/৩খণ্ড, ৩২৩।
[৬৩] ইযালাতুল-খিফা, ১খণ্ড, ১৮৯।
[৬৪] আল-ওয়াছাইকুস-সিয়্যাসিয়া, নং ৩০৭; আত-তাবারী হতে গৃহীত।
[৬৫] আল-ওয়াছাইক, নং ৩৪১-৩৪২।

জনসাধারণের কল্যাণে বায়তুল মাল থেকে ব্যয়

সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরে কোষাগারে এত অধিক পরিমাণ অর্থ উদ্বৃত্ত থাকত যে, সমগ্র রাজ্যের অভাবী জনগণের খাদ্য ও বস্ত্রের সমাধান তাতে অনায়াসে করা যেত। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামলে শাসকের নিজস্ব ব্যয় একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের ব্যয়ের সমান ছিল, শুধু বার্ষিক বেতনেই নয়; বরং সাধারণ সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রেও। উদাহরণস্বরূপ : বায়তুল মাকদিসের রাষ্ট্রীয় সফরে যাত্রাকালে তিনি মাত্র একজন ভৃত্য সঙ্গে নিয়েছিলেন, মাত্র একটি উটে পালাক্রমে প্রভু-ভৃত্য উভয়ে আরোহণ করতেন এবং ঘটনাক্রমে গন্তব্যস্থলে পৌছলে ভৃত্য ছিল আরোহী আর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন পথচারী যার হাতে উটের রজ্জু ছিল।[৬৬] সরকারি কর্মচারীদের অধিকাংশই ছিল 'আরব মুসলিম, তারা স্বল্প বেতনে পরিতুষ্ট থাকতেন এবং জাহেলি যুগে তাদের উপবাসের অভ্যাস এখন তাদের নিকট এমন ফলদায়ক হয় যে, ন্যূনতম বেতনও পূর্বাপেক্ষা উত্তম মনে হচ্ছিল এবং তাতে তারা সন্তুষ্ট ছিলেন। এটি এ কারণে যে, খলিফা স্বয়ং এবং তাঁর নিযুক্ত শাসকবৃন্দ স্বল্পে পরিতুষ্টিমূলক ন্যূনতম জীবনযাপনের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। (৩) সরকারি কর্মচারিগণ ছিলেন বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ এবং তারা সরকারি তহবিলের সামান্যতম তছরুপও করতেন না। যখন সিপাহিগণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাদের সংশ্লিষ্ট কর্তার নিকট আনয়ন করতেন যার মধ্যে মণি-মুক্তা ইত্যাদি জিনিসও থাকত যা সরিয়ে রাখা খুব সহজ ছিল, কিন্তু তারা কখনও এমন কাজ করতেন না। এ সংবাদে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বারবার আনন্দ প্রকাশ করতেন, আর এরূপ কোনই বা তিনি হবেন না? কেননা তিনি স্বয়ং সরকারি কোষাগার হতে এক কপর্দকও অবৈধভাবে গ্রহণ করতেন না। তিনি নিজেই নন; বরং স্বীয় বংশের সকলের প্রতিই এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। একদা গভর্নর আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রীর নিকট একটি কার্পেট উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি তাকে ডেকে পাঠান এবং তার মাথায় কার্পেটি তুলে দেন এবং ফিরিয়ে দেন। একদা স্বয়ং তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী উম্ম কুলছুম বিনত আলী কনস্ট্যান্টিনোপলগামী দূতকে গোপনে একটি উপঢৌকন হস্তান্তর করে বলেন : এটি আমার পক্ষ হতে রোমক সম্রাজ্ঞীকে পৌছে দিবেন। দূতের প্রত্যাবর্তনকালে রোমক সম্রাজ্ঞী একটি মূল্যবান মণিমুক্তাখচিত হার খলিফার বেগমের জন্য প্রদান করেন, যা দূত গোপনে উম্ম কুলছুমকে পৌছে দেন। সংবাদ পেয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে সাধারণ সভায় ঘটনা উত্থাপন করে পরামর্শ আহ্বান করেন। সকলে বলেন : উপঢৌকনের বিনিময়ে উপঢৌকন, এটি

[৬৬] আত-তাবারী, ৫/১খণ্ড, ২৪২২।

সম্পূর্ণ বৈধ। তিনি বললেন : না, এটা করা শুদ্ধ হবে না। ব্যক্তিগত উপঢৌকনটি সরকারি সংবাদ বাহকের মারফত প্রেরিত হয়েছে। ওমর (রা.) স্ত্রীর নিকট হতে জানতে পারেন যে, তার প্রেরিত উপঢৌকনটির মূল্য কত ছিল এবং ঐ পরিমাণ অর্থ বায়তুল মাল হতে স্ত্রীকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় আর বায়যানটীয় উপঢৌকনটি বায়তুল মালে জমা দেওয়া হয়।
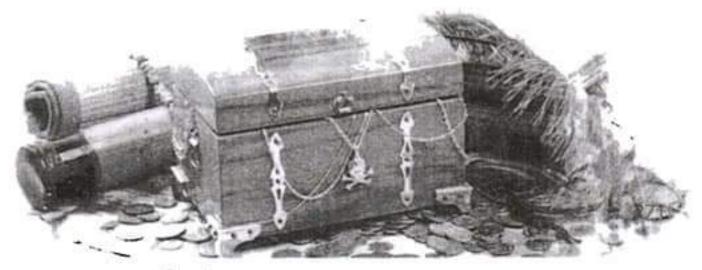
রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে করযে হাসানা প্রদানের ব্যবস্থা

তিনি বায়তুল মাল-এর একটি শাখা কারদ-ই-হাসানার জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। কোনো প্রজা অনুৎপাদনশীল প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করলে সে মাত্র আসল ফেরত দিত। এ কার্য-পদ্ধতি সুদের ব্যবসায় পরিচালকের প্রতি আঘাত হানে এবং এভাবে দেশ হতে সুদগ্রহীতা যারা বিপদগ্রস্তদের রক্ত শোষণ করত তাদের সমাপ্তি ঘটানো হয়; কিন্তু যদি কোনো ব্যবসায়ী ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায় পরিচালনা করতো তখন তার নিকট হতে লাভের অর্ধাংশ গ্রহণ করা হতো এবং যদি সে ব্যক্তি স্বীয় ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হতো তা হলে তার নিকট হতে শুধু আসল টাকাই আদায় করা হতো।[১৭] খলিফা স্বয়ং এভাবে ঋণ গ্রহণ করতেন এবং ঘটনাক্রমে পরিশোধ করতে বিলম্ব হলে বায়তুল মালের কর্মকর্তা তার পক্ষপাতিত্ব করতেন না। মৃত্যুকালে তিনি বলেন যে, তাঁর নিকট বায়তুল মালের আশি হাজার দিরহাম পাওনা আছে (সম্ভবত এর দ্বারা কোনো ভূমি ক্রয় করেছিলেন)। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁর সন্তানদেরকে তা সত্বর পরিশোধ করার নির্দেশ দেন। এ সম্পর্কে আবু উবায়দা লিখেছেন যে, সুস বিজয় লাভের পর সেখানে দানিয়াল (আ.)-এর কবর পাওয়া যায়, যাতে গুপ্তধনও ছিল।[১৮] এতে লিখিতভাবে এই নির্দেশও ছিল, "যার প্রয়োজন এখন থেকে নির্দিষ্টকালের জন্য বিনা সুদে ঋণ গ্রহণ করতে পার।" জনশ্রুতি ছিল যে, খাতক যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে কুষ্ঠরোগে

---

[১৭] ইমাম মালিক, আল-মুওয়াত্তা, কিতাবুল-কিরাদ, হাদিস নং ১।

[১৮] কিতাবুল-আমওয়াল, পৃ. ৮৭৬।

আক্রান্ত হতো। এ কুসংস্কার দূর করণার্থে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ দেন যে, উক্ত গুপ্তধন স্থানীয় বায়তুল মালে স্থানান্তরিত করা হোক।

সামাজিক বিমার প্রচলন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যামানায় ১ম হিজরি হতে মদিনায় সামাজিক বিমার প্রচলন ছিল। একে মাআকিল বলা হতো।[৬৯] এটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দু'ভাবে প্রচলিত ছিল : (১) কোনো ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হওয়ায় তার দিয়াত (রক্তপণের মূল্য বা খেসারত) দেওয়ার প্রয়োজন হলে; (২) শত্রুর হাতে বন্দি ব্যক্তির মুক্তির জন্য ফিদয়া দিতে হলে। রক্তপণ ও ফিদয়ার জন্য এক শত উট দিতে হতো যা পক্ষপাত ব্যতীত অন্য কেউ আদায় করতে পারত না। মাআকিল ব্যবস্থাধীনে এ রকম দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গোত্রীয় লোকদের বিমায় অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সময়ে এটি আরও ব্যাপকতা লাভ করে এবং গোত্রের স্থলে সেনানিবাস অথবা বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট সকলে তাদের বন্ধুকে সাহায্য করার রীতি প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে এটি প্রতি শহর; বরং শহরের প্রত্যেক পেশাজীবীর সম্পদ হতে তা গ্রহণের রীতি প্রচলিত হয়।[৭০]

---

[৬৯] ড. হামীদুল্লাহ The First Written Constitution in the World, লাহোর তা. বি.।

[৭০] আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, কিতাবুল-মাআকিল।

শহর নির্মাণ

মুসলমানরা আরবের পর্বত ও মরু প্রান্তর থেকে বের হয়ে যখন সিরিয়া ও ইরানের শ্যামল-সবুজ উদ্যানে পৌঁছে গেল তখন এসব দেশ তাদেরকে এমনভাবে মুগ্ধ করল যে, তারা নিজেদের জন্মভূমিকে চিরবিদায় জানিয়ে এখানেই বসবাস করতে লাগল। এভাবে এসব দেশে অসংখ্য উপনিবেশ গড়ে উঠল। ওমর (রা.)-এর আমলে এভা যেসব শহর গড়ে ওঠে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো :

১. বসরা : ১৪ হিজরিতে উতবা ইবনে গাজাওয়ান ওমর (রা.)-এর নির্দেশে এ শহরটি গড়ে তোলেন। শুরুতে মাত্র আটশ লোক এখানে আবাস স্থাপন করে; কিন্তু এখানকার বসবাসকারীদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। এমনকি যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ানের শাসনামলে কেবল সামরিক রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ লোকদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০ হাজার এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের সংখ্যা ছিল এক লাখ কুড়ি হাজার। বিদ্যা ও জ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে বসরা বহুদিন পর্যন্ত মুসলমানদের নিকট উচ্চ আসনে সমাসীন ছিল।[৭১]

২. কুফা : সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) আমিরুল মু'মিনীননের নির্দেশে ইরাকের পুরাতন আরব শাসক নোমান ইবনে মানযারের রাজধানীতে বসতি গড়ে তোলেন। সেখানে ৪০ হাজার লোকের বসবাসের উপযোগী গৃহ নির্মাণ করেন। এ শহরটি গড়ে তোলার ব্যাপারে ওমর (রা.) ভীষণ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করেন। নিজেই শহরের নকশা সম্পর্কিত একটি স্মারক পাঠান। তাতে নির্দেশ ছিল– রাজপথগুলো ৪০ হাত করে প্রশস্ত রাখতে হবে। এর থেকে কম প্রশস্ত পথগুলো হবে ৩০ হাত ও ২০ হাত করে প্রশস্ত। এর চাইতে কম প্রশস্ত কোনো পথ থাকবে না। জামে মসজিদটির ইমারতটি এত প্রশস্ত ছিল যে, এক সঙ্গে ৪০ হাজার লোক তাতে অনায়াসে নামায পড়তে পারত। মসজিদের সম্মুখ ভাগে দু'শ হাত লম্বা একটা প্রশস্ত খিলান ছিল। লাল পাথরের স্তম্ভের ওপর তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ওমর (রা.)-এর শাসনামলেই এ শহরটি এতই শান-শওকত ও উন্নতির উচ্চতম শিখরে পৌঁছে যায় যে, তিনি নিজেই একে ইসলামের কেন্দ্রস্থল বলতেন। বিদ্যা ও তত্ত্বজ্ঞানের দিক দিয়েও শহরটি হামেশা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। ইমাম নাখারী, হাম্মাদ, ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফী এ শহরকে গৌরবান্বিত করেন।[৭২]

---

[৭১] তারীখ আত তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭৭।

[৭২] তারীখ আত-তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮১৪।
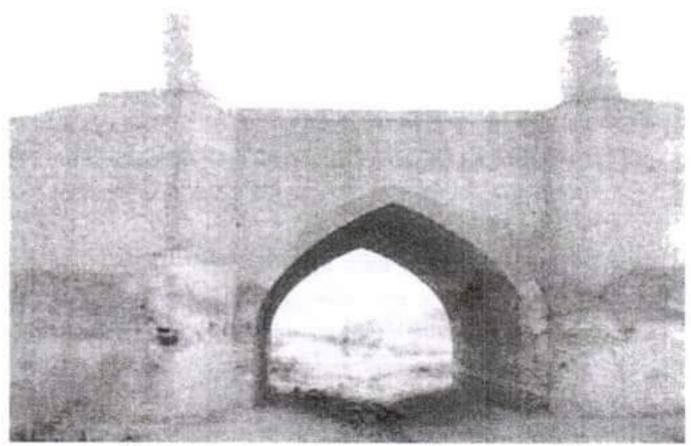
৩. ফুস্তাত : নীলনদ ও মাকতাম পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বিশাল প্রান্তর ছিল। মিশর বিজয়ী আমর ইবনুল আস যুদ্ধকালে এখানে সেনাবাহিনীসহ অবস্থান করেন। ঘটনাক্রমে একটি কবুতর তাঁর খিমায় বাসা বাঁধে। আমর ইবনুল আস সে স্থান ত্যাগ করার সময় কবুতরের কষ্ট হবে ভেবে ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের খিমাটি রেখে যান। মিশর জয়ের পর তিনি ওমর-এর নির্দেশে ওই প্রান্তরে একটি শহর গড়ে তোলেন। খিমাকে আরবি ভাষায় ফুস্তাত বলা হয়। তাই এ শহরটিকে ফুস্তাত নামকরণ করা হয়।

ফুস্তাত অতি দ্রুত উন্নতি লাভ করে সমগ্র মিশরের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। চতুর্থ শতকের জনৈক পরিব্রাজক নিম্নোক্ত ভাষায় এ শহরের উন্নতি ও অগ্রগতির চিত্র অঙ্কন করেন–

"এ শহরটি বাগদাদের খ্যাতি হরণকারী পশ্চিমের অর্থভাণ্ডার এবং ইসলামের গৌরব। ইসলামি দুনিয়ার কোথায়ও এখানকার জামে মসজিদের তাত্ত্বিক মজলিসের চাইতে বেশি মজলিস অনুষ্ঠিত হয় না। এখানকার উপকূলে যত জাহাজ নোঙর করে এত বেশি জাহাজ আর কোথায়ও নোঙর করে না।"

৪. মুসেল : এ শহরটি প্রথমে একটি গ্রাম ছিল। ওমর-একে বিরাট শহরে পরিণত করেন। হিরসান ইবনে উরফাজা এর ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি এখানে একটি জামে মসজিদ তৈরি করেন। এ শহরটি পূর্ব ও পশ্চিমকে মিলিত করে বলে এর নাম হয় মুসেল।

৫. জানীরা : ইসকানদারিয়া বিজয়ের পর আমর ইবনুল আস রাঃ রোমীয়দের দরিয়ার দিক থেকে হামলার আশঙ্কায় উপকূলে কিছু সৈন্য মোতায়েন রাখেন। দরিয়ার দৃশ্য তাদের এতই ভালো লাগে যে, তারা সেখান থেকে সরে আসা পছন্দ করেনি। ওমর রাঃ তাদের হেফাযতের জন্য ২১ হিজরিতে সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। তখন থেকেই এখানে একটি স্থায়ী উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

তিনি সামরিক ছাউনির জন্য বহু নতুন শহরও পত্তন করেছিলেন। এ সকল সামরিক ছাউনির অবস্থান নির্ধারণের সুনির্বাচনের প্রশংসা ও বিস্তারিত ভৌগোলিক চিত্রের বৈশিষ্ট্যের William Marcais বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।[৭৩]

বাজার পরিদর্শন

ওমর রাঃ মদিনা মুনাওয়ারাতে প্রায়ই বাজার পরিদর্শন করতেন এবং শহর ও শহরতলীতে প্রায়ই রাতে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি সাধারণ লোকের আকস্মিক অভাব পূরণ করতেন। একদিন তিনি এক নবাগত অপরিচিত অসহায় পথিকের স্ত্রীর প্রসব বেদনা দেখতে পান। অতঃপর তিনি দ্রুত সরকারি গুদামে এসে খাদ্যশস্য বহন করে নিজ হাতে রান্না করে তাকে খাওয়ান এবং প্রসূতিকে সাহায্য করার জন্য তাঁর স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যান। যখন তাঁর স্ত্রী ঘরের ভিতর হতে ডেকে বললেন : আমিরুল মু'মিনীন! আপনার বন্ধুকে পুত্র লাভের সুসংবাদ দিন– তখন পথিক বুঝতে পারল যে, ইনি কোনো ব্যক্তি! ওমর রাঃ একবার কোনো এক ঘরে মদ্য পানের অনুষ্ঠান দেখে ঠিকানা লিখে নিলেন এবং প্রভাতে বাড়ির মালিককে

---
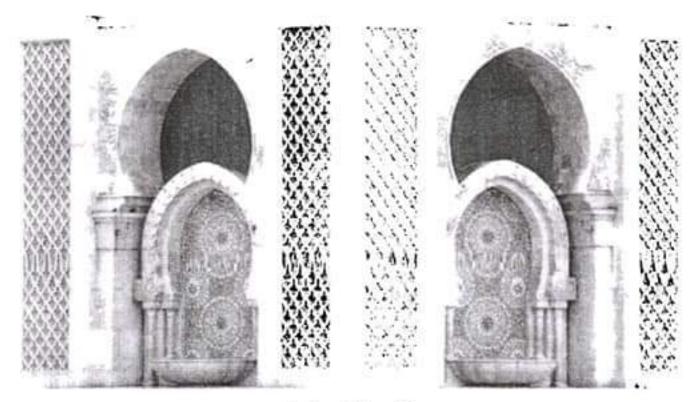
[৭৩] William Marcais, L' Islamisme et la vie urbanie, Comtesredus de 1'Academie de Inscription-এ. et Belles-letters প্যারিস ১৯২৮ খৃ., পৃ. ৮৬-১০০।

ডেকে সাবধান করে দেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এ অভিযোগ অস্বীকার করলে ওমর رضي الله عنه বললেন : আমি স্বয়ং গোপনে ঘটনাটি দেখেছি। ঐ ব্যক্তি বলল : আল্লাহ তো কুরআন মাজীদে গুপ্তচর বৃত্তি নিষিদ্ধ করেছেন। ওমর رضي الله عنه চুপ রইলেন এবং ঐ বারের জন্য তাকে শাস্তি দিলেন না। একদা একটি ন্যায়পরায়ণ বালিকাকে তার মা বলছিল, উঠ এবং দুধে পানি মিশ্রিত কর। বালিকাটি বলল, আম্মাজান! ওমর رضي الله عنه দুধে পানি মিশ্রিত করতে নিষেধ করেছেন। মা বলল, বেটি! এখন রাত্রিকাল, ওমর رضي الله عنه এখানে কোথায়? ওমর رضي الله عنه প্রভাতে তার সকল পুত্রকে ডেকে বললেন, আমি একটি অতি উত্তম বালিকার সন্ধান পেয়েছি। তোমরা কেউকি তাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত আছ? আসিম رضي الله عنه ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং এ ঘরে উম্ম আসিম জন্মলাভ করেন, যিনি পরে ওমর ইবন আবদিল আযীয রহ.-এর ন্যায় মহান খলিফার মা হন।[৭৪]

কুরআনের খেদমত

ইসলাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা এবং মূলনীতিগুলোর ব্যাপক ও বহুল প্রচারের ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। কুরআন শরীফের হেফাযত ও সাধারণ্যে এর শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করাই ছিল সর্বপ্রথম ও প্রধান কাজ। ওমর رضي الله عنه কুরআনের শিক্ষা ও প্রচারের জন্য যে সাধনা করে গেছেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রহ.) লিখেছেন : আজ দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে যে কেউই কুরআন পাঠ করুক না কেন তারই ওপর ফারুকে আযম رضي الله عنه-এর কিছু না কিছু উপকার বর্তিত হয়।

ইসলামের উৎস-মূল এবং সর্বপ্রধান ভিত্তি হচ্ছে কুরআন মাজীদ। এ কুরআন মাজীদকে বিক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপি হতে একত্রে জমা করা, শুদ্ধরূপে এর সংযোজন করা, সর্ববাদী সম্মত শুদ্ধ গ্রন্থ তৈরি করে তা রক্ষা করা এবং বিভিন্ন দেশে এর অসংখ্য গ্রন্থ প্রেরণ করা ইত্যাদি সবকিছুই ওমর رضي الله عنه-এর অমরকীর্তি।

ইলমে হাদিসের সেবা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পাকের পরেই হাদিসে রাসূলের স্থান। ওমর رضي الله عنه ইলমে হাদিসের প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যাপক সাধনা করে গেছেন। কিন্তু সর্বদাই তিনি এ ব্যাপারে কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করতেন। বিশিষ্ট সাহাবীগণ ব্যতীত তিনি অন্য কাউকেও হাদিস বর্ণনা করতে অনুমতি দিতেন না। শাহ্ ওলীউল্লাহ্ লিখেছেন : "ওমর رضي الله عنه আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোগাফ্ফাল ও এমরান ইবনে হোসাইনকে বসরায় প্রেরণ করেন এবং উবাদা ইবনে সামেত ও আবু দারদাকে

---

[৭৪] ইযালাতুল খিফা, ২খণ্ড, ১৯৬।

সিরিয়ায় প্রেরণ করে সেখানকার শাসনকর্তা আমির মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাঃকে বিশেষভাবে লিখে পাঠান, যেন এদের বর্ণিত হাদিস হতে বেশি কিছু প্রচার করা না হয়। এত ছাড়া ওমর রাঃ ইলমে হাদিসের যে সমস্ত নিয়ম-পদ্ধতির প্রচলন করেন, তা তাঁর অমর কীর্ত এবং অপূর্ব প্রজ্ঞার পরিচায়ক।

ইমাম ও মোয়ায্যিনদের বেতন

উল্লিখিত ইলমে দীনের বিরাট খেদমত ব্যতীতও ওমর রাঃ আরও বিশেষ কয়েকটি দীনী খেদমত বিশেষভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। যথা– প্রত্যেক জনপদের মসজিদগুলোর জন্য তিনি বেতনভোগী ইমাম ও মোয়ায্যিনের ব্যবস্থা করেন। আল্লামা ইবনে জাওযী 'সিরাতে ওমরায়েন' নামক কিতাবে লিখেছেন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ এবং উসমান ইবনে আফ্ফান রাঃ বায়তুল মাল হতে ইমাম ও মোয়ায্জিনদের বেতন দিতেন।

মোয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ পাঠে জানা যায় যে, মসজিদে নববীতে জামাআতের কাতার ঠিক করার জন্য ওমর রাঃ কয়েকজন বেতনভোগী লোক নিযুক্ত করেছিলেন।

হজের মওসুমে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ হাজিগণকে হজের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে সাহায্য করার জন্যও ওমর রাঃ একদল লোক নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর খিলাফতের আমলে দশবার হজের সুযোগ এসেছে: প্রত্যেকবারই তিনি স্বয়ং 'আমিরুল হজের' দায়িত্ব পালন করতে এসে নিজ হাতে হাজীদের নানা প্রকার খেদমত করতেন।

মসজিদ নির্মাণে ওমর রাঃ

মসজিদ মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র। ওমর বিজিত দেশসমূহে অসংখ্য মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি শাসনকর্তা আবু মূসা আশআরী রাঃকে লিখে পাঠিয়েছিলেন যে, "বসরা শহরে একটি বিরাট আকারে জামে' মসজিদ নির্মাণ করে প্রত্যেক কাফেলার জন্য ছোট ছোট মসজিদ নির্মাণ করে দিবে।" সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাঃ এবং আমর ইবনুল আস রাঃ প্রমুখের নিকটও তিনি অনুরূপ নির্দেশনামা প্রেরণ করেছিলেন। সিরিয়ার প্রত্যেক কর্মচারীর নিকটও তিনি প্রতি

শহরে অন্তত একটি করে মসজিদ তৈরি করার নির্দেশ প্রেরণ করেছিলেন। এ মসজিদগুলো আজ পর্যন্তও 'জামে ওমরী' বা ওমরের মসজিদ বলে খ্যাত আছে; তবে কোনোটিতে সেই পুরাতন ইমারত আর বিদ্যমান নেই। বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আল্লামা জামালুদ্দিন 'রাওয়াতুল আহবাব' নামক কিতাবে লিখেছেন যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যামানায় প্রায় চার হাজার নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।
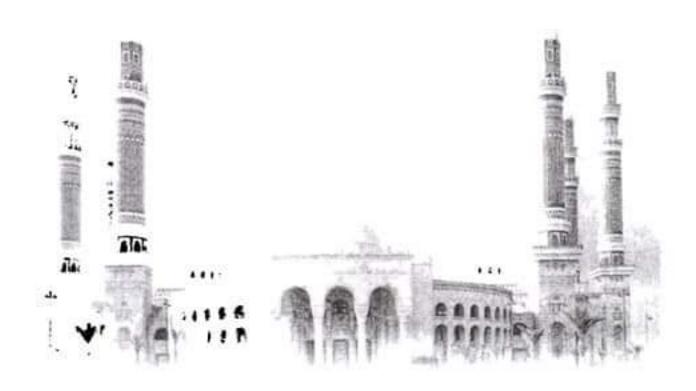
কা'বা শরীফ সম্প্রসারণ

ইসলামের বিস্তৃতির সাথে সাথে মক্কায় হজ ও যিয়ারতকারীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বায়তুল্লাহর চারপাশের প্রাঙ্গণ যথেষ্ট সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন হয়। এজন্য ওমর হিজরি সতেরো সালে বায়তুল্লাহর আশেপাশে কিছু বাড়ি-ঘর ক্রয় করে তা ভেঙে ফেললেন। সে সময় পর্যন্ত বায়তুল্লাহ্ শরীফের প্রাঙ্গণসহ কোনো দেয়াল ছিল না; এজন্য তিনি কা'বা শরীফের প্রাঙ্গণ ঘিরে একটি দেয়াল উঠালেন এবং বায়তুল্লাহর প্রাঙ্গণকে মানুষের বাড়ি-ঘর হতে পৃথক করে ফেললেন। এছাড়াও তিনি কা'বা শরীফে বাতি জ্বালানোরও ব্যবস্থা করেন। খাস বায়তুল্লাহ্র গায়ে জাহেলিয়াতের যামানা হতে চাদর জড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। ইসলামের পূর্বে কুরাইশগণ নাতা' এক শ্রেণির সাধারণ কাপড়ের গেলাফ লাগাত। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পরিবর্তে 'কাবাতী' নামক এক প্রকার উৎকৃষ্ট মিশরী কাপড়ের গেলাফের ব্যবস্থা করেন। কা'বা শরীফের চার কোণের কোনো দিক দিয়ে তিন মাইল, কোনো দিক দিয়ে নয় মাইলব্যাপী হারামের সীমা ছিল। এ সীমার সাথে হজের বহু হুকুম আহ্কাম জড়িত ছিল বলে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তা স্থায়িভাবে চিহ্নিত করে রাখেন।

মসজিদে নববীর সংস্কার ও সম্প্রসারণ

ওমর মসজিদে নববীও যথেষ্ট সম্প্রসারিত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ মসজিদের জন্য যে গৃহ নির্মাণ করেছিলেন সে সময়ের মুসলিম জাহানের প্রধান কেন্দ্রস্থল ফারুককে মদিনার জন্য তা মোটেই যথেষ্ট ছিল না। কেননা, তখন রাজধানী মদিনার লোকসংখ্যা পূর্বাপেক্ষা অনেকগুণে বেড়ে গিয়েছিল। হিজরি সতেরো সালে ওমর মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য চার পাশের বাড়ি-ঘরগুলো ক্রয় করে ফেলেন। সাথে আব্বাস এরও একখানা বাড়ি ছিল। ওমর তা যথেষ্ট মূল্যে ক্রয় করতে চাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই বিক্রয়ে রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত ওমর উবাই ইবনে কা'বের নিকট বিচারপ্রার্থী হন। বিচারে উবাই রায় দিলেন যে, কারও বাড়ি-ঘর মসজিদের জন্য হলেও বলপূর্বক ক্রয় করার অধিকার ওমর-এর নেই। মোটকথা, ওমর যখন সবদিক দিয়ে নিরাশ হলেন, তখন আব্বাস তাঁর বাড়ি বিনামূল্যে মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিলেন। তারপর উম্মুল মু'মিনীনদের ঘরগুলো ঠিক রেখে চারপাশের ঘরবাড়ি ভেঙে মসজিদ সম্প্রসারিত করা হলো। পূর্বে মসজিদের দৈর্ঘ্য ছিল একশত গজ। ওমর তা একশত চল্লিশ গজ পর্যন্ত বর্ধিত করেন। অনুরূপভাবে প্রস্থও বিশ গজ বর্ধিত করে দেন; কিন্তু এতো বিরাট আয়োজন করা সত্ত্বেও মসজিদ নির্মাণ করতে গিয়ে কোনোরূপ বাহুল্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। রাসূলুল্লাহ-এর সময়কার কাঠের স্তম্ভগুলোই ঠিক রাখা হয়। সাথে সাথে তিনি মসজিদের একপাশে নানাবিধ আলাপ-আলোচনা এবং কবিতা পাঠের জন্য পৃথক আর একটি চত্বরও নির্মাণ করেন।
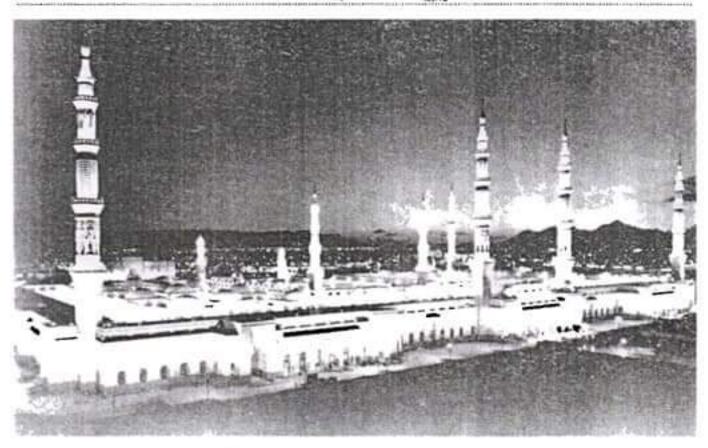
মসজিদের সুগন্ধি ও আলোর ব্যবস্থা

ওমর রাঃ-এর পূর্বে মসজিদে আলো প্রদানের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তিনিই সর্বপ্রথম রাতের বেলায় নানাবিধ রৌশনীর দ্বারা মসজিদ আলোকিত করার নিয়ম প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ, ওমর রাঃ-এর অনুমতিক্রমে সর্বপ্রথম 'তামীমে দারী' মসজিদে বাতি জ্বালানো আরম্ভ করেন।

মসজিদে সুগন্ধি দেওয়ার রীতিও সর্বপ্রথম ওমর রাঃ কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। এ সুন্দর নিয়মটির প্রবর্তন হয় নিম্নরূপে :

একবার গনিমতের মালের সাথে এক বান্ডিল 'উদ' নামক সুগন্ধি কাঠ আসে। এত অল্প কাঠ সমস্ত মুসলমানের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং নিরুপায় হয়ে ওমর রাঃ তা মসজিদে জ্বালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যাতে সমস্ত মুসলমানই এর কিছু কিছু অংশ পেতে পারে। ওমর রাঃ তা মোয়ায্যিনের হাতে দিয়ে দেন। মোয়ায্যিন প্রতি জুমুআর দিন ঐ উদ জ্বালিয়ে প্রত্যেক কাতার প্রদক্ষিণ করতেন। এরপর হতে নিয়মিতভাবে নামাযের সময় মসজিদে সুগন্ধি দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়।

মসজিদের ভেতর বিছানার ব্যবস্থাও সর্বপ্রথম ওমর রাঃ-এর কৃতিত্ব। কিন্তু ফারূক রাঃ যে বিছানার ব্যবস্থা করেছিলেন তাতে কোনোরূপ আড়ম্বরের গন্ধও ছিল না; বরং এখানেও ইসলামের সহজ ও সরল জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী আড়ম্বরপূর্ণ গালিচা, কালীন, শতরঞ্জির পরিবর্তে সাধারণ চাটাইয়ের ব্যবস্থা করা হলো, যেন নামাযীদের পরিধেয় বস্ত্রে মাটি লাগতে না পারে।

ইসলামি মুদ্রার প্রচলন

সাধারণ ঐতিহাসিকদের মতে খলিফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান সর্বপ্রথম ইসলামি মুদ্রার প্রচলন করেন। ইতঃপূর্বে আরবে ইসলামি মুদ্রার কোনো প্রচলন ছিল না। কিন্তু প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল্লামা মাকরিযীর বর্ণনানুযায়ী দেখা যায় যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুই সর্বপ্রথম ইসলামি মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। প্রমাণস্বরূপ আমরা এখানে মাকরিযীর বর্ণনার হুবহু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

আমিরুল মু'মিনীন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন খলিফা হলেন এবং আল্লাহ যখন তাঁর দ্বারা মিশর, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী দেশ জয় করালেন, তখনও তিনি নতুন কোনো প্রকার মুদ্রার প্রবর্তন করেননি; বরং আগেকার প্রচলিত মুদ্রাই বহাল রাখলেন। হিজরি আঠারো সালে যখন বিভিন্ন স্থান হতে বিভিন্ন প্রতিনিধি দল এসে সেখানকার নানা সমস্যা সম্বন্ধে খলিফাকে অবহিত করান। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের আবেদনক্রমে মা'কিল ইবনে ইয়াসারকে কুফায় প্রেরণ করেন। মা'কিল বসরায় একটি নহর খনন করে দেন, যা 'নহরে মা'কিল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ঐ সময়েই ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাদশাহ্ নওশেরওয়াঁর মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রা প্রচলন করেন। তাঁর এ নতুন মুদ্রার পিঠে কোনোটাতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ কোনোটাতে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ কোনোটাতে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ লিখা ছিল। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শেষ যমানায় দশ দেরহামের সমষ্টিতে যে মুদ্রার সৃষ্টি হয়েছিল তার ওজন ছিল ছয় 'মিসকাল'।

হিজরী সাল প্রচলন

হিজরী সাল প্রচলন মুসলিম সভ্যতার জন্য একটি যুগান্তকারী সূচনা। অন্যান্য জাতি থেকে মুসলিম জাতির এ বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের ওপর ভিত্তি করে হিজরী সালের প্রচলনকারী প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। মাইমুন বিন মিহরান বর্ণনা করেন, একদা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কিছু ব্যবসায়িক দলীলপত্র দেওয়া হয়েছিল অথবা অন্য কোনো বিষয়ের কিছু দলীল দস্তাবেজ দেওয়া হয়েছিল, যার কার্যকারীতার সময়কাল ছিল শাবান মাস। কিন্তু তখনও মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের ঘটনাবলীর দিন তারিখ নির্ণয়ের কোনো পঞ্জিকা ছিল না। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতেই পারছেন না যে, কোন শাবান মাসে

তাকে এগুলো দেয়া হয়েছিল? তিনি বলতে লাগলেন, এগুলো কি গত শাবান মাসের নাকি পরবর্তী শাবান মাসের নাকি আমরা এখন যে শাবান মাসে অবস্থান করছি তার? উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন সাহাবিগণকে একত্রিত করে বললেন, জনগণের জন্য বৎসর গণনার একটি নিয়ম পদ্ধতি চালু করুন। এমন পদ্ধত যারই সাথে সকলেই পরিচিত হতে পারে। উসমান বিন ওবায়দুল্লাহর অন্য এক বর্ণনামতে জানা যায় যে, তিনি সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মুহাজির ও আনসার সাহাবাগণকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করলেন- ইতিহাসের কোন্ ঘটনাটিকে আমাদের দিন তারিখ গণনার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত করা যায়? জবাবে আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- মক্কা থেকে মদিনায় হিজরাতের সময়কালকেই আমাদের পঞ্জিকার মূল ভিত্তি ধরা উচিত। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ ঘটনাকেই মুসলিম পঞ্জিকার ভিত্তি হিসেবে প্রচলন করার সিদ্ধান্ত নিলেন।[৭৫]
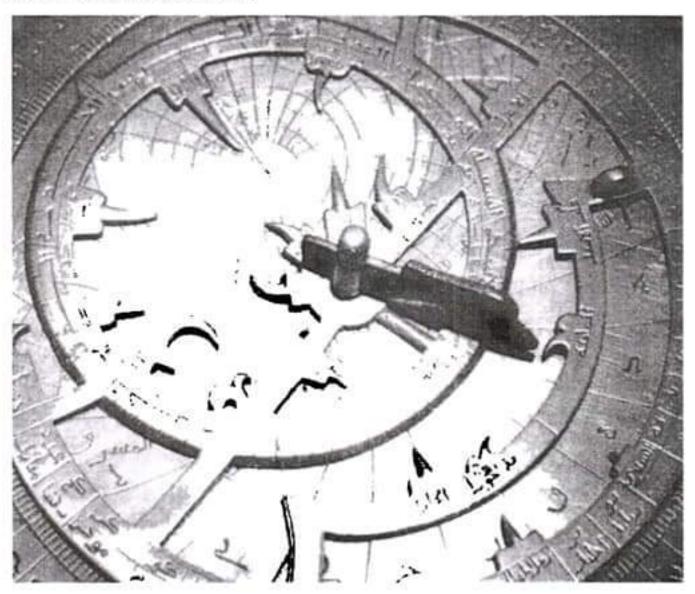
[৭৫] আল মুসতাদরাক : ৩/১৪

অধ্যায়-৫

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও শেষ জীবন

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের মানুষ। অন্যায়ের প্রতি তিনি কিছুতেই আপস করতেন না। অন্যায়কারীর শাস্তি দিতে গিয়ে তিনি নিজ পুত্রকেও রেহাই দেননি। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কোনো কারণে রাগান্বিত হলে তাঁকে শান্ত করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে যেত। তবে কেউ তাঁর সামনে আল্লাহর নাম নিলে অথবা কেউ কুরআনের কোনো আয়াত তেলাওয়াত করলে তিনি সাথে সাথে তাঁর কঠোর মনোভাব ছেড়ে শান্ত হয়ে যেতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, উয়ায়নাহ্ ইবনে হিসন ইবনে বদর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একবার তাঁর আপন ভাতিজা হুর ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঘরে মেহমান হলেন। হুর ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মজলিশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একজন ছিলেন। আর তাঁর মজলিসে ও পরামর্শে যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে একান্ত কোররা অর্থাৎ আলেমগণই শরিক হতেন। অতএব উয়ায়নাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ভাতিজাকে বললেন ভাতিজা! এ আমিরের নিকট তোমার তো বেশ খাতির আছে। তুমি আমার জন্য দেখা করার অনুমতি নাও। তিনি তার জন্য অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। উয়ায়নাহ্ ভেতরে প্রবেশ করেই বললেন, ওহে খাত্তাবের বেটা, আল্লাহর কসম, তুমি না আমাদেরকে বেশি পরিমাণে দাও আর না আমাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফায়সালা কর। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এটি শুনে এত রাগান্বিত হলেন যে, তাকে শাস্তি দেবার ইচ্ছা করলেন। হুর ইবনে কায়েস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তৎক্ষণাৎ বললেন, "হে আমিরুল মু'মিনীনন, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন-

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ۝

"বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদের সাথে যে আচরণ সমীচীন মনে হয় তা গ্রহণ করুন, আর ভালো কাজের শিক্ষা দিতে থাকুন এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে একদিকে সরে থাকুন।"[৮১]

আর এ মূর্খ যালেমেরই একজন। উক্ত আয়াত তেলাওয়াতের পরে আল্লাহর কসম, ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কঠোর মনোভাব ছেড়ে শান্ত হয়ে যান। আসলাম রহ.কে

---

[৮১] আল-কুরআন, সূরা আরাফ, ১৯৯।

বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আসলাম, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কেমন পাচ্ছ? আমি বললাম ভালো, তবে তাঁর গোস্‌সা একটি সাংঘাতিক ব্যাপার। বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তিনি যখন গোস্‌সা হন তখন যদি আমি থাকতাম তবে তাঁর সামনে কুরআন পড়তাম, আর তাঁর গোস্‌সা দূর হয়ে যেত। তার চরিত্রের বিশেষ দিকগুলো নিম্নরূপ–

খোদাভীতি

খোদাভীতি এবং সবসময় আল্লাহর ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ওপর অটল বিশ্বাসই চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও সৌন্দর্যের মূল উৎস। যে হৃদয় আল্লাহ ভীতি ও বিনয়-নম্রতা শূন্য তা নিছক একটি মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিনয় ও মানসিক একাত্মতার সাথে সারারাত নামায পড়তেন, খুব ভোরে বাড়ির সবাইকে জাগাতেন এবং নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করতেন

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

"তোমার পরিজনদেরকেও নামাযের হুকুম দাও"[৮২]

নামাযে সাধারণত এমন সূরা পাঠ করতেন যেগুলোয় কিয়ামতের উল্লেখ থাকত। আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব ও তাঁর প্রভাবিত ক্ষমতার বর্ণনা থাকত এবং সেগুলো দ্বারা তিনি অত্যধিক প্রভাবিত হয়ে অনর্গল অশ্রু বিসর্জন করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে শিদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, আমি পেছনের সারিতে দাঁড়ানো সত্ত্বেও যখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"আমি আল্লাহর কাছেই আমার দুঃখ বেদনার অভিযোগ জানাচ্ছি। আর আল্লাহর নিকট হতে যে জ্ঞান আমার আছে, তা তোমাদের জানা নেই।"[৮৩]

আয়াতটি পাঠ করে কাঁদতে থাকতেন, তখন আমি তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতাম। ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, একবার ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নামায পড়ছিলেন। যখন নিম্নোক্ত আয়াতে পৌছলেন

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۔ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۔

"তোমার প্রতিপালকের আযাব অবশ্যই সংঘটিত হবে, এর প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারোর নেই।"[৮৪]

---

[৮২] সূরা ত্বহা, ১২০।
[৮৩] সূরা ইউসুফ, ৮৬।
[৮৪] সূরা তূর, ৭৮।

তখন এত বেশি প্রভাবিত হলেন যে, কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখ ফুলে গেল। অনুরূপভাবে একবার নিম্নোক্ত আয়াতটি

وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا۔

"যখন এক শিকলে কয়েকজন বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোনো সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে।"[৮০]

পাঠ করতে করতে এত বেশি তন্ময় ও অস্থির হয়ে পড়লেন এবং কাঁদতে লাগলেন যে, তাঁর অবস্থা সম্পর্কে অজানা যেকোনো ব্যক্তিই তাঁকে ওই অবস্থায় দেখলে মনে করত বুঝি তার প্রাণবায়ু বহির্গত হবে।

আত্মিক নমনীয়তা ও কোনো বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে এতই অগ্রণী ছিলেন যে, একদিন ফজরের নামাযে সূরা ইউসুফ শুরু করে

وَابْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ

"আর দুঃখে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল, কিন্তু সে তো সংবরণকারী।"[৮১]

আয়াতে পৌছার পর ভীষণভাবে কাঁদতে শুরু করলেন। অবশেষে কুরআন পাঠ বন্ধ রেখে রুকু করতে বাধ্য হলেন। কিয়ামতের হিসাব-নিকাশকে খুব ভয় করতেন। সবসময় একথা মনে জাগরূক রাখতেন।

সাহসীকতা

তাঁর সৎ সাহসিকতার পরিচয় এ দ্বারাও পাওয়া যায় যে, অন্য লোক মুসলমান হলে তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি ইসলামের শত্রুদের নিকট গোপন রাখতেন, কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পরক্ষণেই শত্রুদের সমাবেশে উপস্থিত হয়ে স্বয়ং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন এবং সেখানে দীর্ঘক্ষণ যাবত একাই বহু লোকের মারপিটের মোকাবিলা করেন। অতঃপর তিনি একমাত্র মহানবী ﷺ ও সাধারণ মুসলমানদের রক্ষার কাজেই দণ্ডায়মান ছিলেন না; বরং তাঁর গোত্র বনু 'আদী-র সক্রিয় বিরোধিতা ও প্রতিরোধেও সফলকাম হন। দারুন-নাদওয়া-এ যখন মহানবী ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছিল তখন বনু আদী গোত্রের কোনো অমুসলিম মহানবী ﷺ-কে হত্যার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করতে সাহস পায়নি। হিজরতের পরে বদর যুদ্ধে মক্কা মুকাররমা হতে আগত শত্রু সৈন্যদের মধ্যেও বনু 'আদী-র কোনো ব্যক্তি ছিল না। সপ্তম হিজরির শা'বান মাসে বনু হাওয়াযিন-এর

---

[৮০] সূরা ফুরকান, ১৩।

[৮১] সূরা ইউসুফ, ৮৪।

কয়েকটি শাখাকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য একবার তিনি সেনানায়ক হিসেবে (বনু আমির-এর এলাকায়) তুরাবা স্থানে গমন করেন (দ্র. আল-মাসউদী, তানবীহ)। এ যাযাবরগণ যথাসময়ে পালিয়ে যায় এবং যুদ্ধের আশঙ্কা বিলুপ্ত হয়।

ক্ষমাশীলতা

এ মমত্ববোধের কারণে ওমর রাঃ ক্ষমাশীলতার নীতিও অবলম্বন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একবার হুর ইবনে কায়েস উয়াইনা ইবনে হাসান তাঁর নিকট এলেন। উয়াইনা বললেন, আপনি ইনসাফ সহকারে রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন না। ওমর রাঃ এ বেআদবীর জন্য ভীষণ রাগান্বিত হলেন। হুর ইবনে কায়েস বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীনন! কুরআন মাজীদে উল্লিখিত হয়েছে : "এ ব্যক্তি মূর্খ, এর কথা গায়ে মাখবেন না।" একথার পর ওমর রাঃ-এর রাগ একেবারে পানি হয়ে গেল।

মহানবী সাঃ-এর দেখাশুনা

হিজরতের পূর্বে ভ্রাতৃ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি আবু বকর রাঃ-এর ভাই হন। কিন্তু হিজরতের পরে ভ্রাতৃ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি উতবান ইবন মালিক আনসারী রাঃ-এর ভাই হন।[৮২] ওমর রাঃ তাঁর সাথে শহরতলীতে স্থায়িভাবে বসবাস করেন। তিনি মদিনায় এসে মহানবী সাঃ-এর দরবারে একদিন অবস্থান করতেন এবং তার ভাই উদ্যান তত্ত্বাবধান করতেন। অন্যদিন তিনি উদ্যানের তত্ত্বাবধান করতেন এবং ভাই মদিনায় আসতেন, রাতে মহানবী সাঃ-এর দরবারের খবরাখবর তাঁকে অবগত করতেন, কিন্তু অচিরেই তাঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র ঘর তৈরি করেন যার জন্য মহানবী সাঃ তাদেরকে ভূমি প্রদান করেছিলেন (ইবন সাদ)। তিনি বদর হতে আরম্ভ করে তাবুক পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধেই মহানবী সাঃ-এর সাথে ছিলেন। হিজরতের পরে প্রথম দিকে যখন দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আগমন করতে লাগলেন, তখন মহানবী সাঃ ওমর রাঃকে মহিলাদের বাইয়াত গ্রহণের জন্য দায়িত্ব প্রদান করেন যেন তিনি ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রত্যেক মহিলাকে নির্দিষ্ট বাণী পুনরাবৃত্তি করান।

ওমর রাঃ-এর অন্তরে রাসূল সাঃ-এর প্রতি মহব্বত

ওমর রাঃ ছিলেন রাসূল সাঃ-এর বিশ্বস্ত ও প্রিয় সাহাবীদের একজন। তিনি রাসূল সাঃ-এর জীবদ্দশায় সার্বক্ষণিক তাঁর পাশে থাকতেন। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ

৮২ ইবনে হাযম, জাওয়ামিউস সীরা, পৃঃ ৬৯।

কাজে রাসূল ওমর -এর ওপর আস্থার সাথে নির্ভর করতেন। ওমর রাসূল কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাই রাসূল -এর জীবদ্দশায় যেমন তাঁর কথা ও আদেশ-নিষেধ পরম শ্রদ্ধার সাথে পালন করতেন। তাঁর মৃত্যুর পরও ওমর -এর অন্তরে রাসূল -এর প্রতি ভালোবাসা ও মহব্বত ছিল অবর্ণনীয়। এ মর্মে ইবনে আব্বাস বলেন, আব্বাস -এর ঘরের ওপর থেকে পানি গড়াবার নল ওমর -এর চলাচলের রাস্তার ওপর ছিল। একবার জুমুআর দিন ওমর নতুন কাপড় পরিধান করলেন। সেদিন আব্বাস -এর ঘরে দু'টি পাখির বাচ্চা জবাই করা হয়েছিল। ওমর যখন সেই নলের নিকট পৌছলেন তখন ওপর থেকে সেই নল দিয়ে উক্ত পাখির বাচ্চার রক্ত ফেলা হলো যা ওমর -এর ওপর পড়ল। ওমর সেই নল উপরিয়ে ফেলার হুকুম দিলেন এবং ঘরে ফিরে কাপড় খুললেন এবং অন্য কাপড় পরিধান করলেন। তারপর মসজিদে এসে লোকদের নামায পড়ালেন। অতঃপর আব্বাস ওমর -এর নিকট এসে বললেন, আল্লাহর কসম! এটি সেই স্থান যেখানে রাসূলুল্লাহ নিজে এ নল স্থাপন করেছিলেন। ওমর আব্বাস কে বললেন, আমি আপনাকে কসম দিয়ে বলছি যে, আপনি আমার কোমরের ওপর উঠে এ নল সেই স্থানে লাগিয়ে দেবেন যেখানে রাসূলুল্লাহ তা লাগিয়েছিলেন। আব্বাস তাই করলেন।

ইবনে সা'দ -এর বর্ণনায় অতিরিক্ত এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, ওমর আব্বাস কে নিজের ঘাড়ের ওপর উঠালেন এবং আব্বাস ওমর -এর ঘাড়ের ওপর দু পা রেখে সেই নল যথাস্থানে পুনরায় লাগিয়ে দিলেন ।

বিদ্যানুরাগী ওমর

আদ-দারিমী প্রমুখের নিম্নলিখিত বর্ণনা দ্বারা তাঁর বিদ্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন তিনি কোনো ইহুদি হতে যাবুর অথবা তাওরাত-এর কিছু বাণী শুনেন। তাঁর এত পছন্দ হয়েছিল যে, তিনি এটি নকল করে রাসূলুল্লাহ কে শুনান এবং বলেন, তাদের জ্ঞান দ্বারা আমাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পেতে পারে।" কিন্তু মহানবী তাঁকে নিষেধ করেন। হয়ত কোনো ব্যক্তিগত কারণে অথবা ইসলামের প্রারম্ভিককালে তা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু পরে মহানবী আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস কে তাওরাত পাঠের অনুমতি দান করেছিলেন।[৮৩] একদা মহানবী তাঁকে যাকাত সংগ্রহ করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। সম্ভবত এর ১০ হিজরির ঘটনা। কেননা লিখিত আছে যে, তিনি আব্বাস

---

[৮৩] ইবনে হাম্বল মুসনাদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২২: আবু নুআয়াম, হিলয়াতুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮৬।

-এর নিকটও যাকাত চেয়েছিলেন কিন্তু মহানবী সংবাদ পেয়ে তাকে জানান যে, আব্বাস এক বছর পূর্বে সম্ভবত তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য অগ্রিম যাকাত দিয়েছেন।[৮৪]

একদিন মহানবী বলেন, "আমার দুজন আসমানি উপদেষ্টা আছে : জীবরাঈল আ. ও মীকাঈল আ. এবং দুজন ভূ-পৃষ্ঠের উপদেষ্টা আছে : আবু বকর ও ওমর ।[৮৫] আর একবার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচার কাজে যাত্রা করার জন্য মহানবী উপযুক্ত লোকের খোঁজ করছিলেন। কেউ আবু বকর ও ওমর -এর নাম উল্লেখ করলে তিনি বলেন, "আমি তাদের ছাড়া কেমন করে বাঁচতে পারি? তারা তো ধর্মীয় কাজে আমার জন্য কান ও চোখ স্বরূপ" ।[৮৬] "যদি আবু বকর ও ওমর কোনো কথায় মতৈক্যে পৌঁছে তাহলে আমি এর বিরোধিতা করব না" ।[৮৭] খন্দকের যুদ্ধে মুসলিমগণ জাবাল-ই-সালা'-এ যুদ্ধের ঘাঁটি নির্মাণ করেন। সেখানে ওমর -এর নিজের হাতে লিখিত একটি শিলালিপি পাওয়া যায় ইস্তাম্বুলের তুর্কি ইসলামি নিদর্শনাবলির যাদুঘরে ওমর কর্তৃক লিখিত কুরআনের একটি পৃষ্ঠা সংরক্ষিত আছে।

ওমর বিদ্যানুরাগী হলেও রাসূলুল্লাহ কর্তৃক আনীত ইলম ব্যতীত অন্য ইলম অর্জন বা তাতে মশগুল হওয়াকে অপছন্দ করতেন এবং কঠোরভাবে তা নিষেধ করতেন।

এ প্রসঙ্গে খালেদ ইবনে উরফুত রহ. বলেন, আমি ওমর -এর নিকট বসেছিলাম, এমন সময় আবদে কায়েস গোত্রের সূস্ নিবাসী এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো। ওমর তাকে বললেন, তুমি অমুকের বেটা অমুক না? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি নিজের একটি লাঠি দ্বারা তাকে প্রহার করলেন। সে বলল, হে আমিরুল মু'মিনীন! কি অন্যায় হয়েছে আমার? তিনি বললেন, বস। সে বসলে তিনি পড়তে লাগলেন :

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۔ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۔

---

৮৪ আল-বালাযুরী,আনসাবুল-আশরাফ, পাণ্ডু ইস্তাম্বুল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫২৯

৮৫ আয-যাবী, তারীখুল-ইসলাম, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫১।

৮৬ শাহ ওয়ালিউল্লাহ, ইযালাতিল খিফা, ১ম খণ্ড, পৃ : ৩০৫

৮৭ ইবনে কাছির, আয-যাবী ইত্যাদি।

"আলিফ-লাম-র। এগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। আমি এটিকে অবতীর্ণ করেছি কুরআন রূপে আরবি ভাষায়, যেন তোমরা বুঝতে পার। আমি যে, এ কুরআন আপনার নিকট প্রেরণ করেছি, এর দ্বারা আমি এক অতি উত্তম ঘটনা আপনার নিকট বর্ণনা করছি। আর যদিও আপনি এর পূর্বে এ ঘটনা সম্বন্ধে একেবারেই অনবহিত ছিলেন।"[৮৮]

উক্ত আয়াতগুলো তার সামনে তিনবার পড়লেন ও তাকে তিনবার প্রহার করলেন। সে ব্যক্তি বলতে লাগলেন কি অন্যায় হয়েছে আমার? হে আমিরুল মু'মিনীন! ওমর রাঃ বললেন, তুমিই সে ব্যক্তি যে দানিয়ালের কিতাব নকল করে এনেছ! সে বলল, আপনি আমাকে যা ইচ্ছা আদেশ করুন, আমি তা পালন করব। তিনি বললেন, যাও, সেটি গরম পানি ও সাদা পশম (ব্রাশ) দ্বারা মুছে ফেল। তুমিও তা পাঠ করবে না এবং আর কেউ যেন তা পাঠ না করে। যদি আমি আবার জানতে পারি যে, তুমি তা পড়েছ অথবা কাউকে পড়িয়েছ তবে তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব। অতঃপর তাকে বললেন, বস। সে তাঁর সামনে বসল। ওমর রাঃ একবার আমি আহলে কিতাবদের নিকট হতে একটি কিতাব নকল করে চামড়া দ্বারা আবৃত করে নিয়ে আসলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ওমর! তোমার হাতে ওটি কি? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমাদের ইলমের সাথে আরও ইলম বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে একটি কিতাবের নকল এনেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হলেন এবং তাঁর গণ্ডদ্বয় রাগে লাল হয়ে গেল। 'আসসলাতু জামেয়াতুন' বলে আওয়াজ লাগান হলো। আনসারগণ বলতে লাগলেন তোমাদের নবী রাগান্বিত হয়েছেন, তোমরা অস্ত্র ধারণ করো, অস্ত্র ধারণ করো। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বারকে চারদিক থেকে ঘিরে নিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে লোক সকল! আমাকে অতীব সারগর্ভ কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক ও চূড়ান্ত কালাম দান করা হয়েছে, এবং আমার জন্য তা যথেষ্ট সংক্ষেপ করা হয়েছে। আমি তোমাদের জন্য তা স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন রূপে নিয়ে এসেছি। তোমরা সংশয়গ্রস্ত হয়ো না এবং সংশয়গ্রস্ত লোকদের ধোঁকায় পড়ো না। ওমর রাঃ বলেন, আমি দাঁড়িয়ে বললাম, আমি রব হিসেবে আল্লাহর প্রতি, দীন হিসেবে ইসলামের প্রতি এবং রাসূল হিসেবে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট আছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বার হতে নেমে আসলেন।

---

[৮৮] আল কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১-৩।

সাম্যের চিন্তা

ওমর রা.-এর আমলে বাদশাহ-ফকির, আমির-গরিব, ধনী-দরিদ্র সবাইকে এক সারিতে দেখা যেত। মানুষের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য না করা বা লোক দেখানোর জন্য কিছু না করার জন্য তিনি শাসকদের কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওমর রা. নিজেও ব্যক্তিগতভাবে সাম্যের প্রতিষ্ঠাকে নিজের প্রধানতম দায়িত্ব মনে করেছিলেন। এ কারণে তিনি নিজেও অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শনকে তিনি অন্তরের অন্তস্তল থেকে ঘৃণা করতেন। একবার এক ব্যক্তি বলল, আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গিত। একথা শুনে ওমর রা. বললেন, এমন কথা বলো না, এর ফলে তোমার নিজের আত্মা লাঞ্ছিত হবে। অনুরূপভাবে একবার তিনি মদিনার কাযী যায়েদ ইবনে সাবেত রা.-এর আদালতে আসামি হিসেবে গেলেন। কাযী তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিলেন।

ওমর রা. বললেন, এ মামলায় তুমি এই প্রথম বেইনসাফী করলে- একথা বলে তিনি নিজের প্রতিপক্ষের পাশে আসন গ্রহণ করলেন।

তিনি প্রায়ই বলতেন, আমি যদি আয়েশ-আরামের জীবনযাপন করি আর সাধারণ মানুষ দারিদ্র্য ও অভাবে দিন কাটায় তাহলে আমার চাইতে মন্দ লোক আর কেউ হবে না। সিরিয়া সফরে তাঁকে উত্তম উপাদেয় খাদ্য পরিবেশন করা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, সাধারণ মুসলমানরা সবাই কি এ উত্তম মানের খাদ্য লাভ করে? লোকেরা জবাব দিল, সবার জন্য এ কেমন করে সম্ভব? জবাবে বললেন, তাহলে আমারও এর প্রয়োজন নেই।

তাঁর খেলাফতের প্রতাপ-প্রতিপত্তি সারা দুনিয়ায় বিস্তৃত ছিল; কিন্তু তিনি সাম্যের নমুনা পেশ করেছিলেন। যার ফলে রোম ও ইরান সম্রাটের দূতরা মদিনায় এসে বাদশাহ ও সাধারণ লোকের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারত না। আসলে এক্ষেত্রে ওমর রা. নিজেই ছিলেন সাম্যের আদর্শ। তিনি নিজের চরিত্রের মধ্যে সে সাম্যের এমন দৃষ্টান্ত কায়েম করেছিলেন যার ফলে শাসক ও প্রজা এবং মনিব ও গোলামের পার্থক্য তিরোহিত হয়েছিল।

ওমর رضي الله عنه-এর দানশীলতা

আল্লাহর পথে ব্যয় করা ছিল ওমর رضي الله عنه-এর কাছে নিজের প্রয়োজনে খরচ করার চেয়ে অধিক প্রিয়। তাই নিজের অর্থ-সম্পদ ও আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতসমূহকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। আর এক্ষেত্রে তিনি নিজেদের অভাব-অনটন সত্ত্বেও অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিতেন।

ওমর رضي الله عنه বেশি ধনী ছিলেন না। তবুও তিনি খোদার পথে যা কিছু ব্যয় করেন তা তাঁর মতো লোকের জন্য অনেক বেশি ছিল। ৯ হিজরিতে রাসূল ﷺ তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি চালান। অধিকাংশ সাহাবা যুদ্ধ তহবিলে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য করেন। এ সময় তাঁর ধন-সম্পদের অর্ধাংশ যুদ্ধ তহবিলে দান করেন।

বনী হারেসার ইহুদিদের থেকে তিনি একটি জমি পেয়েছিলেন। এ জমিটি তিনি খোদার পথে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে খায়বারে এক টুকরা অত্যন্ত উর্বর জমি পেয়েছিলেন। রাসূল ﷺ-এর খেদমতে হাযির হয়ে তিনি বললেন, আমি এক টুকরা অত্যন্ত মূল্যবান জমি পেয়েছি এর চাইতে বেশি মূল্যবান কোনো সম্পত্তি আমার কাছে নেই। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? রাসূল ﷺ বলেন : জমিটি ওয়াকফ করে দাও। সুতরাং রাসূল ﷺ-এর কথামত তিনি জমিটি গরিব, মিসকীন, মুসাফির, গোলাম ও জিহাদের জন্য ওয়াক্‌ফ করেন। একবার জনৈক বেদুঈন অত্যন্ত সংবেদনশীল কবিতা শুনিয়ে তাঁকে কিছু সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়। ওমর رضي الله عنه তার কবিতায় অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে ভীষণ ক্রন্দন করেন এবং নিজের জামাটি খুলে নিয়ে তাকে দান করেন।

ওমর কর্তৃক খায়বারের জমি দান করা

ইবনে ওমর বলেন, ওমর খায়বরে একখণ্ড জমি লাভ করেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ -এর খেদমতে এসে আরজ করলেন, আমি এমন একটি জমি পেয়েছি যার চেয়ে উত্তম জমি আর কখনও পাইনি। তার ব্যাপারে আপনি আমাকে কি আদেশ করেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে আসল জমি ওয়াকফ করে তার উৎপন্ন ফসলকে দান করতে পার। সুতরাং ওমর নিম্নবর্ণিত শর্তে উৎপন্ন ফসল দান করলেন। শর্তাবি এই যে, এ জমি বিক্রয় করা যাবে না বা কাউকে দান করা যাবে না। আর না উত্তরাধিকার সূত্রে কেউ এর মালিক হতে পারবে। উৎপন্ন ফসল গরিব ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ব্যয় হবে এবং গোলাম আযাদ করা, আল্লাহর পথে জেহাদ ও মেহমানদের মধ্যে ব্যয় করা হবে। আর যে ব্যক্তি এ জমির মুতাওয়াল্লী বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে তার জন্য অনুমতি রইল যে, সাধারণ নিয়মানুসারে সে নিজে বা নিজ বন্ধু-বান্ধবদেরকে খাওয়াতে পারবে, তবে তার আয় থেকে নিজের জন্য সঞ্চয় করে রাখার অনুমতি নেই।[৮৯]

তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ওমর তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক চাঁদা হিসেবে দান করেন।[৯০]

মিতব্যয়ী ওমর

আরবগণ ছিল দরিদ্র। একদা ফারুকী খিলাফতের প্রথমদিকে বাহরাইন-এর আমির (গভর্নর) আবু হুরায়রা মদিনায় সরকারি মাল আনয়ন করে বলেন : আমি পাঁচ লক্ষ দিরহাম উসুল করে এনেছি। ওমর তা বিশ্বাস করলেন না। পুনরায় কয়েকবার প্রশ্নের পর যখন শুনলেন যে, তিনি এক শত হাজার পাঁচবার উচ্চারণ করলেন। এতে তিনি এমন আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, লোকদেরকে বললেন : এত দিরহাম এসেছে যে, গণনার স্থলে ওজন করে বন্টন করা যেতে পারে।[৯১] কিন্তু দু' এক বছর পরেই একমাত্র সাওয়াদ-ই 'ইরাক' প্রদেশ হতে বারো কোটি দিরহাম এবং মিশর হতে বার্ষিক পাঁচ কোটি দীনার (অর্থাৎ পঞ্চশ কোটি দিরহাম) আসতে থাকে ।[৯২]

---

৮৯ ইবনে সা'দ, আত তাবাকাত, ১/৩ খণ্ড, পৃ:২৬০।

৯০. আত-তিরমিযী ; আবু দাউদ।

৯১ বালাযুরী, ফুতুহ, পৃ: ৪৫৩; ইবনে সা'দ ১/৩৩,২১৬।

৯২ বালাযুরী,ফুতুহ, পৃ: ৫৪৩।

রাষ্ট্রের এ ক্রমোন্নয়নের যুগে যদি ওমর -এর স্থলে কোনো দুনিয়াদার শাসক থাকতেন তাহলে এ নব আরব রাষ্ট্র তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলত এবং সত্বরই তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ওমর স্বয়ং নিজেও অপচয় করতেন না এবং সরকারি সম্পদের একটি শস্যকণাও অন্যায়ভাবে নষ্ট হতে দিতেন না।

ওমর -এর কঠোরতা

তিনি মহিলাদের ন্যূনতম মহর ধার্য করার জন্য শক্তভাবে পরামর্শ দিতেন।[৯৩] যার প্রয়োজনীয়তা এখন আমরা প্রত্যক্ষ করছি। তিনি গভর্নরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর দৃষ্টি রাখতেন, নিয়োগের সময় তাদের সম্পদের পরিমাণ অবহিত হতেন, অতঃপর মাঝে মাঝে তাদের সম্পদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হতো এবং যদি সন্দেহজনকভাবে তাদের ধন-সম্পদ অতিরিক্ত হতো তাহলে সংশ্লিষ্ট শাসককে শুধু পদচ্যুতই করা হতো না বরং তার অর্ধেক সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হতো।[৯৪] নিয়োগপত্রে স্পষ্ট শর্ত থাকত যে, তিনি জাঁকজমকপূর্ণ তুর্কি ঘোড়ার আরোহণ করবেন না, চালাই করা আটার রুটি ভক্ষণ করবেন না, সুরু ও কোমল পোশাক পরিধান করবেন না (রেশমি হারাম পোশাক পরিধান তো দূরের কথা), দ্বার বন্ধ করে প্রহরী রাখবেন না; বরং জনগণ তার সাথে সদা সাক্ষাৎ করতে পারবেন।[৯৫] সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস প্রবেশদ্বারসহ একখানি জাঁকজমকপূর্ণ বাসগৃহ নির্মাণ করেন। এ সংবাদ ওমর -এর গোচরীভূত হলে তিনি তাকে কিছু না লিখিয়ে মদিনা হতে এক ব্যক্তিকে তার গৃহের দরজা অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করার জন্য প্রেরণ করেন। শাসনকর্তা ব্যাপারটি বুঝতে পেরে নিশ্চুপ থাকলেন। ইয়ারমুক-এর বিজয়িগণ রেশমি পরিচ্ছদ পরিধান করে মদিনায় উপস্থিত হলে ওমর তাদের প্রতি প্রস্থর নিক্ষেপ করেন। অতঃপর তারা পোশাক পরিবর্তন করে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে স্বাগতম জানান এবং তাদের কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করেন। ইয়াদ ইবন গানাম কে কোমল পরিচ্ছদ পরিধানের দরুন গভর্নরের পদ হতে পদচ্যুত করা হয় ।[৯৬] নুমান ইবন ফুদালা-র কাব্য চর্চায় মধ্যের বর্ণনার কারণে একই শাস্তি হয়েছিল।[৯৭] ইয়ালা ইবন ইমায়্যা মক্কা বিজয়ের অনেক পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ফারূকী খিলাফতকালে তার

---

[৯৩] ইবনে আবদিল বারর জামি বায়ানিল ইলম, ১ম খণ্ড, ১৩১।
[৯৪] ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, ২০৩।
[৯৫] আয-যাবী, তারীখুল-ইসলাম, ২য় খণ্ড, ৫৫।
[৯৬] ইবনুল-জাওযী, আল-মুনতাজাম, ২য় খণ্ড, ২৭৫।
[৯৭] ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাজাম, ২য় খণ্ড, ২৭৫।

ইয়ামান-এর শাসনামলে একটি নিজস্ব সংরক্ষিত চারণভূমি প্রস্তুত করে সেখানে অন্য কারও পশু চরান নিষেধ করেছিলেন। এতে ওমর ؓ তাকে পদচ্যুত করে পদব্রজে মদিনা আগমনের নির্দেশ দেন। তিনি পথিমধ্যে ছিলেন, এমন সময় ওমর ؓ-এর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে অবশিষ্ট পথ অশ্বারোহণে অতিক্রম করেন।[৯৮]

যাহোক, ওমর ؓ-এর চরিত্রে এ কঠোরতা সত্ত্বেও নমনীয়তাও ছিল। সিরিয়া ভ্রমণকালে গভর্নর আমির মুআবিয়া ؓ তাকে মিছিল সহকারে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। তাদের জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি তিনি আপত্তি উত্থাপন করলে আমির মুয়াবিয়া ؓ বলেন, আমিরুল-মু'মিনীন! এ জাঁকজমককে অত্যন্ত স্থানীয় রোমকগণের কারণে, অন্যথায় তারা আমাদেরকে হেয় ও নীচ প্রকৃতির বলে প্রতিপন্ন করবে। তবে আমাদের বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ পরিচ্ছদের অন্তরালে রয়েছে আমাদের মোটাসোটা ও অমসৃণ আরবি পোশাক। এতে ওমর ؓ কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না।[৯৯] গভর্নরদের নিয়োগপত্রেও তিনি সংশ্লিষ্ট প্রদেশের জনগণকে সম্বোধন করে বলতেন, "ইসমাউ ওয়া আতীউ মা আদালা ফীকুম" অর্থাৎ "হে তোমরা গভর্নরের আদেশ শ্রবণ করো ও পালন করো যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তোমাদের মধ্যে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে থাকবেন"।[১০০]

আত্মমর্যাদা

ওমর ؓ প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত আত্মমর্যাদা সচেতন ছিলেন। এমনকি রাসূল ﷺ নিজেও তাঁর আত্মমর্যাদার প্রতি লক্ষ রাখতেন। মুসলিম, তিরমিযী এবং অন্যান্য কয়েকটি সহীহ হাদিস গ্রন্থে বিভিন্ন শব্দের হেরফেরসহ বর্ণিত হয়েছে। মিরাজ ভ্রমণকালে রাসূল ﷺ জান্নাতে একটি রূপালি মহল দেখেন। এটি ওমর ؓ-এর জন্য নির্ধারিত ছিল। তিনি ওমর ؓ-এর আত্মমর্যাদা জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই এর মধ্যে প্রবেশ করেননি। তিনি ওমর ؓ-এর সামনে একথা উত্থাপন করলে ওমর ؓ কেঁদে ফেললেন এবং বললেন : "আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর উৎসর্গিত হোক, আপনার মোকাবিলায় আমি আত্মমর্যাদা প্রকাশ করব, এও কি সম্ভব?"

আল-হিজাব-এর আয়াত নাযিল হবার আগে আরবে পর্দার প্রচলন ছিল না। এমনকি রাসূল ﷺ-এর সহধর্মিণীদেরও পর্দা করতেন না। এ পর্দাহীনতা ওমর ؓ-এর আত্মমর্যাদায় আঘাত হানত। বার বার রাসূল ﷺ-এর নিকট আবেদন

---

[৯৮] ইবনে আবদিল বারর, আ-ইসতী আব, নং ২৭৬৫।

[৯৯] ইবনে কাছীর, আল বিদায়া, ৮ম খণ্ড, ১২৪-১২৫।

[১০০] শাহ ওয়ালিউল্লাহ দিহলবী, ইযালাতুল খিফা, ১ম খণ্ড, ১৭২।

করেন, আপনার সহধর্মিণীদের পর্দার নির্দেশ দেন। তাঁর এ আকাঙ্ক্ষার পরই হিজাবের আয়াত নাযিল হয়।

তিনি এত বেশি আত্মমর্যাদা সচেতন ছিলেন যে, যখন তিনি মুসলমান মেয়েদের ঈসায়ী মেয়েদের সামনে হাম্মামে বেপর্দা অবস্থায় গোসল করার খবর পেলেন তখন নির্দেশ জারি করে দিলেন, মুসলমান মেয়েদের অন্য ধর্মের মেয়েদের সমান বেপর্দা হওয়া বৈধ নয়।

ফিকহ্ চর্চা

ওমর রা. ফিকহ্-এর প্রচার ও প্রসারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইলমে কানূন (উসূলুল ফিকহ)-এর সূচনা হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিম্নবর্ণিত হাদিস দ্বারা : মু'আয ইবন জাবাল রা. রাসূলুল্লাহ সা.-এর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "আমার নিকট কোনো মোকদ্দমা আসলে আমি মীমাংসা করব আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী; এতে সুস্পষ্ট ফায়সালা না পাওয়া গেলে নবী সা.-এর হাদিস অনুযায়ী; এতেও যদি পাওয়া না যায় তাহলে আমি স্বীয় প্রজ্ঞার সাহায্যে মোকদ্দমার মীমাংসা করব।" কুরআন ও হাদিসের পরে ইজমা ও কিয়াসকে যারা শরীআতের মূল হিসেবে গ্রহণ করেছেন ওমর রা. তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি বলে প্রতীয়মান হয় (ইযালাতুল-খিফা, ২য় খণ্ড, ৮৫) এবং এ অদ্যাবধি ইসলামি আইনে প্রচলিত আছে। আবু মূসা আল-আশআরী রা.-এর নামে তাঁর বিখ্যাত চিঠিতেও কিয়াস-এর আলোচনা আছে।[১০১] তাঁর খিলাফতকালে ফিকহ্-এর উন্নতি ছিল অবধারিত। নবী সা.-এর অব্যবহিত পরেই বিজিত এবং বিদেশি জাতির সঙ্গে মেলামেশার দরুন ক্রমশ নিত্য নতুন সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে এবং তার ১২ বছরের খিলাফত কালের প্রতিটি মীমাংসাই নজির হয়ে রয়েছে। সাধারণত সাহাবীদের সহযোগে মন্ত্রণা সভার পরামর্শক্রমেই করা হতো। ফলে এ ইজমা-এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.) -এর ইযালাতুল-খিফা গ্রন্থে (বিশেষত দ্বিতীয় খণ্ডে) এর প্রচুর উপাদান রয়েছে। কিন্তু ওমর রা. অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতেন না। বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বীয় রায় প্রদান করতেন।[১০২] কুরআন মাজীদেও তিনি যুক্তিতর্কের প্রশ্রয় দিতেন না। ইলমুল ফারাইদ (উত্তরাধিকার বিদ্যা)-এর বিশ্লেষণে তার বিরাট ভূমিকা রয়েছে, যদিও এ কুরআনের আয়াতসমূহের ওপরই নির্ভরশীল। কিন্তু কোনো কোনো

---

[১০১] Administration of Justice under the early caliphat; Instruction of Caliph Umar to Abu Musa Al-Ash'ari (dated 17 H., in J. Pak. Hist. Sco) করাচি, জানুয়ারি ১৯৭৩, পৃ. ১-৫০।

[১০২] ইযালাতুল-খিফা, ১খ, ১২৮।

অবস্থার বিশদ বিবরণ কুরআন মাজীদ ও হাদিসে মিলে না। যেমন কোনো ব্যক্তির যদি স্ত্রী, মাতা, পিতা এবং দু কন্যা উত্তরাধিকারী হয় তা হলে কুরআন মাজীদের নির্দেশানুসারে স্ত্রী এক-অষ্টমাংশ, মাতা এক-ষষ্ঠাংশ, পিতাও এক-ষষ্ঠাংশ এবং কন্যাসমূহ দু-তৃতীয়াংশ পাবে। কিন্তু এটি চব্বিশ-এর সাতাশ হয়ে একক-কে অতিক্রম করে। ওমর ﷺ আওল সম্পর্কে নির্দেশ দেন যে, সকলের অংশ আনুপাতিক হারে হ্রাস করতে হবে। যেমন স্ত্রী এক-অষ্টমাংশের স্থলে এক-নবমাংশ পাবে ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রেখে তিনি নির্দেশ দেন যে, মুশরিক পুরুষের সঙ্গেই নয়, খ্রিস্টান ইত্যাদি আহল-ই কিতাব পুরুষের সঙ্গেও মুসলমান মহিলাদের বিবাহ নিষিদ্ধ। তারা একমাত্র মুসলিম পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।[১০৩] বিবাহিত স্ত্রীলোকের ব্যভিচারের জন্য রাজম (প্রস্তর নিক্ষেপ) দ্বারা মৃত্যুদণ্ডের হুকুম নবী ﷺ-এর যামানা হতে চলে আসছিল। ওমর ﷺ তাকে বহাল রাখেন। তিনি এর গুরুত্বের প্রতি জোর দিয়ে বলেন যে, আল-কুরআনে তাহরীফ হয়েছে– জনগণের এ ধরনের অভিযোগের ভয় না হলে আমি হাদিসের রজম-এর হুকুমটি কুরআন মাজীদের হুকুম বলে জারি করতাম।

মসজিদ-ই নববী-এর মধ্যে মুসল্লিগণ সালাতের পরে অথবা সালাতের অপেক্ষায় বসে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনাও করত। একে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ না করে তিনি মসজিদ সংলগ্ন জায়গায় একটি বসার স্থান নির্মাণ করে বলেন, "হাসি, কৌতুক কিংবা কবিতা আবৃত্তি করতে হলে ঐ স্থানে উপবেশন করো; মসজিদের মুসল্লী এবং কুরআন পাঠকারীদের অসুবিধার সৃষ্টি করেও না"।[১০৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় প্রবর্তিত করসংক্রান্ত আইনে ফারূকী আমলে মাঝে মধ্যে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। এর একটি উদাহরণ আবু উবায়দ উল্লেখ করেছেন, নাবীতিগণ উত্তর আরবের ইরাক এবং সিরিয়ার মধ্যভাগে বসবাস করত।[১০৫] তার ব্যবসার উপলক্ষ্যে খাদ্যশস্য যায়তুনের তৈল কাফেলাযোগে মদিনা নিয়ে আসত। মদিনায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে খলিফা এর আমদানি শুল্ক অর্ধেক অর্থাৎ শতকরা দশ ভাগের পরিবর্তে পাঁচ ভাগ কমিয়ে দেন, অন্যথায় তিনি খাদ্যশস্যের ওপর শতকরা দশ ভাগ শুল্ক আদায় করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানার পরে ফাতওয়ার মাধ্যমে ইসলামি আইনের বিকাশ ঘটে। মুসলিম আলিমগণ ফাতওয়া দেওয়ার অধিকার রাখেন। ফলে ইসলামি রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ ও আইন প্রণয়নের বিষয়টি শাসন বিভাগ হতে মুক্ত থাকে।

---

[১০৩] ইযালাতুল-খিফা, ১ব, ১৭৫।
[১০৪] আস-সামহূদী, পৃ. ৪৯৭-৪৯৮।
[১০৫] কিতাবুল আমওয়াল, নং ১৩৯৭, ১৬৬০।

সহজ-সরল জীবন

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের স্ত্রী-পরিজন ও সন্তান-সন্ততিদেরকে ভালোবাসতেন। কিন্তু তাদেরকে এমন পর্যায়ে ভালোবাসতেন না যার ফলে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা কোনো প্রকার বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। খান্দানের অন্যান্য লোকদের সাথে সম্পর্ক বেশি গভীর ছিল না। তবে নিজের সহোদর ভাই যায়েদকে খুব বেশি ভালোবাসতেন। ইয়ামামার যুদ্ধে যায়েদ শহিদ হলে অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে পড়েন। তিনি বলতেন, ইয়ামামার দিক থেকে বাতাস চললে আমি তাতে যায়েদের খোশবু পাই। যায়েদের আসমা নামক একটি মেয়ে ছিল, তাকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

মক্কা থেকে হিজরত করে আসার পর তিনি মদিনার দু মাইল দূরে আওয়ালীতে থাকতেন। কিন্তু খেলাফত লাভের পর মদিনা শহরের মসজিদে নববীর সন্নিকটে বসবাস শুরু করেন। যেহেতু মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ইন্তেকালের পর এ গৃহ বিক্রি করা হয় এবং দীর্ঘকাল দারুন কাযা নামে পরিচিত থাকে।

তাঁর রুজি সংস্থানের প্রধান অবলম্বন ছিল ব্যবসায়। মদিনায় পৌছে কৃষিকাজও শুরু করেন। কিন্তু খেলাফতের গুরুদায়িত্ব তাঁকে ব্যক্তিগত কাজকর্ম বন্ধ করতে বাধ্য করে। তখন তাঁর অভাব-অনটন দেখে সাহাবাগণ তাঁর জন্য মামুলি খাওয়া-পরার উপযোগী মাসোহারা নির্ধারণ করেন। ১৫ হিজরিতে সাধারণ মানুষের ভাতা নির্ধারিত হলে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্যও বার্ষিক পাঁচ হাজার দিরহাম নির্ধারিত হয়।

তিনি অত্যন্ত সাধারণ খাদ্য অর্থাৎ নিছক রুটি ও যয়তুন তেল আহার করতেন। কখনো গোশত, দুধ, সবজি ও সিরকাও দস্তখানে দেখা যেত। পোশাকও ছিল অত্যন্ত সাধারণ পর্যায়ের। অধিকাংশ সময় কেবল জামা পরিধান করতেন। প্রায়ই মাথায় পাগড়ি বাঁধতেন তিনি। প্রাচীন আরবিয় পেটার্নের জুতা পরতেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত লাভ

সকল মুসলিম ঐতিহাসিক তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসেবে বর্ণনা করেন যে, আবু লুলু ফিরোয নামক জনৈক পারসিক (খ্রিস্টান কিংবা অগ্নি উপাসক) ক্রীতদাস মদিনায় বাস করত।

একদিন এ দাস ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট অভিযোগ করেন যে, তার মুনিব তার কাছ থেকে অতিরিক্ত শুল্ক নিচ্ছে। তার শুল্কের কথা শোনার পর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার শুল্কের পরিমাণ শুনে বুঝতে পারলেন এবং বললেন, এটা তো তোমার জন্য অতিরিক্ত নয়। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ কথা শুনে আবু লুলু ফিরোয ক্রোধান্বিত হলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে একটি কারখানা তৈরি করে দিতে বললে, দাসটি বলে

উঠল- আমি তোমাকে এমন এক কারখানা বানিয়ে দিব যা নিয়ে সারা বিশ্বের মানুষ কথা বলবে। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বুঝতে পারেন যে, তাকে ধমক দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তিনি তার কথার দিকে কর্ণপাত করেননি। আবু লুলু ফিরোয একটি দুমুখো তরবারি নিয়ে মসজিদে নববীতে লুকিয়ে থাকে। ২৩ হিজরি ২৭ যিলহজ বুধবার ফজর নামাযের সময় আবু লুলু ফিরোয তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে। অন্য বর্ণনামতে, ২৪ হিজরির ১ মুহাররাম তিনি ইন্তেকাল করেন।

আবু লুলুকে বন্দি করা হলে সে আত্মহত্যা করে মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কাল, 'আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ প্রমুখ আধুনিক ঐতিহাসিক ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের কারণ পারসিকগণের ষড়যন্ত্র বলে সিদ্ধান্ত করছেন)।

আঘাত প্রাপ্তির পর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুর রহমান ইবন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ডেকে পাঠান। তিনি ধারণা করেন যে, সম্ভবত আমিরুল-মু'মিনীন তাকে স্থলাভিষিক্ত করতে চাইছেন। কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই তিনি বলে উঠলেন, "আল্লাহর কসম! আমি কখনও তা গ্রহণ করব না।"[১০৬]

চিকিৎসকগণ তার চিকিৎসা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু তার অন্ত্রাদি কেটে গিয়েছিল এবং সে যুগে শৈল্য চিকিৎসা ততদূর উন্নতি লাভ করেনি বলে তার কোনো চিকিৎসা হলো না। সুতরাং অনুরোধ করা হলো যে, ওসিয়াত করতে হলে সত্বরই করতে হবে। মানুষ এতে অভিভূত না হয়ে পারে না যে, একজন অমুসলিমের হাতে মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও খলিফা মৃত্যুশয্যায় ওসিয়ত করলেন, "তোমরা অমুসলিম প্রজাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।"[১০৭] তাঁর বায়তুলমাল-এর কিছু ঋণ ছিল; তিনি পুত্রকে আদেশ দেন যেন তা সত্বর পরিশোধ করা হয়।[১০৮]

পরবর্তী খলিফা নির্বাচন

স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের প্রশ্নটি ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর খিলাফতের সারাক্ষণই এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতেন। কেউ উত্তরাধিকারী নির্ধারণের পরামর্শ দিলে তিনি বলতেন : যদি আমি কোনো ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত করি তা

---

[১০৬] লা ওয়াল্লাহি লা আদখুলু ফীহি আবাদন, আত-তাবারী, পৃ. ২৭২৩

[১০৭] আল-বুখারী, কিতাবুল-জিযয়া, অধ্যায় ৩

[১০৮] ইবন সা'দ, ১/৩খণ্ড, ২৬০।

হলে আমা হতে উত্তম ব্যক্তি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নজির রয়েছে। অন্যপক্ষে যদি না করি তবে তা রাসূলের সুন্নাত।[১০৭]

অবশেষে মৃত্যু পূর্বমুহূর্তে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা নির্বাচনের নতুন রীতি অনুসরণ করেন, তা নিম্নরূপ–

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু পূর্ববর্তী নিয়ম অনুসরণ না করে মুসলমানদের মধ্যে একতা ধরে রাখার লক্ষ্যে খলিফা নির্বাচনের একটি নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি তোমাদের সামনে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের একটি নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করব। তাঁর এ পদ্ধতি ছিল তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। তার এ পদ্ধতির বিভিন্ন দিক হলো-

১. নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন প্রদান : প্রথমে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ৬ জনের একটি শূরা পরিষদ গঠন করেন। শূরা পরিষদের ৬ জন সদস্য হলেন–

ক. আলী ইবন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু

খ. উসমান ইবন আফান রাদিয়াল্লাহু আনহু

গ. আব্দুর রহমান ইবন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু

ঘ. সাদ ইবন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু

ঙ. যুবাইর ইবন আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু

চ. তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু

এ ছয়জন ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশ্বস্ত সাহাবী। তারা মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতকালে এদের ওপর খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন এদের সবাই খলিফার দায়িত্ব পালন করার জন্য উপযুক্ত।

২. নির্বাচনের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ : ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শূরা পরিষদের সদস্যদের জন্য তিন দিন সময় নির্ধারণ করে দেন। তিনি বলেন একটি সিদ্ধান্তে আসার জন্য তিন দিনের বেশি সময় লাগবে না। তিনি একজন সৈন্যকে ঘড়ি নিয়ে আসতে বলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ ব্যাপারে তদারকি করার আদেশ দেন।

---

[১০৭] ইবনুল-আরাবী, আল-আওয়াসিম মিনাল-কাওয়াসিম, পৃ. ১৪৪

৩. নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করেন : ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সমগ্র নির্বাচন পদ্ধতি পরিচালনা এবং দেখাশুনার দায়িত্ব দেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। তিনি শূরা বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন, কিন্তু তিনি কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিবেন না এবং তিনি নির্বাচনের জন্য মনোনীতও নয়।

৪. পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করেন : ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সমগ্র নির্বাচন পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য ৫০ জন মুসলিম ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলেন। মিকদাদ ইবনে আসাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু তালহা আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পর্যবেক্ষণকারীদের সমন্বয়কারী হিসেবে নিযুক্ত করেন।

৫. নির্বাচনী আচরণ বিধি নির্ধারণ : ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, খিলাফত হলো একটি মহান দায়িত্ব। এ কাজে কোনো ধরনের স্বজনপ্রীতি কাম্য নয়। সাইদ ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আশারায়ে মুবাশ্‌শারার সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে শূরা সদস্য হিসেবে মনোনীত করেননি; কেননা তিনি ছিলেন তাঁর চাচাতো ভাই। তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, তাঁর চাচাতো ভাই হওয়ার কারণে লোকেরা খিলাফতের প্রশ্নে প্রাধান্য দেবেন। নির্বাচন চলাকালীন এ সময় শূরার সদস্যদের কেউ নামাযে ইমামতি করবে না। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাযে ইমামতির জন্য সুহাইব ইবন সিনান আর-রূমী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দায়িত্ব দেন।

৬. নির্বাচনের পদ্ধতি : শূরার সদস্য হিসেবে মনোনীত ৬ জন পরস্পর আলোচনা করে একজনকে নির্বাচিত করবেন। যদি ৩ জন এক ব্যক্তি নির্বাচিত করেন এবং অন্য ৩ জন আরেক জনকে নির্বাচিত করেন, তবে আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকে নির্বাচিত করবেন তিনিই খলিফা হবেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন, তারা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না চায়; তবে তারা আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৭. নির্বাচনী কাজে সেনাবাহিনী নিযুক্তকরণ : নির্বাচন পরিচালনা, সময় গণনা, নির্বাচন কাজে বাধা অথবা শূরা বৈঠকে আড়িপাতা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি রোধে সেনাবাহিনী নিযুক্ত করেন।

এভাবে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি আলোচনার মাধ্যমে উত্তম পন্থায় সবার কাছে গ্রহণযোগ্য খলিফা নির্বাচন পদ্ধতি রেখে যান।

ওমর -এর কাফন ও দাফন

ইন্তেকালের পর ওমর কে রাসূলুল্লাহ -এর পাশে আবু বকর -এর সন্নিকটে দাফন করা হয়। ওয়ালিদ ইবন আবদিল-মালিক-এর খিলাফতকালে নবী -এর হুজরাটির একটি প্রাচীর কোনো কারণে বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং একখানি পদ মুবারক দৃষ্ট হয়। অভিজ্ঞ মহলের মতে এটি ওমর -এর কবর।[১১০] আস-সামহূদী বর্ণনা করেন, যেহেতু ওমর দীর্ঘদেহী ছিলেন, দাফনের সময় তাঁকে আবু বকর -এর কাঁধ বরাবর শয়ন করালে পবিত্র হুজরাতে তার কবরের স্থান সংকুলান না হওয়ায় তার পদদ্বয়ের জায়গা তৈরি করার জন্য নবী -এর হুজরার একটি প্রাচীরের নিম্নভাগে সুড়ঙ্গ করতে হয়েছিল। ফলে প্রাচীরটি ঐ স্থানে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরে ধসে যায়।

উসমান তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত

আবদুর রহমান বিন আউফ শূরার সদস্যরা ও মদিনার আনসার-মুহাজিররা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সকলে ভেবেছিলেন আলী অথবা উসমান কে তাদের খলিফা নিযুক্ত করা হবে। প্রসিদ্ধ হাদিস, তাফসীর ও ইতিহাসবিদ ইবন কাছীর খলিফা নির্বাচন সম্বন্ধে যে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন তার উল্লেখ করে বিবরণের যবনিকা টানা হলো : অতঃপর আবদুর-রহমান জনগণের সাথে পরামর্শ আরম্ভ করেন; পৃথক পৃথক ও সমষ্টিগতভাবে, গোপনে ও প্রকাশ্যে, এমনকি তিনি অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের নিকটও গিয়েছিলেন এবং মাদরাসার ছাত্রদের মদিনায় আগত বিদেশি ও মরুবাসী আরবদের নিকটও তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আম্মার ইবন ইয়াসির এবং আল-মিকদাদ ব্যতীত সকলেই উসমান -এর পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। (অতঃপর উসমান ও আলী -এর নিকট হতে গোপনে এ স্বীকৃতি গ্রহণ করেন যে, তাঁকে নির্বাচিত করা না হলে তিনি নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ণ আনুগত্য করবেন)। অতঃপর মসজিদ-ই নববীতে আগমন করে মিম্বরের ওপর দণ্ডায়মান হলে সকলেই তাঁর ফয়সালা শোনার জন্য সমবেত হলেন। আবদুর রহমান প্রথমত আলী কে জিজ্ঞেস করেন : হে আলী ! আপনি কি আমার নিকট এ মর্মে শপথ করতে প্রস্তুত আছেন যে, আপনি আল্লাহর কিতাব, নবীর সুন্নাত এবং আবু বকর ও ওমর -এর আদর্শ অনুযায়ী শাসন কাজ পরিচালনা করবেন? উত্তরে তিনি বললেন : এতখানি নয়, অবশ্য এ আমার শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে (তার বিনয়ের পরিচয়)। অতঃপর উসমান -এর নিকটও এ একই প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর

---

[১১০] ইবন সা'দ, ১/৩খণ্ড, ২৬৮।

দিলেন : জী হ্যাঁ। অতঃপর আবদুর রহমান আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে হাত রেখে বললেন : হে আল্লাহ! আপনি শুনুন ও সাক্ষী থাকুন যে, আমি আমার সমুদয় দায়িত্ব উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর ন্যস্ত করলাম। অতঃপর জনগণ বায়আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল।[১১১]

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারীদের বিচার

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর বাধ্য হয়ে তাঁকে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যার বিচারে মনোযোগ দিতে হলো। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রত্যক্ষ হত্যাকারী আবু লুলু আত্মহত্যা করে। উবায়দুল্লাহ ইবন ওমর আবু লুলুকে খঞ্জর সরবরাহকারী হুরমুযান, জুফায়না ও আবু লুলু এর কন্যা ক্রোধের উন্মাদনায় হত্যা করে ফেলল। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হুরমুযান–এর পুত্রকে ডেকে এনে বললেন, এ উবায়দুল্লাহ তোমার পিতার হত্যাকারী; নিয়ে গিয়ে আইনানুযায়ী প্রতিশোধ গ্রহণের মানসে হত্যা করতে পার। কিন্তু সে বলল : "আমি আল্লাহ ও মুসলিমগণের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর মৃত্যুদণ্ড মার্জনা করে দিলাম।" এতে জনগণ এত খুশি হয়েছিল যে, তাকে মাথায় তুলে তার ঘর পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়।[১১২] জুফায়না খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী এবং আবু লুলু-র কন্যা অগ্নি উপাসক ছিল বিধায় তাদের বিচার মৃত্যুদণ্ড নয়; বরং দিয়াত (রক্তপণ) যা খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং আদায় করে দেন।[১১৩]

---

[১১১] আল-বিদায়া, ৭খ, ১৪৬-১৪৭।

[১১২] আত-তাবারী, ১খ, ২৮০১

[১১৩] ইবনুল-আরাবী, আল আওয়াসিম মিনাল-কাওয়াসিম, পৃ. ৮৪

উসমান ইবনে আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

[খিলাফতকাল : ২৩ হিজরী, ৩০ জিলহজ থেকে ৩৫ হিজরী, ১৮ জিলহজ]

অধ্যায়-১

উসমান -এর ব্যক্তিগত জীবন

১. জন্ম পরিচয়

উসমান হাতী বাহিনীর ঘটনার সাতবছর পর তায়েফ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। সম্ভবত তাঁর প্রাথমিক জীবনের ইতিহাস সম্পর্কিত রেওয়াতগুলো সনদবিহীন। যে বছর ইয়ামানের গভর্নর আবরাহা হাতী বাহিনী নিয়ে কা'বা গৃহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মক্কা আক্রমণ করেছিল, সে বছরটিকে আরবরা 'আম-আল-ফীল' অর্থাৎ, 'হস্তিবর্ষ' নামে অভিহিত করত। এ বছরটি আরবদের অধিবাসীদের নিকট একটি চিরস্মরণীয় ঘটনার কারণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছিল। কুরআন মাজীদে 'সূরাতুল ফীলে' (আলাম্ তারায়) এ ঘটনাই উল্লিখিত হয়েছে। এ ঘটনাটি ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল। এ সনেই রাসূল -এর জন্ম হয়। এর ছয় বছর পর উসমান জন্মগ্রহণ করেন। এ হিসাবে উসমান -এর জন্ম হয় ৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে।[১] এক বর্ণনামতে, উসমান মহানবী মুহাম্মদ -এর জন্মের ৬ বছর পরে ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে তায়েফে জন্মগ্রহণ করেন। উসমান বিখ্যাত কুরাইশ বংশের উমাইয়্যা গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

মক্কা থেকে হযরত উসমান রা.-এর জন্মস্থান তায়েফে যাওয়ার বর্তমান রাস্তা

---

[১] সাদিক উরজূন, উসমান ইবনু আফ্ফান (আদ্দার আস-সাউদিয়্যাহ, ১৯৯০), পৃ. ৪৫।

২. বংশ পরিচয়

উসমান -এর প্রাক ইসলামি যুগের জীবন সম্পর্কে সবিস্তার তথ্য পাওয়া না গেলেও তাঁর 'নসবনামা' অর্থাৎ বংশ লতিকা রাবীদের নিকট হতে সঠিকভাবে পাওয়া যায়। তাঁর বংশ পরম্পরা এরূপ– উসমান ইবনে আফফান, ইবনে আবিল আস, ইবনে উমাইয়্যা, ইবনে আবদে শামস, ইবনে আবদে মনাফ, ইবনে কুসাই। অর্থাৎ, তাঁর বংশধারা পিতার দিক হতে উর্ধ্বতন পুরুষ আবদে মনাফ পর্যন্ত গিয়ে রাসূল -এর পূর্ব-পুরুষের সাথে মিলিত হয়। মায়ের দিক হতে এ বংশগত সম্পর্ক রাসূল -এর আরও নিকটবর্তী হয়ে যায়। উসমান -এর মাতার নাম ছিল আরওয়া এবং তাঁর বংশধারাও উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষে গিয়ে রাসূল -এর বংশের সাথে মিলিত হয়। অর্থাৎ, আরওয়া বিনতে কুরাইয, ইবনে রবীআহ, ইবনে হাবীব, ইবনে আবদে শামস, ইবনে আবদে মনাফ। আবদে মনাফের দুই পুত্রের মধ্যে একজনের বংশে রাসূল এবং অন্য পুত্রের বংশে উসমান -এর জন্ম হয়। ওসমানের মাতা আরওয়া ছিলেন রাসূলে করীম -এর ফুফু উম্মে হাকিম বায়যা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা। অতএব, রাসূল -এর আপন ফুফু হলেন উসমান -এর নানী। উসমান -এর মা তারই খিলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর সময়ই মারা যান।[১]

উসমান -এর বংশ মক্কায় খুবই সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত বলে গণ্য হতো। উমাইয়া ইবনে আবদে শামস ছিলেন প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দের অন্যতম। কুরাইশ বংশের গোত্রীয় ঝাণ্ডা এ বংশেরই হাতে থাকত, ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর এ বংশের ওক্বা ইবনে আবি মুআইত ও আবু সুফিয়ান ইবনে হরব খুবই খ্যাতি এবং সম্মান লাভ করেছিলেন।

গোটা আরব দেশে সম্মান ও কৌলিন্যে এবং ধনসম্পদ ও ক্ষমতার দিকদিয়ে দুটি বংশ খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। একটি রাসূল -এর বংশ বনু হাশেম, অপরটি উসমান -এর বংশ বনু উমাইয়্যা। পার্থিব দিক হতে বনু উমাইয়্যা এবং ধর্মীয় দিক হতে বনু হাশেম গোত্র সম্মান ও খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করছিল। আরববাসী বনু হাশেম গোত্রকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখত।

মর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রশ্নে এ দুটি বংশের মধ্যে আবহমান কাল হতে হানাহানি চলে আসছিল। উসমান -এর পিতা আফফান এবং গোটা বনু উমাইয়্যা বংশ; বরং আবদে শামসের বংশধর এবং কুরাইশের অধিকাংশ লোক ব্যবসায়-বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। এহেন মর্যাদা ও সম্পদশালী বিখ্যাত গোত্রে উসমান

[১] আত তাবারী, খ. ৪, পৃ. ৪২০।

(রা) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এতই সুদর্শন ও সুশ্রী ছিলেন যে, মক্কার লোকেরা বলাবলি করত কেউ যদি এ যুগে ইউসুফ (আ)-এর রূপরাশি দেখতে চাও, তবে উসমান ইবনে আফফানের প্রতি তাকাও। ফুলের মতো সুকুমার এবং শিশিরের শুভ্র মন নিয়ে তিনি আরবের সুপ্রসিদ্ধ ধনী সওদাগর আফফানের গৃহ আলোকিত করেছিলেন।
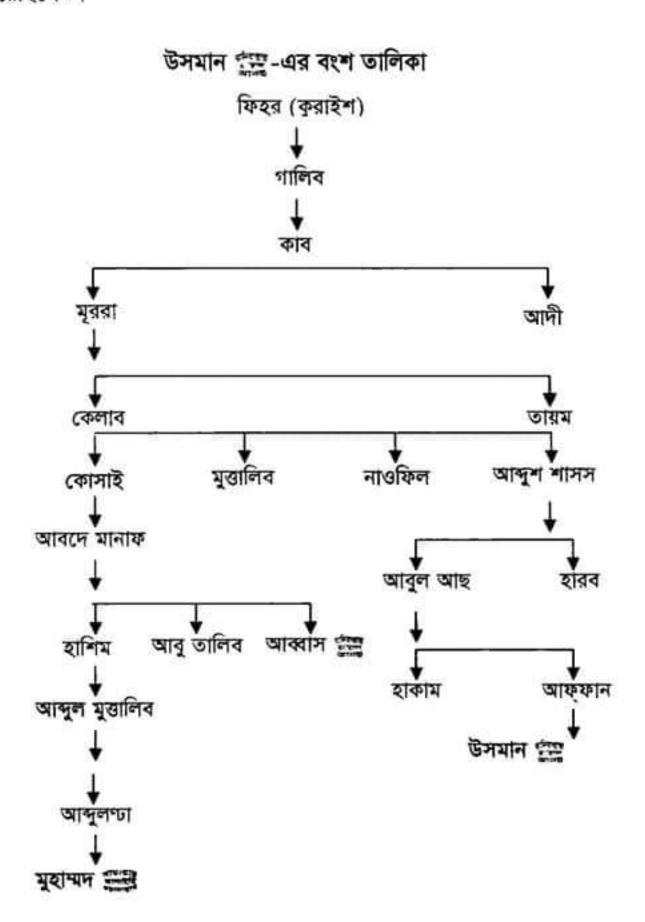
৩. ডাকনাম ও উপাধি

জাহিলিয়া যুগে উসমান -এর কুনিয়াত অর্থাৎ ডাকনাম ছিল আবু আমর। মহানবী -এর কন্যা রুকাইয়া -কে সন্তান প্রসব করার পর সন্তানের নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ। তখন থেকেই মুসলমানরা উসমান -কে আবু আব্দুল্লাহ বা আব্দুল্লাহর পিতা নামে ডাকতে লাগলেন।

রাসূল- তনয়া রুকাইয়াহ -এর গর্ভে 'উসমান -এর প্রথম পুত্রের জন্ম হলে তার নাম রাখা হয় 'আব্দুল্লাহ। এরপর থেকে তিনি আবূ আবদিল্লাহ উপনামে পরিচিত হন।[৩]

৪. জুন নূরাইন

উসমান -এর উপাধি ছিল জুন নূরাইন বা "দুই জ্যোতির অধিকারী"। তাঁকে দুই জ্যোতির অধিকারী বা জুন নূরাইন কেন বলা হতো? কারণ তিনি মুসলমান হওয়ার পর প্রথমে মহানবী -এর কন্যা রুকাইয়াকে বিবাহ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি মহানবী -এর আরেক কন্যা উম্মে কুলসুম কে বিবাহ করেন। এ কারণেই উসমান -এর সম্মানিত উপাধি জুন নূরাইন' বা "দুইটি জ্যোতির অধিকারী" বলে অভিষিক্ত হন।[৪] উল্লেখ্য যে, উসমান ছাড়া আদম আ. থেকে আজ পর্যন্ত কেউই কোনো নবীর দুই কন্যাকে বিবাহ করেন নি। উম্মে কুলসুম -এর মৃত্যুর পর মহানবী বলতেন- "আমি উসমানকে এতই ভালোবাসি যে, আমার আরো কন্যা থাকলে আমি তাকে তাঁর সাথে বিবাহ দিতাম।"

৫. গনী উপাধিতে ভূষিত

কুরাইশদের সাধারণ পেশা ছিল ব্যবসা। ব্যবসায়-বাণিজ্যে তিনি খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সূরা লিঈলাফের মধ্যে গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমে কুরাইশদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে উসমান -ও ব্যবসাকে জীবিকার মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছিলেন। রবিয়া ইবনে হারেস-এর সাথে শরিক হয়ে বিশাল আকারে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করে দেন। ব্যবসায় তিনি এমন প্রসিদ্ধি ও সফলতা লাভ করেন যে, তিনি উসমান গনী উপাধিতে ভূষিত হন।

---

[৩]. ইবনু সা'দ, ৩:৫৩-৫৪; আত-তাবারী, ৪:৪১৯।

[৪] আয যাহাবী, তারীখ, খ. ৩, পৃ. ৯৩।

৬. শিক্ষাজীবন

পিতা-মাতা স্বগৃহেই তাঁর বাল্যশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। ইসলামপূর্ব যুগে বিদ্যাশিক্ষার তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না, ধনী বণিক ও নেতৃস্থানীয় লোকের সন্তানেরা নিজ নিজ গৃহেই লেখাপড়া শিখত, ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য ততবেশি লেখাপড়ার প্রয়োজনও ছিল না। উসমান ঘরে বসিয়ে মোটামুটি ভালো লেখাপাড়া শিখিয়েছিলেন।

৭. উসমান -এর স্ত্রী

উসামান জীবনে আটটি বিয়ে করেন এবং সবগুলোই মুসলমান হওয়ার পর।

১. রুকাইয়া

রাসূলে করীম উসমান -কে নিজের জামাতারূপে বরণ করেন। আবু লাহাবের পুত্র উতবার সাথে রাসূলে করীম -এর দ্বিতীয় কন্যা রুকাইয়া -এর বিয়ে হয়েছিল।

নবী করীম যখন কুরাইশ বংশীয় মুশরিকদের হাতে নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছিলেন, তখন তাঁর দুকন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম -এর স্বামী ওতবাহ ও ওতাইবাহ দুভাই নবীজীর প্রচারিত নতুন ধর্মের প্রতি শত্রুতাস্বরূপ তাঁর কন্যাদ্বয়কে তালাক প্রদান করে। রুকাইয়া তখন সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছেন। উম্মে কুলসুম তখনও কিশোরী। নবুওয়াতের পূর্বেই উপরিউক্ত দুভাইয়ের সাথে তাঁদের বিবাহ হয়েছিল। এখন নবীজী ও তাঁর প্রচারিত নতুন ধর্মের বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে তাঁর নিরীহ ও অবলা কন্যাদ্বয়কে অন্যায়ভাবে ও বিনা কারণে তালাক প্রদান করে তাদের স্বামীরা নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিল। আবু লাহাবের দুই ছেলে তাদের পিতা-মাতার অভিপ্রায় অনুযায়ী রুকাইয়া ও উম্মে কুলসূমের সাথে বাসর রাত যাপনের পূর্বেই বিবাহ বিচ্ছেদ করে।[৫] এ সংকট মুহূর্তে এহেন বর্বরোচিত আচরণে নবীজীর অন্তর ব্যথিত হলো। রাসূল -এর বিবি খাদীজাতুল কোবরা ও এ ঘটনায় প্রচণ্ডভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই অসহায় মুহূর্তে এ নির্মম আচরণের প্রতিবাদ বা প্রতিকার করার কোনো উপায় ছিল না। ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক রাসূল সবকিছুই সহ্য করলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য করলেন না। এ দুঃসময়ে নবীজী -এর অবস্থা বিশেষত বালিকা দুটির দুরবস্থা চিন্তা করে কোমলপ্রাণ উসমান নবীজীর কন্যা রুকাইয়া -কে বিবাহ

[৫] আয যাহাবী, তারীখ, খ. ৩, পৃ. ৬৭৫।

করার প্রস্তাব করলেন। রাসূলে আকরাম ﷺ তাঁকে বুঝালেন, "উসমান! এমনিতেই তুমি আমার প্রচারিত ইসলাম ধর্ম কবুল করেছ। এখন আবার আমারই কন্যাকে বিবাহ করে তুমি এক বিরাট ঝুঁকি মাথায় নিচ্ছ।" কিন্তু উসমান তাঁর প্রস্তাবে অটল রইলেন। অবশেষে সন্তুষ্টচিত্তেই নবীজী ﷺ স্বীয় কন্যাকে উসমান-এর সাথে বিবাহ দিলেন।

নবীজী ﷺ পূর্বে যা আশঙ্কা করেছিলেন, তাই সত্যে পরিণত হলো। এ বিবাহের ফলে স্বগোত্রীয় লোকদের তরফ হতে উসমান-এর প্রতি নির্যাতন ও উৎপীড়ন চরমে পৌছল। তিনি দুঃখ ও দুর্দশার অথৈ সাগরে ভাসতে লাগলেন।

বদর যুদ্ধ চলাকালে রুকাইয়া মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন। তাই উসমান বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি । এ সময় এ যুদ্ধে যোগদান করতে না পারার দুঃখ তিনি সারা জীবনেও ভুলতে পারেননি। মদিনায় হিজরতের পূর্বে হাবশায় থাকাকালেই নানা প্রকার রোগ ও শোকে রুকাইয়া-এর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। এখানে আসার পর তাঁর স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হয়নি, ক্রমশ অবনতি ঘটিয়ে তিনি মুমূর্ষু অবস্থাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ মুমূর্ষু অবস্থায় কন্যাকে রেখেই রাসূল ﷺ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, আর উসমানকে তাঁর শয্যা পার্শ্বে রেখে গিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ যুদ্ধে জয়লাভ করলেন বটে; কিন্তু মৃত্যু তাঁর নয়নমণি প্রিয়তমা কন্যা রুকাইয়াকে কেড়ে নিল। নবীজী বিজয়ী বেশে মদিনায় ফিরে দেখতে পেলেন স্নেহের কন্যা-রত্নের কবর। তিনি তাঁর কবর সম্মুখে রেখে কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রু বিসর্জন করলেন।

উসমান তখন দ্বিবিধ দুঃখ ও শোকে দুঃখিত এবং শোকাতুর ছিলেন। এক দুঃখ এজন্য যে, তিনি বদরের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত রইলেন। দ্বিতীয় দুঃখ এ কারণে যে, রুকাইয়া-এর পাণি গ্রহণ করে তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে আত্মীয়তার যে মর্যাদা ও গৌরব লাভ করেছিলেন, আজ সেই গৌরব ও মর্যাদা হারিয়ে ফেললেন। একবার ওমর তাঁকে দুঃখিত ও চিন্তিত দেখে বললেন, "এখন আপনার ধৈর্যধারণ করা উচিত। যা হবার ছিল হয়ে গেছে।" উসমান বললেন ঃ "আফসোস! রাসূলে আকরাম ﷺ-এর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল, এ ক্ষতি আর জীবনে পূরণ হবার নয়।"
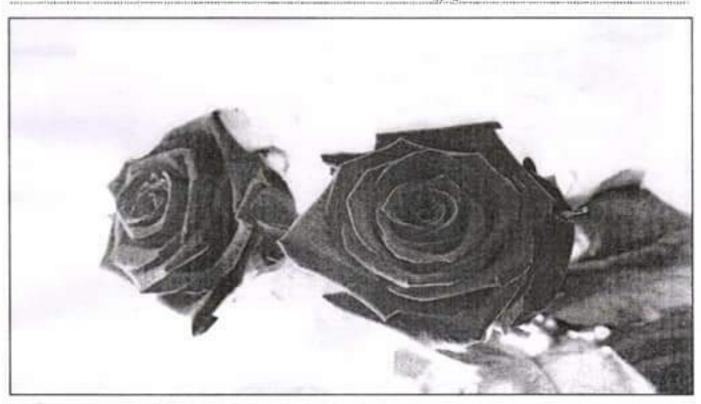
২. উম্মে কুলসূম

রাসূলে আকরাম উসমান -এর মনোবেদনা এতটুকু অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর সেই বেদনায় সহানুভূতি প্রকাশের জন্য তিনি ব্যবস্থা অবলম্বনপূর্বক উসমান কে বদরের যুদ্ধের মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে গণ্য করে তাঁকে বদরের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমতের মাল হতে ততটুকু অংশই প্রদান করলেন, যতটুকু অংশ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য মুজাহিদগণকে প্রদান করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে দিলেন যে, এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য মুজাহিদের সমপরিমাণ সওয়াব উসমানও প্রাপ্ত হবে, সওয়াবে তাঁর অংশ অন্য কারো চেয়ে কম হবে না। দ্বিতীয় দুঃখটির প্রতি সহানুভূতি এরূপে প্রকাশ করলেন, মরহুমা রুকাইয়া -এর কনিষ্ঠ ভগ্নি, রাসূল -এর অন্যতমা কন্যা উম্মে কুলসুম কে ৩য় হিজরিতে ওসমানের সাথে বিবাহ দিলেন। উসমান রাহমাতুল্লিল আলামীন নবী -এর এ অপরিসীম অনুগ্রহ ও দয়াপ্রাপ্ত হয়ে খুবই আনন্দিত হলেন। কেননা, তিনি বদর যুদ্ধের মুজাহিদগণের দলভুক্তও হলেন এবং সর্বাধিক আনন্দের বিষয়– পুনরায় তিনি রাসূল -এর জামাতা হওয়ার গৌরব এবং মর্যাদাও লাভ করলেন। এ গৌরব লাভে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অদ্বিতীয় হওয়া নিছক আল্লাহ তা'আলার দান ব্যতীত আর কি হতে পারে? এ বিবাহের পর হতে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে 'যুন্নুরাইন' অর্থাৎ, দুই নূরের (জ্যোতি) অধিকারী বলে আখ্যায়িত করতে লাগলেন। কিন্তু উসমান -এর এ স্ত্রীও বেশি দিন জীবিত রইলেন না, বিয়ের ছয়-সাত বছর পর ইন্তিকাল করেন। তখন রাসূলে আকরাম বলেছিলেন, "আমার যদি আরও কোনো কন্যা থাকত, তবে আমি তাকেও উসমানের সাথে বিবাহ দিতাম।"

৩. ফাখতা বিনতে গাযাওয়াস : তাঁর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ কিন্তু শৈশবেই তার মৃত্যু হয়;

৪. উম্মে আমর বিনতে জুন্দুব : তাঁর গর্ভে আমর, খালেদ, আবান ও ওমর নামক চার পুত্র ও মরিয়ম নামক এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে;

৫. ফাতেমা বিনতে অলীদ : তাঁর গর্ভে অলীদ ও সাঈদ নামে দুটি পুত্র জন্ম নেয়;

৬. উম্মে নাবীয়্যীন বিনতে ইতীয়্যা : তাঁর গর্ভে আব্দুল মালিক নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। তাঁরও শৈশবে মৃত্যু হয়;

৭. রমলা বিনতে শায়বা : তাঁর গর্ভে আয়েশা, উম্মে আবান ও উম্মে আমর নামক তিনটি কন্যার জন্ম হয়;

৮. নায়েলা বিনতে আলফরাসা : উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদতের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। মরিয়ম বিনতে উসমান নামে তাঁর গর্ভে একটি কন্যা জন্ম লাভ করেন।

শাহাদতের সময় তাঁর চার স্ত্রী বর্তমান ছিলেন: রামলা, উম্মুল বানীন, ফাখিতা ও নায়িলা। তবে কেউ কেউ বলেন, অবরুদ্ধ অবস্থায় তিনি উম্মুল বানীনকে তালাক দিয়েছিলেন।[১]

---

[১]. ইবনুল আসীর, ২:৪৫৭।

৮. উসমান -এর সন্তানাদি

উসমান -এর নয়জন পুত্র ও সাতজন কন্যা ছিল। পুত্রদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ছিলেন মহানবী -এর কন্যা রুকাইয়ার সন্তান। আব্দুল্লাহ হিজরতের দু বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা রুকাইয়া উসমান -এর সাথে মদিনায় হিজরতের সময় তাঁকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। হিজরতের পর মদিনায় থাকাকালীন একটা পোষা মোরগ আব্দুল্লাহর চোখে ঠোঁট দিয়ে আঘাত করে। ফলে ছয় বছর বয়সে ৪ হিজরিতে তিনি মারা যান।

পুত্রদের মধ্যে আবান পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বনী উমাইয়া আমলে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। আবান ছিলেন তাঁর নয় পুত্রের মধ্যে অন্যতম। আবানের মাতার নাম উম্মে আমর বিনতে জুনদুব। তিনি (আবান) ছিলেন ফিকহ্ বা ইসলামি আইনশাস্ত্রের বিখ্যাত জ্ঞানী। আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান এর খিলাফতকালে তিনি ৬ বছরের জন্য মদিনার গভর্নর নিযুক্ত হন। আবান অসংখ্য হাদিস তাঁর পিতা উসমান থেকে বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে নিচের হাদিসটি তিনি তার পিতা উসমান থেকে বর্ণনা করেন। "যে ব্যক্তি দিন ও রাতের শুরুতে বলে- 'আল্লাহর নামে' بسم الله আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন, ঐ দিন বা রাতে কোনোকিছুই তাকে ক্ষতি করতে পারবে না।"

এই হাদিসটি তিরমিযি শরীফে বর্ণিত। আবান ছিলেন উসমান -এর সময়ে বিখ্যাত ইসলামি আইন শাস্ত্রবিদ। তিনি ১০৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

উসমান ইবনে আফফান -এর পাঁচ স্ত্রীর সাতজন কন্যা ছিল।[৭] তারা হল- ১) মারইয়াম, তার মা উম্মু আমর বিন্‌তু জুনদুব; (২) উম্মু সাঈদ, তাঁর মা ফাতিমা বিনতুল অলীদ; (৩) আয়িশা, (৪) উম্মু আবান, (৫) উম্মু আমর, এদের মা রমলা; (৬) মারইয়াম, তার মা হলেন নায়িলা; (৭) উম্মুল বানীন, আল-ওয়াকিদী বলেন, ইনি নায়িলার কন্যা;[৮] আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু আবি সুফিয়ানের সাথে তাঁর বিয়ে হয়।[৯]

৯. উসমান -এর ভাই-বোন

হযরত উসমান -এর কোনো আপন ভাই ছিল না। আমিনা বিন্‌তু আফ্‌ফান নামে তাঁর আপন এক বোন ছিল। জাহিলী যুগে তিনি কেশ বিন্যাসকারিণীর

---

[৭]. ইবনুল আসীর, ২:৪৫৭; ইবনু কাসীর, ৭:২১৮।

[৮]. ইবনু সা'দ-এর মতে উম্মুল বানীন, 'উসমান - এর দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন (ইবনু সা'দ, ৩:৫৪)।

[৯]. আত-তাবারী, ৪: ৪২০-২১।

পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি আল-হাকাম ইবনু কায়সানকে বিয়ে করেন। এক যুদ্ধে 'আব্দুল্লাহ ইব্নু জাহাশ, আল-হাকামকে বন্দি করে মদিনায় নিয়ে আসেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে একনিষ্ঠ মুসলিম বনে যান। চতুর্থ হিজরির প্রারম্ভে বী'র-এ-মা'উনার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। আমিনা বিন্তু 'আফ্ফান মুশরিক অবস্থায় মক্কায় থেকে যান। শেষ পর্যন্ত মক্কা বিজয়ের দিন তিনি নিজের মা ও অন্য বোনসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু সুনয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতু উতবার সাথে আমিনাও রাসূল - এর কাছে এ মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করেন যে, তাঁরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবেন না, চুরি করবেন না ও যিনা করবেন না।[১০]

উসমান -এর বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন তিনজন। তারা হলেন: আল-ওয়ালীদ ইব্ন 'উকবা ইবনি আবি মু'আইত। উকবা বদর যুদ্ধের দিন মারা যান। আল-ওয়ালীদ মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন।

উসমান -এর আরেক বৈপিত্রেয় ভাই হলেন ওমর ইব্নু উকবা যিনি দেরিতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তৃতীয় বৈপিত্রেয় ভাইয়ের নাম খালিদ ইব্নু উকবা।

উসমান -এর বৈপিত্রেয় এক বোনের নাম উম্মু কুলছুম বিন্তু উকবা। হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকারী প্রথম মহিলা ছিলেন তিনি। 'উসমান -এর আরো দুই বৈপিত্রেয় বোনের নাম জানা যায়। তাঁরা হলেন উম্মু হাকীম বিন্তু আকবা ও হিন্দ বিন্তু উকবা।[১১]

---

[১০]. ইবনুল আসীর, ২:১০৯।

[১১]. মাহমূদ শাকির, ৩৫৪।

অধ্যায়-২

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মাক্কীজীবন

১. ইসলাম পূর্বযুগে মক্কায় উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সামাজিক মর্যাদা

জাহিলিয়া যুগে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সবার মধ্যে ছিলেন সর্বোত্তম ব্যক্তি। তিনি উচ্চ সামাজিক মর্যাদা, প্রচুর সম্পদ এবং উদার মনের অধিকারী ছিলেন। লোকজন তাঁকে খুবই ভালোবাসাত এবং সম্মান দেখাত। জাহিলিয়া যুগে তিনি কোনোকিছুর পূজা করতেন না। তিনি কখনো কোনো অমানবিক কাজ করেননি, ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তিনি কোনো দিন মদ পান করেননি। তিনি বলতেন, "মদ যুক্তিকে ধ্বংস করে। আল্লাহ মানুষকে যুক্তি দানের ক্ষমতাকে উত্তম বস্তু হিসেবে দিয়েছেন। মানুষ যুক্তি প্রদানের ক্ষমতা দ্বারা নিজেকে মূল্যায়ন করতে পারে। সুতরাং এটা ধ্বংস করা তাদের উচিত নয়।"

জাহিলিয়া যুগে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরবদের বংশানুক্রম বিদ্যায় অনেক পারদর্শী ছিলেন। বংশবৃত্তান্ত বিদ্যা হলো- পারিবারিক ইতিহাস, যেটাতে পূর্বপুরুষদের নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে জানার জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত থাকে। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর প্রবাদ বাক্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি ঐতিহাসিক অনেক ঘটনাই জানতেন। তিনি অনারবদের সাথেও সিরিয়া ও অবিসিনিয়ায় ভ্রমণ করেছেন। সেখানে তিনি তাদের জীবনযাত্রা ও রীতিনীতি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন যা অনেকেই জানত না।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ব্যবসার কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি যতটাই বড় হতে থাকেন ততটাই নিজেকে সফল ব্যবসায়ী হিসেবে তৈরি করেন। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া ব্যবসায়টি তিনি দেখাশোনা করতেন এবং তাঁর সম্পদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কুরাইশ বংশের বনু উমাইয়্যা গোত্রের সামাজিক উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর গোত্রের লোকজন তাঁকে অনেক ভালোবাসত।

২. ব্যবসায়-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ

তাঁর পিতা আফ্‌ফান সততা ও উদারতার জন্য মক্কা নগরীতে, বিশেষকরে বণিক মহলে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। মিশর, সিরিয়া ও কুফায় তাঁর বাণিজ্যিক কারবার ছিল। তবে তাঁর অধিকাংশ কারবারই ছিল সিরিয়ার সঙ্গে। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বাল্যকালেই পিতৃহারা হন। আফ্‌ফান বাণিজ্যিক সফরে থাকাকালীন সিরিয়ায় পরলোক গমন

করেন। তিনি স্বীয় উত্তরাধিকারীদের জন্য প্রচুর ধন-সম্পদ রেখে যান। পিতার মৃত্যুর পর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় পিতৃব্য হাকেমের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন।

বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পিতৃব্যের সহযোগিতায় ব্যবসায়-বাণিজ্যে জড়িত হন এবং ব্যবসায়িক সফরে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত আরম্ভ করেন। এ সুদর্শন তরুণ ব্যবসায়ীর চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব, কমনীয় কান্তি এবং অমায়িক ব্যবহার দেশে ও বিদেশে তাঁর ব্যবসায়ের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

এ সময় মক্কার তরুণ ব্যবসায়ীদের মধ্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ব্যবসায়ের মাধ্যমে তাঁর সাথে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পরিচয় হয়ে ক্রমে তা অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। কেননা, এ দুজন মহাপুরুষের মধ্যে বয়স ও পেশার সামঞ্জস্য ছাড়াও চরিত্র এবং প্রকৃতিগত সাদৃশ্যও ছিল যথেষ্ট। তাঁদের এ বন্ধুত্বই উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। যে কারণে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় বাণিজ্য ত্যাগ করে তিনি নব দীক্ষিত মুসলমানদের বিপদসঙ্কুল ও কন্টকাকীর্ণ পথে এসে দাঁড়ালেন।

৩. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইসলাম গ্রহণ

ইসলামপূর্ব যুগে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ঈমান আনার পর সর্বাত্মকভাবে ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি নিজের বন্ধুমহলে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে থাকেন। আবু বকর তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সাথে সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর কথায় উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং তখনই ইসলাম গ্রহণের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যেতে উদ্যোগী হন। তাঁরা দু'জন যাওয়ার চিন্তা করছিলেন এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই সেখানে উপস্থিত হলেন এবং উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে বললেন : হে উসমান! আল্লাহর জান্নাত গ্রহণ কর। আমি তোমাকে ও সমগ্র সৃষ্টিকুলকে সত্যপথ দেখাতে এসেছি। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন : রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত এ সহজ সত্য কথাগুলোর মধ্যে জানি না কি আকর্ষণ ছিল! আমি আপনা-আপনিই কালেমায়ে শাহাদত পড়তে লাগলাম এবং তাঁর মুবারক হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করলাম।

এভাবেই তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম হন। তিনি আবু বকর, আলী, যায়েদ ইবনে হারেছার পর চতুর্থ ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি হন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'দারুল আরকামে'[১২] প্রবেশের পূর্বে 'উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৩] আবু ইসহাক বলেন, "আবু বকর, 'আলী ও যায়েদ ইবনে হারিছা

---

[১২]. দারুল আরকামের অর্থ- আল- আরকামের বাড়ি। মাক্কী জীবনের শুরুতে যখন গোপনে দাওয়াতী কাজ চলছিল তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবি আল-আরকাম ইবন আবিল আরকামের বাড়িকে দাওয়াতী কাজের কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

-এর পর (পুরুষদের মাঝে) প্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি হলেন উসমান ।"[১৪]

এক বর্ণনামতে, সিরিয়া থেকে ফেরার পথে বিস্ময়কর এক ঘটনা ঘটে যা তাঁকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। নতুন দীনে দীক্ষিত হওয়ার পর উসমান বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! অতি সম্প্রতি আমি সিরিয়া থেকে ঘুরে এলাম। ফেরার পথে মু'আন ও যারকা'র মাঝামাঝি এক স্থানে আমরা বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। হঠাৎ এক আহ্বানকারীর আওয়াজ শুনতে পেলাম, 'দ্রুত যাও; মক্কায় আহমাদ আবির্ভূত হয়েছেন।' তারপর আমরা মক্কায় এসে আপনার (নবুওয়াতের) কথা শুনলাম।'[১৫]

৪. আবিসিনিয়া হিজরত

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মহানবী -এর সঙ্গীদের অনেক দুঃখ-কষ্ট এবং যন্ত্রণার শিকার হতে হয় এমনকি বিখ্যাত মুসলিম ব্যক্তিরাও এ কষ্ট-যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাননি। মক্কায় ইসলামের দৈনন্দিন উন্নতিতে কুরাইশ মুশরিকদের ক্রোধের আগুন উত্তরোত্তর তীব্রতর হচ্ছিল। উসমান কে নিজের বংশগত মর্যাদা ও সম্ভ্রম সত্ত্বেও অন্যান্য নির্যাতিত মুসলমানদের ন্যায় যুলুম-নিষ্পেষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে হলো। তাঁর চাচা তাঁকে বেঁধে মারপিট করল। ইসলাম গ্রহণের ফলে উসমান কেও তাঁর চাচা আল হাকাম ইবনে আবি আস ইবনে উমাইয়্যার হাতে নির্যাতন ও যন্ত্রণাভোগের শিকার হতে হয়। তাঁর চাচা তাকে বেঁধে রেখে বলল-

"তুমি কি নতুন একটা ধর্মের কারণে তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে চাও? তুমি নতুন এ ধর্ম ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়ব না।" উসমান বলল- "আল্লাহ যদি চান, আমি কখনও এটি ত্যাগ করব না।"

যখন তাঁর চাচা তাঁর এ ধর্মের প্রতি অটল বিশ্বাস দেখতে পেল, সে তখন বাধ্য হয়ে তাকে ছেড়ে দিল। ধীরে ধীরে তাঁর ওপর যুলুম এত বেড়ে যেতে লাগল যে, তাঁর সহ্যের বাঁধ ভেঙে গেল। দিনে দিনে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার বেড়েই চলছিল। ইসলাম গ্রহণের কারণে ইয়াসির এবং তাঁর স্ত্রী সুমাইয়াকে হত্যা করা হলো। মহানবী গভীরভাবে চিন্তিত হলেন যে, মুসলমানরা কোথায় যাবে? তখনই তিনি আবিসিনিয়া সম্পর্কে ভাবলেন। আবিসিনিয়া হলো ইথিওপিয়ার পূর্ব নাম। নবীজী গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন যে, আবিসিনিয়ায় যে বাদশাহ

---

[১৩]. ইবনুল আসীর, ২:৪৫৭; আত-তাবারী, ৪:৪১৯।

[১৪]. ইব্‌ন হিশাম, আস্‌-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ (দারু ইহয়াইত তুরাছ ১৯৯৭), ১:২৮৭-২৮৯।

[১৫]. ইব্‌ন সা'দ, ৩:৫৫।

শাসন করছেন তিনি ধর্মপরায়ণ। সুতরাং তিনি মুসলমানদের অত্যাচার করবেন না বরং তাদেরকে সে সাহায্য করবেন। মুসলমানরা হিজরতের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। মহানবী ﷺ তাঁদেরকে মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে যেতে দেখে খুব কষ্ট পেলেন। অবশেষে রাসূল ﷺ-এর ইঙ্গিতে তিনি স্ত্রী রুকাইয়া (রা.)-এর খাতিরে দেশ ও দেশবাসীকে ত্যাগকারী এটিই প্রথম কাফেলা। অন্য বর্ণনায় এসেছে–

হিজরতের পর রাসূল ﷺ তাঁদের অবস্থা কিছুই জানতে পারলেন না। তাই তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। একদিন জনৈক মহিলা তাঁদের দুজনকে দেখেছেন বলে খবর পাঠালেন। তাঁদের সম্পর্কে এতটুকু জানার পর রাসূলে করীম ﷺ বললেন:

إِنَّ عُثْمَانَ أَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ بِأَهْلِهِ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ.

অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম উসমানই সস্ত্রীক হিজরত করলেন।

উসমান (রা.) আবিসিনিয়ায় কয়েক বছর অবস্থান করলেন। অতঃপর কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণের ভুল খবর পেয়ে অপর কতিপয় সাহাবা যখন মক্কায় ফিরে আসলেন তখন উসমান (রা.)-ও তাঁদের সঙ্গে ফিরে এলেন। তবে এখানে এসে খবরটি মিথ্যা জানতে পেরে অনেক সাহাবা পুনর্বার আবিসিনিয়ায় চলে গেলেন কিন্তু উসমান (রা.) আর গেলেন না।

আবিসিনিয়ার তৎকালীন রাজপ্রাসাদগুলোর মধ্যে একটির ধ্বংসাবশেষ

উসমান ও রুকাইয়া -এর হাবশার এ নির্বাসিত জীবন খুব সুখের ছিল না। কেননা হাবশা দরিদ্র দেশ। উসমান সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যে সুবিধা করতে পারেননি। নতুন জায়গার আবহাওয়ায় রুকাইয়া -এর স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটে। আর্থিক অভাব-অনটনও তাঁদের লেগে থাকত। ইতোমধ্যে একদিন তাঁরা সংবাদ পেলেন, খাদীজাতুল কোবরা ইন্তেকাল করেছেন। মাতার ইন্তেকালের সংবাদে রুকাইয়া শোকে ও দুঃখে মূহ্যমান হয়ে পড়েন। এ সংবাদে উসমান -ও কম শোকাহত হননি।

উসমান এই হিজরত থেকে অনেক উপকৃত হয়েছিলেন। তিনি অনেক অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা অর্জন করেছিলেন, যা তাঁর পরবর্তী জীবনে তাঁকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছিল। তিনি শিক্ষাগ্রহণ করলেন যে, বিশ্বাসীদের অটল বিশ্বাসের চিহ্ন হলো তাতে অনেক নির্যাতন ও যন্ত্রণা থাকবে। উম্মতের প্রতি মহানবী -এর যে কতটা সমবেদনা তা থেকেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করলেন।

উসমান মহানবী -এর আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ থেকে শিখলেন যে, নেতাদের পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়-স্বজন সর্বদা ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকবে। তারা সর্বদা সম্মুখে অবস্থান করবে। তাই যখন উসমান খলিফা হলেন, তাঁর আত্মীয়-স্বজন সেনাবাহিনীর সম্মুখভাগে ছিল।

অধ্যায়-৩

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মাদানী জীবন

১. মদিনায় হিজরত

ইত্যবসরে মদিনায় হিজরতের পরিবেশ সৃষ্টি হলো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবাকে মদিনায় হিজরত করার ইঙ্গিত দিলেন। এসময় উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও নিজের পরিবার-পরিজনসহ মদিনায় চলে গেলেন। তিনি সেখানে আওস ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মেহমান হলেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ও আওস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব কায়েম করে দিলেন। এ ভ্রাতৃত্ব উভয় পরিবারকে এত বেশি প্রেমপ্রীতি ও একাত্মতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইন্তেকালে হাসসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সারা জীবন শোক করেন এবং তাঁর জন্য অত্যন্ত করুণ মর্সিয়া লেখেন।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বছর মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন সে বছর উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বয়স ৪৭ বছর ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স তখন ৫৩ বছর।

রিয়াজুল জান্নাতে অবস্থিত হযরত উসমান রা.-এর নামে চিহ্নিত খুঁটি

২. মদিনায় ভ্রাতৃ বন্ধনে আবদ্ধ উসমান রাঃ

মদিনায় হিজরতের পর রাসূল ﷺ আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন। উসমান রাঃ-এর সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল বানু নাজ্জার-এর আওস সাবিত রাঃ-এর সাথে। ইনি ছিলেন রাসূল ﷺ- এর কবি হাস্‌সান ইবনু সাবিত রাঃ- এর ভাই।[১৬]

৩. মদিনায় বাড়ি নির্মাণ

রাসূল ﷺ মুহাজির সাহাবিদের জন্য জমি বরাদ্দ দিয়েছিলেন। উসমান রাঃ-এর অনুকূলেও জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়। বরাদ্দকৃত জমিতে তিনি বাড়ি নির্মাণ করেন। মসজিদ-ই-নববীর বাবুন নাবী-এর বিপরীতে উসমান রাঃ-এর বাড়ির একটি ছোট দরজা ছিল। রাসূল ﷺ উসমান রাঃ-এর বাড়িতে গেলে এ দরজা দিয়ে বের হতেন।[১৭]

৪. মদিনায় রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উসমান

মক্কায় মুসলমান হওয়ার পর উসমান মহানবী ﷺ-এর কাছাকাছি অবস্থান করতেন। হিজরত করার পর মদিনাতেও তিনি রাসূল ﷺ-এর খুবই নিকটে অবস্থান করতেন। উসমান রাঃ জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা গ্রহণে রাসূল ﷺ হতে শিক্ষা নিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং সেখান থেকে আল্লাহর সর্বোত্তম আদর্শের শিক্ষা লাভ করেন। উসমান রাঃ নিজেকে রাসূল ﷺ-এর জ্ঞানের শিক্ষায় তলিয়ে দেন। তিনি যুদ্ধ এবং শান্তি উভয় সময়েই রাসূল ﷺ-এর পাশাপাশি অবস্থান করতেন। উসমান ছিলেন ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি। তিনি কোনো উপদেশ, মতামত কিংবা সম্পদের ক্ষেত্রে অস্বীকার করতেন না। বদর যুদ্ধ ছাড়া তিনি সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাতেই উপস্থিত ছিলেন।

একবার রাসূলে আকরাম ﷺ-এর গৃহে চারদিন যাবৎ অনাহার চলছিল, দুর্বলতায় রাসূল ﷺ এবং তাঁর পরিবারের সকলের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। উসমান রাঃ এ সংবাদ পেয়ে কয়েক বস্তা আটা, কয়েক সের ঘি, কয়েক বস্তা খোরমা খেজুর, পূর্ণ একটি বকরির গোশ্‌ত এবং তিন শত মুদ্রা পাঠিয়ে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে পাঠালেন যে, "এ সমস্ত খাদ্য প্রস্তুত করতে বিলম্ব হবে, আমি পাকান খাদ্যসামগ্রীও পাঠাচ্ছে।" বস্তুত এর পর তিনি প্রচুর রুটি এবং ভুনা গোশত পাঠিয়ে দিলেন। এ সময়ও রাসূল ﷺ তাঁর জন্য

---

[১৬]. ইবনু সা'দ, ৩:৫৫-৬।

[১৭]. প্রাগুক্ত, ৩: ৫৫।

পূর্বের মতোই দোয়া করলেন। সময় সময় তিনি ইসলামের ও রাসূল ﷺ-এর এ ধরনের বহু খেদমত করেছেন।

সুদীর্ঘ একটি সময় তিনি ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজও করেছেন। এটা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ খেদমত– যার জন্য কুরআন পাকে বহু প্রশংসাও এসেছে। ওহী লিপিবদ্ধ করা ছাড়াও উসমান রাসূল ﷺ-এর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রও লিখতেন।

৫. বদর যুদ্ধে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু

যখন মুসলমানরা বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হলো, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী মহানবী ﷺ-এর কন্যা রুকাইয়া হাম রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তিনি (রুকাইয়া) বিছানায় আচ্ছন্ন ছিলেন যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ মুসলমানদেরকে কুরাইশদের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আসা মালামাল আটক করার নির্দেশ দেন। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে রুকাইয়ার পাশে থেকে তার সেবা করার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু তার রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। অবশেষে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর পিতার পথে তাকিয়ে থাকলেন, যখন তিনি বদরের যুদ্ধে গিয়েছিলেন।

রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। মুহাম্মদ ﷺ বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তাঁর কন্যা রুকাইয়ার মৃত্যুর সংবাদ পেলেন, তিনি জান্নাতুল বাকীতে তাঁর কন্যার কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তার ভুলত্রুটির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমার দোয়া করলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেন, তোমাকে বদরে অংশগ্রহণকারী সাহাবিদের মর্যাদায় অংশীদার করা হলো। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর স্ত্রী মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্যা রুকাইয়ার অসুস্থতার কারণে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।

তাসত্ত্বেও আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ তাঁকে বদরের যুদ্ধের গনিমতের মালের অংশ প্রদান করেন। এভাবে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন বদরী সাহাবি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাছাড়া তিনি কেবল স্ত্রীর সেবার জন্যই মদিনায় থেকে যাননি; বরং মুসলমানদের মহান সেনাপতি রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে মদিনা নগরীর দায়িত্বে ন্যস্ত ছিলেন।

৬. উহুদের যুদ্ধে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু

হিজরি তৃতীয় সনের শাওয়াল মাসে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে প্রথম দিকে মুসলিম মুজাহিদগণ প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করে। কিন্তু পশ্চাৎদিক রক্ষাকারী তীরন্দাজগণ নিজেদের স্থান ত্যাগ করে গনিমতের মাল সংগ্রহে ব্যাপৃত হলে কাফিররা এই সাময়িক ভ্রান্তিকে কাজে

লাগায়। তারা পেছন থেকে অকস্মাৎ হামলা করে বসে। মুসলমানরা গাফেল হয়ে পড়েছিল। তারা এ আকস্মিক হামলা রুখতে সক্ষম হয়নি। তারা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। ইত্যবসরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাহাদত লাভের খবর ছড়িয়ে পড়ে। এ গুজবটি সাহাবাগণের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া অবশিষ্ট সবাই স্ব স্ব স্থানে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুও এই মুষ্টিমেয় দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

উহুদ যুদ্ধে সাহাবাগণের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া একটি আকস্মিক ব্যাপার ছিল। মুসলিম তীরন্দাজগণের ভুলের কারণে এটি সংঘটিত হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও সবাই এজন্য অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত ছিলেন। বিশেষকরে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত বেদনাহত হয়েছিলেন; কিন্তু ঘটনাক্রমে এ ভুলটি ঘটে গিয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে সাধারণ ক্ষমার সুসংবাদ দান করলেন:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"আর তোমাদের মধ্যে যারা যুদ্ধের সময় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে আসলে শয়তান তাদের কোনো কার্যের প্রতিদানে তাদেরকে পদস্খলিত করেছে। আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল।" (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৫)

৭. গাতফান যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিনিধি উসমান

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৪০০ সাহাবি নিয়ে গাতফান গোত্রের উদ্দেশ্যে বের হন। তাঁর সাথে কয়েকটি ঘোড়া ছিল। এ সময় তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রতিনিধি হিসেবে মদিনায় রেখে যান।[১৮] যুল কুস্‌সা নামক এলাকায় মুসলিমরা গাতফানের এক লোককে আটক করলেন। লোকটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- কে বললেন, আপনি তাদের কাউকে পাবেন না। আপনার অগ্রযাত্রার খবর পেয়ে তারা পাহাড়ের শীর্ষদেশ পাড়ি দিয়ে পালিয়েছে। আমি আপনার সাথে যাচ্ছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। লোকটি ইসলাম গ্রহণ করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। এগারো দিন পর বাহিনী মদিনায় ফিরে এল।[১৯]

---

[১৮]. ইব্‌নু সা'দ, ২:৫৭।

[১৯]. ইব্‌নু সা'দ, ২: ৩৪-৩৫।

৮. যাতুর রিকা যুদ্ধে রাসূল ﷺ-এর প্রতিনিধি উসমান

হিজরি চতুর্থ সনে রাসূল ﷺ খবর পেলেন যে, গাতফান ও আনমার-এর একটি দল মদিনা আক্রমণে এগিয়ে আসছে। রাসূল ﷺ চারশ যোদ্ধা নিয়ে মদিনা হতে বের হলেন। এবারও তিনি প্রতিনিধি হিসেবে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মদিনায় রেখে গেলেন। মুসলিম বাহিনী গাতফানের এক বিরাট বাহিনীর মুখোমুখি হন। এ যুদ্ধের প্রাক্কালে দু'দলই একে অপরের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে। ফলে কোনো সম্মুখ যুদ্ধ হয়নি। রাসূল ﷺ এ যুদ্ধে সালাতুল খাওফ বা ভয়কালীন সালাত আদায় করেন। তিনি পনেরো দিন মদিনার বাইরে ছিলেন।[২০]

৯. খন্দক যুদ্ধে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু

পঞ্চম হিজরিতে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এসব যুদ্ধে শরিক ছিলেন।

১০. তাবুক অভিযানে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সম্পদ

নবম হিজরিতে রোমান শাসক হিরাক্লিয়াস আরব ভূখণ্ডের দিকে অভিযানের উদ্দেশ্যে মনোনিবেশ করে। সে আরব ভূখণ্ডে আক্রমণ করতে চেয়েছিল এবং তা তার সাম্রাজ্যের অধীন করে শাসন করতে চেয়েছিল। যখন আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ তার এই গোপন ষড়যন্ত্রের বিষয়টি জানতে পারলেন, তিনি তাঁর সাহাবিদেরকে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম বা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে বললেন।

আরবে তখন ছিল একদিকে গ্রীষ্মের প্রখর তাপ বা খরা অন্যদিকে চলছিল চরম দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভোগ। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ সাহাবিদেরকে নগদ অর্থ সম্পদ দান করার ব্যাপারে জোরালো আহ্বান জানান, প্রত্যেকে তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ দান করেছিলেন। মহিলারা তাদের অলংকার রাসূল ﷺ-এর হাতে সমর্পণ করেন এবং তিনি এগুলো সৈন্যদের যাবতীয় অস্ত্র সংরক্ষণে ব্যয় করেন। যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল ﷺ-এর এ আহ্বান শুনলেন; তিনি তাবুক অভিযানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল সৈনিকের ব্যয়ভার গ্রহণ করলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাবুক অভিযানে সৈনিকদের জন্য একহাজার পশু সরবরাহ করেন যার মধ্যে নয়শত চল্লিশটি উট এবং ষাটটি ঘোড়া ছিল। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করার লক্ষ্যে পূর্বে মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট দশ হাজার দিনার প্রদান করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দানের টাকা হাতে নিয়ে মুহাম্মদ ﷺ বলেন, এই

---

[২০]. সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতি যাতির রিকা', ২: ৩৭০-৭১; ইবনুল আসীর, ২:৫৬-৭।

সকল সম্পত্তি দানের পরও উসমানকে কোনো প্রকার সমস্যায় পড়তে হবে না। সে এর প্রতিদান অবশ্যই পাবে।

১১. রুমাহ কূপ

মদিনায় আগমনের পর মুহাজিরগণের পানি-কষ্ট দেখা দিল। শহরে একমাত্র রুমা কূপের পানি পানোপযোগী ছিল। কিন্তু জনৈক ইহুদি ছিল এ কূপটির মালিক এবং এটিকে সে নিজের উপার্জনের মাধ্যমে পরিণত করেছিল। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এ বিপদ থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য কূপটি নিজে ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিতে চাইলেন। বহু চেষ্টায় ইহুদি কূপের অর্ধেক স্বত্ব বিক্রয় করতে সম্মত হলো। উসমান বারো হাজার দিরহামে অর্ধেক কূপ ক্রয় করলেন। উভয়ের মধ্যে চুক্তি হলো যে, একদিন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কূপটি ব্যবহার করবেন এবং অন্যদিন তা ইহুদির দখলে থাকবে। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পালার দিন মুসলমানরা কূপ থেকে দুদিনের প্রয়োজনমতো পানি তুলে রাখত। কিছুদিনের মধ্যে ইহুদি দেখল এই কূপ থেকে তার লাভবান হবার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে; তখন সে অবশিষ্ট অর্ধেক স্বত্বও বিক্রয় করতে প্রস্তুত হলো। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আট হাজার দিরহামে ঐ অর্ধস্বত্ব ক্রয় করে কূপটি পুরোপুরি মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দিলেন। এভাবে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুই সর্বপ্রথম মুসলমানদের পানি কষ্ট দূর করার জন্য পানির কূপ ওয়াক্ফ করলেন। আল্লাহ অবশ্যই তাঁকে এর প্রতিদান দেবেন।

হযরত উসমান রা. মুসলমানদের জন্য যে কূপটি কিনেছিলেন

১২. মসজিদে নববী সম্প্রসারণে

মদিনায় রাসূল ﷺ কর্তৃক মসজিদে নববী নির্মাণের পর মুসলমানরা দিনে পাঁচবার সেখানে নামায আদায়ের জন্য সমবেত হতেন। সাহাবিরা সেখানে রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় উপদেশ শুনতেন। সেখানে মুহাম্মদ ﷺ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে আদেশ, নিষেধ প্রদান করতেন। তারা ইসলাম প্রচারে বেরিয়ে পড়েন। দাওয়াত দানের কাজ শেষ করে তারা সেখানেই ফিরে আসেন। এ কাজগুলো সম্পাদন করার জন্য মসজিদটি ছিল খুবই ছোট যেখানে সবার জায়গা হতো না। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ তাঁর কয়েকজন সাহাবিকে মসজিদের পাশের জমিটি ক্রয় করে এটিকে সম্প্রসারণ করতে বলেছেন, যাতে সেখানে সবার পর্যাপ্ত জায়গা হয়। রাসূল ﷺ বললেন, যে ব্যক্তিই এ জমি খণ্ড খরিদ করে আমার মসজিদের সাথে শামিল করে দিবে, সে নির্ঘাত জান্নাত লাভ করবে। উসমান (রা.) বিশ অথবা পঁচিশ হাজার দিরহাম মূল্যে জমিটি খরিদ করে পবিত্র মসজিদে নববীর সাথে শামিল করে দেন।

১৩. উসমান (রা.) এবং বাইয়্যাতে রিদওয়ান

৬২৮ খ্রিস্টাব্দে ষষ্ঠ হিজরির শেষের দিকে মুহাম্মদ ﷺ প্রায় ১৪০০ সাহাবি নিয়ে মক্কায় হজ করার সিদ্ধান্ত নেন। ষষ্ঠ হিজরির সময় মুসলিম ও কাফেরদের সাথে যুদ্ধের সম্ভাবনায় কাফেররা মুসলমানদেরকে প্রকাশ্যে মক্কায় প্রবেশে বাধা দেয়। অন্যদিকে মুহাম্মদ ﷺ কোনো প্রকার সংঘর্ষ এড়াতে তিনি জিলকদ মাসে মক্কায় পৌঁছার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। জিলকদ হলো ঐ চার মাসের একটি যাতে কোনো প্রকার সংঘাত-সংঘর্ষ নিষিদ্ধ। মুহাম্মদ ﷺ ১৪০০ সাহাবি নিয়ে মদিনা থেকে মক্কার উদ্দেশে ইহরাম বেঁধে বের হন। মহানবী ﷺ-এর আগমনের খবর পেয়ে মক্কাবাসী তাদেরকে বাধা দেওয়ার জন্য সৈন্য প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে ২০০ অশ্বারোহী মহানবী এবং তাঁর পথরুদ্ধ করার জন্য মক্কাবাসী প্রেরণ করে। প্রায় ১০০০ শক্তিশালী অস্ত্র নিয়ে মক্কায় চারপাশে অবস্থান নেয়। মহানবী ﷺ যুদ্ধে অবতীর্ণ না হওয়ার জন্য মক্কায় প্রবেশ না করার সিদ্ধান্ত নেন।

তিনি মনেপ্রাণে চাইলেন ওমরা সম্পূর্ণ করার এবং মক্কা থেকে ১ দিনের পথ দূরে বীরে উসফানের নিকট অবস্থান করলেন। রাসূল ﷺ হুদায়বিয়া নামক স্থানে অবতরণ করলেন এবং পরবর্তী কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার জন্য সাহাবিদের নির্দেশ দেন। ইতোমধ্যে মুসলমানদের সাথে মক্কার প্রধান বা গোত্রপ্রধানদের সাথে সমঝোতার জন্য উভয় দলের মাঝে বিভিন্ন দূত প্রেরণের মধ্যমে আলাপচারিতা শুরু হওয়ার পর মুহাম্মদ ﷺ চূড়ান্তভাবে মক্কায় গোত্রপ্রতিদের

নিকট প্রভাবশালী ব্যক্তি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কূটনীতিক হিসেবে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, হে উসমান, মক্কার কুরাইশদের নিকট যাও। এবং বল আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি; বরং আমরা আল্লাহর ইবাদত করতে এসেছি। আমরা এ ঘরের পবিত্রতাকে সম্মান করি।

মসজিদে নববী

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আলোচনার জন্য বেরিয়ে পড়লেন এবং তিনি মক্কার নিকটে বালাদাহ নামক স্থানে গিয়ে পৌছলেন। সেখানে তিনি মক্কার কুরাইশ নেতাদের পেলেন। তিনি তাদের বললেন, আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমাদের নিকট ইসলামের সুমহান আদর্শ গ্রহণ করার দাওয়াত নিয়ে প্রেরণ করেছেন। তারা বলল: তুমি যা বলছ এগুলো পূর্বেও আমরা শুনেছি, কিন্তু এটা গ্রহণ করা যাবে না। তারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খুব ভালোভাবে গ্রহণ করে। তারা এরসাথে এই বলেও অনুতপ্ত হয় যে, তারা মুসলমানদের হুদায়বিয়া থেকে মক্কায় আগমন করতে দেবে না। তারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ব্যক্তিগতভাবে একাকী কাবাঘর তাওয়াফ করার জন্য আহ্বান করে। কিন্তু উসমান এটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়া আমি এ ঘর তাওয়াফ করতে পারি না।

উসমান রাঃ মক্কায় পৌছানোর কিছুক্ষণ পরেই হুদায়বিয়ার মুসলিম শিবিরে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

অতঃপর প্রিয়নবী মুহাম্মদ ﷺ প্রতারক মক্কাবাসী কর্তৃক মুসলমানদের শিবিরে আক্রমণের আশঙ্কা করেন। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ একটি বাবলা গাছের নিচে বসলেন। তারপর প্রত্যেক সাহাবি রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। সাহাবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম আবু সিন্না রাসূলের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট প্রত্যেক সাহাবি অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে কাফেরদের সাথে আমৃত্যু সংগ্রাম করার শপথ গ্রহণ করেন। আবু সিনান এর শপথ গ্রহণ করার পর অবশিষ্ট সাহাবিরা রাসূল ﷺ-এর হাতে শপথ গ্রহণ করেছিলেন। সালমাহ ইবনে আল আকওয়া প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রুপের শপথ কার্যক্রম সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়ে তিনি তিনবার শপথ গ্রহণ করেন। আল সাদ ইবনে কায়েস ব্যতীত সকল সাহাবি মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। আল জাদ ইবনে কায়েস ছিল একজন মুনাফিক। সে তার উটের পেছনে লুকাতে চেয়েছিল, তাসত্ত্বেও সে ধরা পড়ে গেল। ইসলামের ইতিহাসে এ শপথ বাইয়্যাতে রিদওয়ান নামে পরিচিত।

আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ বলেন, আমি উসমানের পক্ষে শপথ গ্রহণ করলাম এই বলে তিনি তাঁর বাম হাত উসমানের পক্ষে তাঁর ডান হাত শক্তভাবে রাখলেন এবং শপথ নিলেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আল ফাতহের ১৮ নং আয়াত নাযিলের পর থেকে বাবলা গাছের নিচের এই শপথ বাইয়্যাতে রিদওয়ান নামে পরিচিত। যার মানে হলো এ শপথটি আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ভালোভাবে গ্রহণ করেছিলেন অথবা এটি আল্লাহর নিকট উত্তম শপথ হিসেবে গ্রহণীয় হয়েছিল।

বাবলা গাছের নিচে রাসূল ﷺ-এর হাতে শপথ গ্রহণকারী সাহাবির সংখ্যা ছিল ১৪০০। পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতহের ১০ আয়াতে শপথ গ্রহণকারী এসব সাহাবিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা পৃথিবীতে সর্বোত্তম ব্যক্তি। এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, স্বয়ং মুহাম্মদ ﷺ এখানে উসমান রাঃ কে সহযোগিতার জন্য শপথ করেছিলেন।
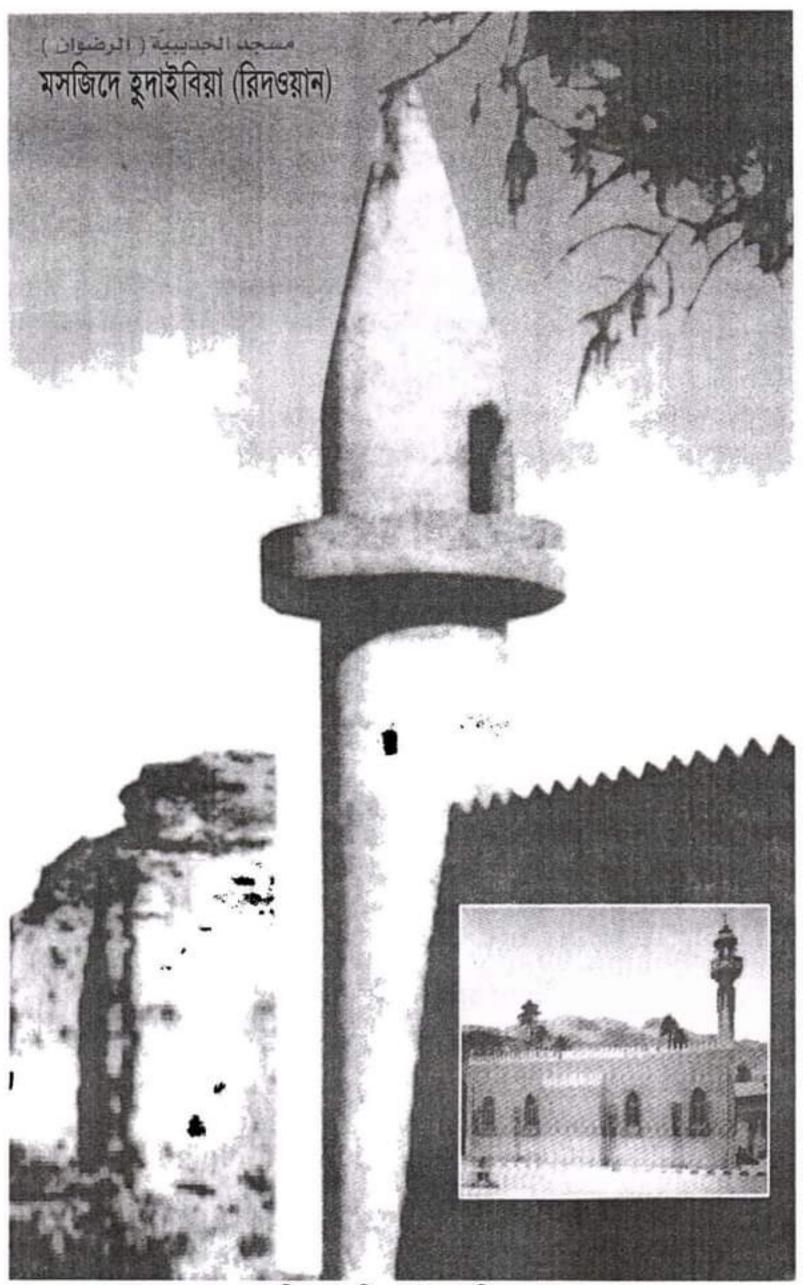
মসজিদে হুদায়বিয়া (বাইয়্যাতে রিদওয়ান)

১৪. মক্কা বিজয়ের দিন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর সুপারিশ গ্রহণ

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন; তবে চারজন ব্যক্তিকে এই সাধারণ ক্ষমার আওতার বাইরে রেখে বলেছিলেন: এদেরকে হত্যা করো যদিও এরা কা'বা-এর পর্দার সাথে ঝুলে থাকে: ইকরামা ইবনু আবি জাহল, আব্দুল্লাহ ইবনু খাতাল, মিকইয়াস ইবনু সাবাবাহ ও আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনি আবি সার্‌হ।[২১]

'আব্দুল্লাহ ইবনু খাতালকে কা'বাঘরের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাকে দেখে সা'ঈদ ইবনু হারিস ও আম্মার ইবনু ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু ছুটে গেলেন। সা'ঈদ যিনি কিনা তরুণ ছিলেন- আম্মারকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে দিয়ে আল্লাহর দুশমনের শিরশ্ছেদ করলেন।

'ইকরামাহ ছুটে গেল জিদ্দা পানে। সেখানে সে একটি নৌকায় ওঠল। হঠাৎ সাগরে প্রবল ঝড় ওঠল। নৌকারোহীরা বলল, তোমরা তোমাদের দীনকে একনিষ্ঠ কর। কারণ তোমাদের খোদাগুলো এই বিপদে কোনো কাজে আসবে না। একথা শুনে ইকরামাহ মনে মনে বলল, ইলাহরা যদি আমাকে জলের বিপদ হতে উদ্ধার করতে না পারে তারা স্থলের বিপদ হতেও উদ্ধার করতে পারবে না। হে আল্লাহ, আপনার সাথে আমি এই চুক্তিতে আবদ্ধ হলাম যে, আপনি যদি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তাহলে আমি মুহাম্মদের কাছে গিয়ে তাঁর হাতে হাত রাখব। বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ইকরামা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

অপরদিকে আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সার্‌হ উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর কাছে এসে আত্মগোপন করল। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- যখন জনসমষ্টির বায়আত নিচ্ছিলেন তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে নিয়ে হাযির হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর মর্যাদার খাতিরে তাকে ক্ষমা করে দেন।[২২]

১৫. বিদায় হজে রাসূল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গী

দশম হিজরিতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ হজ সম্পাদন করেন। এটি বিদায় হজ নামে পরিচিত। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও এই হজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী ছিলেন।

---

[২১]. সাবির আবু সুলায়মান, আদওয়াউল বায়ান ফী তারীখিল কুরআন, ৭৯-৮০।

[২২]. প্রাগুক্ত।

অধ্যায়-৪

আবু বকর ও ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর খিলাফতকালে উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর অবদান

আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর খিলাফতকালে উসমান

রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাতের পর সাকীফায়ে বনী সায়েদায় আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর হাতে খিলাফতের বায়আত অনুষ্ঠিত হলো। আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর খিলাফতকালে উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি খিলাফত পরিচালনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)কে সহযোগিতা করেন।

১. মসলিসে শূরার সদস্য

আবু বকর সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর খিলাফত আমলে উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) মজলিসে শূরার একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দু'সহযোগীর একজন। কঠোরতা ও দৃঢ়তার প্রতীক ছিলেন ওমর ইবনুল খাত্তাব আর নম্রতার প্রতীক ছিলেন উসমান ইবনু আফ্‌ফান। আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর আমলে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)কে যদি ইসলামি খিলাফতের উযির গণ্য করা হয় তাহলে উসমান ছিলেন এই ব্যবস্থার মুখ্য সচিব। তাঁর মতামতকে প্রথম খলিফা যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন। রিদ্দার যুদ্ধের সমাপ্তির পর আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মনস্থির করলেন। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর নানা প্রান্তে ইসলামি বাহিনী প্রেরণের আগ্রহও পোষণ করলেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবিদের পরামর্শ নিলেন। উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বললেন, "আমি তো আপনাকে এই দীনের অনুসারীদের স্নেহময় কল্যাণকামী বলেই জানি। সর্বসাধারণের কল্যাণে আপনি কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে তা বাস্তবায়নে সংকল্পবদ্ধ থাকুন: কারণ আপনি অবিশ্বাসযোগ্য নন।"[২৩]

'উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)-এর এই বক্তব্য শুনে তালহা, যুবাইর, সা'দ, আবু উবাইদা, সা'ইদ ইবনু যায়িদ (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) ও উপস্থিত অন্যান্য আনসার ও মুহাজিরগণ বললেন, উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) সত্য বলেছেন। আপনি সিদ্ধান্তে অটল থাকুন।[২৪]

---

[২৩]. ইবনু আসাকির, তারিখু দিমাশক (দামেশ্‌ক: আল-মাজলিসুল ইলমী ১৯৮৪), ২:৬৩-৬৫।

[২৪]. আস-সাল্লাবী, আবু বকর সিদ্দিক, ৩৬৪।

২. আবু বকর -এর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন

ইতঃপূর্বে আমরা দেখিছি বিভিন্ন সময় রাসূল মদিনার বাইরে গেলে উসমান কে স্থলাভিষিক্ত করতেন। আবু বকর -এর আমলেও উসমান অনুরূপ দায়িত্ব পালন করেছেন। হিজরি দ্বাদশ সনে আবু বকর আমিরুল হজ হিসেবে মক্কা গমন করেন। ঐ সময় খলিফার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মদিনায় উসমান দায়িত্ব পালন করেন।[২৫]

৩. আবু বকর -এর সচিব

আবু বকর -এর সচিব বা কাতিব ছিলেন উসমান ।[২৬] কাতিব হওয়ার জন্য লিখতে ও পড়তে পারার যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল। জাহিলী ও ইসলামের প্রাথমিক যুগে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ছিল খুব কম। কারণ আরবরা ছিল বাগ্মী জাতি, তারা স্মরণশক্তির ওপর ভরসা করত, তারা মনে করত যাদের স্মরণশক্তি কম তারাই কেবল লিখে রাখে। সেই যুগে হাতেগোনা যে ক'জন মানুষ লেখাপড়া জানত উসমান ছিলেন তাঁদের একজন। তাছাড়া উসমান অত্যন্ত বিশ্বস্ত হওয়ায় আবু বকর তাঁর ওপর কাতিবের দায়িত্ব অর্পণ করেন। খলিফার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন ফরমান লিখে প্রদেশসমূহে প্রেরণ করতেন।

সোয়া দুবছর খিলাফতের দায়িত্ব পালনের পর আবু বকর সিদ্দিক ইন্তেকাল করলেন। আবু বকর -এর অসিয়ত ও সাধারণ মুসলমানদের নির্বাচন অনুযায়ী ওমর ফারূক খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য অসিয়তনামা লেখার মধ্যেই পরবর্তী খলিফার নাম লেখার আগেই আবু বকর বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। উসমান নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী সঠিক অনুমান করেই ওমর -এর নাম লিখেছিলেন। হুঁশ ফিরে এলে আবু বকর বললেন : কি লিখেছ পড়। তিনি পড়তে লাগলেন। যখন ওমর -এর নাম পড়লেন, আবু বকর স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠলেন এবং উসমান -এর জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার প্রশংসা করলেন।

৪. আবু বকর -এর খিলাফতকালে উসমান -এর বদান্যতা

আবু বকর -এর খিলাফতকালে একদা সেখানে অনাবৃষ্টি দেখা দিল। সেখানে সামান্যতম তো দূরে থাক কোনো রকম বৃষ্টিই ছিল না। এটা বেশি পূর্বের কথা নয়, উসমান -এর কর্মচারী সিরিয়া থেকে উসমান -এর জন্য খাদ্যদ্রব্য

---

[২৫]. ইবনু সা'দ, ৩:১৮৭।

[২৬]. প্রাগুক্ত, ৩:১৪।

বোঝাই একশত উট নিয়ে আসল। লোকজন উসমান -এর বাড়ির সামনে জড়ো হতে শুরু করল এবং তাঁর ঘরের দরজায় করাঘাত করল। যখন উসমান তাদের সামনে বেরিয়ে আসলেন তারা তাঁকে বলল; এখানে কম বৃষ্টি হয়, জমিনে কোনো রকম খাদ্যশস্য উৎপাদন করা যাচ্ছে না। লোকজন অত্যন্ত কষ্টে তাদের দিনাতিপাত করছে। সুতরাং আপনার খাদ্যদ্রব্যগুলো আমাদেরকে দিন যা আমরা গরিব অসহায় মানুষকে দান করব, তাঁরা উসমান কে ভালো মূল্য দেওয়ার প্রস্তাব দেন। উসমান বলেন, আমার নিকট আরো ভালো প্রস্তাব রয়েছে। ধনীরা বলল : মদিনায় আপনার চেয়ে বড় ধনী আর কেউ নেই। কে আপনাকে আরো ভালো প্রস্তাব দেবে? উসমান বলেন, আল্লাহ আমাকে সবচেয়ে বড় বা উত্তম প্রস্তাব প্রদান করেন। আর তা হলো প্রত্যেক দিরহামের জন্য আমাকে দশগুণ করে প্রদান করবেন। তোমরা কি আমাকে এর চেয়ে বেশি প্রদান করবে? এরপর উসমান তাঁর সমস্ত খাদ্যশস্য মুসলিম দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করে দেন। এটিই হলো উসমান -এর দয়া এবং উদারতার অন্যতম একটি উদাহরণ।

ওমর -এর খিলাফতকালে উসমান

ওমর উসমান কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। যখন লোকেরা ওমর কে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন, তিনি বিষয়টি সম্পর্কে পুরোপুরি জানতে উসমান ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ -এর নিকট যেতেন। ওমর খিলাফতকালে উসমান -এর মতামতকে একটি উপদেশ হিসেবে গ্রহণ করা হতো।

১. উমরের কঠোরতায় উসমান ছিলেন কোমলতার সাথি

ওমর -এর খিলাফতকালে উসমান -এর স্থান ছিল খলিফার কাছে উযিরের ন্যায়। অথবা এভাবেও বলা যায়, আবু বকর -এর খিলাফতকালে ওমর যে মর্যাদায় আসীন ছিলেন ওমর -এর খিলাফতকালে উসমান ও সেই মর্যাদায় অভিষিক্ত ছিলেন। অন্য কথায় বলা যায়, আবু বকর -এর খিলাফতকালে ওমর যে ভূমিকা পালন করেছেন ওমর -এর খিলাফতকালে উসমান সেই ভূমিকাই পালন করেছেন। আবু বকর সাধারণভাবে প্রজাসাধারণের প্রতি এবং বিশেষভাবে মুসলিমদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র ছিলেন। আবার সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ওমর ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ আবু বকর -এর দয়ার সাথে ওমর - এর কঠোরতার মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। এই দুয়ের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সত্য ও ন্যায়ের শাসন।

দয়া ও কোমলতায় উসমান, আবু বকর-এর অনুরূপ ছিলেন অন্যদিকে ওমর ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের পথে কঠোর ও নিরাপোষ। আবু বকর-এর পর ওমর যখন খলিফা হলেন তখন আবু বকর-এর দয়ার বিপরীতে উসমান-এর দয়া ও কোমলতাকে আল্লাহ্ তা'আলা ওমর-এর সাথি করে দিলেন। এই দুয়ের সংমিশ্রণে সর্বাধিক প্রাজ্ঞ ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো।

২. খারাজী ভূমি সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান

বিজিত অঞ্চলের ভূমি বিজয়ী সৈনিকদের মাঝে বণ্টন না করে সাধারণ মুসলিম ও তাদের বংশধরদের জন্য রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ওমর। উসমান, ওমর-এর এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন।[২৭]

৩. উম্মুল মু'মিনীনদের সাথে উসমান-এর হজ আদায়

হিজরি ২৩ সনে ওমর, রাসূল- এর স্ত্রীগণকে হজ করার অনুমতি দেন। এ সফরে তাঁদের সাথে উসমান ও আবদুর রহমান ইবনু আউফ কে প্রেরণ করা হয়। নবীপত্নিগণ হাওদায় আরোহণ করে হাজযাত্রা করেছিলেন। তাঁদের সওয়ারীগুলোর সামনে ছিলেন উসমান আর পেছনে ছিলেন আবদুর রহমান ইবনু আউফ। এ দুই বিশিষ্ট সাহাবি তাঁদের সাথে থাকায় কেউ তাঁদের কাছে ঘেঁষতে পারেনি।[২৮]

৪. উসমান-এর পরামর্শে দিওয়ান প্রতিষ্ঠা

ওমর-এর আমলে বিজয়াধিক্যের কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রচুর সম্পদ জমা হয়। এই সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য ওমর একদল সাহাবিকে ডাকলেন। এ বিষয়ে উসমানের পরামর্শ ছিল, "আমি প্রভূত সম্পদ দেখতে পাচ্ছি যা মানুষের জন্য পর্যাপ্ত। কার কাছ থেকে সম্পদ নেওয়া হলো আর কাকে দেওয়া হলো তার সঠিক পরিসংখ্যান রাখা না হলে পুরো ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়বে বলে আমি আশঙ্কা করছি।" ওমর, উসমান-এর পরামর্শ গ্রহণ করে সম্পদের সঠিক হিসাব রাখার জন্য দিওয়ান প্রতিষ্ঠা করলেন।[২৯]

---

[২৭]. আস-সিয়াসাতুল মালিয়্যা লি উসমান, ২৫।

[২৮]. ইবনু সা'দ, ৩:১৩৪।

[২৯]. আল-বালাযূরী, ৪৪৯।

৫. ইসলামি বর্ষপঞ্জি প্রবর্তনে অবদান

যারা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে মহররম মাস থেকে ইসলামি বর্ষপঞ্জি আরম্ভ করার পরামর্শ দেন তাদের মধ্যে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন। এটা প্রমাণিত যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের বছর থেকে আরবি বা ইসলামি বর্ষপঞ্জি গণনা করা শুরু হয়। এটা এই কারণেই হয়েছিল যে, হিজরত-ই মূলত সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করে। কোন মাস দিয়ে ইসলামি বছর গণনা শুরু করা হবে, এটা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর যুক্তি উপস্থাপন করেন এভাবে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মাসে জন্মগ্রহণ করেছে কারণ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। তাছাড়া লোকেরা এই মাস থেকে গণনা করত এবং এ মাসেই তারা হজ থেকে ফিরে আসত। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উপস্থিত সবাই উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন, এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এভাবে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সকলের জন্য ইসলামি বর্ষপঞ্জির প্রথম মাস নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অবদান রাখেন।

অধ্যায়-৫

তৃতীয় খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

১. উসমান -এর খিলাফতের ব্যাপারে ওমর -এর নির্দেশনা

ওমর ইবনে খাত্তাব মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধতা এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত ছিলেন। এমনকি খলিফা ওমর -এর খেলাফতের শেষ মুহূর্তে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের এক নজিরবিহীন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে খিলাফতের উত্তরাধিকার নির্দিষ্ট করে রাখেননি। মৃত্যু পূর্ববর্তী কালে আবু বকর বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ সাহাবিদের পরামর্শক্রমে ওমর কে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করে যান। ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি যে, খলিফা ওমর তাঁর সময়কার পরিস্থিতি বিবেচনা করে খলিফা নির্বাচনে একটি ভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। নতুন খলিফা নির্বাচনের ক্ষমতা জনগণের মধ্য হতে নির্বাচিত শূরা সদস্যদের হাতে সীমাবদ্ধ থাকবে। ওমর আল্লাহর রাসূল -এর সাহাবিদের মধ্য হতে ছয়জনকে পরবর্তী খলিফা করতে মনোনীত করেন।

তাঁরা হলেন- তালহা, যুবাইর, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, উসমান, আলী এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ, ওমর এটিও সুস্পষ্ট করেছিলেন যে, কীভাবে এখান থেকে খলিফা নির্বাচন করা হবে এবং কতক্ষণ নির্বাচনকালীন সময় চলবে। ওমর একদল সৈন্যকে একটি ঘড়ি নিতে বললেন এবং তাদের আচরণ এবং কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখতে বললেন। ওমর তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকদের দেখাশুনা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে ওমর -এর পুত্র আব্দুল্লাহকে তাদের মধ্যে থেকে পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি শূরা সদস্যদের প্রত্যেককে তাঁর বাড়িতে মিলিত হয়ে একে অপরের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেন। ওমর রা, সোয়াইব আর রুমী কে নির্বাচনকালীন নামাযে ইমাম নিযুক্ত করেন। তিনি মনোনীত ছয় ব্যক্তিকে খলিফা নির্বাচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত নামাযে ইমামতি করতে বারণ করেন, কারণ ইমাম হচ্ছে ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদবি। ইমাম শুধু নামাযের সময়ই নেতৃত্ব দেওয়া নয়; বরং তিনি একটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীরও নেতা।

ওমর তাঁদের বলেছিলেন যদি তিন জনে একজনকে নির্বাচিত করার জন্য সমর্থন দেয়" এবং অন্য তিনজন অন্যজনকে সমর্থন দেয়, তাহলে এক্ষেত্রে

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সিদ্ধান্ত দেবে। তিনি তাদের দুই গ্রুপের নির্বাচিতদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচিত করবেন।

যদি তারা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে তাহলে তিনি উভয় দলকে নিয়ে আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট যাবেন। তিনি আবদুর রহমান ইবনে আওফের সাথে পরামর্শ করে একজন ধার্মিক এবং খোদাভীরু ব্যক্তিকে নির্বাচিত করবেন। তিনি আরো বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ কেমন ধার্মিক এবং খোদাভীরু জান? তিনি আল্লাহর অভিভাবকত্বে আছেন এবং আল্লাহ যাকে সবসময় সহযোগিতা করেন।

২. আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্বাচনকালীন শূরা কাউন্সিল

নির্বাচনকালীন পরিষদ যখন একটি মিটিং এ মিলিত হন তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দাফন সম্পন্ন হলো। আবদুর রহমান ইবনে আওফ এবং পরিষদের অন্য সদস্যরা মদিনার বিখ্যাত ব্যক্তি এবং যারা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দাফনকার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মদিনায় আসেন তাদের সাথে পরামর্শ করেন।

সাধারণত অধিকাংশ ব্যক্তির নিকট আলী অথবা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অধিক জনপ্রিয় ছিলেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর বয়স এবং অভিজ্ঞতার জন্য ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে পছন্দ করেন। উসমানের বয়স আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বয়সের চেয়ে ২৫ বছর বেশি ছিল। আবদুর রহমান ইবনে আওফ উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলিফা হিসেবে চূড়ান্ত করলে কেউ তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেননি। আলী ইবনে আবি তালিব সর্বপ্রথম আবদুর রহমান ইবনে আওফের সিদ্ধান্তের আলোকে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শপথ গ্রহণ করেন। এভাবে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সকল সাহাবির ঐকমত্যের ভিত্তিতে ইসলামের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন।

৩. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আনুগত্যের শপথ

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণের দিন ফজর নামাযের ইমামতি করেন সুহাইব আর রুমী। ঐদিন ছিল ২৩ হিজরি যিলহজ মাসের শেষদিন ৬ নভেম্বর, ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ। নামাযের পর আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ব্যবহৃত মোজা তার হাতে পরিধান করে বের হন। নির্বাচনকালীন পরিষদের সকল সদস্য মসজিদের মিম্বরে সমবেত হলেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ উপস্থিত আনসার এবং সেনাবাহিনীর নিকট সংবাদটি প্রেরণ করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সিরিয়ার গভর্নর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু, উমায়ের ইবনে সাদ তিনিও ছিলেন সিরিয়ার গভর্নর। এবং মিশরের গভর্নর আমর ইবনে আস। তাঁরা ওমর

-এর সাথে মক্কায় হজ করার জন্য গিয়েছিলেন এবং মদিনায় ফিরে এসেছেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ উসমানের ওপর তার আনুগত্যের বিষয়টি ঘোষণা করলেন। এরপর লোকজন উসমান -এর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। যাদের মধ্যে ছিলেন আনসার , মুহাজির এবং মুসলিম সেনাপ্রধানগণ।

৪. খলিফা হওয়ার জন্য সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন উসমান

উসমান ইসলামি খিলাফতের তৃতীয় খলিফা হওয়ার জন্য সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কোনো ব্যক্তিই তাঁর খলিফা হওয়ার বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেননি। সুতরাং এভাবে তিনি খলিফার জন্য গ্রহণীয় হয়ে ওঠেন। ওমর -এর ইন্তেকালের পর সকল মুসলমান উসমান ইবনে আফফান -এর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। এভাবে উসমান শাহাদত বরণ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সকল মানুষকে সত্যের পথে পরিচালিত করতেন এবং ন্যায়নিষ্ঠ বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তী যুগের আহলুস সুন্নাহ-এর অনুসারিগণ এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, ওমর -এর পর খিলাফত লাভে উসমান অগ্রগণ্য ছিলেন। এ ব্যাপারে কেউ মতভেদ বা বিরোধিতা করেননি, বরং সবাই বিষয়টি মেনে নিয়েছেন; কারণ তাঁরা জানতেন আবু বকর ও ওমর -এর পর এই উম্মতের শ্রেষ্ঠজন ছিলেন উসমান । ওমর -এর পর খিলাফত লাভে উসমান -এর অগ্রগণ্যতার বিষয়ে ইজমা সম্পাদনের বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ অনেক রিওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন।

ইবনু আবি শাইবা নিরবচ্ছিন্ন সনদে হারিসা ইবনু মাদরাব থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ওমর -এর খিলাফতকালে হজ করেছি। আমি দেখেছি লোকজন ওমর -এর পর উসমান -এর খলিফা হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ পোষণ করত না।[৩০]

হাফিয আয-যাহাবী, শুরাইক ইবনু আবদিল্লাহ আল-কাযী হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল এর মৃত্যুর পর জনগণ আবু বকর কে খলিফা নির্বাচন করলেন। তারা যদি জানত তাঁদের মধ্যে আবু বকর -এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ আছে তাহলে তারা এটি মেনে নিত না। তারপর আবু বকর , ওমর কে খলিফা ঘোষণা করলেন। তিনি সত্য-সুন্দর ও আদল-ইনসাফের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করলেন। অতঃপর আহত হয়ে মৃত্যুশয্যায় পতিত হলে তাঁর উত্তরাধিকারীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ছয় সদস্যের নির্বাচক পরিষদ গঠন করলেন। তাঁরা উসমান কে খলিফা নির্বাচন করার ব্যাপারে একমত হলেন।

---

[৩০]. ইবনু আবি শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ১৪:৫৮৮।

তাঁরা যদি জানতেন তাঁদের মাঝে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ আছে তাহলে তাঁরা অবশ্যই প্রবঞ্চনা দিয়েছেন।[৩১]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া বলেন, সমগ্র মুসলিম উম্মাহ উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে বায়আত করেছেন, কেউ পিছিয়ে ছিলেন না.. মর্যাদাবান, সম্ভ্রান্ত ও কর্তৃত্বশালীরা বায়আত করলে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইমাম হন। যদি এমন হত আবদুর রহমান ইবনে আউফ ছাড়া অন্য কেউ তাঁর হাতে বায়আত করেননি, তাহলে তিনি ইমাম হতে পারতেন না। কিন্তু ব্যাপারটি তেমন ছিল না। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছয় সদস্যের নির্বাচক পরিষদ গঠন করে তাদের মধ্য থেকে একজনকে খলিফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করেন আবদুর রহমান ইবনে আওফের ওপর। তালহা, যুবাইর ও সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বেচ্ছায় খিলাফতের দাবি পরিত্যাগ করলে বাকি রইলেন তিনজন: উসমান, আলী ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু। ইবনে আওফ তিনদিন বিনিদ্র রাত কাটান; তিনি শীর্ষস্থানীয় প্রবীণ সাহাবিদের পরামর্শ নিলেন, পরামর্শ করলেন তাঁদের অনুগামীদের সাথে, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সাথেও পরামর্শ করলেন যারা সে বছর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে হজ সমাপনান্তে মদিনায় এসেছিলেন। মুসলিমগণ উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলিফা নির্বাচনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর তাই তাঁরা স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর হাতে বায়আত করলেন। এমন নয় যে, উসমান তাঁদেরকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন কিংবা ভয় দেখিয়েছিলেন। আর এ কারণে পূর্বসূরিদের অনেকে, যেমন- আবূ আইয়ূব সাখতিয়ানী, আহমদ ইবনু হাম্বল ও দারাকুতনীসহ অনেকে বলেন, যে ব্যক্তি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চেয়ে এগিয়ে রাখে সে ব্যক্তি মুহাজির ও আনসার সাহাবিগণকে অপমান-অপদস্থ করে। এ দলিল প্রমাণ করে যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চেয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন: কারণ সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বেচ্ছায় পরামর্শের ভিত্তিতে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু–এর পূর্বে খলিফা নির্বাচন করেছিলেন।[৩২]

৫. খলিফা হিসেবে গভর্নর হিসেবে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চিঠি

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্ধারিত সকল নিয়ম-নীতি ও মূলনীতিসমূহ বহাল রাখেন। এটি সকলের জানা আছে যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম তাঁর বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নরদেরকে চিঠি লেখেন। যেখানে তিনি তার খিলাফত পরিচালনার পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। শুরুতে তিনি সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে

[৩১]. আয-যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল (কায়রো: দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ ১৩৮২ হি.), ২: ২৭৩।

[৩২]. ইবনু তাইমিয়া, মিনহাজুস সুন্নাহ, ১:১৩৪।

কোনো ধরনের পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকেন। যার ফলশ্রুতিতে ইসলামি রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি তাঁর সরকারকে একটি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এই অভিযান সম্পদ সংগ্রহের অভিযান নয়; বরং তাঁর কাজ হচ্ছে সকল নিপীড়িত মানুষের সকল প্রকার দেখাশুনা করা। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর দাপ্তরিক কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন- তারা জনগণের কাছ থেকে যা প্রাপ্য শুধু তাই গ্রহণ করবে আর জনগণের যা প্রাপ্য তা তাদের দিতে বাধ্য থাকবে। এছাড়া উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রথম চিঠিতে মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষায় জোর গুরুত্বারোপ করেন।

৬. রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী মহান আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ আল কুরআন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ। উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন এ দুটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবি, প্রথম খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও দ্বিতীয় খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

৭. শূরা ও পরামর্শ পরিষদ গঠন

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর রাষ্ট্রের প্রয়োজনে একটি পরামর্শ পরিষদ গঠন করেন। তিনি আল্লাহর রাসূলের আনসার ও মুহাজিরদের মধ্য হতে বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ সাহাবিদের নিয়ে একটি শূরা ও পরামর্শ পরিষদ গঠন করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সরকার এবং সেনাপ্রধানকে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেন; সেখানে তিনি বলেন, তাঁরা যেন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর রেখে যাওয়া নিয়মনীতি ও মূলনীতি অনুসরণ করে কোনোরূপ পরিবর্তন না করে। কোনো ব্যাপারে তোমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হলে তা আমাদের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে করতে হবে। উক্ত বিষয়টি নিয়ে আমরা পরামর্শ পরিষদে মিলিত হব এবং এ ব্যাপারে একটি গঠনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সেনাপ্রধান ও প্রধান কর্মকর্তা তাঁর নির্দেশ মেনে চলেন। তারা যদি কোনো রকম সামরিক অভিযান পরিচালনা বা বিজিত অঞ্চলের শাসনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতেন, তাহলে তাঁরা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং পরামর্শ পরিষদের সাথে পরামর্শ করতেন এবং তাদের অনুমতি নিতেন। একদা আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট আফ্রিকায় অভিযান পরিচালনার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। এর কারণ উক্ত ভূখণ্ড রোমকদের অধীনে ছিল যেখানে মুসলমানদের দাওয়াত প্রদানের কোনো সুযোগ ছিল না। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সকলের সাথে পরামর্শ করে তাঁকে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন এবং লোকজনকে সে অভিযানে অংশ নিতে বললেন।

যখন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবি সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু সাইপ্রাস এবং রুদিস দ্বীপে অভিযান পরিচালনার অনুমতি চান সেক্ষেত্রেও তিনি একই পদ্ধতি অনুসরণ করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শূরা কাউন্সিল বা পরামর্শ পরিষদের সাথে মিলিত হয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন, তারপর তার অনুমতি প্রদান করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআন গ্রন্থায়নের ব্যাপারে অভিজ্ঞ এবং বয়স্ক সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন। একইভাবে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সেনাপ্রধান শূরা পরিষদের সাথে পরস্পর পরামর্শ করে যুদ্ধ পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। বিশেষত দৈনন্দিন কাজকর্মে তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, আবদুর রহমান ইবনে আউফ (র.)সহ বিশিষ্ট সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।[৩৩]

৮. বিভিন্ন রাজ্যে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক গভর্নর নিয়োগ

খিলাফতের একবছর কাল কেটে গেল, এক বছর কাল পূর্ববর্তী গভর্নদেরকে স্ব স্ব পদে বহাল রাখার জন্য ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যেই অসিয়ত করেছিলেন, তা শেষ হয়ে গেল। এবার উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সবকিছু নতুন করে ভাবতে বাধ্য হলেন। এবার তাঁকে গভর্নরদের নিয়োগ, বদলি ও অপসারণে নিজের ওপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হলো। যেসব প্রদেশে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক বা সামরিক গুরুত্ব ছিল না, সেসব প্রদেশের প্রতি তিনি তেমন গুরুত্ব প্রদান করেননি। সেসব প্রদেশে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নরগণকেই বহাল রাখলেন। সেকালে যে কয়েকটি প্রদেশের সামরিক, প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেগুলো ঐসব প্রদেশ, যা রোমক সাম্রাজ্য ও পারস্য সাম্রাজ্য হতে মুসলিম শক্তি কর্তৃক বিজিত হয়েছিল।

তথায় স্থানীয় অধিবাসীদেরই প্রাধান্য ছিল। এদিক দিয়ে চারটি প্রদেশই ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ– সিরিয়া, মিশর, বসরা ও কূফা। এ চারটি প্রদেশের প্রত্যেকটিরই সীমান্ত অঞ্চল রক্ষণা-বেক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কেননা, এর প্রত্যেকটির সীমান্তই শত্রু রাজ্যের সাথে মিলিত ছিল। এসব এলাকায় মুসলমানদেরকে সর্বদাই বিশেষ বিব্রত থাকতে হতো। সিরিয়ার সঙ্গেই ছিল রোমান সাম্রাজ্য এবং সমুদ্র উপকূল, মিশরের সাথে মিলিত ছিল উত্তর আফ্রিকা। বসরা ও কূফার সম্মুখে ছিল পারস্যের অনধিকৃত ও অধিকৃত এলাকা। তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যে এ চারটি কেন্দ্রই ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এসব স্থানে মুসলিম সেনাবাহিনীর স্থায়ী সেনানিবাস থাকত, এরা শত্রু রাজ্যের সীমানায় অহরহ টহল দিয়ে বেড়াতেন। এ চারটি প্রদেশ ছিল ইসলামি সাম্রাজ্যের শক্তি এবং সমৃদ্ধিরও

---

[৩৩] ইবনুল আসীর, খ. ২, পৃ. ৩৯।

উৎস। ইসলামি তাহযীব ও তামাদ্দুনের গৌরবময় ঐতিহ্য এ চারটি প্রদেশেই বিশেষভাবে সৃষ্টি হচ্ছিল। রাষ্ট্রের রাজস্বও এ কয়েকটি প্রদেশ হতেই সর্বাপেক্ষা অধিক আমদানি হতো, এ যিম্মী প্রজার সংখ্যা এখানেই ছিল অধিক। সুতরাং জিযিয়া কর সাধারণ রাজস্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এসব প্রদেশের আমদানির পরিমাণ বাড়িয়ে দিত। এ চারটি প্রদেশের স্থায়ী সেনানিবাস হতে মুসলিম মুজাহিদগণ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন দেশ জয় করতেন এবং গনিমত সামগ্রী এসব সামরিক কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত করে পঞ্চমাংশ দারুল খিলাফত মদিনায় পাঠিয়ে দিতেন এবং বাকী চার-পঞ্চমাংশ যথানিয়মে মুজাহিদীনের মধ্যে বণ্টন করা হতো।

সুতরাং গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশগুলোর চেয়ে এ চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

অবশ্য মক্কা, তায়েফ এবং ইয়ামনও এক একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল এবং এ প্রদেশগুলোর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। কিন্তু এ প্রদেশগুলো কোনো শত্রু শক্তির নাগালের মধ্যে ছিল না বলে এগুলোর রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব তুলনামূলক কম ছিল। রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধির জন্য কোনো উপকরণ, সাজ-সরঞ্জাম ও সম্বল এ প্রদেশগুলো হতে আশা করা যেত না। অবশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সমগ্র আরব দেশে ইসলাম বিস্তারের চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন, তখন এ প্রদেশগুলোর গুরুত্ব ও মর্যাদা ছিল অসাধারণ; কিন্তু সমগ্র আরব বিজয়ের পর যখন ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলো এবং ইসলাম দিগ্বিজয়ের পথে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন আর্থিক ও সামরিক গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশগুলো দ্বিতীয় স্থানে এসে দাঁড়াল এবং পূর্বোক্ত চারটি প্রদেশ প্রথম স্থান অধিকার করল। সেই প্রথম শ্রেণির প্রদেশগুলো জয় করার জন্য আরবদেরকে যথেষ্ট তাগ এবং কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। সুতরাং দেখা যায়, যেসব মুসলমান মদিনা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা মক্কা, তায়েফ ও ইয়ামনের দিকে গমন না করে বসরা, কূফা, সিরিয়া ও মিশরের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন। এসব বাস্তুত্যাগীদের মধ্যে যেসব সাধারণ নাগরিক নেককার ও সরলপ্রাণ ছিলেন, তাঁরা বিজিত রাজ্যের সমৃদ্ধির সাথে সাথে দাওয়াত, তাবলীগ, সীমান্ত রক্ষা এবং শিক্ষা বিস্তারে ব্যস্ত থাকতেন। আর যারা শুধু পার্থিব উদ্দেশ্যে বের হতো, তাঁরা সেসব প্রদেশে গিয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য আরম্ভ করত। চাষাবাদ এবং কৃষিকার্যও করত, এভাবে বিভিন্ন শ্রেণির লোকের সমন্বয়ে নতুন মুসলিম সভ্যতা বিকশিত হতে থাকে। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রাদেশিক গভর্নর ও আঞ্চলিক শাসকদের তালিকা প্রদান করা হলো:[৩৪]

---

[৩৪] ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, উসমান ইবনু আফফান (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৩), পৃ. ১৪১-১৫৬।

প্রদেশ/অঞ্চল	গভর্নর/শাসনকর্তা [ওমর -এর আমল]	গভর্নর/শাসনকর্তা [উসমান -এর আমল]
মক্কা	খালিদ ইবনুল আস	'আব্দুল্লাহ আল-হাদরামী
আত-তায়িফ	সুফইয়ান ইবনু আবদিল্লাহ আস-সাকাফী	আল-কাসিম ইবনু রাবী'আ আস-সাকাফী
সান'আ	ইয়া'লা ইবনু মুনাব্বিহ	ইয়া'লা ইবনু মুনাব্বিহ
বসরা	আবূ মূসা আল-আশা'আরী	১. আবূ মূসা আল-আশ'আরী (২৪-৩০ হিজরি) ২. আব্দুল্লাহ ইবনু আমির ইবনু কুরাইয (৩০-৩৫ হিজরি)
কূফা	আল-মুগীরা ইবনু শু'বা	১. সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (২৪-২৫ হিজরি) ২. আল-ওয়ালীদ ইবনু উকবা (২৫-৩০ হিজরি) ৩. সা'ঈদ ইবনুল আস (৩০-৩৪) ৪. আবূ মূসা আল-আশ'আরী (৩৪-৩৫ হিজরি)
মিশর	'আমর ইবনুল আস	১. আমর ইবনুল আস (২৪-২৭ হিজরি) ২. আব্দুল্লাহ্ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সার্‌হ (২৭-৩৫ হিজরি)
আল-বাহরাইন	উসমান ইবনু আবিল আস	'আব্দুল্লাহ ইবনু কায়স আল-ফাযারী
সিরিয়া	মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান	মু'আবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান
হিমস	উমাইর ইবনু সা'দ	'আবদুর রহমান ইবনু খালিদ ইবনিল ওয়ালীদ
জর্দান		আল-আ'ওয়ার ইবনু সুফিয়ান

		(মু'আবিয়ার অধীন)
ফিলিস্তিন		আলকামাহ ইবনু হাকীম (মু'আবিয়ার অধীন)
কিন্নাস্‌রিন		হাবীব ইবনু মাসলামা (মু'আবিয়ার অধীন)
কারকীসিয়া		জারীর ইবনু আবদিল্লাহ
আজারবাইজান		আল-আশ'আস ইবনু কায়স
হালাওয়ান		উতবা ইবনুন নাহাস
হামাযান		আন-নাসীর
ইস্পাহান		আস-সাইব ইবনুল আকরা
মাসাবযান		ঘাবীশ

৯. ন্যায়বিচার এবং সমতা বিধান

ইসলামি আইন বাস্তবায়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো একটি ইসলামি ন্যায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। যার মধ্যদিয়ে একটি সুন্দর মুসলিম সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে। ইসলামি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায়বিচার এবং সমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়। এ বিষয়ে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু জনসাধারণের উদ্দেশ্যে লিখেন এবং বলেন, তোমরা সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজের নিষেধ কর, কোনো বিশ্বাসীর পক্ষে কাউকে অবমাননা করা উচিত হবে না। আমি সর্বদাই দুর্বল ব্যক্তির সাথে থাকব এবং শক্তিশালীর নিকট থেকে তাঁর অধিকার রক্ষা করব যতক্ষণ পর্যন্ত না সে কোনো ধরনের অপরাধের সাথে যুক্ত হয়।

তাঁর শাসনব্যবস্থা ছিল ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ণিত আছে যে, একদা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর একজন কর্মচারীর ওপর রাগান্বিত হলেন এবং তার কান টেনে দিলেন এতে সে ব্যথা পেল। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সে রাতে ঘুমাতে পারলেন না। তখন তিনি তাঁর কর্মচারীকে তাঁর রুমে ডাকলেন এবং তাঁর কান টেনে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে বললেন। কর্মচারীটি প্রথমে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কান টানতে অপারগতা প্রকাশ করেন। কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে প্রতিশোধ গ্রহণে বাধ্য করলেন।[৩৫]

---

[৩৫] হামদ মুহাম্মদ আস সামাদ, নিযামুল হুকুম ফী আহদিল খুলাফাইর রাশিদীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

১০. ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমরের বিচার

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সর্বপ্রথম যেই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা ছিল ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র ওবায়দুল্লাহর বিচার। যেদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আততায়ীর হাতে নিহত হন, সেদিন তাঁর পুত্র ওবায়দুল্লাহ পারস্য হতে আগত হরমূযানকে হত্যা করেছিলেন। মুসলিমশক্তি কর্তৃক পারস্য বিজিত হলে সে মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণপূর্বক বসবাস করতে থাকে। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফজরের নামাযের ইমামত কালে পারসিক শিল্পকর্মী আবু লুলু ফিরোয একখানি বিষাক্ত ছুরি দ্বারা তাঁকে অতর্কিতে আঘাত করে, সেই আঘাতের ফলেই ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুমুখে পতিত হন। আততায়ী আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে, কিন্তু জবানবন্দির পূর্বেই সে আত্মহত্যা করায় সে হত্যাকাণ্ডের কিছু গুরুত্বপূর্ণ রহস্য অনুদ্ঘাটিত থেকে যায়।

বর্ণিত আছে যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যেদিন আহত হন, তার পূর্বদিন সন্ধ্যায় আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বেড়াতে বের হয়ে কোনো এক নির্জন স্থানে হরমূযান, জুফাইনা ও আবু লুলু ফিরোযকে গোপনে পরামর্শ করতে দেখতে পান। তাঁকে দেখে তারা হতচকিতভাবে উঠে দাঁড়ায় এবং তাদের হাত হতে খঞ্জর খসে পড়ে। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকাল হওয়ার সাথে সাথে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ঘটনা শুনে তলোয়ার হাতে বের হয়ে পড়েন এবং হরমূযানকে হত্যা করেন।

নির্বাচনের ঝামেলা হতে অবসর লাভ করে খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ওবায়দুল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ওবায়দুল্লাহ নিজ হাতে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন। উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে একজন মুসলমানকে হত্যা করলে শরীআত অনুযায়ী সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার উপযোগী হয়। ফকীহগণ ফেকাহ শাস্ত্র অনুযায়ী এরূপ অপরাধের একমাত্র বিধান মৃত্যুদণ্ড বলেই মত প্রকাশ করলেন। পক্ষান্তরে, অনেকে এ বলে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধেও মত প্রকাশ করলেন যে, মাত্র সেদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হলেন, আজ আবার তাঁর পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে?

তরুণবয়স্ক ওবায়দুল্লাহ যে, পিতৃবিয়োগ শোকে অত্যন্ত অভিভূত হয়েই এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিলেন তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু খলিফার সম্মুখে এখন দুটি সমস্যা বিদ্যমান, একদিকে হত্যাকাণ্ড, অপরদিকে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শোক সন্তপ্ত পরিবারের মর্মবেদনা।

এ মামলার মীমাংসা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের সাথে সমঝোতায় এসে ওবায়দুল্লাহকে মৃত্যুদণ্ড হতে নিস্কৃতি প্রদান করে নিজের অর্থ দ্বারা খুনের বিধিসম্মত ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেন।[৩৬]

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উদার চরিত্রের সঙ্গে এ বিচারের সামঞ্জস্য খুবই সুস্পষ্ট। একজন কুরাইশ যুবকের বিশেষ করে খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্রের রক্তপাতের দ্বারা তাঁর খিলাফতের সূচনা হউক এটা তিনি চাইতেন না, আবার এ হত্যাকাণ্ডও তিনি উপেক্ষা করে যেতে পারেন না। এ কারণে একদিকে তিনি ওবায়দুল্লাহকে মৃত্যুদণ্ড হতে অব্যাহতি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, অন্যদিকে নিহতের রক্তের দাবি নিজের অর্থ দ্বারা পরিশোধ করেছিলেন। এ মীমাংসায় খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূক্ষ্ম রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়।

১১. সকলের জন্য স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আপামর জনসাধারণের জন্য সকল ধরনের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে। যেমন: ধর্মীয় স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, নিরাপত্তার অধিকার, ব্যক্তির বসতবাড়ির নিরাপত্তা, অর্থ-অর্জন করা বা মালিকানার স্বাধীনতা এবং মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা।

১২. নাগরিকদের ভাতা বৃদ্ধি

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যে সময় খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন মদিনায় খাদ্যাভাব অত্যন্ত প্রকটরূপ ধারণ করায় মদিনাবাসিগণ নিতান্ত কষ্ট ভোগ করছিলেন। মদিনায় সে বছরটি ছিল অজন্মার বছর। মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোরই বেশি কষ্ট হচ্ছিল। খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এটা অনুভব করে করুণায় বিগলিত হলেন। তাঁর খিলাফতের বয়স তখন সবে মাত্র নয়দিন, সেই সময় তিনি এক ফরমান জারি করে রাজধানীর সকল স্বাধীন নাগরিকের ভাতা সমান হারে একশত দিরহাম করে বাড়িয়ে দিলেন। মদিনাবাসী সকলে এতে যারপরনাই খুশি হলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাতা বৃদ্ধির এ নমুনা পরবর্তী খলিফা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুও অনুসরণ করেন।[৩৭]

১৩. মসজিদে নববী সংস্কার

জুমাবারে মসজিদে ব্যাপক লোকসমাগম হওয়ার কারণে লোকজন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মসজিদে নববীকে সংস্কার করার জন্য অনুরোধ জানান। এটা এই কারণে যে, তখন মদিনায় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

---

[৩৬] আত তাবারী, খ. ৪, পৃ. ২৩৯।
[৩৭] ইবন কাসীর, খ. ৭, পৃ. ১৪৮।

উসমান বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ সাহাগণের সাথে পরামর্শ করে মসজিদটি ভেঙে পুনরায় নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। খুব শীঘ্রই এই মসজিদটি ভেঙে ফেলে পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। উসমান নিজে মসজিদের পাশের অবশিষ্ট জমি ক্রয় করে এই মসজিদটির পরিধি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি তাঁর এই অবদানের জন্য সর্বদাই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

মুহাম্মদ -এর সময়কালে কাবাঘরের চারপাশে কোনো ধরনের দেওয়াল বা প্রাচীর ছিল না। সেখানে কেবল একটি সংকীর্ণ চত্বর ছিল যেখানে লোকজন তাদের ইবাদত করত। মসজিদটির পূর্বের অবস্থা আবু বকর -এর খিলাফতকাল পর্যন্ত বহাল ছিল। ওমর -এর খিলাফতকালে তিনি মসজিদটিকে সম্প্রসারিত করেন। তিনি মসজিদের পাশে থাকা কূপগুলো ক্রয় করেন এবং এগুলো ভরাট করে তাকে মসজিদের আঙিনার সাথে সংযুক্ত করেন। এরপর তিনি এর চতুর্পার্শ্বে একটি ছোট সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করেন, যার সাথে তিনি অনেকগুলো বাতি সংযুক্ত করেন এবং সেখানে আলোর ব্যবস্থা করেন।

যাহোক হাজীদের ভিড়ে মসজিদটি দিনে দিনে খুবই পরিপূর্ণ হয়ে পড়ে যারা এখানে হজ পালনের উদ্দেশ্যে আসে। মূলত মক্কা বিজয়ের পর লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে উসমান -এর সময়কালে মুসলমানদের সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পায় যে, এই মসজিদটি তাদের জন্য খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে উসমান আল্লাহর এই পবিত্র গৃহের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এর পাশের জমির সাথে সংযুক্ত করেন। তিনি জমি ক্রয় করেন এবং তার চারপাশে দেওয়াল নির্মাণ করেন, যা সাধারণত একজন মানুষের চেয়ে উচ্চতর।[৩৮] উসমান -এর সরকার বিভিন্ন প্রদেশে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এর ব্যয়ভার প্রাদেশিক কোষাগার থেকে বহন করা হয়।

১৪. সামরিক ব্যবস্থাপনা

ওমর নিজের আমলে যে সামরিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন উসমান তাকে আরো উন্নত করেন। সামরিক বাহিনীর সাথে যুক্ত থাকার কারণে ওমর যাদের যে পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন, উসমান তাতে একশ দিরহাম করে বৃদ্ধি করেন। তিনি সমর বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে আলাদা করেন এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় স্থান পৃথক ও স্বতন্ত্র সামরিক অফিসারের অধীন করেন। এ আমলের সামরিক ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ চিত্র অনুধাবন করার জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সিরিয়া সীমান্তে গ্রিকদের সাথে মোকাবিলা করার জন্য আমির মুআবিয়া -এর সৈন্য সাহায্যের প্রয়োজন হলে ইরান ও আর্মেনিয়ার

---

[৩৮] ইবনু আসীর, পৃ. ৩৮২।

সেনাবাহিনী অতিদ্রুত যুদ্ধস্থলে পৌছে যায়। অনুরূপভাবে তারাবিলাসে বিদ্রোহ দমন করার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে সারাহর যখন সামরিক শক্তির প্রয়োজন হলো, তখন সিরিয়া ও ইরাকের সেনাবাহিনী যথাসময়ে তাঁর সাহায্যে উপস্থিত হলো। মিশরীয় সেনাদল আফ্রিকা বিজয়ে ব্যর্থ হলে মদিনা থেকে সাহায্য পাঠানো হলো। এ সেনাদলের সেনাপতি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি এ যুদ্ধে সফলতা অর্জন করেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলে যেসব স্থান সামরিক কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হয়েছিল উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলে সেগুলো ছাড়াও তারাবিলাস, সাইপ্রাস, তাবারিস্তান ও আর্মেনিয়ায় সামরিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং বিভিন্ন জিলায় সামরিক ছাউনি নির্মাণ করা হয়। এসব ছাউনিতে সবসময় কিছু কিছু সৈন্য মোতায়েন থাকত।

ঘোড়া ও উট পালনের জন্য সারা দেশে বিস্তৃত এলাকাব্যাপী বড় বড় চারণক্ষেত্র তৈরি করা হয়। রাজধানী মদিনার আশেপাশেও অসংখ্য চারণক্ষেত্র ছিল। মদিনা থেকে চার মনজিল দূরে 'রাবযাহ' নামক স্থানে সবচেয়ে বড় চারণক্ষেত্র ছিল। এটি দশ মাইল লম্বা ও দশ মাইল চওড়া ছিল। মদিনার ২০ মাইল দূরে 'নাকী' নামক স্থানে আর একটি চারণক্ষেত্র ছিল। অনুরূপভাবে 'যারবাহ' নামক স্থানে একটি চারণক্ষেত্র ছিল। এটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান ছয় মাইল বিস্তৃত ছিল। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলে উট ও ঘোড়ার সংখ্যা বেড়ে গেলে এ চারণক্ষেত্রগুলোকে আগের চাইতে বড় করা হয় এবং প্রত্যেক চারণক্ষেত্রের কাছে কূপ খনন করা হয়। 'যারবাহ' চারণক্ষেত্রে বনী সাবী বাহর কাছ থেকে একটি কূপ ক্রয় করে চারণক্ষেত্রের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। এ ছাড়াও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে উদ্যোগী হয়ে সেখানে আরো একটি কূপ খনন করান এবং চারণক্ষেত্রের কর্মচারীদের জন্য গৃহাদিও নির্মাণ করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলে উট ও ঘোড়ার সংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, একমাত্র যারবাহর চারণক্ষেত্রে ৪০ হাজার উট পালিত হতো।

সে যুগে উপর্যুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের পাশাপাশি আরেকটি অস্ত্রের প্রয়োগ দেখা গেছে এটির নাম মিনজানিক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ অভিযানে মিনজানিক ব্যবহার করেছিলেন। এর মাধ্যমে দূর হতে দুর্গে পাথর ছোঁড়া যায়। দাব্বাবাহ নাম আরেকটি অস্ত্রের প্রচলন ছিল সেকালে। ট্যাংক জাতীয় এই যানে চড়ে যোদ্ধারা শত্রুর দুর্গের কাছাকাছি পৌছে আক্রমণ শানাতে পারতেন। চারদিক আবৃত থাকায় শত্রুর আঘাত সরাসরি যোদ্ধাদের গায়ে লাগত না। দাব্‌র নামে আরেকটি সাঁজোয়া যান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবহার করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এটিও অনেকটা দাব্বাবাহ-এর মতো।[৩৭] উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগেও এই যুদ্ধাস্ত্রসমূহ (মিনজানিক, দাব্বাবাহ ও দাব্‌র) ব্যবহৃত হয়েছিল। বিশেষত, মধ্য এশিয়ার বিজয়াভিযানে ব্যাপকহারে মিনজানিক ব্যবহারের বর্ণনা পাওয়া গেছে।

---

[৩৭] হাসান ইবরাহীম হাসান, প্রাগুক্ত, ৩৯০।

১৫. নৌবহর সৃষ্টি

ইসলামে নৌযুদ্ধ ও নৌবহরের বিশেষ ব্যবস্থাপনা উসমান -এর আমল থেকে শুরু হয়। ইতঃপূর্বে একে একটি ভয়াবহ কাজ মনে করা হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কিত ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। কেবল এতটুকু জানা যায় যে, আমির মুআবিয়া এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করলে উসমান একটি নৌবহর তৈরি করার নির্দেশ দেন। তবে তিনি শর্তারোপ করেন যে, যেন কাউকে জোরপূর্বক নৌবহরে অংশগ্রহণ করানো না হয়।[৪০] আব্দুল্লাহ ইবনে কাশেম হারেসী -কে নৌ-সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। তবে অত্যন্ত নির্ভরতার সাথে একথা বলা যেতে পারে যে, মুসলমানদের নৌশক্তি তৎকালে অত্যধিক সুদৃঢ় হয়, যার ফলে অতি সহজেই সাইপ্রাস বিজিত হয় এবং পাঁচশ যুদ্ধ জাহাজ সমন্বয়ে গঠিত রোমানদের বিরাট নৌবহর ইসলামি নৌবহরের কাছে চরম পরাজয় বরণ করে। অতঃপর পরবর্তীকালে পারস্য কোনোদিন ইসলামি দেশগুলোর উপকূল সীমান্তের দিকে অগ্রসর হবার সাহস করেনি।

উসমান -এর খিলাফতকালে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠার ব্যয়ভার বহন এবং গুরুত্বের সাথে এর দেখাশুনা করতেন।

২৬ হিজরি বা ৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় লোকেরা উসমান -এর নিকট সুহাইবা-এর নৌবন্দরটি জেদ্দায় স্থানান্তর করতে অনুরোধ করেন। জাহিলিয়াতের সময়ে এটি মূলত মক্কারই একটি অংশ ছিল। উসমান সুহাইবা বন্দরটি পরিদর্শনে গেলেন এবং তিনি সেখানে কর্মরতদের নির্দেশ দিলেন এই বন্দর যেন জেদ্দায় স্থানান্তর করা হয়।

১৬. বসরার গভর্নরের পদচ্যুতি

আবূ মূসা আশ'আরী ওমর -এর আমল থেকেই বসরার গভর্নর পদে নিযুক্ত ছিলেন। উসমান ও নিজের শাসনামলে ছয় বছর পর্যন্ত তাকে এ পদে বহাল রাখেন। কিন্তু এখানকার একটি বড় দল হামেশা আবূ মূসা আশআরী -এর বিরোধিতা করে আসছিল। ওমর -এর আমলে বারবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছিল; কিন্তু ওমর -এর ব্যক্তিত্ব ও প্রতাপ বিরোধীদেরকে কোণঠাসা করে রেখেছিল। উসমান -এর আমলে তারা আবূ মূসা আশআরী -এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অবাধ সুযোগ লাভ করল। ইত্যবসরে কুর্দীরা বিদ্রোহ করল। আবূ মূসা মসজিদে জিহাদ সম্পর্কে বক্তৃতা করলেন এবং পদব্রজে পথ চলার মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। ফলে যেসব মুজাহিদের কাছে ঘোড়া

[৪০] হাসান ইবরাহীম হাসান, প্রাগুক্ত, ৩৯৩।

ছিল তাদের অনেকেই পদব্রজে চলতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু কতিপয় লোক বলল: আমাদের তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়; বরং আমাদের গভর্নর কীভাবে চলেন তা দেখে তবে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। প্রত্যুষে গভর্নর ভবনের সামনে মুজাহিদদের ভিড় জমে উঠল। আবূ মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বের হলেন। তিনি একটি তুর্কি ঘোড়ায় সওয়ার ছিলেন এবং চল্লিশটি খচ্চরের পিঠে তাঁর আসবাবপত্র সাজানো ছিল। লোকেরা তাঁর ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল। তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে এই বৈপরীত্যের কারণ জানতে চাইল। তারা জিজ্ঞেস করল: অন্যকে আপনি একটি কাজ করতে বলেন অথচ নিজে তা করেন না কেন? আবূ মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কোনো সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ একটি দল তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে মদিনায় পৌঁছল এবং তাঁকে পদচ্যুত করার দাবি জানাল। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ২৯ হিজরিতে তাঁকে পদচ্যুত করলেন এবং তদস্থলে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে গভর্নর নিযুক্ত করলেন।[৪১]

১৭. ইসলামের প্রচার-প্রসার

ইসলামের খিদমত ও তার প্রচার-প্রসারের যথাযথ ব্যবস্থা করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরাধিকারীর প্রধানতম দায়িত্ব, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সবসময় এ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকতেন। জিহাদে যেসব বন্দি গ্রেফতার হয়ে আসত তাদের সম্মুখে তিনি নিজেই ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন, ইসলামের গুণাবলি বর্ণনা করতেন। একবার অনেক রোমান মহিলা গ্রেফতার হলো। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে তাদেরকে আনা হলে তিনি তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। ইসলামের সুমহান আদর্শে প্রভাবিত হয়ে দুজন মহিলা ঘটনাস্থলে কালেমায়ে তাওহীদ পড়ে মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

বিজাতির কাছে ইসলাম প্রচারের পর মুসলমানদেরকে ইসলামি শিক্ষা ও চরিত্রে সুসজ্জিত করাই ছিল সবচেয়ে বড় কাজ। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই ফিকহর মাসায়েল বর্ণনা করতেন এবং লোকদেরকে ফিকাহ শিক্ষা দিতেন। একবার তিনি ওযু করে লোকদেরকে দেখিয়ে বললেন : আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে ওযু করতে দেখেছি। যে বিষয়ে সন্দেহ হতো এবং নিজে কোনো যথার্থ রায় দিতে পারতেন না, সে ব্যাপারে অন্যান্য সাহাবাকে জিজ্ঞেস করতেন এবং জনগণকেও তাঁদের কাছ থেকে জেনে নিতে বলতেন। একবার হজ সফরের মধ্যে এক ব্যক্তি পাখির গোশ্‌ত পেশ করল। এ পাখি শিকার করা হয়েছিল। খেতে বসে ইহরাম অবস্থায় শিকার করা গোশ্‌ত খাওয়া যায় কিনা এ ব্যাপারে তাঁর মনে সন্দেহ জাগলো।

[৪১] আত তাবারী, খ. ৪, পৃ. ২৬৬।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও সহযাত্রী ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি নাজায়েয হবার ফতোয়া দিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তৎক্ষণাৎ হাত গুটিয়ে নিলেন।

১৮. খলিফা হয়েও সরকারি কোষাগার থেকে বেতন নেননি

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বায়তুল মাল বা সরকারি কোষাগার থেকে কোনোকিছুই গ্রহণ করতেন না। তিনি কুরাইশদের মধ্যে অন্যতম ধনী ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ব্যয়ভার তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি থেকে বহন করতেন।

১৯. সরকারি কোষাগার থেকে সরকারি কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বেতনভাতা প্রদান

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত আমলে ইসলামি রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। খলিফা কর্তৃক সরকারিভাবে প্রত্যেক প্রদেশে প্রশাসক হিসেবে একজন গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছিলো। প্রত্যেক গভর্নর সরকারি কোষাগার বায়তুল মাল থেকে তাদের বেতনভাতা গ্রহণ করতেন এবং তারা তাদের প্রদেশকে ইসলামি শরীআতের নিয়ম-নীতির আলোকে পরিচালনা করতেন। প্রদেশের অর্থ আয়ের হিসাব-নিকাশ পর্যবেক্ষণ করা গভর্নরের অন্যতম কাজ। এ অর্থ আসত জিযিয়া, খারাজ ও উশর থেকে। গভর্নর কর্তৃক এই সকল উৎস থেকে আদায়কৃত অর্থ প্রদেশের বিভিন্ন কাজে ব্যয় করা হতো। উদ্বৃত্ত অর্থ মদিনায় মুসলিম রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বা কেন্দ্রীয় কোষাগারে পাঠানো হতো। আর যাকাত (সম্পদ পরিচ্ছন্নকারী অর্থ) যা বিত্তবানদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয় এবং নির্ধারিত দরিদ্রদের মাঝে তা বিতরণ করা হয়। অর্থসংগ্রহের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনভাতা সরকারি কোষাগার থেকে প্রদান করা হতো।

২০. রাষ্ট্রীয় চারণভূমি সংরক্ষণ

খুলাফা রাশিদুনের আমলে যাকাতের গবাদিপশু ও যুদ্ধের অশ্ব বিচরণের জন্য চারণভূমি সংরক্ষণ করা হতো। রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি অংশ এই খাতে ব্যয় করতে হতো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকী উপত্যকার চারণভূমিটি রাষ্ট্রীয় অশ্বের জন্য সংরক্ষণ করেছিলেন।[৪২] আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলেও এই চারণভূমিটি সংরক্ষিত ছিল। মদিনার ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে এটির সীমানা শুরু; আর এটি আশি কিলোমিটার দীর্ঘ। আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর আমলে এটি চারণভূমি হিসেবে সংরক্ষিত ছিল। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলে যাকাতের পশু এবং জিহাদের

[৪২]. আল-আলবানী, সাহীহ সুনানি আবি দাউদ, ২:৫৯৫।

অশ্বের সংখ্যা বৃদ্ধিতে চারণভূমির সংখ্যা ও আয়তন বেড়ে যায়; এগুলোর মধ্যে একটি ছিল রাবাযার চারণভূমি; হানী নামে এক গোলাম এর দেখভাল করতেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেছিলেন, গরিবদের গবাদিপশু রাষ্ট্রীয় চারণভূমিতে বিচরণ করতে পারবে; তবে ধনীদের জন্তু-জানোয়ার যেন তথায় বিচরণ না করে। বনু সা'লাবা'র এলাকায় তিনি আরেকটি চারণভূমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্থানীয়রা বিরোধিতা করলে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই বলে জবাব দিয়েছিলেন যে, "ভূমি মাত্রই আল্লাহর! আল্লাহর সম্পদের জন্য তা সংরক্ষণ করা যাবে।"[৪৩] চারণভূমি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু পূর্বসূরি দু'খলিফার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। তাঁর আমলে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা বর্ধিত হওয়ায় জনসংখ্যা বেড়ে যায়; যাকাত ও সাদাকাহ খাতে সংগৃহীত পশুর সংখ্যাও বেড়ে যায়। ফলে অধিক সংখ্যক চারণভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই তিনি পূর্বোক্ত চারণভূমিগুলোর পাশাপাশি আরো চারণভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

২১. রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মুয়াজ্জিনের বেতনভাতা প্রদান

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মুয়াজ্জিনের বেতনভাতা প্রদান করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে এই বেতন প্রদান করতেন মসজিদে আযান প্রদান করার বিনিময়ে। এর ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বায়তুল মাল তাদের অর্থব্যয়ের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এর মাধ্যমে প্রশাসনে নতুন একটি ব্যয়সংক্রান্ত পদ তৈরি হলো যার ভিত্তিতে লোকদের এর প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। একই সাথে এ অর্থ ইসলাম প্রচারের পথে ব্যয় হয়। রাষ্ট্রের সরকারি কোষাগার সর্বপ্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের নৌবাহিনী তৈরিতে অর্থায়ন করে। মসজিদ নির্মাণ এবং এর সংস্কার, মুয়াজ্জিনের বেতনভাতা, প্রশাসক, বিচারক, সৈনিকদের বেতন এবং সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা সরকারি কোষাগারের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এছাড়াও টাকা ব্যয় করা হতো হজের সময় কাবাঘরের নিরাপত্তা প্রদান, কাবার উপরের গিলাফ লাগানোর কাজে যা মুসলমানদের সর্বপ্রথম কিবলা।

রাষ্ট্রীয় কোষাগারের টাকা ইসলামি রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সুপেয় পানির ব্যবস্থা করার জন্য কূপ খননেও ব্যয় করা হতো। রাষ্ট্রের করের আয়ের টাকা, যাকাত এবং যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে গরিব, নিঃস্ব, এতিম, আগন্তুক এবং মুসাফিরদের বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করা হতো। এছাড়া রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থ দাসমুক্ত করার কাজে ব্যবহার করা হতো।

---

[৪৩]. ইবনু সা'দ, ৩:৩২৬।

অধ্যায়-৬

উসমান (রা)-এর রাজ্যবিস্তার

উসমান (রা)-এর শাসনকাল ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও শিক্ষণীয়। তাঁর শাসনকালের প্রথম ছয় বছরে তিনি সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং ইসলামি সাম্রাজ্যের সীমানাও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তবে অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাঁর খিলাফতকালের পরবর্তী বছরগুলো ছিল বিপর্যয়ের কাল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর রাজ্য বিজয়ের ঘটনা ইতিহাসের পাতায় তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

১. আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়

দ্বিতীয় খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলে মিশরের রোমান রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া মুসলিমদের হস্তগত হয়। তবে মুসলিমরা ঐ শহরে বসবাসরত রোমানদেরকে বহিষ্কার করেননি। তাছাড়া বিপুলসংখ্যক মুসলিমও আলেকজান্দ্রিয়ায় হিজরত করেননি। কেবল সীমান্ত পাহারার দায়িত্বে ছিল কিছু মুসলিম সৈনিক। ফলে শহরটিতে অনারব-অমুসলিম নাগরিকের আধিক্য ছিল।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যার পর ইসলামের শত্রুরা তাদের হারানো ভূমি পুনরুদ্ধার করার জন্য পদক্ষেপ নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। রোমানরা এবং ফরাসিরা আশা করেছিল তারা তাদের হারানো ভূমি উদ্ধার করবে এবং তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। রোমানদের নেতা তাদের পরাজয়ের পর লিবিয়া চলে যায় এবং কনস্টানটিনোপলের দিকে অগ্রসর হতে চায়। তারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সময়ে তাদের হারানো ভূমি ফিরে পাওয়ার জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করা শুরু করে। অপরদিকে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মিশরের শাসনকর্তার পদে পরিবর্তন আনেন: তিনি আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পরিবর্তে আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ ইবনু আবি সারহ্-কে মিশরের শাসক নিয়োগ করেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাসরত রোমানরা এটিকে মুসলিমদের দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করে রোমান সম্রাট কন্সট্যান্টাইনকে হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে উস্কানি দিতে থাকে। এদের আবেদনে সাড়া দিয়ে রোমান সম্রাট সেনাপতি মানাভীলের নেতৃত্বে ৩০০ রণতরী সজ্জিত একটি বিরাট বাহিনী ২৫ হিজরিতে আলেকজান্দ্রিয়া পুনরুদ্ধারের মিশনে প্রেরণ করেন।

আলেকজান্দ্রিয়ার খ্রিস্টান শাসক মুকাউকিস অবশ্য চুক্তি ভঙ্গ করেননি, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।[৪৪]

রোমানদের প্রস্তুতির খবর পেয়ে মিশরের মুসলিমরা খলিফা উসমানকে পরিস্থিতি অবহিত করে পত্র দিল। তারা মনে করল আমর ইবনুল আসকে পুনরায় শাসক নিয়োগ করা দরকার; কারণ রোমানদের যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বেশি ওয়াকিফহাল। খলিফা তাদের অনুরোধে সম্মত হয়ে আমরকে পুনরায় মিশরে প্রেরণ করলেন। রোমান সেনাপতি মানাভীল আলেকজান্দ্রিয়ায় লুটপাটের মাধ্যমে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে নিম্ন মিশরের (Lower Egypt) দিকে রওয়ানা করল। মানাভীলকে পশ্চাদ্ধাবনের পরামর্শ দিলেন সহযোদ্ধারা; কিন্তু আমর-এর মস্তিষ্কে ছিল ভিন্নচিন্তা; তিনি মানাভীলের লাগাম ছেড়ে দিলেন, তাকে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর সুযোগ দিলেন। প্রকারান্তরে তিনি মিশরবাসীকে বিচারমূলক তুলনার সুযোগ দিলেন। মিশরবাসী যেন রোমান খ্রিস্টান ও মুসলিম শাসনের মাঝে তফাৎ উপলব্ধির প্রত্যক্ষ সুযোগ পায়, সে লক্ষ্যে আমর ইবনুল আস মানাভীলকে একটু সুযোগ দিলেন।

মানাভীল বিনা বাধায় নিম্ন মিশরের দিকে এগিয়ে গেল; নাকয়ূস শহরে পৌঁছে তার বাহিনী ব্যাপক লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাল। ইতোমধ্যে আমর-এর সেনাপতিত্বে মুসলিম বাহিনী এগিয়ে গেল, নগর প্রাচীরের বাইরে নীল নদের তীরে দু'বাহিনীর মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেঁধে গেল। দূর হতে সেনাবাহিনী পরিচালনার পরিবর্তে আমর এ যুদ্ধে নিজেই ময়দানে নেমে পড়েন। এক পর্যায়ে তার অশ্ব শরাহত হলে তিনি বাহন ছেড়ে দিয়ে পদাতিক বাহিনীতে ঢুকে পড়েন। তীব্র লড়াইয়ের পর রোমান বাহিনী পরাজিত হলো, বিপুলসংখ্যক রোমান সৈনিক নিহত হলো। অবশিষ্ট সৈনিক নিয়ে মানাভীল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে রওয়ানা করল।

যুদ্ধ শেষে মুসলিমরা জরুরি কিছু সংস্কার কাজ সম্পন্ন করল। রোমানরা পলায়ন-পথে রাস্তাঘাট ও পুল-ব্রিজ ধ্বংস করে দিয়েছিল। মুসলিম বাহিনী বিধ্বস্ত অবকাঠামো জরুরি ভিত্তিতে সংস্কার করল। এই কাজে তারা মিশরীয়দের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করল। স্থানীয়রা মুসলিম বাহিনীকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করল।

আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে মুসলিম বাহিনী শহর অবরোধ করে মিনজানিক দিয়ে হামলা শুরু করল। কয়েকদিন প্রতিরোধের পর স্থানীয়রা নগরদ্বার খুলে দিতে

৪৪. ইবনুল আসীর, ২:৩৭৮; আল-বালাযুরী, ২২১-২২২।

বাধ্য হলো। শহরের অভ্যন্তরে দু'বাহিনীর মাঝে তীব্র লড়াই চলল কয়েকদিন মানাভীলসহ বহুসংখ্যক খ্রিস্টান সৈন্য নিহত হলো, অনেকে পালিয়ে গেল। শহরের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে আর কোনো প্রতিরোধ আসছে না দেখে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধ থামাতে বললেন। যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার স্থানে মুসলিমরা মসজিদুর রাহমাহ নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করল। আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু অবকাঠামো পুনঃনির্মাণে মনোযোগ দিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় শান্তি ফিরে এল; কপটিক খ্রিস্টান বিশপ বেঞ্জামিন পলায়ন করেছিলেন; ফিরে এসে তিনি জানালেন শহরের খ্রিস্টানরা চুক্তিভঙ্গ করেনি; অতএব তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হয় এবং নিরাপদে ধর্মকর্ম পালনের সুযোগ দেওয়া হয়। চুক্তি মেনে চলার শর্তে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করলেন।

দলে দলে মিশরীয়রা এসে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে অভিযোগ করল, রোমানরা তাদের গবাদিপশু থেকে শুরু করে সবকিছু লুট করেছে, তাদের লুণ্ঠিত সম্পদ যেন ফেরত দেওয়া হয়। আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এদের অনুরোধ রাখলেন, রোমানদের ফেলে যাওয়া সম্পদ প্রমাণসাপেক্ষে মিশরীয় মালিকদের কাছে ফেরত দিলেন। এটি মুসলিমদের পরম ঔদার্যের দৃষ্টান্ত; শত্রুদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি গনিমতের সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয় এবং তা নিয়মানুসারে যোদ্ধাদের মাঝে বণ্টন করা হয়। মযলুম মিশরীয়দের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু দখলদার রোমান বাহিনীর পরিত্যক্ত সম্পদ মালে-গনিমত হিসেবে বণ্টন না করে প্রকৃত মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন।

'আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আলেকজান্দ্রিয়ার নগর প্রাচীর ভেঙে ফেললেন। এতদসত্ত্বেও শহরে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করল। প্রদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অংশ মুসলিমদের দখলে ছিল। বারকাহ্ যুওয়াইলাহ ও পশ্চিম ত্রিপলিসহ আলেকজান্দ্রিয়ার পশ্চিম অংশ জিজিয়া প্রদানের বিনিময়ে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করেছিল। রোমানদের মেরুদণ্ড এমনভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল যে, মিশরের উত্তর অংশ তাদের দখলে থাকলেও তারা কখনো পুনরাক্রমণের দুঃসাহস দেখাল না। মুসলিম বাহিনী তটরেখা বরাবর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল।[৪৫]

২. আজারবাইজান বিজয়

আজারবাইজান উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত আমলে বিজয় লাভ করে। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর পর আজারবাইজানে একদল বিদ্রোহী ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হওয়ার পর আল-ওয়ালীদ ইবনু

---

[৪৫]. আত-তাবারী, ৪:২৫০।

উকবাকে কূফার শাসনকর্তা নিয়োগ করা হলে তিনি আজারবাইজানের শাসনকর্তা উতবা ইবনু ফারকাদকে পদচ্যুত করেন। এ সুযোগ আজারীরা বিদ্রোহ করে এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলে তাঁরা হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিল তা ভঙ্গ করে।[৪৬] ২৫ হিজরিতে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কূফার শাসনকর্তাকে বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেন। আল-ওয়ালীদ সেনাপতি সালমান ইবনু রাবী'আহ আল-বাহিলীকে একদল সৈনিকসহ অগ্রবাহিনী হিসেবে প্রেরণ করেন। অব্যবহিত পরে তিনিও একটি বড় সেনাদলসহ রওয়ানা হন। মুসলিমদের যুদ্ধযাত্রা দেখে আজারবাইজানের বিদ্রোহীরা হুযাইফা'র শর্তে আনুগত্য স্বীকার করল আল-ওয়ালীদ তাদের আনুগত্য গ্রহণ করলেন এবং চারদিকে ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু শুবাইল আল-আহমাসী চার হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মুকান, বাবর ও তাইলাসান জয় করেন। তারপর সালমান আল-বাহিলী বারো হাজার সৈন্য নিয়ে আর্মেনিয়া জয় করেন। এ যুদ্ধে প্রচুর গনিমতের সম্পদ অর্জিত হয়। বিজয় শেষে আল-ওয়ালীদ কূফায় ফিরে আসেন।[৪৭]

পরবর্তীতে আজারীরা বেশ কয়েক বার বিদ্রোহ করে। বাধ্য হয়ে আজারবাইজানের শাসক আশ'আস ইবনু কায়স কূফার শাসক আল-ওয়ালীদকে পত্র লিখেন। আল-ওয়ালীদ একদল সৈন্য দিয়ে আশ'আস-এর শক্তি বৃদ্ধি করেন। পুনর্গঠিত বাহিনী নিয়ে আশ'আস বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করেন; তারা প্রথম চুক্তির শর্তে পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব দেয়, আশ'আস তা মেনে নিলেও পুনঃবিদ্রোহের আশঙ্কায় একদল বেতনভুক্ত আরবকে সরকারি দফতরে নিয়োগ দেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের নির্দেশ দেন। সা'ঈদ ইবনুল আস কূফার শাসক নিযুক্ত হলে আজারীরা আবার বিদ্রোহ করে। তখন তিনি জারীর ইবনু আবদিল্লাহ আল-বাজালীকে প্রেরণ করেন। তিনি বিদ্রোহীদের সর্দারকে হত্যা করেন। পরবর্তীতে বিপুলসংখ্যক আজারী ইসলাম গ্রহণ করলে ওই অঞ্চলে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়।[৪৮]

---

[৪৬] ২২ হিজরিতে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু আজারবাইজান জয় করে বার্ষিক ৮ লক্ষ দিরহাম কর আদায়ের শর্তে তাদের সাথে চুক্তি করেন [আত-তাবারী, ৪:২৪৭]।

[৪৭]. আত-তাবারী, ৪:২৪৬।

[৪৮]. আল-বালাযুরী, ৩২৭-২৮।

মানচিত্র : আজারবাইজান

৩. আরমেনিয়া বিজয়

২৫ হিজরিতে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান আরমেনিয়ায় একদল সৈন্য প্রেরণ করেন রোমানদের মোকাবিলা করার জন্য। এভাবে ২৫ হিজরির শেষদিকে ককেশাস অঞ্চল মুসলিম সাম্রাজ্যের অধীনে ইসলামের ছায়াতলে আসে।

৪. উত্তর আফ্রিকা বিজয়

উত্তর আফ্রিকা শাসন করার ক্ষেত্রে রোমানদের জন্য মিশর ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ট্রিপলী (বর্তমান লিবিয়ার রাজধানী) রোমানদের খুবই শক্ত ঘাঁটি। মিশরের গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে সারাহ খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট উত্তর আফ্রিকা অভিযান পরিচালনার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে তাঁকে অভিযান পরিচালনার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তিনি সৈন্য ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সবাইকে মিশর পাঠালেন আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নেতৃত্বে উত্তর আফ্রিকায় অভিযান পরিচালনা করার জন্য। অভিযানে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক প্রাজ্ঞ সাহাবি ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারের ছেলে-সন্তানরা এবং আনসার ও মুহাজির সাহাবিদের পরিবারের ছেলে-সন্তানরা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যার মধ্যে- ইমাম আল

হাসান, আল হোসাইন, ইবনে আব্বাস, ইবনে জাফর অন্যতম। উসমান হারেস ইবনে আল হাকিমকে এই যোদ্ধাদের নেতা নিযুক্ত করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ -এর সাথে মিলিত হন।

উসমান সাহাবিদের মালামাল বহন করার জন্য এক হাজার উট প্রদান করেন। যখন যোদ্ধারা মিশরে পৌছল তারা আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ -এর সৈন্যদের সাথে মিলিত হলো যার ফলে আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ -এর নেতৃত্বে বিশ হাজার সৈন্যবাহিনী মিশরের দিকে অভিযানে রওনা হয়। রোমানরা উত্তর আফ্রিকায় চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলো। মুসলমান নৌবাহিনী যখন উপকূল দখল করে তখন রোমানদের জন্য উপকূল খুবই বিপজ্জনক হয়ে পড়ে।

উসমান -এর খিলাফতকালে একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন ছিল নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করা। এটা ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজের অংশীদার। এটা মুসলিম বিশ্বের উপকূলীয় এলাকাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাইপ্রাস বিজয়ে মুসলিম নৌবাহিনী খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নৌবাহিনীর প্রথম নৌবহর অভিযান পরিচালনা করে সাইপ্রাসের বিরুদ্ধে ২৮ হিজরি বা ৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে যার প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব দেন আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস আল যায়সি। অতি সহজে তারা সাইপ্রাস বিজয় লাভ করে। গ্রীষ্ম এবং শীতকাল মিলিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস নদীপথে প্রায় ৫০টি অভিযান পরিচালনা করেন। এর মধ্যে কোনো অভিযানেই তিনি দুর্ঘটনায় নিমজ্জিত হননি। তিনি সর্বদাই তাঁর এবং তাঁর দলের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন। যখন তিনি কোনো ধরনের ঝুঁকি গ্রহণের ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি নিজেই গুপ্তচরের কাজ করতেন। একবার তিনি রোমানদের নিয়ন্ত্রিত একটি নৌবন্দরে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে কিছু ভিক্ষুক দেখতে পেলেন, যারা সেখানে সবার নিকট ভিক্ষা করছে। তিনি তাদেরকে কিছু দান করলেন। এক বৃদ্ধ মহিলা ভিক্ষুক তার গ্রামে ফিরে গেল এবং সে লোকদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েসের আগমন সম্পর্কে সবাইকে জানালো। তারা তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হলো এবং তাঁকে আক্রমণ করল। তিনি তাদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন এবং তারা তাঁকে হত্যা করল। এ সময় তাঁর সাথে থাকা নাবিক পলায়ন করে এবং পরবর্তীতে সাহাবিদের কাছে ফিরে আসে।

৫. তারাবিলাস অভিযান

২৫ হিজরি থেকেই তারাবিলাস অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। কিন্তু ২৭ হিজরি থেকেই যথারীতি সৈন্য পরিচালনা শুরু হয়। মিশরের গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান অফিসার। উসমান রাজধানী

থেকেও একটি শক্তিশালী সেনাদল তাদের সাহায্যার্থে পাঠালেন। এ সেনাদলে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকরও শামিল ছিলেন। ইসলামি সেনাদল দীর্ঘদিন তারাবিলাসে যুদ্ধাভিযান চালিয়ে ছিলেন। অবশেষে মুসলিম সেনাদলের বীরত্ব, শৌর্যবীর্য, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার কাছে তারাবিলাসবাসীর সমস্ত প্রতিরোধ ধূলিসাৎ হলো। আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ সেনাদলকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে সারাদেশে ছড়িয়ে দিলেন। তারাবিলাসের লোকেরা যখন দেখল মুসলমানদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, তখন তারা ২৫ লাখ দীনার দিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সারাহর সাথে সন্ধি করল।

৬. স্পেন আক্রমণ

আফ্রিকার পশ্চিমাংশ বিজয়ের পর স্পেনের দ্বার উন্মুক্ত হলো। ২৭ হিজরিতে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামি সেনাবাহিনীকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এ অভিযান পরিচালনার জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে ইবনে আবদে কায়েস ও আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে ইবনে হোসাইনকে নিযুক্ত করলেন। তাঁরা কিছু কিছু সাফল্য অর্জন করলেন। অতঃপর এ অভিযান স্থায়িভাবে বন্ধ করে দেওয়া হলো। আব্দুল্লাহ ইবনে নাফে ইবনে আবদে কায়েসকে আফ্রিকার গভর্নর নিযুক্ত করা হলো।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সারাহর সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, আফ্রিকা বিজয়ের প্রতিদানস্বরূপ তাঁকে গনিমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ দান করা হবে। এই ওয়াদা অনুযায়ী আব্দুল্লাহ নিজের অংশ নিয়ে নিলেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানরা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এই দানশীলতায় অসন্তোষ প্রকাশ করল। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা জানতে পেরে আব্দুল্লাহর কাছ থেকে ঐ অর্থ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন : নিশ্চয়ই আমি ওয়াদা করেছিলাম; কিন্তু মুসলমানরা তার স্বীকৃতি দিচ্ছে না, কাজেই আমি অক্ষম।

অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছিল, আফ্রিকা থেকে গনিমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ মদিনায় পাঠানো হয়েছিল এবং তা মারওয়ানের হাতে পাঁচ দীনার মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছিল। ইবনে আমির উপরিউক্ত বর্ণনা দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বলেছেন: আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সারাহকে আফ্রিকার প্রথম যুদ্ধের (সম্ভবত তারাবিলাস) গনিমতের মালের পঞ্চমাংশ বিক্রয় করা হয়েছিল।

মানচিত্র : স্পেন

৭. সাইপ্রাস বিজয়

ভূ-মধ্যসাগরে সিরিয়ার সন্নিকটে সাইপ্রাস একটি অত্যন্ত উর্বর দ্বীপ। এটি ইউরোপ ও রোমের দিক থেকে মিশর ও সিরিয়া বিজয়ের দ্বার - স্বরূপ। এই সামুদ্রিক দ্বার পথটি মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে না আসা পর্যন্ত মিশর ও সিরিয়ার প্রতিরক্ষা এবং রোমানদের আক্রমণের আশঙ্কা দূর হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলেই সাইপ্রাস আক্রমণ করার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জলযুদ্ধ বিরোধী ছিলেন, তাই অনুমতি দেননি। অতঃপর ২৮ হিজরি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলে সাইপ্রাস আক্রমণের অনুমতির জন্য আবেদন জানালেন এবং জলযুদ্ধকে যতটা ভীতিপ্রদ মনে করা হয় আসলে ততটা ভীতিপ্রদ নয় বলে জানালেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখে পাঠালেন, তোমার বর্ণনা যথার্থ হয়ে থাকলে তুমি আক্রমণ চালাতে পার, তবে এ অভিযানে যারা স্বেচ্ছায় শরিক হতে চায়, একমাত্র তাদেরকেই শরিক করো। এভাবে অনুমতি লাভের পর আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস হারেসীর পরিচালনাধীনে ইসলামি নৌবাহিনী সাইপ্রাস আক্রমণের উদ্দেশে রওনা হলো। তারা নিরাপদে সাইপ্রাস পৌঁছে ঘাঁটি গাড়ল। নৌ- সেনাপতি (আমিরুল বাহার) আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস হঠাৎ শহীদ হয়ে গেলেন। কিন্তু সুফিয়ান ইবনে আউফ ইযদী সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে

সাইপ্রাসবাসীকে পরাজিত করলেন এবং নিম্নলিখিত শর্তাদি সাপেক্ষে চুক্তি সম্পাদিত হলো:

১. সাইপ্রাসবাসী বার্ষিক ৭০০০ দীনার খারাজ আদায় করবে।

২. মুসলমানরা সাইপ্রাসের প্রতিরক্ষার জন্য দায়ী থাকবে না।

৩. জলযুদ্ধের সময় সাইপ্রাসবাসীরা মুসলমানদের শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কে মুসলমানদেরকে অবহিত করবে।

সাইপ্রাসবাসীরা কিছুদিন পর্যন্ত এ চুক্তি মেনে চলল। কিন্তু ৩৩ হিজরিতে তারা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে রোমান নৌবাহিনীকে সাহায্য করল। ফলে আমিরে মুয়াবিয়া দ্বিতীয়বার সাইপ্রাস আক্রমণ করলেন এবং দ্বীপটি জয় করে ইসলামি জাহানের অন্তর্ভুক্ত করলেন। তিনি ঘোষণা করে দিলেন : ভবিষ্যতে এখানকার বাসিন্দারা রোমীয়দের সাথে কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখতে পারবে না।

মানচিত্র : সাইপ্রাস
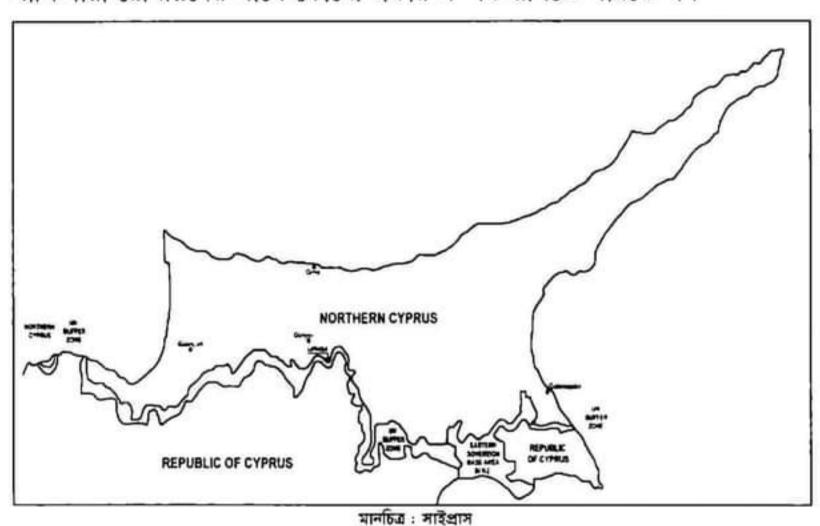
৮. তাবারিস্তান বিজয়

৩০ হিজরি সালে কূফার গভর্নর সা'ঈদ ইবনুল আস কূফা হতে খুরাসান বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন; তাঁর সাথে অনেক সাহাবি ছিলেন; হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান, আল-হাসান, আল-হুসাইন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস, আব্দুল্লাহ ইবনুয্ যুবাইর-সহ অনেকে। অন্যদিকে বসরার গভর্নর আব্দুল্লাহ ইবনু আমিরও খুরাসান জয়ের লক্ষ্যে বসরা হতে রওয়ানা করলেন। বসরার

যোদ্ধারা কূফাবাসীদের ছেড়ে এগিয়ে গেল, আব্দুল্লাহ ইবনু আমির আগেই আবরাশহর গিয়ে পৌছলেন। এ খবর পেয়ে সা'ঈদ ভিন্ন পথে রওয়ানা করলেন, তিনি কূমিসে পৌছলেন। এটি অবশ্য আগেই চুক্তিবদ্ধ ছিল; নাহাওয়ান্দ বিজয়ের পর হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান কূমিসবাসীদের সাথে সন্ধি করেছিলেন। অতঃপর সা'ঈদ ইবনুল আস জুরজানে আসলে স্থানীয়রা বার্ষিক দু'লক্ষ দিরহাম প্রদানের শর্তে সন্ধিচুক্তি করল। তারপর তিনি তামিসা-এ পৌছালেন; এটি ছিল তাবারিস্তানের অন্তর্গত ও জুরজানের সীমান্তে অবস্থিত সাগরের তীরবর্তী একটি শহর। মুসলিম বাহিনী ও স্থানীয়দের মাঝে এমন ভীষণ যুদ্ধ বেঁধে গেল যে মুসলিমদেরকে সালাতুল খাওফ বা ভয়কালীন নামায আদায় করতে হলো। তুমুল যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী শত্রুদেরকে পরাভূত করতে সক্ষম হলো। বিজয়ী বেশে কূফায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সা'ঈদ রূইয়ান, দানাবান্দ, তাবারিস্তানের সমভূমি ও নামিয়া মরুভূমি জয় করেন।[৪৯]

জুরজানবাসী সা'ঈদের সাথে চুক্তি করলেও তারা তা পালন করত না। কোনো বছর তারা এক লাখ দিরহাম কর প্রদান করত। আবার কোনো বছর দু'লাখ দিরহাম আদায় করত। সা'ঈদের পর কেউ জুরজানে অভিযানও পরিচালনা করেনি। এক পর্যায়ে তারা কর প্রদান বন্ধ করে দেয় এবং মুসলিমদের সাথে শত্রুতামূলক আচরণ শুরু করে। জুরজানবাসীর ভয়ে কোনো মুসলিম কূমিসের পথ ধরে নির্ভয়ে খুরাসানে যেতে পারত না। কুতাইবা ইবনু মুসলিম খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর জুরজানবাসীকে পদানত করে কূমিসের রাস্তার নিরাপত্তা বিধান করেন।[৫০]

৯. পারস্য সম্রাট ইয়াযদগির্দ-এর বিরুদ্ধে অভিযান

৩০ হিজরি সনে 'আব্দুল্লাহ ইবনু আমির পারস্য সম্রাট ইয়াযদগির্দ- বিরুদ্ধে রওয়ানা করেন। মুসলিম বাহিনীর অগ্রগামিতার খবর পেয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন পারস্যের সম্রাট ইয়াযদগির্দ আর্দাশীরে পালিয়ে গেলেন। সম্রাটকে পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য ইবনু আমির, মাজাশি ইবনু মাস'উদ আস-সুলামীকে প্রেরণ করলেন। তিনি কিসরাকে তাড়িয়ে কারমানে নিয়ে গেলেন। ইয়াযদগির্দ খুরাসানে পালিয়ে গেলেন আর মাজাশি সেনাবাহিনী নিয়ে সায়ারজানে ছাউনি ফেললেন।[৫১]

---

[৪৯]. আত-তাবারী, ৪:২৬৯-৭০; ইবনুল আসীর, ২:৩৯৮; ইবনু কাসীর, ৭:১৫৪-৫৫; আল-বালাযুরী, ৩৩৪-৩৫; আয-যাহাবী, ৩:১১।

[৫০]. আত-তাবারী, ৪:২৭১; ইবনুল আসীর, ২:৩৯৯।

[৫১]. আত-তাবারী, ৪:২৯৩।

ইবনু ইসহাক বলেন, ইয়াযদগির্দ একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে কারমান থেকে মার্ভে পালিয়ে গেলেন। তথাকার জনৈক বাসিন্দার কাছ থেকে সম্রাট কিছু সাহায্য চাইলেন। স্থানীয়রা নিজেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার ভয়ে সম্রাটকে আশ্রয় দিল না, শুধু তাই নয় তারা সম্রাটের বিরুদ্ধে তুর্কিদের সাহায্য চাইল। তুর্কি সৈন্যরা ইয়াযদগির্দের ক্ষুদ্র বাহিনীকে হত্যা করলে সম্রাট পালিয়ে গিয়ে মারগাব[৫২] নদীর তীরে এক ব্যক্তির ঘরে আশ্রয় নিলেন। লোকটি তাঁকে আশ্রয় দিলেও রাতের বেলা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে হত্যা করল।[৫৩]

আত-তাবারী অন্য একটি বর্ণনার সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, মুসলিম বাহিনী আসার আগেই ইয়াযদগির্দ কারমান ছেড়ে তাবাসাইন ও কুহমিস্তানের পথ ধরে মার্ভের কাছাকাছি পৌছেন। তার সাথে চার হাজার সৈন্য ছিল। তিনি আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য খুরাসান থেকে একদল সৈন্য সংগ্রহ করার পরিকল্পনা আঁটছিলেন। পথিমধ্যে তার সাথে দু'জন সেনাপতির দেখা হয়; একজনের নাম বারায, অন্যজনের নাম সানজান। দু'জনে তাঁর আনুগত্য মেনে নিলে তিনি মার্ভে অবস্থান করলেন। সম্রাট বারাযকে কাছে টেনে নিলে অপর সেনাপতি সানজান বিদ্বেষী হয়ে পড়ল। ওদিকে বারায, সানজানের বিরুদ্ধে সম্রাটের মন বিষিয়ে তুলল। পুরো বিষয়টি সানজানের কাছে ধরা পড়লে সে বারায ও সম্রাটের যৌথ সেনাবাহিনীর চেয়ে বড় একটি বাহিনী প্রস্তুত করে। তারপর সানজান সম্রাটের প্রাসাদ অভিমুখে রওয়ানা হয়। বিরাট বাহিনী দেখে বারায সম্রাটকে ফেলে পালিয়ে গেল, অন্যদিকে ভীতসন্ত্রস্ত সম্রাট বেশ পরিবর্তন করে প্রাসাদ থেকে বের হয়ে পড়লেন। কিছুদূর গিয়ে ইয়াযদগির্দ ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে একটি ঘরে আশ্রয় নিলেন। গৃহকর্তা আশ্রয়প্রার্থীর বেশভুষা দেখে তাঁকে সম্ভ্রান্ত মনে করে আদর-আপ্যায়ন করলেন। পরে ইয়াযদগির্দের মণিমুক্তার লোভে লোকটি ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে হত্যা করে এবং পাশের নদীতে লাশ নিক্ষেপ করে।[৫৪]

বর্ণনা দু'টোতে এত বেশি বৈসাদৃশ্য আছে যে, সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব। তবে ঘটনার সারবস্তু হিসেবে বলা যায়, বিপর্যস্ত পারস্য সম্রাটের সামনে পৃথিবী সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। মুসলিম বাহিনী তাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত হতভাগ্য সম্রাট বেশভুষা পরিবর্তন করেও আত্মরক্ষা করতে ব্যর্থ হন। বিশ্বাসঘাতক আশ্রয়দাতার হাতে তিনি নিহত হন।

---

[৫২]. মারগাব: মার্ভের একটি নদী।

[৫৩]. আত-তাবারী, ৪:২৯৫।

[৫৪]. প্রাগুক্ত, ৪:২৯৭।

ইয়াযদগির্দ বিশ বছর রাজ্য শাসন করেন; চার বছর স্বস্তিতে, বাকি ষোলো বছর মুসলিমদের ভয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। তিনিই ছিলেন পারস্যের সর্বশেষ কিসরা। রাসূল ﷺ বলেছেন, "এই কায়সার মারা গেলে এরপর আর কায়সার আসবে না, এই কিসরা মারা গেলে এরপর আর কিসরা আসবে না। যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার শপথ ! তাঁদের ধনভাণ্ডার আল্লাহ্র পথে ব্যয়িত হবে।"[৫৫]

১০. খুরাসান বিজয়

৩১ হিজরি সনে আব্দুল্লাহ ইবনু আমির ফার্স জয় করার পর বসরায় ফিরে গেলেন। পথিমধ্যে তিনি শারীক ইবনুল আ'ওয়ার আল-হারিসীকে ইস্তাখ্র-এর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। বসরায় থিতু হওয়ার আগেই ইবনু আমিরকে আবার অভিযানে বের হতে হলো। আল-আহনাফ ইবনু কায়স নামে বনু তামীমের জনৈক সেনাপতি ইবনু আমিরকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, আপনার শত্রু পলায়নপর, সে আপনার ভয়ে ভীত, আল্লাহর যমিন প্রশস্ত; অতএব আপনি বেরিয়ে পড়ুন, আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন এবং তাঁর দীনকে বিজয়ী করবেন। একথায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইবনু আমির আবার অভিযানের প্রস্তুতি নিলেন। বসরার শাসনভার যিয়াদের হাতে অর্পণ করে তিনি প্রথমে সাইয়িরজান পৌছলেন; সেখান থেকে মুজাশি ইবনু মাস'উদ আস-সুলামীকে কারমানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। এ এলাকার অধিবাসীরা ইতঃপূর্বে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করেছিল। অন্যদিকে আর-রাবী ইবনু যিয়াদকে সিজিস্তানে প্রেরণ করেন। তারপর ইবনু আমির রাবার-এর পথ ধরে তাবাসাইন পৌছে তাদের সাথে সম্পাদিত পুরাতন চুক্তিটি বহাল রাখলেন। এরপর ইবনু আমির আবরাশাহ্র অভিযানে বের হন। যাবার পথে তিনি সহজেই খাবীস ও খুওয়াস্ত অতিক্রম করেন। কিন্তু নিশাপুর (আবরাশাহর)-এর পথে কুহিস্তান অতিক্রম করার সময় তিনি হায়াতালা -এর কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। সেনাপতি আল-আহনাফ ইবনু কায়স তাদের দর্প চূর্ণ করে নিশাপুরের রাস্তার নিরাপত্তা বিধান করেন। তারপর ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণ করে তিনি রাসতাক যাম, বাখার্য ও জুওয়াইন দখল করেন।

এখান থেকে ইবনু আমির, আল-আসওয়াদ ইবনু কুলসূম আল- আদাবীকে বাইহাকের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। নগরপ্রাচীরের এক ছিদ্রপথ দিয়ে তিনি দলবলসহ শহরে প্রবেশ করেই স্থানীয়দের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। যুদ্ধে আল-আসওয়াদ নিহত হলে তার অনুজ আদহাম ইবনু কুলসূম মুসলিম বাহিনীর

[৫৫]. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফিতান, নং ২৯১৮, ২৯১৯।

নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং বিজয় সম্পন্ন করেন। নিশাপুর বিজয়ের পূর্বে ইবনু আমিরের সেনাপতিত্বে বুশ্ত, আশবান্দ, রুখ, যাওয়াহ, খুওয়াফ, আসফারাইন ও আরগিয়ান বিজিত হয়।

অবশেষে আব্দুল্লাহ ইবনু আমির নিশাপুরের উপকণ্ঠে এসে শহর অবরোধ করলেন। শহরটি চারভাগে বিভক্ত ছিল; প্রতি ভাগে একজন করে শাসক ছিল। এক-চতুর্থাংশের শাসক, ইবনু আমিরের কাছ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেয়ে মুসলিমদেরকে শহরে প্রবেশ করতে দিলেন। আচানক শত্রু বাহিনী দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিশাপুরের প্রধান শাসক সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। নিশাপুর হতে বার্ষিক দশ লক্ষ দিরহাম কর প্রদান করা হবে-এই শর্তে চুক্তি সম্পাদিত হলো। কায়স ইবনুল হায়সাম নিশাপুরের শাসক নিযুক্ত হলেন।

অতঃপর ইবনু আমিরের নির্দেশে উমাইন ইবনু আহমার আল-ইয়াশকুরী চতুস্পার্শ্বের কয়েকটি শহর-হুমরান, নাসা ও আবীওয়ার্দ - সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে (যুদ্ধ না করেই) জয় করেন। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনু আমির আব্দুল্লাহ ইবনু খাযিমকে সারখসের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। মুসলিমদের অগ্রযাত্রায় শহরবাসীর প্রতিরোধ চেষ্টা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি; সারাখ্স- শাসক যাযওয়াই সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব দিলে আব্দুল্লাহ ইবনু খাযিম তা মেনে নেন। এখান থেকে ইয়াযীদ ইবনু সালিমকে সারাখ্সের উপকণ্ঠে প্রেরণ করা হয়; তিনি অল্পায়াসে কায়ফ ও বীনা দখল করেন।

তূসের শাসক কানাযতাক-এর আমন্ত্রণে আব্দুল্লাহ ইবনু আমির খুরাসান অভিযানে বের হয়েছিলেন। তিনি এসে বার্ষিক ছয় লক্ষ দিরহাম প্রদানের শর্তে সন্ধি করলেন। তারপর আউস ইবনু সা'লাবাকে হারাতের উদ্দেশে প্রেরণ করা হয়। মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে হারাত-শাসক স্বেচ্ছায় চুক্তি করলেন, এই সন্ধিতে বাযাগীশ ও বূশান্জও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে তাগূন ও বাগূন নামক গ্রাম দু'টিকে বশ্যতা স্বীকার শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। ইবনু আমির ও হারাত শাসকের মাঝে সম্পাদিত চুক্তির ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ:

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম! এটি হারাত, বূশান্জ ও বাযাগীস-এর শাসকের প্রতি আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমিরের নির্দেশনামা- তিনি হারাতের শাসককে আল্লাহ-ভীতি, মুসলিমদের কল্যাণ-কামনা ও আওতাধীন ভূমি সংস্কারের নির্দেশ দিচ্ছেন। হারাতের সমভূমি ও পাহাড়ি এলাকার জন্য এই চুক্তি প্রযোজ্য হবে এই শর্তে যে, চুক্তি মোতাবেক জিজিয়া প্রদান করতে হবে এবং তা ন্যায্যতার ভিত্তিতে বণ্টন করতে হবে। কেউ যদি তার ওপর আরোপিত কর আদায়ে অসম্মত হয় তবে তার

জন্য কোনো নিরাপত্তা-প্রতিশ্রুতি নেই [খোশনবীশ: রাবী ইবনু নাহশাল, সীল: ইবনু আমির]।[৫৬]

তারপর আব্দুল্লাহ ইবনু আমির, হাতিম ইবনু আন-নু'মান আল-বাহিলীকে মার্ভে এবং আল-আহনাফ ইবনু কায়সকে তুখারিস্তানের উদ্দেশে প্রেরণ করেন। হাতিম বিনাযুদ্ধে মার্ভ জয় করেন; সিন্জ নামক গ্রামটি দখলে অবশ্য সামান্য শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। ওদিকে তুখারিস্তান যাওয়ার পথে আল-আহনাফ সাওয়ানজির্দ নামে একটি জিলা ৩ লক্ষ দিরহাম কর প্রদানের শর্তে জয় করেন।

১১. নুবা (সুদান) বিজয়

দ্বিতীয় খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অনুমতিসাপেক্ষে মিশর-শাসক আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু নুবা নামক রাজ্যে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তবে এই অভিযানে মুসলিমরা সুবিধা করতে পারেননি। নুবা-এর কৃষ্ণযোদ্ধাদের কাছ থেকে তারা তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। মুসলিমরা অভিনব এক যুদ্ধকৌশলের কাছে পরাস্ত হন। নুবার কালো যোদ্ধা তীর নিক্ষেপে খুবই দক্ষ ছিল। তারা মুসলিম মুজাহিদদের চোখ লক্ষ করে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। প্রথম যুদ্ধেই কমপক্ষে ১৫০ জন মুসলিম যোদ্ধা চোখ হারান। বাধ্য হয়ে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু নুবা-এর অধিবাসীদের সাথে সন্ধি করেন। পরবর্তীতে সন্ধির শর্তের ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ায় আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সন্ধি বাতিল করেন। তবে তিনি নতুন করে কোনো অভিযান পরিচালনা করেননি।

মিশরের শাসক হিসেবে নিয়োগ লাভের পর আব্দুল্লাহ ইবনু সা'দ ৩১ হিজরিতে আবার নুবা'য় অভিযান পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধেও বিপুলসংখ্যক মুসলিম যোদ্ধা চোখ হারান।[৫৭] তীব্র লড়াইয়ের পর নুবা'র অধিবাসীরা সন্ধির প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাব মেনে নিয়ে ইবনু সা'দ তাদের সাথে সন্ধি করেন যা ছয় শতাব্দী স্থায়ী ছিল। খিলাফতের ইতিহাসে বিরল এই চুক্তিটির কর বা জিজিয়ার বিনিময়ে সম্পাদিত হয়নি। নুবা বা সুদান ছিল মরুময় এলাকা; সেখানে শস্য উৎপাদন হত না বললেই চলে। ফলে কর হিসেবে নগদ অর্থ বা শস্য প্রদান তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। পক্ষান্তরে, দারিদ্র্যের কারণে সেখানে দাস কেনাবেচা হতো। অভিভাবকরা স্বেচ্ছায় নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে বিক্রি করে দিত। মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে এই বাস্তবতার প্রতিফলন ছিল। চুক্তির শর্ত ছিল এই: প্রতি বছর নুবাবাসী ৩০০ (বা ৪০০) দাস প্রদান করবে, বিনিময়ে

---

৫৬. আল-বালাযুরী, ৪০৫।

৫৭ [আয-যাহাবী, ৩:১১৩]।

মুসলিমরা (সমমূল্যের) গম ও যবসহ প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সরবরাহ করবে। পাশাপাশি নুবা'র অধিবাসীদের স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হয় এবং মুসলিমদের অবাধ যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ স্বীকার করা হয়। এই চুক্তি নুবা'য় ইসলাম প্রচারের বিরাট সুযোগ এনে দেয়; মুসলিমদের সাহচর্যে বিপুলসংখ্যক নুবাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেন।[৫৮]

১২. সিজিস্তান ও কাবুল বিজয়

আব্দুল্লাহ ইবনু আমির খুরাসান জয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার প্রাক্কালে কারমান হতে আর-রাবী ইবনু যিয়াদ আল-হারিসীকে সিজিস্তানের উদ্দেশে প্রেরণ করেছিলেন। আর-রাবী প্রথমে ফাহরাজে অবতরণ করেন, তারপর প্রায় ৭৫ ফার্লং পথ অতিক্রম করে তিনি যালিক-এ পৌঁছেন। এটি সিজিস্তান হতে পাঁচ ফার্লং দূরে অবস্থিত একটি দুর্গ। উৎসবের দিন আক্রমণ শানিয়ে তিনি ঐ দুর্গের অধিপতিকে পাকড়াও করেন এবং কারমানের শর্তে চুক্তি করতে বাধ্য করেন। অতঃপর ইবনু যিয়াদ (যালিক থেকে পাঁচ মাইল দূরত্বে অবস্থিত) কারকূইয়া নামক একটি জনপদ চুক্তির মাধ্যমে জয় করেন। তারপর তিনি হায়সূনে অবতরণ করেন, এই এলাকার অধিবাসীরা বিনাযুদ্ধে পরাজয় মেনে নেয়। এরপর যারান্জ যাওয়ার পথে হিন্দমিন্দ অতিক্রম করে নূক উপত্যকা পাড়ি দিয়ে তিনি রুস্ত (যুস্ত)-এ পৌছান। এখানে ইবনু যিয়াদ স্থানীয়দের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। উভয় পক্ষে বিপুলসংখ্যক যোদ্ধা হতাহতের পর মুসলিমরা জয়ী হয়। এরপর নাশিরুয ও শারওয়ায নামক দু'টি গ্রাম জয় করে আর-রাবী যারান্জ-এ উপনীত হন। এই শহরের শাসক আবারভীয সামান্য প্রতিরোধের পর রণেভঙ্গ দেন। তারপর তিনি সানারূয নামক উপত্যকা অতিক্রম করে একটি গ্রামে পৌছান। এখানে পারস্যবীর রুস্তমের আস্তাবল ছিল। তীব্র লড়াইয়ের পর মুসলিমরা বিজয়ী হলেও ইবনু যিয়াদ সামনে অগ্রসর না হয়ে যারান্জ-এ ফিরে আসেন। সিজিস্তানে আড়াই বছর শাসন করে তিনি ইবনু আমিরের কাছে ফিরে যান। তাঁর সচিব ছিলেন বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী। এই এলাকা ত্যাগের পূর্বে বানূল হারিস ইবনু কা'ব-এর এক লোককে প্রতিনিধি করে রেখে যান। কিন্তু স্থানীয়রা বিদ্রোহ করে তাঁকে বের করে দেয়।

আর-রাবী ইবনু যিয়াদ ফিরে যাওয়ার পর আব্দুল্লাহ ইবনু আমির সিজিস্তানের শাসক হিসেবে আবদুর রহমান ইবনু সামুরাকে নিয়োগ দেন। নতুন শাসক ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা বর্ধনে চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। প্রথমে তিনি যারান্জ-এর বিদ্রোহ দমন করেন। তারপর ভারত সীমান্তে যারান্জ ও কাশ-এর মধ্যবর্তী এলাকা জয়

---

৫৮. আল-বালাযুরী, ২৩৭-৩৮; আয-যাহাবী, ৩:১১৩।

করেন। অতঃপর রুখ্খাজ জয় করে দাউন[৫৯] -এর বাসিন্দাদেরকে যুয্ পাহাড়ে অবরোধ করেন। সামান্য প্রতিরোধের পর স্থানীয়রা সন্ধি করে। ঐ পাহাড়ে যুয নামে একটি স্বর্ণমূর্তি ছিল যার দু'চোখ ছিল ইয়াকুত পাথরের। আবদুর রহমান মূর্তিটির হাত কেটে চোখ বের করে নিলেন। কিন্তু স্বর্ণ ও জহরত না নিয়ে শহরের শাসকের কাছে সেগুলো ফেরত দিয়ে বললেন, এগুলোতে আমার কাজ নেই, আমি শুধু তোমাকে দেখাতে চেয়েছিলাম যে, মূর্তিটি ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। তারপর তিনি বুশ্ত, কাবুল ও যাবুলিস্তান (বা গজনী) জয় করেন। তারপর বিজয়াভিযান দীর্ঘ না করে তিনি যারান্জ-এ ফিরে আসেন। উসমান -এর খিলাফতের শেষদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তিনি উমাইর ইবনু আহমার আল-ইয়াশকুরীকে প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে যারান্জ ত্যাগ করেন।[৬০]

১৩. একনজরে উসমান -এর আমলে পরিচালিত বিজয় অভিযান

আমরা এখন যেসব বিজয় অভিযান সম্পর্কে জানাব সেগুলো উসমান -এর সময়কালে প্রেরিত অভিযান। মুসলমানরা তাবারিস্তান, নাসা, সারাকাস, মারওয়া, কিরমান, নিশাপুর এবং হেরাত (বর্তমান আফগানিস্তান)। এভাবে মুসলমানরা এশিয়ার বৃহতাংশ, আফ্রিকা, আফগানিস্তান, তুর্কিমিনিস্তান, উজবেকিস্তান, ইরান, ইরাক, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, তুর্কি, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্দান, মিশর, লিবিয়া, আলজেরিয়া, তিউনেসিয়া, মরক্কো, আরবীয় এবং ইয়েমেনসহ উপসাগরীয় দেশসমূহ শাসন করে। ইসলামি রাষ্ট্র অতীতের রোমান অথবা ফরাসি শক্তির চেয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

১৪. আধুনিক মানচিত্রে উসমান -এর আমলের মুসলিম বিশ্ব

উসমান -এর শাসনামলে এশিয়া মহাদেশের নিম্নোক্ত রাষ্ট্রগুলো ইসলামি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল: ১. সৌদি আরব, ২. ইয়ামান, ৩. ওমান, ৪. কাতার, ৫. বাহরাইন, ৬. সংযুক্ত আরব আমিরাত, ৭. কুয়েত, ৮. ইরাক, ৯. ইরান, ১০. জর্দান, ১১. সিরিয়া, ১২. ইসরাইল, ১৩. ফিলিস্তিন, ১৪. লেবানন, ১৫. আর্মেনিয়া, ১৬. আজারবাইজান, ১৭. তুর্কমেনিস্তান, ১৮. তাজিকিস্তান, ১৯. উজবেকিস্তান, ২০. আফগানিস্তান (আংশিক) ২১. তুরস্ক (আংশিক), ২২. সাইপ্রাস। আফ্রিকা মহাদেশের নিম্নোক্ত রাষ্ট্রগুলো উসমান -এর আমলে ইসলামি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল : ১. মিশর, ২. লিবিয়া, ৩. তিউনিসিয়া, ৪. সুদান, ৫. আলজেরিয়া (আংশিক)।

---

[৫৯]. ইবনুল আসীর, ২:৪১৩; দাউন-এর ভিন্নপাঠ হলো দাওয়ার [আল-বালাযুরী, ৩৯৪]।

[৬০]. সিজিস্তান ও কাবুল বিজয়ের আদ্যোপান্ত জানতে দেখুন, ইবনুল আসীর, ২:৪১২-১৩; আল-বালাযুরী, ৩৯২-৯৫।

অধ্যায়-৭

কুরআন সংকলন ও উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

১. কুরআনের প্রতি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর সুগভীর ভালোবাসা

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং অন্যান্য সাহাবি একমাত্র কুরআনের মাধ্যমেই শিক্ষা লাভ করেন এবং প্রশিক্ষিত হন। মহিমান্বিত কুরআনই হলো একমাত্র গ্রহণযোগ্য শিক্ষার উৎস। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি যেসকল আয়াত শুনতেন, সেগুলোই তাঁকে ইসলামি ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেগুলো তাঁর হৃদয় ও মনকে বিশুদ্ধ করে ফেলে। তখন নতুন মূল্যবোধ, আবেগ, লক্ষ্য, আচরণ ও প্রত্যাশার সমন্বয়ে নতুন মানুষে রূপান্তরিত হন।

আল্লাহর এই মহান কিতাবের প্রতি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল, যার ফলে এটাতে তিনি গভীরভাবে নিমগ্ন ছিলেন। যখন তিনি কুরআনের দশটি আয়াত শিখতেন, তিনি তখন এগুলোর বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতেন এগুলোর বাইরে যেতেন না। এভাবেই তিনি কুরআনের জ্ঞান ও প্রয়োগ একই সাথে শিক্ষা লাভ করেন, উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম যারা কুরআন শিখে এবং কুরআন শিক্ষা দেয়।"

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পূর্বেই সমস্ত কুরআন মুখস্থ করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলতেন- "পৃথিবীর ৩টি কাজ আমার নিকট প্রিয় তা হলো- ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেওয়া, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান এবং কুরআন তিলাওয়াত করা।"

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু সমস্ত কুরআনের হাফেজদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি সর্বদাই কুরআন তিলাওয়াত করতেন। যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইন্তেকাল করলেন, তাঁর কুরআনের কপিটি জীর্ণশীর্ণ হয়েছিল কারণ তিনি অত্যধিক তিলাওয়াত করতো। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর মহান আল্লাহ, জীবন, পৃথিবী, জান্নাত, জাহান্নাম, ইলাহী আদেশ ও হুকুম, মানুষের সত্যিকার প্রকৃতি শয়তানের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম সম্পর্কে ধারণা ছিল কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহভিত্তিক। রাষ্ট্রীয়ভাবে কুরআনের চূড়ান্ত কপি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর সর্ববৃহত্তম অর্জন, যা তিনি সংকলন করেছিলেন।

২. মুহাম্মদ ﷺ-এর সময়কালে কুরআন গ্রন্থায়ন

আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ তাঁর সাহাবিদের তাঁর নিকট অবতীর্ণ কুরআনের বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। যায়েদ বিন সাবেত রা. যার ডাকনাম হচ্ছে কাতেবে ওহী। কারণ তিনি ছিলেন প্রধান ওহী লেখক। মহানবী মুহাম্মদ ﷺ মক্কায় যাদেরকে ওহী বা কুরআন লিখার কাজে নিয়োজিত করেন তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ ইবনে সারাহ। মক্কায় কুরআন লেখার ব্যাপারে আরেকটি প্রমাণ হলো যেভাবে ওমর রা. ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তার মাধ্যমে। যখন তিনি তাঁর বোনকে প্রহার করেন, তখন তিনি তাঁর হাতে একটি লিখিত কপি দেখতে পান যাতে লেখা ছিল সূরা ত্ব'হা।

মুহাম্মদ ﷺ-এর ইন্তেকালের সময় সমগ্র কুরআন লিপিবদ্ধ অবস্থায় ছিল। কিন্তু তা এক জায়গায় সংগৃহীত ছিল না। তখন কুরআন চামড়া এবং পাথরের মধ্যে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় লেখা হয়েছে। অন্যদিকে কিছুসংখ্যক সাহাবি মুখস্থ করে রেখেছেন। যদিও এটি বিভিন্ন শিট এবং সাহাবিদের অন্তঃকরণে মুখস্থ আছে; তবুও জিবরাঈল আ. রাসূলকে বছরে একবার তা শুনাতেন। আল্লাহর নবীর ইন্তেকালের বছর জিবরাঈল আ. তাঁকে পবিত্র কুরআন দুবার শুনান। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ এটাকে এক খণ্ডে গ্রন্থিত করে যাননি। কারণ তাঁকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নবুয়াতী দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকতে হতো তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। তাঁর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে নবুয়তী দায়িত্ব শেষ হওয়ার পর আল্লাহ রাসূলের সাহাবিদের সুন্দরভাবে এটি সমাপ্ত করতে ব্যাপক প্রয়াস পরিচালনা করেন।

৩. আবু বকর রা.-এর খিলাফতকালে কুরআন গ্রন্থায়ন

আবু বকর রা.-এর খিলাফতকালে মুসলমানদের মধ্যে অনেক সাহাবি যারা কুরআন মুখস্থ করে রেখেছিলেন। আবু বকর রা. ওমর রা.-এর সাথে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার ব্যাপারে পরামর্শ করেন। আবু বকর রা. এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার জন্য যায়িদ বিন সাবিত আল আনসারীকে দায়িত্ব দেন। যিনি রাসূল ﷺ-এর নবুয়তের পুরো সময় তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন যুবক, যাঁর বয়স ছিল মাত্র ২১ বছর। তাই তাঁকে যে কাজ দেওয়া হতো, তিনি তা সম্পন্ন করার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী এবং সৎপরায়ণ ব্যক্তি। যায়িদ বিন সাবিত রা. কুরআনের হস্তলিপি, প্রস্তরলিপি, মানুষের মুখস্থ করা অংশ এবং পশুর চামড়ায় সংরক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্নভাবে থাকা কুরআনের অংশ সংগ্রহ করেন। তিনি একটি কপি তৈরি করেন এবং তার কপি আবু বকর রা.-এর সময়কালে তাঁর কাছে হস্তান্তর করেন। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তা তাঁর নিকট ছিল। আবু বকর রা. এরপর ওমর রা.-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত এ

অনুলিপিটি তাঁর নিকট ছিল। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকালের পর এটি তাঁর কন্যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট সংরক্ষিত ছিল।

৪. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সময়কালে গ্রন্থিত কুরআনের অবস্থা

পার্থক্যটা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়কালে পুরো কুরআন লিপিবদ্ধ করা থাকলেও এটি বিভিন্ন পাতায়, সমতল পাথরে, পশুর চামড়ায় এবং অন্যান্য জিনিসে ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় লিপিবদ্ধ ছিল। সবগুলো সূরা এক জায়গায় ছিল না। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে কুরআন সূরাভিত্তিক আয়াতগুলো লিপিবদ্ধ অবস্থায় ছিল। কিছু লোকদের অন্তঃকরণে মুখস্থ অবস্থায় ছিল যারা আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি মুখস্থ করেছিলেন; এরপর যায়িদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু পুরো কুরআন শরীফ একত্রিত করে লেখা শুরু করেন। যায়িদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু পুরো কুরআন শরীফকে সূরা ভিত্তিকভাবে লিপিবদ্ধ করেন যেভাবে তাঁকে আল্লাহ্ রাসূল পূর্বে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপর তিনি কুরআনের পুরো একটি কপি তৈরি করেন। পরবর্তীতে এর একশত কপি তৈরি করা হয়।

৫. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে কুরআন গ্রন্থায়ন

রাষ্ট্রীয়ভাবে কুরআন সংরক্ষণ করা এবং প্রতিটি ইসলামি প্রদেশে এর একটি কপি প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সময়কালে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উসমানকে রাদিয়াল্লাহু আনহু এ উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য স্মরণ করা হয়। এটি মুসলিম জাতির জন্য একটি চূড়ান্ত ধাপ।

২৫ হিজরি/৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট সাহাবি হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলে সিরীয় ও ইরাকি যোদ্ধাদের সাথে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান বিজয়াভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নানা অঞ্চলের মানুষের কুরআন পাঠের ভিন্নতা দেখে তিনি শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করলেন, কেউ ইবনু মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অনুসরণে কুরআন তিলাওয়াত করে, আবার অন্যরা আবূ মূসা আল-আশ'আরীর কিরআত তিলাওয়াত করে। শুধু তাই নয়, এক দল অন্য দলকে হেয়জ্ঞান করে। এই অবস্থা দেখে তিনি বললেন, কূফাবাসী বলেঃ ইবনু মাস'উদের কিরআত, বসরাবাসী বলেঃ আবূ মূসার কিরআত। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আমীরুল মু'মিনীনের কাছে গিয়ে অনুরোধ করব তিনি যেন সবাইকে একই পঠনপদ্ধতির ওপর একত্রিত করেন। অভিযান শেষে মদিনায় এসে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! ইহুদি ও নাসারাদের মতো

নিজেদের কিতাবের ব্যাপারে মতভেদ করার পূর্বেই আপনি এই উম্মাহ্কে রক্ষা করুন।'[৬১]

পঠনপদ্ধতির ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন কারীর ছাত্রদের মাঝে বচসার বিষয়টি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনায়ও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একবার তিনি মসজিদে খুতবা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, তোমরা আমার সামনেই মতভেদ কর, না জানি দূরে যারা আছে তারা কী করে?!'[৬২]

হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, "হে খলিফা! এ সম্প্রদায়কে আপনি এখনি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসুন; তা না হলে তারা এ গ্রন্থটিকে (কুরআন) তাওরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবের ন্যায় পরিবর্তন-পরিবর্ধন করবে।

৬. কুরআন গ্রন্থায়নে সাহাবিদের সাথে পরামর্শ

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আবেদনটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিলেন। করণীয় নির্ধারণে তিনি মুহাজির ও আনসারী সাহাবিগণকে একত্রিত করলেন: উম্মাহ-এর শ্রেষ্ঠ আলিম, ফকীহ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি এঁদের মাঝেই ছিলেন, যাদের শীর্ষে ছিলেন আলী ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, এ অবস্থা দীর্ঘায়িত হতে দেওয়া যায় না, মু'মিনদের অন্তরে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় যেন প্রবেশ না করতে পারে। তাঁরা হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে রক্ষিত সাহীফাগুলো হতে অনুলিপি প্রস্তুত করে কুরআনের বিশুদ্ধ কপি ইসলামি খিলাফতের নানা স্থানে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্ত অনুসারে খলিফা, উম্মুল মু'মিনীন হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, আমার কাছে কুরআনের অংশগুলো পাঠিয়ে দিন, আমি কয়েকটি অনুলিপি তৈরি করে মূল কপিগুলো আপনার কাছে ফেরত পাঠাব। হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর কাছে রক্ষিত আল কুরআনের সহীফাগুলো উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে পাঠিয়ে দেন।

৭. কুরআন গ্রন্থায়নের জন্য কমিটি গঠন

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করলেন, যার সদস্যরা ছিলেন: যায়িদ ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু, সা'ঈদ ইবনুল আস ও আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনি হিশাম রাদিয়াল্লাহু আনহু। তাঁদেরকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সহীফাগুলোর আলোকে কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন।

---

[৬১]. ইবনু হাজর, ফাতহ, ৮:৬৭৮।

[৬২]. প্রাগুক্ত, ৮:৬৭৯।

কমিটির সদস্যদের মাঝে যায়িদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আনসারী, বাকি তিনজন ছিলেন কুরাইশী। তিনজনের কুরাইশ দলকে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ. فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ. فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ.

"কুরআনের কোনো শব্দের আরবীত্বের ব্যাপারে যায়িদ ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে তোমাদের মতভেদ হলে তোমরা তা কুরাইশী ভাষায় লিপিবদ্ধ কর; কারণ এ কিতাব তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে।"[৬৩]

২৫ হিজরিতে কমিটির সদস্যরা কাজ শুরু করেন। চার সদস্যের কমিটির সবাই হাফিযুল কুরআন হলেও তাঁরা হাফসার কাছ থেকে আনীত সহীফাগুলোর ওপর ভিত্তি করে কুরআনের কয়েকটি অনুলিপি প্রস্তুত করলেন। 'উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলে সংকলিত আল কুরআনে আয়াত বা সূরার ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে কোনোরূপ পরিবর্তন আনা হয়নি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সংকলনে যে ধারাবাহিকতা ছিল সেটিই হুবহু বহাল ছিল উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সংকলনে। তাছাড়া কোনো শব্দে কোনোরূপ পরিবর্তন আনা হয়নি, সেটি সম্ভবও ছিল না। কুরআন সংকলনকালে ইবনুয্‌ যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, সূরা আল বাকারার ২৪০ নং আয়াতটি তো অন্য আয়াত দ্বারা (একই সূরার ২৩৪নং আয়াত দ্বারা) মানসূখ হয়ে গেছে, তবে কেন আপনি সেটি বহাল রাখছেন:' জবাবে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "ভাতিজা, আমি (আল কুরআনের) কোনোকিছু স্বস্থান হতে পরিবর্তন করতে পারি না।"[৬৪]

খলিফার এই জবাব হতে বোঝা যায়, কোনো আয়াত বাদ দেওয়া তো দূরের কথা, কোনো আয়াতের স্থান পর্যন্ত পরিবর্তন করা হয়নি। মৃত্যুর পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম পুরো কুরআন উপস্থাপন করেছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সংকলনটি সেই উপস্থাপনার অনুরূপ, আবার উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর সংকলনটি ছিল আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সংকলনের অনুরূপ। এখানে কোনোরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধনের কোনো ক্ষমতা কারো ছিল না।

---

[৬৩].সাহীহুল বুখারী, হাদিস নং : ৩৫০৬।
[৬৪].সাহীহুল বুখারী, কিতাব তাফসীরিল কুরআন, ২:৪৬৮।

৮. বিভিন্ন প্রদেশে কারী ও কুরআনের কপি প্রেরণ

গ্রন্থাকারে কুরআনের অনুলিপি তৈরির কাজ সম্পন্ন হলে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মূল কপির পৃষ্ঠাগুলো হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে ফেরত পাঠালেন এবং অনুলিপিকৃত কুরআনের এক একটি কপি দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রেরণ করলেন। এ কপিগুলোতে হারাকাত বা স্বরচিহ্ন এবং নুক্তা ছিল না। ফলে কুরআনের শব্দগুলো বিভিন্নভাবে তিলাওয়াত করার সুযোগ ছিল। এ কারণে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরআনের অনুলিপি প্রেরণের পাশাপাশি কারীও প্রেরণ করেন, যাতে তারা জনগণকে একই পদ্ধতির কিরাআতের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন। বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত মুসহাফের (কুরআনের কপি) সংখ্যার বিষয়ে মতভেদ আছে। অধিকাংশ আলেম বলেন, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু চারটি মুসহাফ প্রস্তুত করেছিলেন। মদিনায় একটি মুসহাফ রেখে বাকিগুলো সিরিয়া, কূফা ও বসরায় পাঠানো হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, উপর্যুক্ত চারটির পাশাপাশি কুরআনের আরেকটি কপি মক্কাবাসীদের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। আবার কারো মতে, প্রেরিত মুসহাফের সংখ্যা ছয়; পূর্বোক্ত পাঁচটি এবং আরেকটি পাঠিয়েছিলেন বাহরাইনে। যারা বলেন, সাতটি মুসহাফ প্রেরণ করা হয়েছিল তারা বলেন সপ্তম কপিটি ইয়ামানে পাঠানো হয়েছিল। প্রেরিত মুসহাফের সংখ্যা আট বলেও একটি মত পাওয়া যায়, সেমতে অষ্টম মুসহাফটি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের কাছে রেখেছিলেন। শাহাদতের সময় তিনি সেটি তিলাওয়াত করছিলেন।[৬৫] প্রতিটি মুসহাফের সাথে একজন করে কারীও প্রেরণ করা হয়, যার দায়িত্ব ছিল বিশুদ্ধ তিলাওয়াত পদ্ধতি প্রশিক্ষণ দেওয়া। আব্দুল্লাহ্ ইবনু সাইব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মক্কায়, আল-মুগীরা ইবনু শিহাবকে সিরিয়ায়, আবূ আবদিল্লাহ আস-সুলামীকে কূফায়, আমির ইবনু কায়সকে বসরায় প্রেরণ করা হয়। যায়িদ ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মদিনার অধিবাসীদেরকে কিরাআত প্রশিক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়।[৬৬]

---

[৬৫]. আদওয়াউল বায়ান ফী তারীখিল কুরআন, ৭৭।
[৬৬]. প্রাগুক্ত।

৯. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কুরআন গ্রন্থায়নের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা

সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কুরআন সংকলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তাঁরা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এই সিদ্ধান্তে বিমোহিত হয়ে বলেছিলেন, আপনার সিদ্ধান্ত কতই না উত্তম এবং তিনি চমৎকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'[৬৭]

মুস'আব ইবনু সা'দ সাহাবায়ে কিরামের যুগ পেয়েছেন। তাঁর মন্তব্য হলো এই যে, কুরআন সংকলনে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সিদ্ধান্তে তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন।[৬৮] কুরআন সংকলনের কারণে যারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সমালোচনা করত, তাদেরকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, "ওহে জনগণ, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না, তাঁর সম্পর্কে ভালো বৈ অন্য কিছু বলো না। আল্লাহর শপথ, কুরআন সংকলনের ব্যাপারে তিনি তো আমাদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আল্লাহর শপথ, আমি যদি দায়িত্বে থাকতাম তবে অনুরূপ সিদ্ধান্তই নিতাম।"[৬৯]

আল-কুরতুবী (রহ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুহাজির ও আনসারী সাহাবিগণের সাথে পরামর্শ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যা বিশ্বস্তসূত্রে বর্ণিত তা গ্রহণ এবং অন্যগুলো বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁরা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করেছিলেন আর এটি ছিল যথার্থ ও সঠিক।[৭০]

১০. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কুরআন সংকলনের পার্থক্য

ইবনুত্ তীন (রহ) বলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলে কুরআন সংকলন করা হয়েছিল এ কারণে যে, তিনি হাফেজে কুরআনদের ইন্তেকালে আংশিকভাবে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কা করেছিলেন; কারণ এই মহাগ্রন্থ একস্থানে একত্রিত অবস্থায় ছিল না। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশনা অনুসারে সূরাসমূহের আয়াতগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে কুরআন সংকলন করেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গ্রন্থায়নকৃত কুরআনে বিভিন্ন উপভাষায় কুরআন যেভাবে নাযিল হয়েছে সেভাবে রাখা হয়েছে। কুরআন যে সাত হরফে তথা উপভাষায় নাযিল হয়েছে তা অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছিল। কুরআনের সাত উপভাষা সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

---

[৬৭]. ফিতনাতু মাকতালি উসমান, ১:৭৮।

[৬৮]. আল-বুখারী, আত-তারীখুস সাগীর, ১:৯৪।

[৬৯]. ইবনু হাজর, ফাতহ., ৯:১৮।

[৭০]. আল-কুরতুবী, আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, ১:৮৮।

إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. فَاقْرَءُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ.

"নিশ্চয়ই কুরআনকে সাত হরফে নাযিল করা হয়েছে, সুতরাং সেটি তোমার কাছে সহজ মনে হয়, সেভাবে তিলাওয়াত কর।"[৭১]

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আমলে কুরআনের পাঠপদ্ধতি নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়; আরবী ভাষার বিভিন্ন উপভাষায় কুরআন তিলাওয়াতের সুযোগ থাকায় লোকজন নিজস্ব উপভাষায় কুরআন তিলাওয়াত করত এবং অন্য উপভাষায় তিলাওয়াতকারীদেরকে ভুল সাব্যস্ত করত। এই প্রবণতার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে আবু বাকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সংকলন হতে আল কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করেন। আরবী ভাষার অন্যান্য উপভাষায় তিলাওয়াতের সুযোগ রহিত করে কেবল কুরাইশী আরবী ভাষায় আল কুরআন সংকলন করা হলো। প্রাথমিক যুগে শিক্ষার অনগ্রসরতার কারণে বিভিন্ন গোত্রের লোকদের তিলাওয়াতের সুবিধার্থে নানা উপভাষায় কুরআন তিলাওয়াতের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে আরব গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণ করে এবং পরস্পরের কাছাকাছি আসায় ভাষার দূরত্ব দূর হয় এবং কুরাইশী ভাষা মানভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই, কুরআন তিলাওয়াতের অভিন্নতার সুবিধার্থে অন্যান্য উপভাষায় তিলাওয়াতের সুযোগ রহিত করে কেবল কুরাইশী ভাষায় কুরআন সংকলন করা হয়।

অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের চেয়ে পবিত্র কুরআনের একটি গৌরবান্বিত গুণ হচ্ছে সমগ্র বিশ্বে এক এবং অভিন্ন। পুরো বিশ্বের মুসলমানরা একই ধরনের একই কুরআন অনুসরণ করেন।

[৭১] সহীহ বুখারী, হাদিস নং : ২৪১৯।

অধ্যায়-৮

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব

উসমান প্রকৃতিগতভাবে সৎ, আল্লাহ্ ভীরু, বিশ্বস্ত ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। লজ্জা ও অনুকম্পা তাঁর বিশেষ গুণ ছিল। আইয়ামে জাহিলিয়াতে আরবের ঘরে ঘরে শরাবের প্রচলন ছিল। যুব-বৃদ্ধ নির্বিশেষে আরবের প্রতিটি ব্যক্তি শরাব পানে অভ্যস্ত ছিল। এ সময়ও উসমান শরাব থেকে দূরে ছিলেন। সারা দুনিয়া যখন মিথ্যা, দুর্নীতি, অশালীনতা ও চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতার শিকার ছিল তখনও তিনি নিজেকে কলুষমুক্ত রেখেছিলেন। পরে রাসূলে করীম -এর সাহচর্য তাঁর এ গুণাবলিকে অধিকতর সুষমামণ্ডিত করেছিল।

১. শারীরিক গড়ন

উসমান খুব বেশি লম্বা অথবা খুব খাটো ছিলেন না। তিনি ছিলেন নরম ত্বকের অধিকারী। তাঁর ছিল লম্বা ঘন দাড়ি, সুঠাম দেহ, প্রশস্ত কাঁধ এবং মাথায় ঘন চুল। তিনি বাঁকা নাক, স্থূল এবং লোমযুক্ত দীর্ঘ বাহুর অধিকারী ছিলেন। তাঁর ছিল সুদর্শন মুখ। তাঁর মাথার চুল কান পর্যন্ত নেমে থাকত। তাকে দেখতে অনেকটা অভিজাত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি লাগত।

২. কুরাইশদের ভালোবাসার পাত্র

উসমান স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, ধৈর্যশীল, দানশীল ও সচ্চরিত্রের মানুষ ছিলেন। বিধায় কুরাইশদের মধ্যে সম্মানিত ও মান্যবর ছিলেন। কুরাইশদের ভালোবাসা তাঁর জন্য প্রবাদ বাক্য হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আরবরা বলত–

حُبُّكَ وَالرَّحْمٰنِ حُبُّ قُرَيْشٍ عُثْمَانَ.

"আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে এমন ভালোবাসি, যেমন কুরাইশরা উসমানকে ভালোবাসে।"

৩. অনাড়ম্বর পোশাক-পরিচ্ছদ

উসমান বড় মাপের ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে শুরু থেকেই সচ্ছল ও সম্পদশালী ছিলেন। واما بنعمة ربك فحدث এর আদেশ অনুযায়ী আল্লাহ

তাআলার নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়া ছিল তাঁর অভ্যাস। সুতরাং তিনি উত্তম ও দামি পোশাক পরিধান করতেন। সে যুগে ইয়ামানী চাদর খুব মূল্যবান ও দামী মনে করা হতো। এ চাদর ব্যবহারকে আভিজাত্য মনে করা হতো। সাধারণত এই চাদর পীত বর্ণের হতো। মূল্য ছিল প্রায় ১০০ দেরহাম। পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি সুন্নতের প্রতি লক্ষ রাখতেন। সালামা ইবনে আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু পায়ের অর্ধ গোছা পর্যন্ত লুঙ্গি বাঁধতেন। তিনি বলতেন, আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর লুঙ্গি পরা এরকম ছিল।

৪. বিনয়ী

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সকল সাহাবির মধ্যে সর্বাধিক বিনয়ী ও লজ্জাশীল। বিনয়ীভাব এবং লজ্জাশীলতা ছিল উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লজ্জাশীলতা সম্পর্কে বললেন: আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমাশীল বা দয়ালু হলো আবু বকর, ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী ওমর, সর্বাধিক বিনয়ী উসমান, ইসলামে হালাল ও হারামের ব্যাপারে অত্যধিক পণ্ডিত হলো মুয়াজ ইবনে জাবাল, কুরআন সম্পর্কে পণ্ডিত হলো উবাই, উত্তরাধিকারীর সম্পত্তি বণ্টন সম্পর্কে অত্যধিক জ্ঞানী হলো যায়িদ বিন সাবিত। প্রত্যেক জাতির একজন গোপনীয় কাজের সংরক্ষক রয়েছে; এই জাতির গোপনীয় বিষয়ের সংরক্ষক উবাই ইবনে আল জাররাহ। তার বিনয়ের একটি নিদর্শন হলো- তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে কখনো বাহনে আরোহন করতেন না। আরোহী অবস্থায় তার সাথে দেখা হলে বাহন থেকে নেমে যেতেন।[৭২]

৫. ওহী লিখন

তাঁর লিখন পারদর্শিতার জন্য রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ওহী লেখার কাজে নিযুক্ত করেন। কোনো আয়াত নাযিল হলে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডেকে এনে সঙ্গে সঙ্গেই লিখিয়ে নিতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন : একবার রাতে ওহী নাযিল হয়। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে লেখার নির্দেশ দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ নির্দেশ পালন করলেন।

৬. রচনাশৈলী

হাদিস ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যে সমস্ত ফরমান ও পত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে সেগুলো থেকে তাঁর রচনাশৈলী সম্পর্কে অনুমান করা যায়। দুঃখের বিষয়, অনুবাদের মাধ্যমে উপস্থাপিত করার জন্য তাঁর রচনার মাধুর্য ও অলংকারিত্ব

---

[৭২] আত তাবইন ফিল আনসাবিল কারশিয়ীয়ন, পৃ. ১৫৩।

অনুধাবন করা সম্ভব নয়। খিলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হবার পর তিনি সারা দেশে যে সমস্ত ফরমান পাঠান তন্মধ্যে একটির কয়েকটি বাক্য নিচে উদ্ধৃত হলো :

اِنَّا بَلَغْتُمْ بِالْاِقْتِدَاءِ وَالْاِتِّبَاعِ فَلَا تَلْفَتَنَّكُمُ الدُّنْيَا عَنْ اَمْرِ كُمْ فَاِنَّ اَمْرَ هٰذِهِ لِاُمَّةٍ صَائِرٍ اِلَى الْاِبْتِدَاعِ بَعْدَ اِجْتِمَاعِ ثُلُثٍ فِيْكُمْ تَكَامُلُ النِّعَمِ وَبُلُوْغُ اَوْلَادِكُمْ مِنَ السَّبَايَا وَقِرَاةُ الْاَعْرَابِ وَلَا عَاجِمِ الْقُرْاٰنَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) وَقَالَ اَلْكُفْرُ فِى الْعُجْمَةِ فَاِذَا اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِمْ اَمْرٌ تَكَلَّفُوْا وَابْتَدَعُوْا۔

"আনুগত্য ও নির্দেশ পালন করার জন্য তোমরা এ মর্যাদা লাভ করেছ। কাজেই পার্থিব স্বার্থের প্রত্যাশা যেন তোমাদেরকে নিজেদের উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়। মুসলমানদের মধ্যে তিনটি কারণ একত্রিত হবার পর বিদ'আতের সিলসিলা শুরু হয়ে যাবে। অর্থের প্রাচুর্য, বাঁদীদের গর্ভজাত সন্তানদের সংখ্যাধিক্য এবং গ্রামীণ আরবী ও আজমীদের কুরআন পাঠ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অনারব প্রবৃত্তির মধ্যে কুফরী অবস্থান করছে। কারণ যখন তারা কোনো কথা বুঝতে পারে না তখন (অনর্থক) ইচ্ছা করেই নতুন নতুন কথা তৈরি করে নেয়।"

শাসনকর্তাদের কাছে প্রেরিত আর একটি ফরমানে তিনি বলেন :

لِيَشْكُنْ اَئِمَّتِكُمْ اَنْ يَصِيْرُوْا جُبَاةً وَلَا يَكُوْنُوْا دُعَاةً فَاِذَا عَادُوْا كَذٰلِكَ اِنْقَطَعَ الْحَيَاءُ وَالْاَمَانَةُ وَالْوَفَاءُ اِلَّا وَاِنَّ اَعْدَلَ السَّيْرَةِ اِنْ تَنْظُرُوْا فِىْ اُمُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَفِيْمَا عَلَيْهِمْ فَتُعْطُوْهُمْ مَالَهُمْ وَتَأْخُذُوْهُمْ بِالَّذِىْ عَلَيْهِمْ۔

"শীঘ্রই তোমাদের নেতৃবর্গ তত্ত্বাবধায়কদের পরিবর্তে কেবল তহশীলদারে পরিণত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় লজ্জা, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা খতম হয়ে যাবে। তবে মুসলমানদের লাভ-লোকসানের প্রতি নজর রাখা, তাদেরকে তাদের অধিকার দান করা, তাদের কাছ থেকে যা গ্রহণ করা উচিত তা গ্রহণ করা তোমাদের জন্য উত্তম।"

৭. হাদিস চর্চা

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যে সমস্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন, তন্মধ্যে মরফূ হাদি সের সংখ্যা অন্য সাহাবার তুলনায় অনেক কম। তিনি মোট ১৪৬টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে তিনটি হাদিস বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। আটটি হাদিস কেবল বুখারীতে এবং পাঁচটি কেবল মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে বুখারী ও মুসলিমে তাঁর মোট ১৬টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।[৭৩] তাঁর এত কমসংখ্যক হাদিস বর্ণনা করার কারণ হচ্ছে এই যে, হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তিনি বলতেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে এ চিন্তা আমাকে বাধা দান করতো যে, সম্ভবত অন্যান্য সাহাবার তুলনায় আমার স্মরণশক্তি বেশি শক্তিশালী নয়; কিন্তু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি– যে ব্যক্তি আমি যে কথা বলিনি তা আমার সাথে সম্পর্কিত করবে, সে জাহান্নামে নিজের স্থান বানিয়ে নিয়েছে। এজন্য হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আবদুর রহমান ইবনে হাতেব বর্ণনা করেছেন : আমি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ন্যায় পূর্ণ বক্তব্য পেশকারী দ্বিতীয় কোনো সাহাবা দেখিনি, কিন্তু হাদিস বর্ণনা করতে তিনি ভয় করতেন।

৮. ফিকাহ ও ইজতিহাদ

তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ন্যায় নেতৃস্থানীয় মুজতাহিদ না হলেও রীয়ত ও ধর্মীয় বিষয়াবলিতে মুজতাহিদ পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। অন্যান্য মুজতাহিদ সাহাবার ন্যায় তাঁর ইজতিহাদ ও ফয়সালাসমূহও বিভিন্ন আছার গ্রন্থসমূহে (সাহাবাগণের বাণী ও জীবনীসংক্রান্ত গ্রন্থ) উল্লিখিত হয়েছে। লোকেরা তাঁর কথা ও কর্ম থেকে সনদ গ্রহণ করত। বিশেষকরে হজের আরকান ও মাসায়েল সম্পর্কিত জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। এ জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর পরে ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্থান। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খিলাফত আমলেও উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছ থেকে ফতওয়া চাওয়া হতো এবং জটিল বিষয়সমূহে তাঁর মতামত গ্রহণ করা হতো।

একবার ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কায় গেলেন এবং কা'বাগৃহে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তির উপর নিজের চাদর নিক্ষেপ করলেন। ঘটনাক্রমে তার উপর একটি কবুতর উড়ে এসে বসল। কবুতর মল ত্যাগ করে চাদরটি নোংরা করে দিতে পারে– এ ভয়ে তিনি চাদরটি টেনে নিলেন। কবুতর উড়ে গিয়ে অন্যত্র বসল। সেখানে একটি সাপ তাকে কামড়ালো। ফলে তৎক্ষণাৎ কবুতরটি মারা গেল। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর

৭৩

সম্মুখে এ বিষয়টি উপস্থাপিত করা হলে তিনি কাফফারা দেবার ফতওয়া দিলেন। কারণ কাপড় টেনে নেওয়ার ফলে কবুতরটি সংরক্ষিত স্থান থেকে একটি অসংরক্ষিত স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল।

খিলাফতের দায়িত্বে আসীন হবার পর পরই উসমান -এর সম্মুখে হরমুযানের হত্যার মোকদ্দমা পেশ করা হলো। আসামি ছিলেন উবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর । এ মোকদ্দমার ফায়সালাটিকেও একটি ইজতিহাদ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে সমকালীন শাসকই হবেন তার অভিভাবক। এ হিসেবে হরমুযানের কোনো উত্তরাধিকারী না থাকার জন্য অভিভাবক হিসেবে উসমান কিসাসের পরিবর্তে দীয়াত বা আর্থিক ক্ষতি পূরণ গ্রহণ করতে রাজি হলেন এবং এ অর্থও নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দান করে বায়তুল মালে দাখিল করলেন।[৭৪]

উসমান নিজের অনেক ইজতিহাদের মাধ্যমে অনেক কঠিন বিষয় সহজ করে দেন। যেমন দীয়াতের ক্ষেত্রে উট দিবার রেওয়াজ ছিল কিন্তু উসমান উটের পরিবর্তে তার মূল্য দান করাও বৈধ বলে গণ্য করেন।

তাঁর কোনো কোনো ইজতিহাদের সাথে অন্যান্য মুজতাহিদ সাহাবার মতবিরোধও ছিল কিন্তু উসমান নিজের মতকে নির্ভুল মনে করতেন বলে নিজের ইজতিহাদ প্রত্যাহার করেননি। যেমন তিনি লোকদেরকে 'তামাত্তু হজ' অর্থাৎ হজ ও ওমরাহর জন্য আলাদা আলাদা নিয়ত করতে নিষেধ করতেন, কারণ তখন তার বৈধ হবার কারণ অর্থাৎ কাফিরদের ভয়ের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু আলী একথা স্বীকার করতেন না। অনুরূপভাবে উসমান মনে করতেন, কোনো ব্যক্তি হজের সময় অবস্থানের নিয়ত করলে তাকে মীনায়ও পূর্ণ চার রাকাত নামায পড়তে হবে। আলী মীনায় কসর করা অর্থাৎ ফরয নামায চার রাকাতের পরিবর্তে দু'রাকাত পড়া জরুরি মনে করতেন। উসমান ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা অবৈধ গণ্য করতেন। কারণ রাসূলে করীম -এর কাছ থেকে তিনি এর নিষিদ্ধকরণের কথা শুনেছিলেন। কিন্তু আলী ও অন্যান্য সাহাবা এর বৈধতার ফতওয়া দিতেন। উসমান বায়েন তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে ইদ্দতের মধ্যে উত্তরাধিকারী গণ্য করতেন। কারণ তাঁর মতে ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক কায়েম থাকে। কিন্তু আলী -এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করতেন। উসমান মনে করতেন, কোনো ব্যক্তি ইদ্দতের মধ্যে কোনো স্ত্রীলোককে বিবাহ করলে সে দণ্ডনীয় অপরাধ করল। কারণ কুরআনে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। হযরত উসমান -এর আমলে এক ব্যক্তি এ কাজ করলে তিনি তাকে

---

[৭৪] আত তাবারী, খ. ৪, পৃ. ২৩৯।

দেশ থেকে নির্বাসিত করেন। আলী এ কাজকে শরীয়তের দিক থেকে দণ্ডনীয় মনে করতেন না।[৭৫]

এভাবে আরো বিভিন্ন মাসায়েলেও উসমান, আলী ও অন্যান্য সাহাবার মধ্যে মতবিরোধ ছিল। কিন্তু তাঁদের এ মতবিরোধের পেছনে কোনো ব্যক্তিস্বার্থ বা আক্রোশ ছিল না। কিন্তু তাঁদের সহিষ্ণুতা ও আন্তরিক নিষ্কলুষতা এত দূর পৌঁছে গিয়েছিল যে, উসমান যখন মীনায় দু'রাকাতের পরিবর্তে চার রাকাত নামায পড়লেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন : যদিও আমার মতে কসর করা অপরিহার্য তবুও আমি কার্যত আমীরুল মু'মিনীনের বিরোধিতা করব না। কাজেই তিনি নিজেও দু'রাকাতের পরিবর্তে পূর্ণ চার রাকাত পড়লেন। অনুরূপভাবে উসমান যখন অন্যান্য সাহাবার মধ্যে বিভিন্ন মাসায়েলে মতবিরোধ দেখলেন, তখন তিনি বললেন : প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে যেটি সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, সেটির ওপর আমল করার তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে, আমি কাউকে আমার মত মেনে নিতে বাধ্য করব না। কোনো কোনো অজ্ঞ লোক উসমান -এর কোনো মাসায়েলে আপত্তি জানালে তিনি বলেন : আল্লাহর কসম, আমরা সফরে রাসূলে করীম -এর সাথে থাকতাম। আমরা অসুস্থ হলে তিনি আমাদেরকে দেখতে আসতেন। তিনি আমাদের জানাযার পেছনে পেছনে চলতেন। আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে জিহাদ করতেন। কমবেশি যা কিছু হতো তাতে আমাদের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করতেন, আর এখন এমনসব লোক আমাদেরকে তাঁর (রাসূলের) সুন্নাত জানাতে উদ্যোগী হচ্ছে, যারা হয়ত কোনো দিন তাঁর চেহারাও দেখেনি।

৯. ফারায়েয বিদ্যা

উসমান ব্যবসায়ী ছিলেন বলে সম্ভবত অংকশাস্ত্রের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল গভীর। এর প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, ফারায়েয অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের ব্যাপারে অঙ্কের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি এবং এ শাস্ত্রটির সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। এ শাস্ত্রটির বিন্যাস ও প্রণয়নে তিনি যায়েদ ইবনে সাবিত -এর সহযোগী ছিলেন। কুরআন মজীদে 'যাবীল ফুরুজ' ও অন্য আত্মীয়দের বর্ণনা রয়েছে। উসমান ও যায়েদ ইবনে সাবিত নিজেদের ইজতিহাদী ক্ষমতার সাহায্যে দুটিকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে বর্তমান ফারায়েয শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। স্ব স্ব যুগে তাঁদের দুজনকে ফারায়েয শাস্ত্রের ইমাম মনে করা হতো। আবু বকর ও ওমর -এর আমলে তাঁরা মিরাস সম্পর্কিত বিবাদের মীমাংসা করতেন এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় জটিল সমস্যার

[৭৫] আল ইজতিহাদ ফিল ফিকহিল ইসলামী, পৃ. ১৪২।

সমাধান করতেন। কোনো কোনো সাহাবা ভয় করতেন যে, তাঁদের দুজনের মৃত্যুর পর হয়ত ফারায়েয শাস্ত্রের ক্ষেত্রে বিরাট সংকট দেখা দেবে।

১০. আল্লাহভীতি

আল্লাহভীতি সমস্ত গুণের উৎস। যে হৃদয় আল্লাহর ভয়ে ভীত নয় তার কাছ থেকে কোনো প্রকার নেকী ও সৎবৃত্তির আশা করা যেতে পারে না। উসমান প্রায়ই আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন। মৃত্যু, কবর ও পরকালের চিন্তা তাঁর সঙ্গী-সাথি ছিল। সম্মুখ দিয়ে জানাযা যেতে দেখলে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং চক্ষু থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অশ্রু নির্গত হতো।[৭৬] কবরস্থানের কাছ দিয়ে যাবার সময় কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি সিক্ত হয়ে যেতো। লোকেরা বলত : জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনায় তো আপনি অত বেশি কাঁদেন না। কবরস্থানের মধ্যে এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে, কবর দেখলে আপনি একেবারে অস্থির হয়ে পড়েন? জবাব দিতেন : রাসূলে করীম বলেছেন, "কবর আখিরাতের প্রথম মনজিল। এখানে সহজে নিষ্কৃতি লাভ করা সম্ভব হলে এরপর পরবর্তী মনজিলগুলোও সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে। আর যদি এখানে উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে তাহলে পরবর্তী সমস্ত মনজিলই কঠিন হয়ে পড়বে।"

১১. নবী-প্রেম

উসমান প্রায় সমস্ত যুদ্ধে রাসূলে করীম -এর সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর জন্য উৎসর্গিত প্রাণ হবার প্রমাণ পেশ করেছিলেন। রাসূলে করীম কে তিনি এতো বেশি ভালোবাসতেন যে, তাঁর দারিদ্র্য ও ফকিরী জীবনযাপন দেখে অস্থির হয়ে পড়তেন এবং সুযোগ পেলেই তাঁর কাছে তোহ্ফা ও হাদিয়া পেশ করতেন। একবার রাসূলে করীম -এর গৃহে চারদিন পর্যন্ত সবাই অভুক্ত ছিলেন। উসমান একথা জানতে পেরে কেঁদে ফেললেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রচুর খাদ্যসামগ্রী ও তিনশ দিরহাম নজরানা হিসেবে পেশ করলেন।

উসমান রাসূলে করীম -কে অত্যধিক সম্মান করতেন। যে হাত দিয়ে তাঁর হাতে বায়'আত করেছিলেন তা আর কোনো দিন নাপাকি বা নাপাকির স্থানে স্পর্শ করেননি। রাসূল -এর পরিবারবর্গ ও তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন। নিজের খিলাফতকালে ভাতাধারীদের জন্য রমযানের প্রতিদিনকার বিশেষ ভাতা নির্ধারণের সময় রাসূল -এর পবিত্র স্ত্রীগণের ভাতা সবার দ্বিগুণ করেন।

---

[৭৬] ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি এ সুগভীর প্রেম ও শ্রদ্ধার কারণে তাঁর প্রতিটি কথা ও কর্ম এমনকি তাঁর চলাফেরা, ওঠাবসা ও ঘটনাক্রমে অনুষ্ঠিত কোনো কর্মেরও অনুসরণ করে চলতেন। একবার ওযু করে হেসে ফেললেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল : হাসলেন কেন? জবাব দিলেন : একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওযু করার পর এভাবে হাসতে দেখেছিলাম। একবার সম্মুখ দিয়ে জানাযা যেতে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনি করতেন। একবার আসরের সময় সবার সামনে ওযু করে দেখিয়ে বললেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে ওযু করতেন। একবার মসজিদের অন্য দরজায় বসে ছাগলের গোশত আনিয়ে খেলেন এবং নতুন ওযু না করেই নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন : রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বসে খেয়েছিলেন এবং অনুরূপ করেছিলেন। হজের সময় তিনি অন্য একজন সাহাবির সঙ্গে তাওয়াফ করছিলেন। সাহাবি রুকনে ইয়ামানী চুম্বন করলেন কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চুম্বন করলেন না। সাহাবি তাঁর হাত ধরে ইয়ামানী চুম্বন করাতে চাইলেন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন : তুমি একি করছো? তুমি কি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাওয়াফ করনি? সাহাবি জবাব দিলেন : হ্যাঁ করেছি। জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি তাঁকে অনুরূপ করতে দেখেছ? সাহাবি জবাব দিলেন : না, দেখিনি। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন : তাহলে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসৃতিই কি সঙ্গত নয়? সাহাবি জবাব দিলেন : অবশ্যই সঙ্গত।

১২. লজ্জাশীলতা

লজ্জা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এজন্য ঐতিহাসিকগণ তাঁর চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে লজ্জার একটি বিশেষ শিরোনামা বেঁধেছেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও তাঁর লজ্জা প্রবণতার প্রতি নজর রাখতেন। একবার সাহাবাগণের সমাবেশে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃসংকোচে বসেছিলেন। তাঁর রানের কিছু অংশ উন্মুক্ত ছিল। এ অবস্থায় উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আগমনের খবর শোনলেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুছিয়ে বসলেন এবং রানের উপর কাপড় টেনে দিলেন। লোকেরা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জন্য এভাবে পরিপাটি হয়ে বসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন : উসমানের লজ্জাশীলতায় ফেরেশতারাও লজ্জা পায়। এ ধরনের আর একটি ঘটনা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-ও বর্ণনা করেছেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এত বেশি লজ্জাশীল ছিলেন যে, একাকী কোনো রুদ্ধ গৃহের মধ্যেও তিনি কখনো উলঙ্গ হতেন না।[৭৭]

---

[৭৭] ইবনু সাদ, খ. ৬, পৃ. ৫৯।

১৩. কৃচ্ছ্রসাধন

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে দুর্বল ছিলেন। এছাড়াও বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা এবং কিছুটা নিজের অভ্যাস অর্থাৎ প্রাচুর্য ও আরাম-আয়েশের মধ্যে প্রতিপালিত হবার কারণে মোটা কাপড় পরিধান ও শুষ্ক সাদামাঠা খাদ্য ভক্ষণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাই তিনি নরম খাদ্য খেতেন ও কোমল পোশাক পরিধান করতেন। কিন্তু তিনি বিলাসী জীবনযাপন করতেন বা আয়েশ-আরামের জন্য প্রাণপাত করতেন– এ ধারণা করার কোনো কারণই থাকতে পারে না; বরং ধন-দৌলতের অস্বাভাবিক প্রাচুর্যের পরও তিনি কোনো দিন আমিরি ও আয়েশী জীবনযাপন করেননি এবং নিছক সৌন্দর্য লাভের জন্য মনোরম সাজসজ্জা করেননি। কাযা নামক এক প্রকার উন্নত ধরনের রোমীয় বস্ত্র আরবে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ধনিক শ্রেণি ছাড়া মধ্যবিত্তরাও সেগুলো পরিধান করতে শুরু করেছিল। কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কখনো সেগুলো ব্যবহার করেননি এবং তাঁর অন্তঃপুরেও সেগুলো প্রবেশাধিকার পায়নি।

১৪. বিনয় ও নম্রতা

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র ও সরল ছিলেন। তাঁর গৃহে বহু গোলাম ও বাঁদী ছিল কিন্তু তবুও নিজের কাজগুলো তিনি নিজের হাতেই করতেন এবং এজন্য অন্যকে কষ্ট দিতেন না। রাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়তে উঠতেন, অন্য কেউ জাগ্রত না হলে নিজেই ওযুর সব ব্যবস্থা করে নিতেন, এজন্য কারোর নিদ্রা ভঙ্গ করে কষ্ট দিতে চাইতেন না। কেউ কঠোর ব্যবহার করলে বা কটু কথা বললে তিনি কোমল স্বরে তার জবাব দিতেন। একবার আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আলোচনাকালে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পিতার মর্যাদার প্রতি বক্রোক্তি করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কোমল স্বরে জবাব দিলেন : ইসলামের জামানায় আইয়ামে জাহিলিয়াতের প্রসঙ্গ কেন? অনুরূপভাবে একদিন জুম'আর সময় তিনি মিম্বরে খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। এমন সময় একদিক থেকে আওয়াজ এলো : হে উসমান, তওবা করো এবং অন্যায় থেকে বিরত হও। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখনই কিবলার দিকে ফিরে হাত উঠিয়ে বললেন :

اللهم انى اول تائب تاب اليك۔

"হে আল্লাহ্! আমি প্রথম তওবাকারী তোমার দিকে মুখ ফিরিয়েছি।"

তিনি মুসলমানদের ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে হামেশা ত্যাগের নিদর্শন পেশ করেছেন। নিজের খিলাফত আমলে বায়তুল মাল থেকে তিনি একটি কপর্দকও নেননি। এভাবে নিজের নির্ধারিত ভাতা সাধারণ মুসলমানদের জন্য দান করে দিয়েছিলেন।

১৫. দানশীলতা

উসমান আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। এই সঙ্গে আল্লাহ তাঁকে দানশীলও করেছিলেন। তিনি নিজের ধন-দৌলতের দ্বারা এমন এক সময় ইসলামকে সাহায্য করেছেন যখন ইসলামের সবচাইতে বেশি প্রয়োজন ছিল এবং যখন মুসলমানদের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ আর কোনো ধনী ছিল না।

মদিনায় একমাত্র রূমা কূপ ছাড়া আর সবকটিই ছিল নোনতা পানির কূপ। কিন্তু এ কূপটি ছিল জনৈক ইহুদির। উসমান জনসেবার খাতিরে ২০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করেছিলেন।[৭৮] অনুরূপভাবে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণে যখন মসজিদে নববীতে নামাযীদের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না, তখন উসমান বিপুল অর্থব্যয়ে মসজিদের পরিসর বৃদ্ধি করেন।

তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি হাজার হাজার দীনার খরচ করে মুজাহিদগণকে অস্ত্র সজ্জিত করেছিলেন। তিনি এমন এক সময় এ দানশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখান যখন একদিকে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন মুসলমানদেরকে পেরেশান করে রেখেছিল এবং অন্যদিকে রোম সম্রাটের যুদ্ধ প্রস্তুতিতে রাসূল নিজেও আশঙ্কাগ্রস্ত হয়েছিলেন।

প্রতি জুম'আর দিন তিনি একটি গোলাম আযাদ করতেন। বিধবা ও এতিমদের সাহায্য করতেন। মুসলমানদের অভাব ও দারিদ্র্য তাঁর অন্তরকে পীড়া দিত। একবার এক জিহাদে অভাব-অনটনের কারণে মুসলমানদের চেহারা শুকিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে মুনাফিকরা উৎফুল্ল বদনে চতুর্দিকে বুক টান করে বেড়াচ্ছিল। উসমান তখনই ১৪টি উটের পিঠে আহার্যদ্রব্য বোঝাই করে রাসূলে করীম -এর কাছে পাঠালেন এবং সেগুলো মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে বললেন।

১৬. আত্মীয়-বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার

তিনি আত্মীয়-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন এবং তাদের লালন-পালন করতেন। তাঁর চাচা হাকাম ইবনুল আসকে রাসূল তায়েফে নির্বাসিত করেছিলেন। উসমান রাসূলে করীম -এর কাছে সুপারিশ করে তাঁর অপরাধ মাফ করান এবং নিজের আমলে তাঁকে মদিনায় আনান। নিজের পকেট থেকে তাঁর সন্তানদেরকে একলাখ দিরহাম দান করেন এবং পুত্র মারওয়ানের সাথে নিজের কন্যার বিয়ে দেন। অতঃপর বিয়ের যৌতকস্বরূপ দম্পতিকে এক লাখ দিরহাম প্রদান করেন।

---

[৭৮] ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমের, আব্দুল্লাহ ইবনে আবী সারাহ, উসমান ইবনে আবীল আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আমির মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর নিকটতম আত্মীয় ছিলেন এবং তাঁর খিলাফত আমলে বড় বড় বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বন্ধু-বান্ধবদের সাথেও তিনি একই ব্যবহার করেন। বন্ধুদের প্রয়োজনে তাদেরকে বিপুল অর্থ ঋণ দিতেন। অনেক সময় তা আর ফেরত নিতেন না। একবার তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কাছ থেকে বহু টাকা ঋণ নেন। কিছুদিন পর তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঐ টাকা ফেরত দিতে এলে তিনি তা ফেরত নিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন : এটি তোমার সদ্ব্যবহারের পুরস্কার।

১৭. ধার্মিকতা

দিনের বেলা তিনি খিলাফতের কাজ-কারবারে ব্যস্ত থাকতেন আর রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকতেন। কখনো কখনো সারারাত জাগতেন এবং একই রাকাতে সমগ্র কুরআন মজীদ খতম করতেন।

একদিন-দুদিন অন্তর প্রায়ই তিনি রোযা রাখতেন। কখনো কখনো মাসের পর মাস রোযা রাখতেন এবং জীবনীশক্তি টিকিয়ে রাখার জন্য যতটুকু প্রয়োজন রাতে কেবল ততটুকুই খেতেন।

প্রতি বছর হজ করতে যেতেন তিনি। নিজে আমিরে হজের দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু নিজের খিলাফত আমলে তিনি এক বছরও হজ থেকে বিরত থাকেননি। তবে যে বছর শহীদ হন সে বছর অবরুদ্ধ থাকার জন্য তিনি হজ করে যেতে পারেননি।

১৮. পরিচ্ছন্নতা

তিনি প্রকৃতিগতভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিলেন। মুসলমান হবার পর তিনি প্রতিদিন গোসল করতেন। ভালো ও পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করতেন ও আতর লাগাতেন। ইবনে সায়াদ তাঁর গ্রন্থে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পোশাকসংক্রান্ত পৃথক শিরোনামা লাগিয়েছেন। তিনি ভালো কাপড় ব্যবহার করতেন ঠিকই কিন্তু এতে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না। যেসব পোশাক অহংকার ও আত্মম্ভরিতার জন্ম দেয় সেগুলো থেকে তিনি সুস্পষ্ট দূরে অবস্থান করতেন। আরবের ধনিক শ্রেণিতে সাধারণত নুফত নামক এক প্রকার বিশেষ রোমীয় বস্ত্রের ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু তিনি কোনোদিন তা ব্যবহার করেননি এবং নিজের অন্তঃপুরেও তা প্রবেশ করাননি। সারাজীবন পায়জামা পরেননি। কেবল শাহাদতের সময় সতর ঢাকবার উদ্দেশ্যেই তা পরিধান করেছিলেন, সাধারণত তহবন্দ পরতেন। জনৈক তাবেয়ী বর্ণনা করেছেন : জুম'আর দিন তাঁকে মিম্বরের উপর দেখলাম। তখন তিনি যে মোটা তহবন্দ পরেছিলেন তার দাম পাঁচ দিরহামের (এক টাকা) বেশি ছিল না।

১৯. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে কুরআনের বাণী

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যাপারেও কুরআনুল কারীমের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তাবুকের যুদ্ধের ঘটনা এমন সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, যখন মদিনা মুনাওয়ারায় তীব্র খাদ্যসংকট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সাধারণ মানুষ ব্যাপক অর্থ সংকটে জর্জরিত ছিল। এমনকি মানুষ গাছের পাতা খেয়ে কালাতিপাত করেছিল। এ কারণেই এ যুদ্ধের সৈন্যদেরকে জায়শুল উসরা বা নিঃস্ব সৈন্য বলা হয়। তিরমিযী শরীফে আবদুর রহমান বিন খাব্বার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এমন সময়ে উপস্থিত হলাম, যখন তিনি জায়শুল উসরা বা নিঃস্ব সৈন্যগণের সাহায্যর্থে মানুষকে উৎসাহিত করছেন। তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর হৃদয় জাগানো উৎসাহমূলক শব্দ শ্রবণে দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একশত উট সরঞ্জামাদিসহ আল্লাহর রাস্তায় পেশ করব। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সৈন্য-সামন্তের খরচাদির ব্যাপারে উৎসাহিত করতে সহযোগিতার ব্যাপারে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। আবারো উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি দুইশত উট যুদ্ধ-উপকরণাদিসহ আল্লাহর পথে উৎসর্গ করব। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় যুদ্ধের উপকরণের ব্যাপারে উপস্থিত জনগণকে সাহায্যের জন্য অনুপ্রাণিত করলে আবার উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি তিনশত উট যুদ্ধসামগ্রীসহ আল্লাহর রাস্তায় হাযির করব। হাদিসের বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বিন খাব্বাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আমি দেখলাম যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বাক্যটি পুনরাবৃত্তি করতে করতে মিম্বর থেকে অবতরণ করতে লাগলেন, "এখন উসমানকে ওই আমল কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, যা সে এর পরে করবে।[৭৯]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর এ আমল এত উঁচুমানের ও এতই মকবুল হয়েছিল যে, যদি তিনি আর কোনো নফল ইবাদত না-ও করেন, তারপরও এ আমলটি তাঁর সুউচ্চ পদমর্যাদার জন্য যথেষ্ট। এ মকবুলিয়্যতের পর তাঁর কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই।[৮০]

আবদুর রহমান বিন সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জায়শুল উসরা'র রণ প্রস্তুতিকালে এক হাজার দীনার স্বীয় জামার আস্তিনে এনেছিলেন (এক দীনার সমান সাড়ে চার মাশা সমপরিমাণ স্বর্ণ-মুদ্রা) এসব স্বর্ণ-মুদ্রা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোলে অর্পণ করেছিলেন। আবদুর রহমান বিন সামুরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি দেখেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই দীনারগুলো নিজের কোলে ওলট-পালট করে

---

[৭৯] তিরমিযী : আস্ সুনান, ১২/১৬১; সুয়ূতী : তারিখুল খোলাফা, পৃ. ৬১; তাবরিযী : মিশকাত, পৃ. ৩২৩;
[৮০] তাবরিয়ী : মিশকাত, পৃ. ৫৬১;

দেখছিলেন এবং বলছিলেন, আজকের পর উসমানকে তাঁর কোনো আমল ক্ষতি করবে না, দু'বার বললেন।[৮১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারে বাক্যটি দু'বার এরশাদ করেছেন। অর্থাৎ উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-র যদি কোনো ভুলত্রুটি সংঘটিত হয় তাহলে আজকের এ আমল তাঁর ভুলের কাফ্ফারা হয়ে যাবে।[৮২]

তাফসীরে খাযেন ও তাফসীরে মা'আলিমুত তানযিলে রয়েছে, যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জায়শুল উসরা'র এক হাজার উট ও যাবতীয় যুদ্ধ-সামগ্রী প্রদান করলেন এবং এক হাজার দীনারও দান করলেন, আবদুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও চার হাজার দীনারের সদকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে প্রদান করলেন, তখন এই দুই মহান ব্যক্তির ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতে করীমা অবতীর্ণ হয়–

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"যারা স্বীয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, অতঃপর না এর কথা বলে বেড়ায় এবং না কাউকে কষ্ট দেয়, তাদের প্রতিদান স্বীয় প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। না তারা ভীত হবে, না শঙ্কিত।"[৮৩]

আল্লামা ইসমাঈল হক্কী লিখেছেন, মদিনা শরীফে একজন মুনাফিক বসবাস করত। তার একটি গাছ একজন আনসারী প্রতিবেশীর জায়গায় ঝুঁকে পড়ে, ফলে ওই গাছের ফল আনসারীর ঘরের পাশে ঝরে পড়ত। আনসার সাহাবি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ ব্যাপারে অভিযোগ করলেন, তখনও ওই মুনাফিকের কপটতা লোক-সম্মুখে প্রকাশিত হয়নি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি আনসারীকে গাছটি দিয়ে দাও, এর বিনিময়ে তোমার জান্নাতের বৃক্ষ মিলবে। কিন্তু মুনাফিক ব্যক্তিটি আনসারীকে গাছটি দিতে অস্বীকার করল। যখন এ সংবাদ উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুনলেন যে, ওই মুনাফিক হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদেশ পালন করেনি, তৎক্ষণাৎ তিনি নিজের একটি বাগানের বিনিময়ে গাছটি ক্রয় করে আনসারীকে দিয়ে দেন। এমতাবস্থায় উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর প্রশংসা এবং মুনাফিকের নিন্দায় নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়,

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى.

---

[৮১]. তিরমিযী : আস্ সুনান, ১২/১৬২; সুয়ূতী : তারিখুল খোলাফা, পৃ. ৬১;

[৮২]. তাবরিযী : মিশকাত, পৃ. ৫৬১;

[৮৩]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/২৬২;

"যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে, আর তা উপেক্ষা করবে যে নিতান্ত হতভাগা, সে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করবে।"[৮৪]

এ আয়াতে (مَنْ يَخْشَى) দ্বারা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং (الْأَشْقَى) দ্বারা ঐ বৃক্ষের মালিক মুনাফিক লোকটিকে বোঝানো হয়েছে।[৮৫]

২০. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে হাদিসের বাণী

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। তাঁর সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، مَعَ بَلْوَى تُصِيبُهُ

"তাকে প্রবেশের অনুমতি দাও আর তার ওপর আপতিত বিপদ সত্ত্বেও তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।"[৮৬]

আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ওমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উহুদ পাহাড়ে ওঠলেন। পাহাড়টি হঠাৎ কেঁপে ওঠল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اسْكُنْ أُحُدُ أَظُنُّهُ ضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ . فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ. وَصِدِّيقٌ. وَشَهِيدَانِ

"শান্ত হও উহুদ ! রাবী বলেন, আমার ধারণা তিনি পা দিয়ে আঘাত করলেন। তোমার ওপর এক নবী, এক সিদ্দিক ও দুই শহীদ ছাড়া কেউ নেই।"[৮৭]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে দেখে ফেরেশতারা লজ্জা পেত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ

"যে ব্যক্তিকে দেখে ফেরেশতারা লজ্জা পায় আমি কি তাকে দেখে লজ্জা পাব না?"[৮৮]

---

[৮৪].আল কুরআন : সূরা আ'লা, ৮৭/১০;

[৮৫].তাফসীরে রুহুল বয়ান, ১০/৪০৮;

[৮৬] সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৪০৩

[৮৭]. সহীহুল বুখারী, হাদিস নং : ৩৬৯৯।

[৮৮]. সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৪০১।

অধ্যায়-৯

খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর শাহাদতের কারণ ও ঘটনাপ্রবাহ

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর খিলাফতের শেষ ছয় বছর ছিল সংকটময়। রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অচলাবস্থা ও গোলযোগপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করা হয়। তাঁর বিরোধীরা নানা অজুহাত দেখিয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। অবশেষে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর হত্যাকাণ্ড ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা। ঐতিহাসিকগণ উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যেসব কারণ চিহ্নিত করেছেন তা হলো–

১. অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা

ইতিহাসগ্রন্থে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর খিলাফতকালকে বিশেষভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ৬ বছর তিনি খুব ভালোভাবে অতিক্রম করেছেন। এরপর গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। তিনি ১২ বছর খিলাফতের দায়িত্বে ছিলেন। এটি খুব সহজে বলা যায় যে, প্রথম ছয় বছর উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ছিলেন খুবই জনপ্রিয় আর পরবর্তী ছয় বছর ছিল একেবারে প্রথমদিকটার উল্টো ঘটনা। অন্যভাবে বলা যায় তাঁর খিলাফত আমলে শেষের দিকে অস্বস্তির জোয়ার বইতে থাকল, যা ইসলামের শত্রুরা পরিপূর্ণভাবে অশান্তি তৈরি করার উদ্দেশ্যে তৈরি করেছে। এই বিশৃঙ্খলা মাত্রাতিরিক্তভাবে দেখা দেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর বয়ঃবৃদ্ধ এবং শান্তশিষ্ট খিলাফত পরিচালনা। যার ফলশ্রুতিতে তাঁকে শত্রু কর্তৃক ৩৫ হিজরি তথা ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে শাহাদত বরণ করতে হয়।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর খিলাফতের প্রথম দিকটা ছিল খুবই শান্তিপ্রিয়। এ সময় মুসলমানরা একে একে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল। যার বর্ণনা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। আরএই খিলাফতকালই ইসলাম ধর্মকে বিশ্বে সর্ববৃহৎ ধর্মের স্বীকৃতি এনে দেয়। যদিও উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর খিলাফতের শেষের দিকটা অত্যন্ত ভয়াবহভাবে বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। যা মূলত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে হত্যা করার দিকে অগ্রসর হয়। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খুবই ভদ্র এবং কোমল হৃদয়ের অধিকারী। প্রথম ছয় বছর লোকজন তাঁকে কোনো ব্যাপারে অভিযুক্ত করেনি। এমনকি তিনি কুরাইশদের নিকট ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর চেয়ে বেশি বিশ্বস্ত ছিলেন। কারণ ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাদের সাথে অত্যন্ত কঠিন আচরণ করেছেন। অন্যদিকে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

তাদের সাথে অত্যন্ত উদার আচরণ করেন। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ বলে থাকেন উসমান -এর শেষ সময়ে বিভিন্ন ফিতনার উদ্ভব ঘটে যার শেষ পরিণতি উসমান -এর শাহাদত বরণের মধ্য দিয়ে নতুন মাত্রায় অগ্রসর হতে থাকে।

আরবী শব্দ ফিতান, যা ফিতনা শব্দের বহুবচন। এটি একটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। ফিতনা শব্দটি বলতে বোঝায় সোনা এবং রূপাকে আগুন দিয়ে পৃথক করা। অর্থাৎ ভালো থেকে খারাপ পৃথক করা। এটা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি ব্যক্তিকে মূলত যাচাই-বাছাই করা সম্ভব। বর্তমান ধারণা থেকে এর অর্থ এসেছে মূলত প্রলোভন থেকে যা মানুষকে বিশৃঙ্খলা, অস্বস্তি, দোলাচলে এবং বিদ্রোহের দিকে ধাবিত করে। আবু বকর, ওমর এবং উসমান কিছুই তাদেরকে আলাদা করতে পারেনি। পরবর্তীতে উসমান -এর শাসনামলের শেষের দিকে কিছু মন্দ লোক তাঁকে হত্যা করে। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে মুসলমানরা বিভক্তিতে জড়িয়ে পড়ে। উসমান -এর আমলে উত্তর আফ্রিকার সীমান্ত এপার-ওপার খুবই সচেতনভাবে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনার জন্য খোলা রাখা হয়েছে।

উসমান -এর খিলাফতকালে পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বদিকে মুসলমানদের বিজয় হতে লাগল এবং যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মাল রাষ্ট্রীয় কোষাগার-বাইতুল মালকে খুবই সমৃদ্ধ করতে লাগল। লোকজনের হাত সর্বদাই ধন-সম্পদে ভরপুর থাকত। মানুষের এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সমাজে প্রভাব ফেলতে শুরু করে; যার কারণে মানুষ সম্পদের প্রতি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের প্রতিযোগিতা এবং হিংসা এই দুয়ের মাঝে একটি সীমানা তৈরি করে দেয়। বিশেষকরে যাদের অন্তরে বিশ্বাসের দুর্বলতা ও অস্বচ্ছতা ছিল এবং যে ব্যক্তি খোদাভীরু নয় যেমন অন্ধকার যুগের আরববাসীর ন্যায়। এই পরিবর্তনের প্রভাব সর্বপ্রথম সীমান্ত এলাকায় পরবর্তীতে যা খিলাফতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে নাড়া দিতে থাকে। উসমান মুসলমানদের নেতৃত্ব স্থানীয়দেরকে তার উপদেশ স্মরণ করিয়ে দেন যে, আপনারা বৈষয়িক কোনো বিষয়ে জড়িয়ে পড়বেন না।

উসমান অত্যন্ত সচেতনভাবে ইসলামি রাষ্ট্রে উদ্ভূত সমস্যার মোকাবিলা করেন এবং তিনি একদা তাঁর সেনাপতির একটা চিঠি প্রেরণ করেন: "লোকজন বিভিন্ন দিকে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে, স্বার্থপরতা তাদের ভেতরে খুব শক্তভাবে বিস্তর জায়গা নিয়ে বিচরণ করছে। এর পেছনে আমি তিনটি কারণ দেখতে পাচ্ছি : (১) দুনিয়ার মোহ ও ভালোবাসা, (২) খেয়ালিপনা ও অবাধ স্বাধীনতা এবং (৩) অত্যধিক হিংসা পরায়ণতা। যা অতিশীঘ্রই অশান্তি এবং গোলযোগ সৃষ্টি করবে।"

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র এবং দয়ালু ব্যক্তি। লোকেরা শান্তশিষ্ট স্বভাবজাত আচরণকে কাজে লাগিয়ে অসন্তোষ সৃষ্টি করার মাধ্যমে সুবিধা আদায় করতে চেয়েছিল। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির মানুষ তিনি তাঁর প্রতি যেমনি কঠোর ছিলেন তেমনি তাঁর অধীনস্থদের প্রতিও ছিলেন কঠোর। অন্যদিকে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সকলের সাথে অত্যন্ত সাধারণ এবং কোমল স্বভাবের আচরণ করতেন। তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো তাঁর প্রতি এবং অন্যদের প্রতি কঠোর আচরণ করতেন না। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই বলেন, "আল্লাহ তা'আলা ওমরকে ক্ষমা করুক, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যেমনটি করেছিলেন আল্লাহ কি তার সাথে সেরূপ আচরণ করবে?"

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কোমল আচরণ প্রাদেশিক গভর্নরদেরকে সাহসী বানিয়েছে, রাজনৈতিক অসন্তোষের কারণে প্রদেশগুলো ধূসর হতে লাগল। যা প্রকৃত অর্থে ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামি অর্থনীতিকে ইসলামের বিরুদ্ধ শক্তির হাতে চলে গিয়েছিল যা তারা মুসলমানদের মোকাবিলা করার জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিল। আর অতিশীঘ্রই তারা এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারল। তারা তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য বের করে দিল এবং বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়াতে লাগল।

২. আদর্শচ্যুতি ও বিজ্ঞ সাহাবিদের অনুপস্থিতি

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফত কালের শেষের দিকে বড় বড় বিজ্ঞ সাহাবি ইন্তেকাল করতে থাকেন। সাহাবিদের আদর্শ, ত্যাগ ও চরিত্র সাধারণ মানুষের প্রেরণার উৎস ছিল। বড় বড় সাহাবি প্রথম খলিফা ও দ্বিতীয় খলিফাকে প্রশাসন চালাতে নানাভাবে উপদেশ ও সাহায্য করতেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উদারতার পরিচয় দিয়ে সাহাবীদেরকে মদীনা ত্যাগের অনুমতি দেন। ফরে সাহাবীরা বিভিন্ন স্থানে গমন করলে তাদেরকে কেন্দ্র করে তাদের অনিচ্ছা থাকা স্বত্ত্বেও একটি সূক্ষ্ম বিভক্তির সূত্রপাত হয়।[৮৯] তাঁদের অনুপস্থিতিতে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিভিন্ন পরামর্শ থেকে বঞ্চিত হন।

৩. অমুসলিম সম্প্রদায়ের অসন্তোষ

ইসলামের উন্নতি ও অগ্রযাত্রা অমুসলিম সম্প্রদায় বিশেষকরে ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকেরা ভালো চোখে দেখেননি। পূর্ণ ধর্মীয় ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও এরা সবসময় ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সময়ে তারা বিদ্রোহীদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্রে যোগদান করে।

---

[৮৯] ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪।

৪. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উদারতা

খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উদারতা ও সরলতা তাঁর বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। অনেক সময় ঘোর অপরাধীকেও শাস্তি না দিয়ে তিনি ক্ষমা করে দিতেন। এ উদারতার সুযোগে দুষ্কৃতকারীরা বিদ্রোহের সাহস পায়। মানুষকে তিনি অবিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি অপরাধী ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শাস্তি বিধানে সমর্থ হলে তাঁর এ নির্মম পরিণতি হতো না। ধর্মপরায়ণ ও সৎলোক হলেও তিনি খুব নরম চরিত্রের লোক ছিলেন, অনর্থক দুঃখ, কষ্ট ও রক্তক্ষয় তিনি পছন্দ করতেন না।

৫. কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ

অবস্থার পরিবর্তন ও কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল। কেন্দ্রীয় শাসন অনভ্যস্ত দুরন্ত আরবদের কাছে ভালো লাগেনি। তাছাড়া উসমানের সময়ে বিজয় অভিযান বন্ধ রাখা হয়। যুদ্ধ বন্ধ হওয়াতে তাদের অলসভাবে সময় কাটাতে হয়, যা তারা পছন্দ করত না। বার্নাল লুইস এ ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন যে, "এ বিদ্রোহ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যাযাবরদের বিদ্রোহ, যা কেবল উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের বিরুদ্ধে নয়, যেকোনো ব্যক্তির পরিচালিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ।"

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার কূটনীতি

ইবনে আস সাওদা নামে পরিচিত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ছিল একজন ইহুদি। সে ছিল সানার অধিবাসী। সে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালের একজন নামধারী মুসলমান। সে মিশর, ইরাক এবং সিরিয়ায় দৃশ্যত সক্রিয় ছিল। সে মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম থেকে দূরে রাখতে এবং খলিফার প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ করতে ধ্বংসাত্মক কূটনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সে তাদের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যককে নিয়ে আলাদা একটি দল তৈরি করে। তার একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অনুসারী ছিল। তারা মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করে তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা কিছুসংখ্যক বিশ্বাসীদের (মুসলমান) ডাকল এবং ঘোষণা করল যে, সে এবং তার জাতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবারকে ভালোবাসে। সে নিজেকে বিশ্বাসী হিসেবে উপস্থাপন করে, সে নিজে তার সম্পর্কে একটি অলীক কাহিনী তৈরি করে। পরবর্তীতে সে তার ঘৃণ্য ও হিংসাত্মক চরিত্র প্রকাশিত করল। সে মুসলমান সমাজে নতুন নতুন আচার-আচরণ আনয়ন করল, যাতে করে তাদের মধ্যকার একতা নষ্ট হয় এবং এর ভেতর দিয়ে সে মুসলিম সমাজে ফিতনার উদ্ভব ঘটানো শুরু করল। সে মুসলমানদের মাঝে বিভক্তির সূত্রপাত

করল, যা উসমান রা.-এর হত্যার অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্যতম। কিছু সাহাবিকে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা আহ্বান করে :

১. এটা একটি অদ্ভুত বিষয় যে, মানুষেরা বিশ্বাস করে ঈসা আ. ফিরে আসবে, কিন্তু মুহাম্মদ সা. ফিরে আসবে, এটা তারা বিশ্বাস করে না। সে বলে কিন্তু পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসার ব্যাপারে ঈসা আ. থেকে মুহাম্মদ সা. বেশি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত, সে তার এই মতের ব্যাপারে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উপস্থাপন করে, কিন্তু সে ঐ আয়াতগুলোকে তার মিথ্যা দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অপব্যাখ্যা করে।[৯০]

২. সে তার বিশ্বাসের উপযোগী করে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ভুল বা অপব্যাখ্যা করে এবং এগুলোকে তিরস্কার করে।

৩. সে অনর্থক অভিযোগ করে যে, রাসূল সা. আলী রা.কে খিলাফতের উত্তরাধীকারী মনোনীত করে গেছেন। সে একথাও বলত যে, পূববর্তী নবীগণ যেভাবে উত্তরাধীকারী মনোনীত করে যেতেন রাসূল সা.ও সেভাবে আলী রা.কে খলিফা মনোনীত করে গেছেন।

যখন সে তার অনুসারীদের অন্তরে এ বিষয়টি ভালোভাবে বিশ্বাস করাতে পেরেছে, তখন সে তার মূল উদ্দেশ্যের দিকে নজর দেয়। আর তা হলো- মানুষজনকে উসমান রা.-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা। সে তার অনুসারী এবং মানুষদেরকে বলতে শুরু করল কে আল্লাহর নবী সা.-এর দৃষ্টিতে অত্যধিক গ্রহণযোগ্য? আলী রা.কে একপাশে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার মতো আর কে আছে, যিনি আল্লাহর রাসূল সা.-এর মাধ্যমে স্থিরকৃত। আর কে আছে যিনি তাঁর উম্মতকে ভুলপথ থেকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে? এটা কি উসমান এর মাধ্যমে সম্ভব তিনি তো একজন অবৈধ ব্যক্তি। আলী রা. হচ্ছে মুহাম্মদ সা.-এর নিকট থেকে সততার মাপকাঠিতে নির্ধারিত ব্যক্তি। যিনি এ ব্যাপারে তাদেরকে উত্তরণ করতে পারেন। সে উসমান রা.-এর সমালোচনা করার মাধ্যমে এই সরকারের বিরোধিতা করা শুরু করে। তার এই ধরনের আদেশ সূচক কাজ একধরনের ভণ্ডামি, অরুচিকর কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে সে লোকদের তার প্রতি অনুগত করে এবং লোকদেরকে এই কাজগুলো করতে উদ্বুদ্ধ করে।

সে এসব বিষয়ে একটি পত্র লিখল এবং তার প্রতিনিধি প্রেরণ করল বিভিন্ন প্রদেশে। তারা গোপনে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তার এই ভ্রান্ত আকিদা প্রচার করা শুরু

[৯০] আত তাবারী, খ.৪, পৃ. ৩৪০।

করল। সে পুনরায় লোকদের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখল, যাতে সে তাদের সরকারে বিভিন্ন দোষত্রুটি উল্লেখ করল। এমনকি তারা মদিনায় একটি পত্র প্রেরণ করল এবং এভাবে তারা তাদের ভ্রান্ত এই ধারণা প্রচারের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করল। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বিতীয় অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করা। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার উদ্দেশ্য হলো লোকদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করা যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। সে লোকদের বলতে শুরু করল যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যায়ভাবে খিলাফতের অধিকারী হয়েছেন, যিনি অন্যায়ভাবে ক্ষমতা এককেন্দ্রিক করে তা তাঁর নিজের অধিকারে রাখে। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা চেয়েছিল এ ব্যাপারে লোকদের মাঝে একটা নাড়াচাড়া দিতে, বিশেষকরে কূফার বাসিন্দাদের যারা এই সরকারের বিরোধিতা করে আসছিল।

প্রাচীন সানা যেখানে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা জন্মেছিলেন

আর সে আরব বেদুঈনদের সমর্থন পেল, যারা দুনিয়াবী বিষয়াদি নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে। সে গুজব ছড়িয়ে মুসলমানদেরকে এই বলে খেপাতে চেয়েছে যে, উসমান তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের বায়তুল মালের অর্থ দিয়ে সহায়তা করেছে এবং তিনি তাদের জন্য অন্যায়ভাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদ ব্যয় করেছে। উসমান এটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, কোনো একটি সম্প্রদায় প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের চক্রান্ত করে বেড়াচ্ছে; যার কারণে মুসলমান সম্প্রদায় একটি খারাপ সময় পার করছে।

ইবনে সাবা তার কুকর্মের ডানহাতস্বরূপ মিশরকে পেল। এটা তার ভ্রান্ত ধারণা পরিচালনা করার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান। সে তার অনুসারীদের উসমান-এর বিরুদ্ধে একত্রিত করতে শুরু করল। সে লোকদেরকে উসমান-এর বিরুদ্ধে কথিত ছলচাতুরির অভিযোগ এনে মদিনার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অভিযাত্রা করার প্রস্তাব করে। সে আরো বলে যে, তিনি আলী থেকে জোরপূর্বক খিলাফত কেড়ে নিয়েছেন। সে আরো অভিযোগ করে বলে, আলী একজন সঠিক ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর নবী দ্বারা নির্ধারিত। সে লোকদের এই বলেও প্রতারিত করল যে, সে তার পত্রে যা উল্লেখ করেছে তা রাসূল-এর বিজ্ঞ সাহাবিদের কাছ থেকে সংগৃহীত। কিন্তু যখন বেদুঈনরা মদিনায় আসল, তখন রাসূল-এর বিজ্ঞ সাহাবিরা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার লেখা চিঠিটি প্রত্যাখ্যান করল।

এই সময় আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে সারাহ মিশরের গভর্নর। যিনি উত্তর আফ্রিকায় রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন যার কারণে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সাবাহ এর এই দুস্কৃতি সম্পর্কে তেমন কোনো মনোযোগ দিতে পারেননি।

এভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবাহ এবং তার চারপাশে অবস্থানকারী দুষ্ট লোকদের নিয়ে সাবা দল তৈরি করে। এই দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গোলযোগের ওপর ভিত্তি করে। যার সমাপ্তি ঘটেছিল উসমান-এর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে। আর ইতিহাসের এই ঘৃণ্য কাজটি ঘটেছিল; কারণ সাবার চক্রান্ত ছিল সংঘবদ্ধ। ইবনে সাবা এবং তার অনুসারীরা তাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেয় এবং তারা তাদের এই মতাদর্শ প্রচারণায় অত্যন্ত সক্ষমতার পরিচয় দেয়। তার অনুসারীরা বিশেষকরে তার অধিকাংশ অনুসারী ছলচাতুরি করার জন্য মুসলমান হয়েছিল এবং তারা তাদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি ব্যবহার করত। তারা একটি বৃহৎ সমাবেশের আয়োজন করে এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের ছলচাতুর্যপূর্ণ খোদাভীরুদের উপস্থিত করা হতো যাতে করে লোকজন তাদের প্রতি অনুগত হয়। তারা তাদের কয়েকটি সক্রিয় শাখা ছিল কুফা, বসরা এবং মিশরে।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা কূফা, বসরা এবং অন্যান্য জায়গায় তার অনুসারীদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে লিখত। সে সরকার, বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং খলিফা উসমান -এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার মাধ্যমে লোকদের উত্তেজিত করত। তারা কর্মকর্তাদেরকে অধার্মিক, কার্যে অনুপযুক্ত এবং খারাপ মুসলিম নতুন একটি অপবাদ দিয়ে ডাকতে শুরু করল। তাদের উদ্ভাবিত চিঠি তারা বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করল, তারা চিঠিতে রাজনৈতিক অসন্তোষ, অবিচার ইত্যাদি বিষয়াদি উল্লেখ করত। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারীরা সাধারণত তাদের চিঠিগুলোকে খুব দ্রুত একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রেরণ করত। তারা যতটুকু সম্ভব অধিকাংশ মানুষের কাছে তাদের এই চিঠিগুলো পড়ে শুনাত। তাদের বিরামহীন এই প্রচারণার কারণে বিভিন্ন স্থানের মানুষ তাদের এই প্রোপাগাণ্ডা বিশ্বাস করতে লাগল, যার ফলে অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবি খলিফা উসমান কে খিলাফত থেকে সরাতে চাইলেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারীরা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রাষ্ট্রের বাইরেও ছড়িয়ে দিলো। তারা সময়ে সময়ে সরকারকে অপসারণ করার জন্য নানাবিধ কারণ অনুসন্ধান করতে লাগল। যখন উসমান কয়েকজন কর্মকর্তা কর্মচারীকে শাস্তি দিল, তারা খলিফার বিরুদ্ধে নিরপরাধ মানুষকে শাস্তি প্রদানের অভিযোগ উত্থাপন করেন। একদিকে তারা মানুষদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলে অন্যদিকে খলিফা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অপরাধের জন্য শাস্তি প্রয়োগ করলে তার বিরুদ্ধে নিন্দা ও বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করে। যখন উসমান গভর্নরের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে তাকে অপসারণ করে, তখন খলিফার বিরুদ্ধে তারা অসঙ্গত উপায়ে তার আত্মীয়-স্বজনদের এই পদ দেওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করে।

৭. গোলযোগ সমাধানে উসমান -এর অনুসৃত পদ্ধতি

উসমান অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, এই গোলযোগ বা ফিতনা বিভিন্নভাবে তৈরি হয়েছে। উসমান সাহাবিদের মধ্য থেকে অত্যন্ত ধার্মিক এবং আন্তরিক কয়েকজনের মাধ্যমে একটি দল তৈরি করলেন যারা কখনো কোনো বিষয়ে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি করবে না। তাদের সাথে কিছুসংখ্যক মানুষকে দিয়ে উসমান এক একটি দল তৈরি করলেন। উসমান তাদেরকে প্রত্যেকটি প্রদেশে প্রেরণ করলেন; তাঁদেরকে খুঁজে বের করতে বললেন, কী কারণে এ ধরনের সমস্যা হচ্ছে? তারা চারটি স্থানে অত্যন্ত কঠিন, বিপজ্জনকভাবে এবং নিঃশেষিত অবস্থায় এই অভিযান পরিচালনা করেন। কিছুদিন পর তাদের নেতা মদিনায় তাদের অভিযানের প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে

আগমন করলেন। তাঁরা খলিফাকে বললেন যা তারা দেখেছিলেন, শুনেছিলেন এবং লোকেরা তাদেরকে বলেছিলেন। সকল কিছুর ভিত্তিতে তারা পেল যে, গভর্নররা লোকদের নিকট জনপ্রিয় ছিল এবং তারা তাদের দেখাশুনা করার জন্য গভর্নরদেরকে অনুরোধ করেছে। সুতরাং এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হলো যে,খলিফা কর্তৃক গভর্নরদের প্রতি কোনোরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোনো কারণ নেই। প্রদেশের লোকেরা অত্যন্ত শান্তিতে আছে। তারা গভর্নরদের কাছ থেকে উপযুক্ত আচরণ পাচ্ছে। আর খলিফা নিজেই একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। তিনি তার সম্পদ সকলের সাথে খুব সুন্দরভাবে ভাগাভাগি করে নিতেন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে আল্লাহর হক এবং বান্দাদের হক আদায় করতেন। গুজব সবসময় মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, যা মানুষের ভেতরে অশান্তি সৃষ্টি করে।

যাহোক, নানাবিধ ষড়যন্ত্রের পর খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হননি; বরং তিনি প্রদেশের লোকদের প্রতি একটি পত্র লেখেন। যার মাধ্যমে তিনি সেখানকার লোকদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা প্রদান করেন। সেখানে তিনি লিখেছেন-

আমি সর্বদাই আমার সরকার, কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে তদারকি করি এবং আমি হজের সময় তাদের সাথে সাক্ষাৎ করি। এ জাতিকে কোন কাজটি ভালো এবং কোন কাজটি খারাপ এ সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আজ পর্যন্ত আমি খলিফা হিসেবে নিযুক্ত আছি। তাদের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে বা আমার সরকারের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অভিযোগ নেই। এগুলো ছাড়া যা ইতোমধ্যে আমি সমাধান করেছি। মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা আমার এবং আমার পরিবারের কোনো অধিকার নেই। মদিনার লোকেরা আমার নিকট অভিযোগ করেছে যে, কিছু লোক অপর কিছুসংখ্যক লোককে অপমানিত এবং প্রহার করছে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ওহ! তোমাদের মধ্যে যে অপমানিত এবং আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে সে যেন হজের সময় হজ আদায় করতে আসে এবং আমার কাছ থেকে অথবা আমার কর্মকর্তা, কর্মচারীদের কাছ থেকে তার অধিকার গ্রহণ করে, আর যে ক্ষমা করে দেবে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার তো রয়েছে।

যখন এই চিঠিটি প্রদেশের লোকদের কাছে পড়ে শোনানো হলো, তখন তারা তাদের ভুলের জন্য কান্নাকাটি করল এবং তাদের ভেতরে একধরনের অনুশোচনা দেখা দিল।

এরপর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশৃঙ্খলা পরিমাপ করার জন্য আলাদা একটি পরিমাপ পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। তিনি তাঁর আস্থাভাজন লোককে পাঠালেন লোকদের অবস্থা দেখে আসার জন্য। তিনি লোকদেরকে চিঠি দিয়ে বলেছেন হজে আসার পূর্বে যদি তাদের কোনো ধরনের অভিযোগ থাকে লোকেরা যেন হজের আসার সময় সে অভিযোগগুলো নিয়ে আসে। এছাড়া তিনি প্রদেশের গভর্নরদের বলেছিলেন তারা যেন লোকদের অভিযোগের ব্যাপারে তাদের সাথে দেখা করে যদি তাদের কোনো ধরনের অভিযোগ থাকে।

৮. গভর্নরদের নিয়ে সভা

যখন আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারীদের মাধ্যমে প্রদেশে নানাবিধ অশান্তির জন্ম নেওয়া শুরু হলো, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রদেশের গভর্নরদেরকে হজের পর মদিনায় আসার জন্য একটি প্রজ্ঞাপন জারি করলেন। এটি সংঘটিত হয়েছিল ৩৪ হিজরি সালে। তাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আমির, মুয়াবিয়াহ ইবনে আবু সুফিয়ান এবং আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ এসে উপস্থিত হয়েছেন। খলিফা তাদের আলোচনায় সাইদ ইবনে আল আস এবং আমর ইবনে আল আসকে অন্তর্ভুক্ত করলেন তারা দুইজনও ছিলেন গভর্নর। সকল গভর্নর সভায় যোগদান করলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের ইসলামি রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ উদ্ঘাটন করতে বললেন। সকল গভর্নর তাদের কোনো ধরনের অভিযোগকারী চিনেন না বা জানেন না। এভাবে বাহ্যিকভাবে সকল কিছুই শান্ত। এমনকি খলিফা কর্তৃক প্রেরিত পর্যবেক্ষক কোনোরূপ ভুলভ্রান্তি না পেয়ে ফিরে আসেন। কেউ তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অভিযোগের বিষয় মনে করতে পারছে না।

এভাবে সাদ ইবনে আল আস উল্লেখ করলেন যে, এক প্রকার দুষ্কৃতিকারী অতি গোপনে বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। যারা লোকদের মাঝে নানাবিধ গুজব বলে বেড়াচ্ছে। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন এ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ কী? তিনি এই পরামর্শ দেন যে, চক্রান্তকারীকে অবশ্যই আটক করতে হবে এবং চক্রান্তকারীদের নেতাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের এই পরামর্শ পছন্দ করলেন না। তিনি তাঁর গভর্নরদের বললেন উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া তিনি মুসলিম জাতির এক ফোঁটা রক্তও ঝরাতে পারবেন না।[৯১] গোলযোগের চাকা ইতোমধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে কোনো প্রকার সংঘর্ষের মাধ্যমে তা সমাধানের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

---

[৯১] ইবনুল আসীর, খ. ২, পৃ. ৪২৭।

যখন এ সমস্যা সমাধানের কোনোরূপ উপায় নির্ধারিত হয়নি। গভর্নররা তাদের প্রদেশে ফিরে গেলেন। যখন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়া ফিরে যাচ্ছেন, তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার সাথে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। যেখানে তার ভক্তবৃন্দ তার জন্য অপেক্ষা করছে কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। এরপর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আরেকটি পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমি আপনার জন্য একদল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করব। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এটিকে প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বলেন, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বসতবাড়ির চারপাশে অবস্থান করে আমি তাদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ শক্তি প্রয়োগ করব না। এই অবস্থায় তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আবার বলেন, হে আমাদের নেতা। এ অবস্থায় শত্রুপক্ষ আপনাকে গোপনে হত্যা করবে অথবা তারা মদিনায় আক্রমণ চালাবে। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিউত্তরে বলেন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি সর্বকার্য সম্পাদনকারী।[৯২]

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি জানতেন যে, সকল প্রকার গোলযোগের পেছনে একটি ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা রয়েছে। তারা খলিফাকে উৎখাত করা ছাড়া আর কোনো কিছু চায়নি এবং তারা খিলাফতকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে একাকী মিলিত হলেন। সেখানে তিনি তাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতের বিষয়ে নসিহত করলেন এবং বললেন, মৃত্যুর পরে আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা করবে না। আর একজন সর্বোৎকৃষ্ট এবং ন্যায়পরায়ণ শাসকের জন্য এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার এটাই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

৯. স্বজনপ্রীতির মিথ্যা অভিযোগ

বিদ্রোহীদের গুরুতর অভিযোগ হচ্ছে, আত্মীয়প্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের বশবর্তী হয়ে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের স্বার্থ উপেক্ষা করে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে তাঁর নিজ বংশের লোক, জ্ঞাতি ও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়োগ করেন। তাদের মতে, খলিফার নিযুক্ত শাসকগণ যেমন ছিলেন অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ তেমনি দুর্নীতিপরায়ণ। ঐতিহাসিক মাসুদী, অধ্যাপক পি. কে. হিট্টি, উইলিয়ম মূইর, ভন ক্রেমার প্রমুখ বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ এ মতকে সমর্থন করেন; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে খলিফার বিরুদ্ধে আনীত স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হবে।

কূফার নিয়োগ : একথা অনস্বীকার্য যে, ওসমানের রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতে যে ব্যাপক প্রশাসনিক রদবদল ঘটেছিল, তা ইসলামের স্বার্থরক্ষা ও এর মর্যাদা বৃদ্ধিকল্পেই

---

[৯২] আত তাবারী, খ.৪, পৃ. ৩৪৫।

হয়েছিল। প্রথমে কূফার নিয়োগের প্রশ্নই ধরা যাক। ওমর পারস্যবিজয়ী সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাসকে কূফার শাসনকর্তা নিয়োগ করেছিলেন। পরে তিনি তাঁকে বিলাসিতার সামান্য অভিযোগে পদচ্যুত করে মুঘিরাকে নিয়োগ করেন; কিন্তু মুঘিরার নৈতিক চরিত্রের ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় খলিফা ওমর তাঁর অন্তিম শয্যায় কূফার শাসনকর্তার পদে সাদকে পুনর্বহাল করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উসমান খলিফাতে অধিষ্ঠিত হয়ে সাদকে পুনর্নিয়োগ করেন এবং এর দ্বারা তিনি পরলোকগত খলিফার ইচ্ছাকেই পূর্ণ করেন। পরবর্তীকালে সাদ কর্তৃক কূফার মালখানা হতে গৃহীত কর্জকে কেন্দ্র করে কোষাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ ইবনে (৬৪৫ খ্রি.) ওয়ালিদ বিন ওকবাকে শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। ঘটনাক্রমে ওয়ালিদ ছিলেন খলিফার দুধভাই। পূর্বাঞ্চলে তাঁর অনেক বিজয়কীর্তি থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁর বিরুদ্ধে মদ্যপান ও চরিত্রহীনতার অভিযোগ আনলে খলিফা উসমান তাঁকে পদচ্যুত করে ৬৫১ খ্রি. জনসমর্থিত সাঈদ আল আসকে নিয়োগ করেন। সাঈদ খলিফা উসমানের কোনো আত্মীয় ছিলেন না; কিন্তু কূফাবাসীরা তার বিরুদ্ধেও কুৎসা রচনা করেন।

বসরায় নিয়োগ : বসরার শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে দেখা যায় যে, ওমর কর্তৃক নিযুক্ত আবু মুসা আল-আশআরী খলিফা উসমানের খিলাফতের ষষ্ঠ বছর পর্যন্ত সেখানে শাসন করছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত শাসন কর্তৃত্বে বহাল থাকায় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা অস্বস্তিবোধ করে এবং তারা আবু মুসার বিরুদ্ধে কুরাইশদের প্রতি আমিরকে স্থলাভিষিক্ত করেন। কর্মোদীপ্ত তরুণ আব্দুল্লাহ ফারস, মার্ভ, নিশাপুর, তুর্কিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে অসামান্য সমর-কৃতিত্ব প্রদর্শন করে ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তবুও আবেগপ্রবণ বিদ্রোহীরা তাঁকে সুনজরে দেখেনি। কেননা তিনি ছিলেন খলিফার আত্মীয়। তাই তাঁর বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ ও কুৎসা মদিনায় পৌছে। পরিশেষে খলিফা উসমান তাকেও অপসারিত করেন।

মিশরে নিয়োগ : মিশর-বিজয়ী আমর ইবন আল-আস ওমরের সময় হতে খলিফা উসমান-এর খিলাফতের চতুর্থ বছর পর্যন্ত মিশরের শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অতঃপর মিশরের রাজস্ব-কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ বিন আবি সাদের সাথে শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর মতভেদ হওয়ায় খলিফা উসমান আমরের স্থলে আব্দুল্লাহকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন। সম্পর্কের দিক দিয়ে আব্দুল্লাহ ছিলেন খলিফার পালিত ভাই। তিনি মিশরে রোমান আক্রমণ প্রতিহত করে, নৌবাহিনী সংগঠন করে এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও উত্তর আফ্রিকায় কয়েকটি সফল অভিযান চালিয়ে সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করেন। এতদসত্ত্বেও

যেহেতু তিনি খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আত্মীয় সেহেতু তাঁর শাসন কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকা বিদ্রোহীদের নিকট আপত্তিকর ঠেকল। অবশেষে খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের দাবি পূরণ করে আব্দুল্লাহর স্থলে তাদেরই মনোনীত প্রার্থী মুহাম্মদ বিন আবু বকরকে মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

সিরিয়ায় নিযুক্তি : সিরিয়ার গভর্নর নিয়োগের ব্যাপারে দেখা যায় যে, উমাইয়া বংশের মুয়াবিয়া ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সময় হতে সেখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক তাঁকে নতুন কোনো নিযুক্তি দেওয়া হয়নি। তিনি তাঁর পূর্বপদেই বহাল ছিলেন। তাঁর ন্যায় একজন দক্ষ প্রশাসকের শাসনাধীনে সিরিয়ায় পূর্ণ শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল। মুয়াবিয়া নিঃসন্দেহে একজন সুদক্ষ শাসক ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি যেহেতু উমাইয়া বংশের লোক এবং খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আত্মীয় ছিলেন, সেজন্য বিদ্রোহীরা এ ব্যাপারেও খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্বজনপ্রীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে।

পর্যালোচনা : উপরিউক্ত নিয়োগগুলোর বিশ্লেষণের পর আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে,

১. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আত্মীয়দের প্রতি কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও অযোগ্য বা অনুপযুক্ত আত্মীয়-স্বজনকে শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করে তিনি রাষ্ট্রের অমঙ্গল সাধনে প্রয়াসী ছিলেন না।

২. খলিফা কর্তৃক নিয়োগকৃত কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে জনগণ অনাস্থা আনলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে উক্ত পদ হতে অপসারিত করতেন।

৩. তাঁর নিযুক্ত সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তাই যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তাদের নিয়োগের যথার্থতা প্রমাণিত করেছেন। উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহ বিশ্লেষণ করলে একথা স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রতীয়মান হয় যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। যদি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত এ সমস্ত অভিযোগ সত্য হতো তাহলে তিনি জনগণের অভিযোগ উপেক্ষা করতেন এবং তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে সরকারি চাকরি হতে পদচ্যুত করতেন না।

১০. কুরআনের কপি দগ্ধীভূতকরণ সংক্রান্ত মিথ্যা অভিযোগ

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ছিল কুরআন শরীফ দগ্ধীভূতকরণ। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে ইসলামি সাম্রাজ্যের পরিধি সুদূর মধ্যএশিয়া হতে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হলে দূরাঞ্চলসমূহে কুরআন শরীফ পাঠ, আবৃত্তি ও উচ্চারণ নিয়ে মুসলমানদের

মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। নবদীক্ষিত মুসলমানগণ তাদের চলতি ও স্থানীয় ভাষায় আবৃত্তি ও উচ্চারণ করলে কুরআন শরীফের পাঠ ও উচ্চারণের মধ্যে প্রভেদ দেখা দেয়। উচ্চারণের প্রভেদ ছাড়াও কখনও কখনও কুরআনের ভাষাও (Script) ভিন্নতর হতে লাগল। বিশেষকরে অনারব অঞ্চলের জনসাধারণ নিজেদের সুবিধার জন্য উচ্চারণের পরিবর্তন করে কুরআন পাঠ করত। উপরন্তু মুসলমানদের ব্যবহারের জন্য তখনও পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত কোনো কুরআন শরীফ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। এ অসুবিধার জন্য চক্রান্তকারী ও বিভ্রান্তকারীরা কুরআনের বাণী বিকৃত করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে দ্বিধা করত না। হুযায়ফা নামক জনৈক ব্যক্তি আযারবাইযান এলাকায় বিভিন্ন প্রকারে কুরআন পাঠ করছে এ সংবাদ খলিফার নিকট জানালে খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তা রোধকল্পে কুরআনে হাফিজ এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের নিয়ে একটি সংকলন কমিটি গঠন করেন। ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে গঠিত এ কমিটি যায়েদ বিন সাবিতের নেতৃত্বে কুরআনকে ভ্রান্তিমুক্ত করার সুপরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ কমিটি বিবি হাফসার নিকট সংরক্ষিত কুরআন শরীফের পাণ্ডুলিপিটি সর্বসম্মতিক্রমে অভ্রান্ত এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত মূল আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্দেশে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যবহৃত ভ্রান্তিপূর্ণ কুরআন শরীফের পাণ্ডুলিপিগুলো সংগ্রহ করা হয় এবং সঙ্গতিহীন ও অপ্রমাণিত বলে সেগুলো দগ্ধীভূত করা হয়। সেই সাথে গৃহীত ও নির্ভুল কুরআন শরীফের সংকলিত কপিগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে বিতরণ করা হয়। কুরআনের নির্ভুল সংস্কার-সাধন খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। কিন্তু চক্রান্তকারী ও স্বার্থান্বেষীরা গোঁড়া ও ধর্মভীরু মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার জন্য প্রচারণা চালাতে থাকে যে, কুরআন দগ্ধীভূত করে খলিফা পবিত্র কুরআনের অমর্যাদা করেছেন এবং এটা তাঁর অমার্জনীয় ও গর্হিতকার্য বলে চিহ্নিত করা হয়।

পর্যালোচনা : উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে কুরআন শরীফের দগ্ধীভূতকরণ দ্বারা ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর। প্রথমত, খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ব্যক্তিগতভাবে এর জন্য দায়ী করা যায় না, কারণ, তিনি স্বয়ং এটি করেননি। এ কাজটি একটি পরিষদের নেতৃত্বাধীনে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। মাওলানা মুহাম্মদ আলী যথার্থই বলেন, "ধর্মীয় অথবা অপবিত্রকরণ যাই হোক না কেন, এটি উসমানের রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজস্ব কার্য ছিল না। এটি একটি পরিষদের দায়িত্বসম্পন্ন মুসলমানদের সম্মিলিত কাজ ছিল।" দ্বিতীয়ত, কুরআন শরীফ ভস্মীভূত করার অভিযোগ অযৌক্তিক।

কারণ, সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও সুসামঞ্জস্যভাবে সংকলিত বিবি হাফসার নিকট সংরক্ষিত কুরআন শরীফই আসল (authentic) মুসলিম ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকৃত এবং এটি দগ্ধীভূত হলে পরবর্তীকালে এটি সঠিক কপি হিসেবে মুসলমানদের নিকট মর্যাদা লাভ করত না। তৃতীয়ত, খলিফা উসমান বিকৃত, ভ্রান্তিকর, অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সঙ্গতিহীন কুরআনের কপিগুলো ধ্বংস করার নির্দেশ দেন ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রের স্বার্থে– নিজস্ব স্বার্থে নয়। সংহতি ও শান্তি বজায় রাখার জন্য এবং ধর্মগ্রন্থকে মূলধন করে যাতে মুসলমানগণ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্যই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কাজেই খলিফা উসমান ধর্মের অবমাননা করেননি; বরং সংকলিত কুরআন লিপিবদ্ধ করে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করেন; কিন্তু বিদ্রোহিগণ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মগ্রন্থ অপবিত্র করার অভিযোগে খলিফাকে অভিযুক্ত করল। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন খলিফা উসমান এই কার্যের সমর্থক ছিলেন না। কারণ তিনি নিজের উচ্চারণ পদ্ধতিকে নির্ভুল মনে করতেন। তাঁর বিরোধিতাও জনগণকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

১১. "বায়তুল মাল আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান" সম্পর্কিত অভিযোগ

উসমান -এর বিরুদ্ধে অর্থ অপচয়, আত্মীয়-স্বজনদের অর্থদান ও অমিতব্যয়িতার অভিযোগ করা হয়। যেমন, রাসূল কর্তৃক তায়েফ-নির্বাসিত হাকাম ইবনুল আসকে মদিনায় আসার অনুমতি দান এবং বায়তুল মাল থেকে এক লক্ষ দিরহাম দান, মারওয়ানকে আফ্রিকার মালেগানিমতের এক-পঞ্চমাংশ দান, আবদুল্লাহ ইবনে খালেদকে তিন লক্ষ দিরহাম দান এবং নিজের জন্য বায়তুল মালের অর্থ দ্বারা মূল্যবান অলংকার এবং নিজের জন্য বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ প্রভৃতি।

বায়তুল মাল আত্মসাৎ করার কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যে বায়তুল মালের জন্য মহান দানশীল উসমান অকাতরে নিজের ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন, তিনি বায়তুল মালের সম্পদের প্রতি লোভ করবেন এটা উদ্ভট কথা। উসমান তাঁর খিলাফত কালেও অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। বায়তুল মাল থেকে অর্থ গ্রহণে তাঁর কোনো প্রয়োজনই হতো না; বরং তিনি নিজের পাওনাটাও বায়তুল মালে জমা দিয়ে দিতেন।

উসমান যেমন সম্পদশালী ছিলেন, তেমন দানশীলও ছিলেন। কাজেই তিনি ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে আপন আত্মীয়-স্বজনকে প্রচুর সাহায্য করতেন। তাঁর এ খ্যাতিকে ভিত্তি করেই বিদ্রোহীরা বায়তুল মাল আত্মসাতের অভিযোগ বানিয়ে নেয়। এ ভুল বুঝাবুঝি তাঁর সেই ভাষণ থেকেই দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল, যেখানে

তিনি বলেছিলেন, মানুষ বলে আমি আমার আত্মীয়-স্বজনকে ভালোবাসি এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় অংশসমূহ দিয়ে থাকি। আমি তাদেরকে সাহায্য করে থাকি আমার ব্যক্তিগত অর্থ থেকেই।

বায়তুল মাল তথা সরকারি কোষাগার থেকে ব্যয়সংক্রান্ত যেসব ঘটনা বর্ণনা করা হয়, তা সম্পূর্ণ বিকৃত তথ্য। প্রকৃত অবস্থায় আপত্তিকর কিছুই নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে খালিদকেও সে সময় উপঢৌকনস্বরূপ পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা দেওয়া হয়েছিল। মুসলমানদের পক্ষ থেকে আপত্তি উঠলে তিনি তা ফেরত নিয়েছিলেন। কাজেই বায়তুল মালের অপচয়ের অভিযোগ চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়।

১২. আবু যর আল-গিফারীর নির্বাসন প্রদান সম্পর্কিত অভিযোগ

কথিত আছে, উসমান আল-গিফারী নামের একজন সাধক ও নবী করীম -এর একজন প্রিয়তম সাহাবিকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। ঘটনাটি সত্য নয়। আবু যর গিফারী কে উসমান দেশ থেকে বহিষ্কার করেননি, বরং তিনি নিজেই এক নির্জন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃত বিবরণ এই যে, আবু যর-আল গিফারী সম্পদের বৈধ সঞ্চয়ের বিরুদ্ধেও বক্তৃতা করতে থাকতেন, এর ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা ভঙ্গের আশঙ্কা ছিল। এজন্য আমির মোয়াবিয়া উসমান কে লিখে পাঠালেন যে, তাঁকে সিরিয়া থেকে মদিনায় নিয়ে যাওয়া হোক। উসমান তাঁকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে নিজের কাছে ডেকে এনে বললেন, আপনি আমার কাছে থাকুন। আপনার যাবতীয় ভরণ-পোষণের ভার আমি বহন করব; কিন্তু তিনি ছিলেন এক স্বনির্ভর বুযুর্গ। কারো দানের প্রতি তিনি মুখাপেক্ষী ছিলেন না। অতঃপর তিনি মদিনায় একটি নির্জন স্থানে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে দুই বছর অবস্থান করার পর অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহীরা আকস্মিক বিদ্রোহ করে। প্রকৃতপক্ষে খলিফা তাঁকে রাবাধায় অন্তরীণও রাখেননি; এমনকি তাঁর প্রচারকার্যে বাধাও দেননি। উপরন্তু তাঁর মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিকভাবে এবং তাঁর মৃত্যুর পর খলিফা তাঁর স্ত্রীকে অর্থ সাহায্যও দিয়েছিলেন। কাজেই আবু যরের প্রতি খলিফা কোনো প্রকার অপমানজনক আচরণ করেননি তা সহজেই অনুমেয়।

১৩. উসমান কর্তৃক আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারী কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগের জবাব

উসমান একদা মসজিদে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করলেন; সেখানে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারীদের আমন্ত্রণ জানালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন তাঁর ব্যাপারে তাদের কোথায় আশঙ্কা। তিনি তাদেরকে বললেন যে, তারা যেন খোলামেলাভাবে খলিফা উসমান কী কী ভুল করছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে। তার পর বিদ্রোহীরা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারীরা সামনে

আসল এবং তারা তাদের মতো করে খলিফা উসমানের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ উত্থাপন করল, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত বাগ্মীতার পরিচয় দিয়ে খুবই পরিষ্কার ভাষায় তাদের উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দেন। তিনি তার অবস্থান পরিষ্কার করলেন এবং তার গৃহীত পদক্ষেপগুলোর ওপর তিনি অবিচল থাকলেন। সাহাবিরা এটি বুঝতে পারলেন যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কোনো প্রকার ভুল করেননি।

বিভিন্ন অভিযোগের মধ্যে একটি অভিযোগের ব্যাপারে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন; তারা বলে আমি (উসমান ইবনে আফ্ফান : খলিফা) আমার পরিবারকে ভালোবাসি এবং আমি তাদের প্রতি উদার। আমি আমার পরিবারকে যেভাবে ভালোবাসি তা আমাকে কোনোরূপ অন্যায় কাজে প্রভাবিত করে না। আমার ভালোবাসা কখনো তাদের অন্যায় বা অবিচারকে সমর্থন করে না। এটা অন্যদের সাথে বৈষম্য করতে আমাকে পরিচালিত করেনি; বরং তারা অন্যদের মতো তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। আমি তাদের কাছ থেকে তাদের কাজের হিসাব প্রতিনিয়তই গ্রহণ করে থাকি। আর আমি তাদেরকে যা প্রদান করি, তা আমি একান্ত আমার ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে প্রদান করি। আমি কখনোই তাদেরকে মুসলমানদের সম্পদ থেকে কোনোকিছুই প্রদান করিনি। আর কখনোই আমি তাদেরকে মুসলমানদের সম্পদ ব্যয়ে কোনোরূপ বিবেচনা করিনি। অন্যায়ভাবে মুসলমানদের সম্পদ ব্যয় করার ক্ষমতা কাউকে প্রদান করা হয়নি। আমি তাদেরকে আমার সম্পদ দানে উদারনীতি অবলম্বন করি। অনিষ্টকারীরা যা কিছুই অভিযোগ করে বলেছে তা বলার জন্য তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আমি প্রদেশগুলো থেকে কোনোরূপ সম্পদ বা উদ্বৃত্ত অর্থ গ্রহণ করিনি। আমি প্রদেশগুলোকে তাদের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছি। আমি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে পাঁচ ভাগের একাংশ (খুমুস) সম্পদ ব্যতীত মদিনায় আর কিছুই আনয়ন করিনি। আর যা ছিল সরকারি কোষাগারের জন্য প্রাপ্য। যার চারভাগের একভাগ ঐ সকল মুসলমানদের প্রদান করা হয়েছে, যারা এই সম্পদ পাওয়ার অধিকারী। আল্লাহর শপথ আমি কোনো প্রকার ভালো অথবা মন্দ কোনোকিছুই গ্রহণ করিনি। আমি আমার ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে আহার করেছি, যা আমাকে আল্লাহ প্রদান করেছেন। আমি আমার পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনদেরকে আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে দান করেছি।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিরুদ্ধে তারা সর্বোৎকৃষ্ট জমিনের তাঁর উট চরানোর ব্যাপারেও অভিযুক্ত করে। এই অভিযোগের ব্যাপারে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন আমাকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়, তখন আমি ছিলাম মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উট এবং ভেড়ার মালিক। কিন্ত এখন আমার প্রায় সবগুলোই বিভিন্নভাবে

ব্যয় হয়ে গেছে। বর্তমানে আমার দুটো ব্যতীত কোনো উট নেই। আর যা আমি হজের জন্য রেখেছি। তিনি বলেন আমার কথা কি ঠিক? সাহাবিরা বলল, হ্যাঁ, তারা এটা সত্যায়ন করল।

এভাবে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সকল প্রকার অভিযোগের উত্তর দেন। তিনি তার অবস্থান পরিষ্কার করেন এবং এ ধরনের গুজবের ইতি টানেন। চক্রান্তকারীদের নেতা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যেখানে বসে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তর দিচ্ছেন, তার পাশেই বসা ছিল। কিন্তু তারা ছিল অপরিবর্তনীয়। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এই ব্যাখ্যা তাদের ধারণায় কোনোরূপ পরিবর্তন আনতে পারেনি। তারা কোনোরূপ নির্দেশনা খোঁজার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। আর তারা কোনোরূপ সহজ পন্থা অবলম্বন করেনি। এই আলোচনায় উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে একজন পেশাদার এবং সৎপরায়ণ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করলেও একমাত্র তারাই তাঁর মধ্যে নানাবিধ অন্যায় ভুল-ভ্রান্তি দেখতে পেল। তাদের মূল উদ্দেশ্যই হলো লোকদেরকে খলিফার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা। এভাবে বিভিন্ন প্রকার প্রমাণ উপস্থাপন করার পরও সাবার অনুসারীদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়নি। তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে যাবে এবং ইসলামের সৌন্দর্য ম্লান করে ছাড়বে।

অন্যদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশ্বস্ত সাহাবি এবং সঠিক মুসলমানরা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দেওয়া বক্তব্য এবং কথা বিশ্বাস করলেন। তারা বিশ্বাস করলেন যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যা কিছু বলেছেন এবং যা কিছু করেছেন, সব কিছুই তাদের ভালোবাসায় তিনি করেছেন।

সাহাবিদের মধ্যে নেত্রী স্থানীয়রা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পরামর্শ দিয়ে বললেন যে, যারা এ ধরনের সমস্যা তৈরি করছে এবং যারা মুসলমানদেরকে শয়তানের পথে পরিচালিত করছে তাদের নেতাকে হত্যা করার জন্য। যার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে স্থায়িভাবে শান্তি ফিরে আসবে এবং তার অনুসারীরা সঠিক পথে পরিচালিত হবে। কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চিন্তা ছিল ভিন্নরকম। তিনি চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা এবং তার অনুসারী যারা কূফা, বসরা এবং মিশর থেকে মদিনায় এসেছে; তাদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। তিনি জানতেন, তারা কেন এ ধরনের চক্রান্ত করছে? তিনি তাদেরকে মদিনা থেকে তাদের নিজেদের ভূমিতে ফিরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

১৪. মদিনায় বিদ্রোহীদের কর্মকাণ্ড

বিদ্রোহীরা মদিনায় উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আক্রমণ করার চূড়ান্ত ষড়যন্ত্র নিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়। সর্বশেষ তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, তাদের মধ্য থেকে একদল সৈন্যবাহিনী খলিফাকে চাপ প্রদান করবে খিলাফত ছেড়ে দেওয়ার জন্য অন্যথায় তাঁকে হত্যা করতে বলা হয়। তারা একটি গোপন মিশনের পরিকল্পনা করল যা তারা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে। বিদ্রোহীরা সিদ্ধান্ত নিল তারা হজের সময় মদিনায় আসবে তিনটি প্রদেশ মিশর, কূফা এবং বসরা থেকে : তারা হজ পালনের ছলনা করে তাদের প্রদেশ ত্যাগ করবে। যখন তারা মদিনায় পৌছবে তারা খাঁটি মুনাফিকদের সাথে মিলিত হবে এবং মক্কায় গমন করবে হজ পালন করার জন্য। মদিনার অধিকাংশ লোকই তখন মক্কায় গমন করবে হজ পালনের জন্য। তারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খিলাফত ত্যাগ করার জন্য অথবা তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে অবরুদ্ধ করবে। তারা ৩৫ হিজরি মোতাবেক ৬৫৫ খ্রি. শাওয়াল মাসে মদিনার বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করছিল। মিশর থেকে বিদ্রোহীদের চারটি দল মদিনায় আসে তাদের প্রত্যেক দলের একজন করে নেতা রয়েছে। তাদের চারজন নেতাকে আবার আরেকজন নেতা নির্দেশনা দিয়ে থাকে আবার তাকে নির্দেশনা দেয় সরাসরি বিদ্রোহী নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা। চারটি দলে মোট প্রায় ১০০০ লোক ছিল। একইভাবে কূফা এবং বসরা থেকে আগত বিদ্রোহীদের সংখ্যা প্রায় ১০০০ ছিল যারা বিভিন্ন স্থানে চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা আগত লোকদের সাথে রওনা হলো এবং সে তার শয়তানী চক্রান্ত সফল করতে পেরে খুবই আনন্দিত এবং গর্বিত ছিল। মিশরের বিদ্রোহীরা আলী ইবনে আবি তালেবকে খলিফা হিসেবে দেখতে চায়। আর কূফা থেকে আগতরা যুবাইর ইবনে আওয়ামকে খলিফা হিসেবে দেখতে চায়। আর যারা বসরা থেকে এসেছে তারা তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহকে খলিফা করতে চায়। তাদের এই চক্রান্ত সাহাবিদেরকে নানাদলে দলবিভক্ত করে ফেলে এবং লোকেরা একধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই চক্রান্তের হাত থেকে রক্ষা করেন। বিদ্রোহীরা মদিনার বাইরে গমন করে ৩৫ হিজরির যিলক্বদ মাসের বুধবারে। প্রথম গমনকারী হিসেবে যে দলটি রওনা করে তারা হলো মিশরের চক্রান্তকারী দল। তারা পৌছার পূর্বে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট তাদের আগমনের খবর এসেছিল, তখন তিনি মদিনার বাইরে একটি গ্রামে অবস্থান করছিলেন। তিনি আলী ইবনে আবি তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রদেশ থেকে আগত বিদ্রোহীদের সাথে মীমাংসা করার জন্য প্রেরণ করেন। খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকাণ্ডের পূর্বে লোকেরা জুল মারওয়া নামক স্থানে প্রায় দেড় মাস পর্যন্ত অবস্থান করেছিল,

যেখানে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে দেখা করতেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শহরের প্রতিটি দলের সাথে একটি চুক্তি করল, এরপর প্রত্যেক দল তাদের নিজেদের শহরের দিকে যাওয়া শুরু করল।

১৫. মিশরের বিদ্রোহীদের প্রতিনিধিদের হত্যার মিথ্যা চিঠি

চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর, লোকেরা সম্পূর্ণ আলাদা একটি কারণে তাদের ফিরতি পথে নতুন বিষয়ে ইস্যুর উদ্ভব করেন। তারা যা অর্জন করেছে তারা তা জানা থেকে দূরে রয়ে গেল। আর চক্রান্তকারীদের নেতারা এবং বিদ্রোহীরা এটি পরিষ্কার বুঝতে পারল যে, তাদের চক্রান্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং লোকদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ধ্বংস করা এবং গোলযোগ সৃষ্টি করার জন্য সম্পূর্ণ নতুন করে আবার চক্রান্ত করা শুরু করল। নতুন চক্রান্তটি হলো : "মিশরের চক্রান্তকারীদের প্রতিনিধি দল যখন তাদের প্রদেশে ফিরে যাচ্ছিল তখন তারা দেখল যে, কেউ একজন উটের পিঠে করে আরোহণ করে কোথাও যাচ্ছে। সে বারবার তাদের নিকটবর্তী হয় এবং আবার ফিরে যায়। সে তাদের নিকটবর্তী হয়ে আবার দূরে চলে যায় এবং বলে "এদিকে আস এবং ধর"। সুতরাং তারা তাকে ধরল এবং তাকে জিজ্ঞেস করল : 'তোমার কী হয়েছে?' সে বলল; 'আমি খলিফার একজন বার্তাবাহক এবং মিশরে তার প্রতিনিধি। তারা তাকে তল্লাশি করল এবং তার কাছে একটি পত্র পেল, যাতে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মোহর মারা ছিল। আর চিঠিটি মিশরের গভর্নরের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। যখন তারা চিঠিটি খুলল তারা সেখানে দেখতে পেল, যাতে বিদ্রোহীদেরকে হত্যা করা বা ফাঁসিতে ঝুলানোসহ তাদের হাত পা কাটার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মিশরের প্রতিনিধি দল মদিনায় ফিরে পুনরায় এলো এবং তারা এ চিঠি সম্পর্কে জানতে চাইল। কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ধরনের চিঠি কখনো পাঠাননি বলে সাফ জানিয়ে দেন। চিঠিতে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যে মোহর মারা ছিল, তা ছিল সম্পূর্ণ জালিয়াতি। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে বললেন : 'আমাকে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য তোমরা দুটি পথ অবলম্বন করতে পার, হয় তোমরা দুইজন মুসলমান ব্যক্তি নিয়ে এসে যারা তোমাদের এই ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবে। অন্যথায় আমি আল্লাহর নামে শপথ করে এর সত্যতা যাচাই করব। আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কোনো প্রভু নেই। আমি ঘোষণা করছি যে, আমি নিজে এ চিঠিটি লিখিনি, অথবা কাউকে এটি লিখাইনি, অথবা এ সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই, আর এটা খুবই সহজ ব্যাপার যে, আমার সিল এখানে সংরক্ষিত করা।

কিন্তু তারা উসমান -এর কথা কোনোভাবেই বিশ্বাস করল না। কিন্তু বিদ্রোহীরা অত্যন্ত ঘৃণ্যভাবে এ বলে পীড়াপীড়ি করতে লাগল যে, যেহেতু এই চিঠিতে উসমান -এর সিলমোহর দেওয়া আছে এবং এ চিঠিটি তার যাকাত উত্তোলনের কাজে ব্যবহৃত উটের মাধ্যমে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আর চিঠি পাঠানো হয়েছিল উসমান -এর গভর্নর আব্দুল্লাহ সা'দ ইবনে আবি সারাহ এর নিকট। যাহোক, এ চিঠিটি ছিল একেবারে জালিয়াতি এবং তা জোর করে উসমান -এর ওপর চাপানো হচ্ছিল। এটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করা যায় যে, এ চিঠিটিই বিদ্রোহীদের প্রথম চিঠি নয়; বরং অতীতেও তারা এ ধরনের নানা চিঠি উদ্ভাবন করে যেখানে তারা বিভিন্ন বিষয়ে খলিফাকে অভিযুক্ত করেছিল আর চিঠিগুলো তারা লিখেছিল সাহাবিদের নিকট এবং রাসূল -এর প্রাজ্ঞ সাহাবিদের নিকট যেমন: হযরত আলী, তালহা এবং আয যুবায়ের নিকটেও।

১৬. অবরোধ চলাকালে সাহায্যের আহ্বান

বিদ্রোহীদের সাথে সমঝোতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে খলিফার আলোচনা চলছিল কয়েক সপ্তাহ ধরেন। এ সময় খলিফা কার্যত তাঁর বাড়িতে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। অবরোধ পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার পূর্বে উসমান ফরয নামাযসমূহ আদায় করার জন্য যেতে পারতেন এবং তিনি যাদের সাথে ইচ্ছা করতেন তাঁর বাসায় দেখা করতে পারতেন। পরবর্তীতে তাঁকে ফরয নামায আদায় করার জন্য বাইরে যেতে বাধা দেওয়া হলো। আর বিদ্রোহীরা দাবি করল উসমান যেন খিলাফত ছেড়ে দেন। শেষ কয়েকদিনে, বিদ্রোহীরা উসমান -এর গৃহের খাবার পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। উসমান আলী -এর নিকট একজন বার্তাবাহক প্রেরণ করলেন এবং তাঁকে বললেন যে, তাঁরা আমার খাবার পানি বন্ধ করে দিয়েছে, তোমার কাছে যদি অতিরিক্ত খাবার পানি থাকে তাহলে তা আমাকে দিতে পার। একইভাবে তিনি তালহা , যুবায়ের এবং আয়েশা -এর নিকট সাহায্যের আবেদন প্রেরণ করেন।

সর্বপ্রথম তাঁর নিকট সাহায্য আসল আলী এবং উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবিবা -এর কাছ থেকে। উম্মুল মু'মিনী হাবিবা অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে অবরোধকারীদের কাছে চিৎকার করে কান্নারত স্বরে খলিফা উসমান -এর কাছে খাবার পানিসহ তার উটটি প্রেরণ করতে চাইলেন। কিন্তু তারা তাঁর সাথে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করল। একদিকে তিনি ছিলেন একজন মহিলা, অন্যদিকে তিনি প্রিয়নবী মুহাম্মদ -এর প্রিয়তমা স্ত্রীদেরও একজন- কোনো কিছুই যেন তাঁকে তাদের নিষ্ঠুর আচরণের হাত থেকে নিস্কৃতি দিল না। বিদ্রোহীরা

তলোয়ারের মাধ্যমে তাঁর এই প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করল এবং তারা তাঁর ঘোড়ার লাগাম কেটে দিল। তারা এই ধরনের আচরণ উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবিবার সাথে করে চলছে। বিদ্রোহীরা তাঁর এ যাত্রা বন্ধ করতে চাইল এবং তাঁর ঘোড়ার পিঠে ছুরি দিয়ে আঘাত করল। তারা তাঁর কাছ থেকে উটের লাগাম কেড়ে নিল এবং তাঁকে থামিয়ে দিল। কিন্তু সেখানে তাঁকে করুণ পরিণতির সম্মুখীন হতে হলো এবং তিনি খুন হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেল। মদিনার অধিকাংশ জনশক্তিই বিদ্রোহীদের এমন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে বিস্মিত হয়ে গেল। কিন্তু কেউ তাদের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থামাতে সাহস পেল না। তারা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হলেও তারা সবাই তাদের ঘরের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত ছিলেন।

১৭. অবরোধকারীদের সাথে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সমঝোতা

এই সমস্যা অবরোধকারীরা সামনের দিকে নিয়ে যায় এবং তারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার ঘরে অবরুদ্ধ করে রাখে। তারা তাঁকে খিলাফত ছেড়ে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে এবং অন্যথায় তাকে হত্যার হুমকি দেয়। তারপরও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফত ছাড়তে রাজি হননি। তিনি বলেন, "আমি নিজে এই খিলাফত গ্রহণ করিনি; বরং আল্লাহই আমাকে এই খিলাফতের দায়িত্ব দিয়েছেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় বলে গিয়েছেন উসমান নিজে কখনোই কোনোকিছু গ্রহণ করে না, যতক্ষণ আল্লাহ তাকে কোনোকিছু দেন।"

তারপরও এ বিষয় নিয়ে কয়েকজন সাহাবি ভিন্ন মত পোষণ করেন। মুগিরা ইবনে আল আখনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন খিলাফত ছেড়ে দিয়ে তাঁর জীবন রক্ষা করেন। কোনোভাবে তিনি আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপদেশকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না, তাই তিনি সাহাবিদের এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করলেন।

এই অবস্থায় আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই সময় আপত্তি করে বলল উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফত ছাড়বেন না। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উল্টো উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করে বলেন, 'যদি আপনি খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দেন, তারপর আপনি চিরকাল বেঁচে থাকতে পারবেন?' উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন, 'না'। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর আবার বললেন, 'যদি আপনি খিলাফত না ছাড়েন তাহলে তারা কি আপনাকে একবারের অধিক হত্যা করতে পারবে?' উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিয়ে বললেন, 'না'। আব্দুল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তাদের কেউ কি এই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে, আপনি জান্নাতে যাবেন, না কি জাহান্নামে?' তিনি বললেন, 'না'। আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এই বলে শেষ করলেন যে, আমি এটি কখনো চিন্তা করতে

পারি না যে, আল্লাহ আপনাকে যা কিছু প্রদান করেছে, আপনি তা ত্যাগ করবেন। আর এটি যদি আপনি না করেন তাহলে এটি সর্বকালের জন্য একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে যে, লোকেরা তাদের খলিফা বা শাসককে অপছন্দ করতো এবং তারা তাকে হত্যা করেছে।"

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর উসমানকে পরিণামদর্শী উপদেশ দিয়েছেন। কারণ তিনি এটি চাননি যে, এটা তার পরবর্তী খলিফার জন্য একটি খারাপ উদাহরণ হয়ে থাকুক। যদিও উসমান আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর-এর পরামর্শ মতে কাজ করে যাচ্ছিলেন। যদি উসমান আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারী বিদ্রোহীদের কথামতো খিলাফত ছেড়ে দিত; তাহলে খিলাফত ভবিষ্যতে অসৎ লোকদের কাছে একটি খেলনার পাত্রে পরিণত হতো। আর এভাবে খলিফার পদটি লোকদের নিকট একটি অস্থিরতার এবং অবাধ্যতার বিষয়ে পরিণত হতো। উসমান তাঁর পরবর্তীতে আগত খলিফার জন্য একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করে গেলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর সহ সাহাবিদের পরামর্শ করে ধৈর্যসহকারে এ অবরোধ মোকাবিলা করেন।

তিনি আল্লাহর নিকট এর বিনিময়ে পুরস্কারের আশা করলেন এবং খিলাফত ত্যাগ করলেন না। তিনি কোনো মুসলমানের রক্ত ঝরাতে রাজি ছিলেন না। আর এটা এ কারণেই; তা না হলে কেন তিনি তাদেরকে প্রতিহত করলেন না? অথবা তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন না? তিনি যেকোনো ধরনের খারাপ পরিস্থিতি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেন। তিনি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন যে, তিনি আল্লাহর ভালোবাসায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করবেন এবং এমন কিছু করবেন যা মুসলিম উম্মার জন্য ভালো হয়। এমনকি, তিনি আল্লাহর রাসূল-এর বাণী থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন।

অধ্যায়-১০

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর শাহাদত

১. বিদ্রোহী কর্তৃক উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে হত্যার হুমকি

একদা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর ঘরের দরজায় গেলেন। তিনি শুনতে পেলেন বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে। তিনি তাঁর দরজা থেকে ঘুরে আসলেন এবং যারা তাঁর সাথে ছিলেন তাদেরকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। তারা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বললেন 'আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট।' উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এ ভেবে বিস্মিত হলেন যে, কেন তাঁরা তাঁকে হত্যা করবে? তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে,

"আল্লাহর শপথ, আমি আমার জীবনে কোনো ধরনের যিনা বা ব্যভিচার করিনি, আল্লাহর রহমতে আমি কখনো আমার ধর্ম ত্যাগ করার জন্য ন্যূনতম চিন্তাও করিনি, আর কখনো আমি কাউকে হত্যা করিনি। তাহলে কেন তারা আমাকে হত্যা করবে?" উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিদ্রোহীদের শান্ত করে এ ধরনের বিদ্রোহ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি বলেছেন অবরোধকারীদের কাছে একজন ব্যক্তিকে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য আসতে বললেন। তারা সাসাহ্ ইবনে সাওয়ান নামক এক যুবককে প্রেরণ করল। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন কেন তারা তাঁর ওপর রাগান্বিত? কিন্তু সাসাহ্ এর সাথে আলোচনা কোনোরূপ ফলপ্রসূ হলো না। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এটি অনুধাবন করতে পারলেন যে, বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে উন্মুখ হয়ে আছে। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাদের বিরুদ্ধাচরণের কারণে কেউ যেন তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করেন সে উপদেশ দেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর বাড়িতে তাঁর সাথে প্রায় ৭০০ জন লোক অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যদি অনুমতি দিতেন এবং আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তারা বিদ্রোহীদের এই শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম ছিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু যদিও তাদের কোনোরূপ প্রতিরোধ গঠন বা যুদ্ধ করতে অনুমতি দেননি।

মুহাজির এবং আনসার সাহাবিরা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। যখন সাহাবিরা দেখলেন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করতে অথবা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে অনুমতি দিচ্ছেন না তখন তাদের মধ্য থেকে কিছুসংখ্যক সাহাবি তাদেরকে অন্যভাবে প্রতিহত করতে চাইলেন। তারা তাকে মক্কায় চলে

গিয়ে তাঁকে তাঁর জীবন বাঁচানোর পরামর্শ দিয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতার প্রস্তাব দেন, কিন্তু উসমান তাঁদের এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।

২. কেন উসমান যুদ্ধের অনুমতি দেননি

গবেষক এবং ইতিহাসবিদগণ উসমান কর্তৃক সাহাবিদেরকে প্রতিহত এবং যুদ্ধ করতে না দেওয়ার পেছনে পাঁচটি কারণ খুঁজে পেয়েছেন। সেগুলো হলো:

১. উসমান মহানবী মুহাম্মদ-এর সাথে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি যেকোনো ধরনের গোলযোগকে অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়ভাবে মোকাবেলা করবেন। রাসূল যখন তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি এ ধরনের গোলযোগের মধ্যে পতিত হবেন তখন তিনি এই অঙ্গীকার করেন।

২. আল্লাহর রাসূল-এর সাহাবিদের মধ্যে তিনি মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিতকারীদের মধ্যে প্রথম হতে চান নি।

৩. তিনি জানেন যে, বিদ্রোহীদের আর কোনো শত্রু নেই, তারা একমাত্র উসমানেরই শত্রু। তাই তিনি চাননি তাদেরকে প্রতিহত করতে গিয়ে কোনো মুসলমান শাহাদত বরণ করুক; বরং তিনি তাদেরকে মোকাবিলা করতে গিয়ে শহীদ হতে চেয়েছেন।

৪. তিনি জানতেন তিনি যদি সত্যের সাথে ধৈর্যের সাথে অবস্থান করেন তাহলে তারা তাঁকে হত্যা করবে। মুহাম্মদ তাঁকে বিপদের মাধ্যমে জান্নাত লাভের সুসংবাদ দেন, যা তিনি ঐ সময় অনুভব করেন।

৫. তিনি প্রতিরোধ গঠন এবং যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এ কারণে যে, তিনি এটি বোঝাতে চেয়েছেন যে, ঐদিন ঐসময় তাদের আনীত অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে তিনি তাঁর অবস্থানে সুদৃঢ় আছেন। আর এভাবে রাসূল-এর ভবিষ্যদ্বাণী উসমান-এর শাহাদত বরণের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হলো।

উসমান একজন শান্তশিষ্ট এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, এবং তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণেও সমর্থ ছিলেন। বিভিন্ন কারণ একত্রিত হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি বিদ্রোহীদের যুদ্ধের পরিবর্তে তাদেরকে সম্মান দেখিয়ে শান্তিপ্রিয় সমাধানের চেষ্টায় করেন। মুহাম্মদ-এর নির্দেশিত পদ্ধতিতে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যার কারণে সাহাবিরা মেনে নিল যে, তিনি সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তিনি জানতেন যে, বিদ্রোহীদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে হত্যা করা।

মুসলমানরা তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে তাঁর পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁকে যুদ্ধ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি লোকদেরকে বলেন, তোমরা যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাক। উসমান ঠিক তাঁর শাহাদতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ ধরনের

সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন এবং এটি মুসলমান জাতির জন্য একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে স্থাপন করেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এ গোলযোগ মিটানোর জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং তিনি তাদের সাথে কোনোরূপ সংঘর্ষে জড়াতে নিষেধ করেন। এভাবে তিনি বিজ্ঞ এবং প্রাজ্ঞ সাহাবিদেরকেও তাদের সন্তানদেরকে যারা তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেছেন তাঁদেরকে বুঝিয়েছেন। এমনকি তিনি তাঁর কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদেরকে যুদ্ধ না করতে জোরালোভাবে নিষেধ করেন। এমনকি কিছুসংখ্যক সাহাবি তাদের নিজেদের প্রতি একরকম রাগান্বিত হলেন যে, যখন তিনি তাদেরকে কোনোকিছুই করতে দিচ্ছে না। তার বিভিন্ন প্রক্রিয়া পরবর্তীতে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে তাদেরকে ফিরিয়ে আনেন, মুসলমান সৈন্যদলের অনেকে অন্যান্য কারণে তাদের নিজেদের ওপর রাগান্বিত হয়, যখন তারা খলিফার পক্ষ অবলম্বন করেছিল।

৩. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদত বরণ

হজের দিন শেষ হয়ে আসছে। বহুসংখ্যক হাজী মদিনার দিকে রওয়ানা হয়ে গেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং অনেক সাহাবি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে মদিনার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এদিকে বিদ্রোহীদের কাছে খবর এল যে, হাজীরা খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সমর্থন দেওয়ার জন্য মদিনার দিকে আসছেন। তাদের এই কাজের জন্য লোকেরা তাদেরকে ঘৃণা করে। তারা এটি অনুধাবন করেছে কোনোকিছুই তাদেরকে বাঁচাতে পারবে না, তাদের বাঁচার একটাই পথ রয়েছে, তা হলো তারা খলিফাকে হত্যা করে চলে যাওয়া।

অবরোধের শেষদিন যেদিন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করা হয়, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘুমে ছিলেন। ঐদিন সকাল বেলা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের বলেছিলেন, আমি স্বপ্নে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে ছিলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, "ও উসমান! তুমি আমাদের সাথে ইফতারি করো।" উল্লেখ্য যে, যেদিন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা হয়েছিল, সেদিন তিনি রোযা রেখেছিলেন।

৪. যেভাবে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করা হলো

বিদ্রোহীরা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে হামলা চালায় এ সময় তারা সাহাবাদের যুবক ছেলেদের বাধার সম্মুখীন হয়। সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি তোমাদের ওপর নির্ভর করতে চাই না।'

বিদ্রোহীরা উসমান -এর ঘরের দরজায় আগুন লাগিয়ে দিল, কিন্তু বাড়ির লোকেরা তাদেরকে থামাতে গেল। এ সময় উসমান নামায আদায় করছিলেন। উসমান তাঁর সমর্থকদেরকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার জন্য বললেন। তিনি তাদেরকে বললেন, আমাকে বিদ্রোহীদের সাথে একাকী থাকতে দাও। যার ফলে উসমান এবং তাঁর পরিবার ছাড়া আর কেউ বাড়িতে রইল না। পূর্বেই উসমান তাঁর কাছে কুরআনের একটি কপি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। তিনি তা তিলাওয়াত করতে ছিলেন। এ সময় একজন বিদ্রোহী তাঁর রুমে তাঁর কাছে আসল। উসমান তাকে দেখলেন। তিনি তাকে বললেন, 'তোমার এবং আমার মাঝে আল্লাহর গ্রন্থ আল কুরআন রয়েছে।' সুতরাং লোকটি বেরিয়ে গেল এবং উসমান আবার একাকী হয়ে গেলেন। যাহোক, সে যেতে না যেতে চতুর্থ ব্যক্তিটি তার কাছে আসল। তাকে মাওয়াত আল আসওয়াদ বলে ডাকা হতো। সে উসমান -এর শ্বাসরোধ করে হত্যা করতে চাইল, পরে সে তাঁকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করল। উসমান নিজেকে বাঁচানোর জন্য তাঁর হাত দ্বারা প্রতিহত করল, কিন্তু তার হাত কেটে গেল। কুরআনের ওপর তাঁর রক্ত ঝরতে লাগল, যা ইতঃপূর্বে তিনি তিলওয়াত করছিলেন। যখন বিদ্রোহীরা তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে, তাঁর স্ত্রী নায়লা তাদেরকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করল এবং তাঁর স্বামীর ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে চাইল। তাঁর হাতে তলোয়ারের অনেকগুলো আঘাত করা হলো। একজন বিদ্রোহী তাঁর দিকে এগিয়ে আসল এবং তাঁর হাতের আঙুলে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করল, তাঁর আঙুলি কেটে গেল। হাতের আঙুলগুলো মাটিতে পড়ে গেল। হযরত উসমান -এর একজন দাস তাঁকে সহায়তা করার জন্য গেল। সে একজন বিদ্রোহীকে হত্যা করল, কিন্তু ইতোমধ্যে তারা তাদের কাজ সেরে ফেলেছে। তার প্রয়াস ব্যর্থ হলো। বিদ্রোহীরা তাদের তলোয়ার খলিফার শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিল এবং তিনি প্রাণহীন অবস্থায় নিচে পড়ে রইলেন।

বিদ্রোহীরা এবার তাদের পথে। তাদের দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল, এ সময় খলিফার বাড়ি একটি বাগাড়ে পরিণত হলো। নায়লা আহত হলেন এবং তাঁর রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তার পর্দা চুরি হয়ে গেছে। কিছু পরে, সরকারি কোষাগার থেকে কান্নার চেঁচামেচির শব্দ শুনা গেল।

বিদ্রোহীরা বাড়ির সকল কিছু তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজি করল। এমনকি মহিলাদের শরীর থেকে তাদের পরিহিত অলংকার পর্যন্ত তারা খুলে নিয়ে গেল। তারা বাইতুল মালের সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য সেখানে হামলা চালাল। কিন্তু তারা সেখানে দুটো খাবারের পাত্র ছাড়া আর কিছুই পেল না। এ ধরনের কার্যকলাপের

মধ্য দিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহীগোষ্ঠী খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হত্যা করে তাদের হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে।

মদিনার শান্তপ্রিয় সাধারণ মুসলমানগণ তাদের খলিফার নির্মম হত্যাকাণ্ডে অত্যন্ত ব্যথিত হন। সাবার বিদ্রোহী দলের সৈন্যরা মদিনা দখল করে নেয় এবং আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা এ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনা গ্রহণ কর, তারা তাদের এ ঘৃণিত কাজ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে উল্লাস প্রকাশ করে।

৫. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জানাযার নামায এবং দাফন কাফন

৩৫ হিজরির ১৮ যিলহজ মাসে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে শহীদ করা হয়। যা ছিল ১৭ জুলাই ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ। ঐদিন ছিল শুক্রবার। যখন তাকে শহীদ করা হয়, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একদল সাহাবি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃতদেহ গোসল দেন। যুবায়ের ইবনে আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর জানাযার নামায পড়ানোর জন্য বলা হলো। তাঁর জানাযার নামায রাতে সালাতুল মাগরিব এবং সালাতুল এশার মাঝামাঝি সময়ে আদায় করা হয়। (অর্থাৎ তাঁর জানাযার নামায পড়া হয়েছিল সন্ধ্যার পরে।)

৬. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদত বরণে মুসলিম উম্মাহর প্রতিক্রিয়া

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদতের ঘটনার পর মুসলমান জাতি পুনরায় এক মারাত্মক গোলযোগের ভেতর পতিত হয়। এর প্রভাব প্রায় প্রতিটি স্থানে লক্ষ করা যায়। মানুষ এ ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদতের শোক প্রতিটি মানুষের অন্তরে অন্তরে ছড়িয়ে পড়ল। এখান থেকে ফিরে আসতে হলে লোকজনকে অবশ্যই ইসলামি হুকুম এবং এর শিক্ষা অবলম্বন করতে হবে। আর এ ধরনের একটি শোকাবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণই হচ্ছে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদত বরণের হৃদয়বিদারক ঘটনা। ঐ ঘটনা থেকে সৃষ্ট মুসলিম জাতির বিভক্তি আজ পর্যন্ত লক্ষ করা যায়। প্রত্যেক মানুষের মনে এক জনের প্রতি আরেক জনের অভ্যন্তরে এক ধরনের ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হয়। যখন দুষ্কৃতিকারীরা তাদের মানবিক অধিকারগুলো তাদের দখলে নিয়ে যায় তখন সেখানকার মানুষকে নানা ধরনের দুর্যোগের মোকাবিলা করতে হয়।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে ছিলেন সেটা তাঁর রক্তে ভিজে যায়। যে দাগ আজো পর্যন্ত দৃশ্যমান। যা মোছে ফেলা কখনো সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনে শিরীন বলেন, 'আমি পবিত্র কাবাঘর তাওয়াফ করছি এমন সময় আমি শুনতে পেলাম এক ব্যক্তি বলছে, "হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও, কিন্তু আমি মনে করি না যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করবে।" আমি

লোকটিকে বললাম "ওহে ভাই! আমি তোমাকে তো অন্য কিছু বলতে শুনিনি, তুমি এগুলো কী বলছ?" সে উত্তর দিল : "আমি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছি যে, আমি যদি উসমানের মুখে চড় মারার সুযোগ পাই, তাহলে আমি তা করব। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃতদেহ তাঁর বাড়ির সামনে রাখা হলো। লোকেরা সর্বশেষ তাঁর সম্মানে তার জন্য দোআ করছিলেন। আমি সেখানে প্রবেশ করলাম এ জন্যে যে, আমি তাঁকে আমার সর্বশেষ ইচ্ছা পূরণ করার জন্য এবং আমি তাঁকে সেখানে একাকী পেলাম। আমি তার মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরালাম। আমি তাঁর মুখে একটি চড় মারলাম এবং আমি পুনরায় তাঁকে ঢেকে রাখলাম। এখন আমার ডান হাতটি অচল হয়ে গেছে।" মুহাম্মদ ইবনে শিরীন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যার ঘটনার ওপর মন্তব্যে এটি বর্ণনা করেন,"আমি ঐ ব্যক্তির হাতটি দেখেছি। যা একটি কাঠের টুকরার মতো শক্ত হয়ে আছে।'

৭. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হত্যার ফলাফল

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামের তৃতীয় খলিফা ছিলেন। আরব দেশের সম্পদশালী ব্যক্তিদের মধ্যে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অন্যতম । ইসলামের খেদমতের জন্য তিনি জানমাল উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি; কিন্তু তাঁর খিলাফতের শেষ দিকে তিনি বিভিন্ন বিদ্রোহের কবলে পড়ে শাহাদত লাভ করেন। নিচে উসমান হত্যার ফলাফল আলোচনা করা হলো-

১. খিলাফতের মর্যাদাহানি : খিলাফত একটি পবিত্র আসন; কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যার ফলে খিলাফত ও খলিফার প্রতি জনসাধারণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভক্তি শিথিল হয়ে যায়। বার্নার্ড জিওস বলেন, "বিদ্রোহী কর্তৃক খলিফা হত্যার মাধ্যমে যে বেদনাবিধুর দৃষ্টান্তের সৃষ্টি হয়, তা ইসলামের ঐতিহ্যের প্রতীক, খিলাফতের প্রতি চরম অবমাননা প্রদর্শন করে। খলিফা ও খিলাফতের প্রতি সাধারণ মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধা কমে আসে। ঐতিহাসিক খোদাবক্স বলেন, "এ হত্যাকাণ্ড সর্বকালের জন্য খলিফার ব্যক্তিগত পবিত্রতা নষ্ট করে।"

২. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি : উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকাণ্ডের ফলে ইসলামের একতা বিনষ্ট হয়। বিভিন্ন কার্যাবলির প্রতিবাদে এবং হত্যার প্রতিবাদে যে সকল মতবাদ ও দল-উপদলের উদ্ভব হয়, তা পরবর্তীকাল মুসলিম উম্মাহকে শতধা বিভক্ত করে। মুসলিম জাতি শিয়া, সুন্নি, খারেজি, রাফেজি প্রভৃতি বিভিন্ন ফিরকা বা উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়।

৩. ঐক্য বিনষ্ট : উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু–এর হত্যাকাণ্ডের ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে ঐক্য, সম্প্রীতি ও সংহতি ছিল, তা বিনষ্ট হতে শুরু করল। এর ফলে ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সূত্রপাত ঘটে। সহনশীলতা ও ধৈর্য পরস্পরের প্রতি আস্থা

ও মমত্ববোধ এবং ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হতে থাকে। আরব-অনারব, কুরাইশ, অ-কুরাইশদের বিরোধের জন্ম দেয়। এ হত্যাকাণ্ড মক্কার হাশেমী ও উমাইয়াদের মধ্যে সুদূরপ্রসারী বিভেদের সৃষ্টি করে। এর ফলে উমাইয়া বংশের সিরিয়ার শাসনকর্তা আমিরে মুয়াবিয়া মদিনার কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যার প্রতিশোধ ও বিচারের অজুহাতে গৃহযুদ্ধের সূচনা করেন। অবশেষে আমিরে মুয়াবিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে খিলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. গৃহযুদ্ধের সূচনা : এ হত্যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে নাশকতামূলক অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যা ছিল গৃহযুদ্ধের বিপদ সংকেত। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতে যে কয়টি গৃহযুদ্ধ হয় তা এ হত্যাকাণ্ডেরই প্রতিক্রিয়া। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠা এবং পতনের পরও এ দ্বন্দ্বের অবসান হয়নি।

৫. মদিনার প্রাধান্য লোপ : এরপর থেকে মদিনার প্রাধান্য লোপ পায়। পরবর্তী খলিফাগণ সুবিধামতো রাজধানীকে কূফা, দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো এবং কর্ডোভায় স্থানান্তর করেন। ফলে মদিনার রাজনৈতিক মর্যাদা কমে যায়। মদিনা একটি পবিত্র ধর্মীয় নগরী হিসেবে পরিগণিত হয়।

৬. ইসলামি গণতন্ত্রের বিলুপ্তির সূচনা : উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী সময়ে যে সকল রাজনৈতিক হট্টগোল দেখা দেয়, তাতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ধীরে ধীরে রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে থাকেন এবং আলী (র)-এর খিলাফতের অবসানের সাথে সাথে ইসলামি গণতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং রাজতন্ত্রের উত্থান শুরু হয়।

৮. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিদায়ে মুসলমানদের হৃদয়ব্যথা

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদতের ঘটনা মুসলমানদের মনে বিরাট প্রভাব ফেলে। তারা সবাই ছিলেন শোকে আচ্ছন্ন। তিনি ৮২ বছর বয়সে শাহাদত বরণ করেন অর্থাৎ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের ১২ বছর পর এই হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে। এটি ছিল তাদের জন্য একটি দুর্ভাগ্য যে, তাঁর হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার দুষ্কর্মগুলো আরো ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আর মুসলিম উম্মাহ তাঁর এই রক্তের ঋণ আজো পর্যন্ত বয়ে বেড়াচ্ছেন যা কোনো দিন শোধ হওয়ার নয়! খলিফার মৃত্যুতে মদিনায় অবস্থানরত বিশিষ্ট সাহাবিগণ যারপরনেই ব্যথিত হন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদতের খবর পেয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর দয়াপরবশ হোন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁকে বলা হয়, হত্যাকারীরা লজ্জিত, অনুতপ্ত। একথা শুনে তিনি আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ.

"এরা শয়তানের ন্যায়, সে মানুষকে বলে, কুফরী কর'; অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন সে বলে, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। ফলে উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে এরা স্থায়ী হবে এবং এটিই যালিমদের কর্মফল।"[৯৩]

আয-যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদতের সংবাদ দেওয়া হয় তখন তিনি বলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। যখন তাঁকে আবার বলা হলো যে, হত্যাকারীরা অনুতপ্ত, লজ্জিত। তখন তিনি বললেন, (এখন অনুতাপের কোনো মূল্য নেই), ওরাই তো পরিকল্পনামাফিক সুনিপুণভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। তারপর তিনি নিচের আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ.

"এদের ও এদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল করা হয়েছে, যেমন পূর্বে করা হয়েছিল এদের সমপন্থিদের ক্ষেত্রে। তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।"[৯৪]

তালহা ইবনু উবায়দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে খালিফার শাহাদতের খবর পৌঁছলে তিনি বললেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি রহম করুন। লোকেরা বলল, হত্যাকারীরা অনুতপ্ত। জবাবে তালহা বললেন, ওয়া ধ্বংস হোক। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন,

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ.

---

[৯৩] আল কুরআন, সূরা হাশর, ৫৯ : ১৬-১৭

[৯৪] আল কুরআন, সূরা সাবা, ৩৪ : ৫৪

"এরা তো অপেক্ষায় আছে এক মহা নাদের যা তাদেরকে আঘাত করবে এদের বাক-বিতণ্ডাকালে। তখন তারা ওসিয়ত করতে সমর্থ হবে না এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসতেও পারবে না।"[৯৫]

বিশিষ্ট সাহাবি সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু খালিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদতের খবর শুনে বলেন, আল্লাহ উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর রহমত নাযিল করুন। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا . الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا . أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا . ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا .

"বল, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের? ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের চেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারাই সৎকর্ম করছে, ওরাই তারা, যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়; সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য ওজনের কোনো ব্যবস্থা রাখব না। জাহান্নাম, এটাই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলি ও রাসূলগণকে গ্রহণ করেছে বিদ্রূপের বিষয়রূপে।"[৯৬]

---

[৯৫] আল কুরআন, সূরা ইয়াসিন, ৩৬ : ৪৯-৫০।

[96] আলকুরআন ১৮: ১০৩-১০৬

আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

[খিলাফতকাল : ৩৫ হিজরী, ১৯ জিলহজ থেকে ৪০ হিজরী, ২১ রমযান]

অধ্যায়-১

আলী-এর বাল্যকাল

নাম পরিচয়

'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাবার নাম আবু তালিব। তাঁর দাদার নাম আব্দুল মুত্তালিব। মাতার নাম ফাতেমা বিনতে আসাদ।

ডাকনাম

'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ডাকনাম ছিল আবু তুরাব। আবু তুরাব অর্থ 'বালির পিতা'। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এ নাম ধরে ডাকতেন। এ ডাকনাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিকট অধিক প্রিয় ছিল। এ নাম দেওয়ার পেছনে একটা বিশেষ ঘটনা আছে : একবার আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বাড়িতে এসে দেখলেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুপস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কোথায়? উত্তরে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন মসজিদে। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝলেন যে, তাদের দুইজনের (স্বামী-স্ত্রী) মাঝে মনোমালিন্য হয়েছিল। তাই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বাড়িতে থাকার পরিবর্তে মসজিদে রাত কাটানোর মনস্থির করেছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ জামাতার খুঁজে মসজিদের দিকে যাত্রা করলেন এবং দেখলেন তিনি ঘাড়ের ওপর চাদর রেখে শুয়ে আছেন। আর তার পিঠে বালি লেগে ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে তাকে উঠালেন এবং পিঠ থেকে বালি ঝেড়ে দিলেন এবং বললেন হে আবু তুরাব (বালির পিতা) উঠো। এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে–

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ قَالَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِي فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِنْسَانٍ انْظُرْ أَيْنَ هُوَ فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِ

وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ قُمْ أَبَا تُرَابٍ قُمْ أَبَا تُرَابٍ

"সাহল ইবনু সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে এলেন, কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ঘরে পেলেন না। তিনি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায়? তিনি বললেন, আমার ও তাঁর মধ্যে বাদানুবাদ হওয়ায় তিনি আমার সাথে রাগ করে বাইরে চলে গেছেন। আমার কাছে দুপুরের বিশ্রামও করেননি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন, দেখ তো সে কোথায়? সে ব্যক্তি খুঁজে এসে বলল: হে রাসূলুল্লাহ, তিনি মসজিদে শয়ন করে আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কাত হয়ে শয়ন করেছিলেন। তাঁর দেহের এক পাশের চাদর পড়ে গেছে এবং তাঁর দেহে মাটি লেগেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দেহের মাটি ঝেড়ে দিতে দিতে বললেন, উঠ, হে আবু তুরাব! উঠ, হে আবু তুরাব![১]

এছাড়াও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আরেকটি উপনাম ছিল। এটি হলো 'আবুল হাসান'। আরবের প্রাচীন প্রথানুযায়ী বড় ছেলের নামানুসারে পিতাকে ডাকা হতো। অর্থাৎ, পুত্রের সাথে আবুল সংযোগ করে ডাকা হতো। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পিতার প্রকৃত নাম হলো আব্দে মানাফ, কিন্তু তার বড় ছেলে তালিবের নামানুসারে তাকে আবু তালিব উপনামে ডাকা হতো। একইভাবে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও বড় ছেলে হাসানের নামানুসারে আবুল হাসান উপনামে ডাকা হতো।[২]

উপাধি

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উপাধি তিনটি। যথা–

১. হায়দার : হায়দার শব্দের অর্থ সিংহ। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ উপাধি দেন। মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাতা তাঁকে এ উপাধি দেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খায়বার বিজয়ের দিন প্রতিদ্বন্দ্বী মারহাবের আস্ফালনের জবাবে বলেছিলেন, "আমি সেই (বিখ্যাত বাহাদুর) ব্যক্তি যে, আমার মাতা আমার না' রেখেছেন, 'হায়দার' অর্থাৎ, সিংহ।[৩]

---

১ সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৪৪১; মুসলিম, হাদিস নং ২৪০৯।

২ মাওলানা নূরুর রহমান, *হযরত আলী ইবন আবি* তালিব (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয় প্রা ২০০৪), পৃ. ১০।

৩ মাওলানা নূরুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

২. আসাদুল্লাহ : আসাদুল্লাহ শব্দের অর্থ 'আল্লাহর সিংহ'। খাইবার যুদ্ধের অভিযান চলাকালে নবী করীম ঘোষণা করলেন- কাল আমি এমন একজন বীরের হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রিয়পাত্র। তাঁরই হাতে খাইবারের দুর্গগুলোর পতন হবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ আলী -এর হাতে ঝাণ্ডা তুলে দিলেন এবং খাইবারের দুর্গগুলোর পতন হয়।

মাওলানা নুরুর রহমান বলেন, আলী -এর মাতা বাবার নামানুসারে পুত্রের নাম রাখেন আসাদ। এ নাম থেকেই তাঁর উপাধি হয় আসাদুল্লাহ।[৪]

৩. মুরতাজা : মুরতাজা শব্দের অর্থ পছন্দনীয়। আলী কে আরবের লোকেরা মুরতাজা বলে ডাকত।

বংশ পরিচয়

আলী কুরাইশ বংশের বনু হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এ গোত্রেই নবী মুহাম্মদ ও জন্মগ্রহণ করেন। কুরাইশ হলো ফিহর ইবন মালিকের পদবি।[৫] কুরাইশ বংশীয় নেতা হলেন হাশিম। হাশিম তাঁর সময়ের একজন জ্ঞানী এবং উদার ব্যক্তি ছিলেন।[৬] দক্ষিণে ইয়েমেন এবং উত্তরে সিরিয়াতে কুরাইশ পণ্যগুলো তিনি সুবিন্যস্ত করতেন। কাফেলাগুলো পূর্বে নজদ এবং মেসোপটেমিয়াতে যাত্রা করত। এই পথে মক্কা আরবের নামকরা বাজার হয়ে ওঠে। তাঁর সাহসিকতা এবং উদারতার কারণে তিনি আরবের একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। হাশিমের অকাল মৃত্যুতে তাঁর বংশধরগণ এবং অন্যান্য অংশীদারগণ দুর্বল হয়ে পড়ে। হাশিমের মৃত্যুর পর তাঁর ছোট ভাই মুত্তালিব কুরাইশদের নেতা হন। শাইবার জন্মের পর মুত্তালিবকে খবর দেওয়া হয়েছিল। তিনি ইয়াসরিবে যান এবং সেখান থেকে তাকে নিয়ে আসেন। আব্দুল মুত্তালিব যখন শাইবাহকে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন সাধারণ মানুষজন সাথে থাকা বালককে মুত্তালিব-এর ভৃত্য আব্দুল মুত্তালিব মনে করেন।[৭] মুত্তালিব শাইবাহকে নিজ সন্তানের ন্যায় বড় করেন। শাইবাহ 'আব্দুল মুত্তালিব' উপনামেই প্রসিদ্ধ হন।

---

৪ মাওলানা নূরুর রহমান. *হযরত আলী ইবন আবি* তালিব (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয় প্রা. লি., ০০৪), পৃ. ১০।

ইবনে হিশাম, 'আল-সীরাতুন্নবীয়াহ', কায়রো ১৯৫৫, ১৩৭৫ হিঃ পৃঃ ৯৩।

ইবনে সা'দ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৮।

৭ ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত. পৃঃ ১২৮: ইবনে সা'দ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩; ইবনে খালদূন, প্রাগুক্ত. পৃঃ ৬৯৬।

মুত্তালিবের পর আব্দুল মুত্তালিব বনু হাশিমের প্রধান হন। তিনি 'সাকিয়াহ' এবং 'রাফিদাহ'-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৮] তখন উমাইয়্যার পুত্র হারব, আব্দুল মুত্তালিবের কর্তৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং পুনরায় বিচারকদের রায় তার বিরুদ্ধে যায় যেমনটি তার পিতার ক্ষেত্রে ঘটেছিল।[৯] ফলে বনু হাশিম এবং বনু উমাইয়্যার মধ্যবর্তী ঈর্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

পিতা হাশিমের ন্যায়, পুত্র আব্দুল মুত্তালিব তাঁর উদারতা এবং স্বচ্ছতা দ্বারা নির্বিবাদে সকল কুরাইশের মনজয় করেন। প্রসিদ্ধ জমজম কূপ (বিবি হাজেরার পানি ফুরিয়ে গেলে শিশু ইসমাইলের পায়ের আঘাতে অলৌকিকভাবে যা উৎসারিত হয়েছিল) মরুভূমির ধুলায় ঢেকে গিয়েছিল।[১০] আব্দুল মুত্তালিব এটি পুনঃখনন করেন। প্রস্রবণ পরিষ্কার করা হয় এবং দেয়াল মেরামত করা হয়। এটি পুনরায় পানি সরবরাহ করতে শুরু করে। আব্দুল মুত্তালিব বিচারের ক্ষেত্রে বিচক্ষণ ছিলেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞানী ছিলেন এবং উচ্চ চারিত্রিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। ফলে কুরাইশদের নিকট তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। তিনি অর্ধ শতকেরও বেশি সময়, প্রায় উনষাট বছর মক্কা শাসন করেন। তাঁর শাসনামলে আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান নেতা আবরাহা যিনি ইয়েমেনে হিমেরীয়দের পরাজিত করেন, ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র কা'বা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে মক্কা আক্রমণ করেন। তার সঙ্গে বিশাল হস্তি-বাহিনী ছিল। মক্কাবাসী আগে কোনোদিন এরূপ জন্তু দেখেনি। আবরাহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং তার সৈন্য-সামন্ত প্রবল বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টিসহ ঝড়ে ধ্বংস হয়ে যায় এবং মহান আল্লাহ তা'আলা আবাবিল পাখি প্রেরণ করেন।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝ وَّأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ ۝ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ۔

"তুমি কি দেখনি তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কী করেছিলেন? তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেননি? আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে

---

৮ ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫১; ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪২; ইবনে সা'দ, প্রাগুক্ত পৃঃ ৮৩; ইবনে খালদূন, প্রাগুক্ত, ৬৯৬।

৯ আকবর শাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ৬১; হাফিয গুলাম সারোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬।

১০ আকবর শাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫; হাফিয গুলাম সারোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮।

ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন। তারা তাদের ওপর নিক্ষেপ করে পোড়ামাটির কঙ্কর। অতঃপর তিনি তাদেরকে করলেন ভক্ষিত শস্যপাতার ন্যায়।[১১]

অবশিষ্ট যেসব সৈন্য সেখান থেকে পালাতে পেরেছিল তারা বসন্ত রোগের মহামারীতে আক্রান্ত হয়। ফলে আবরাহার বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।[১২] এ বছর আরব ইতিহাসে হস্তি-বছর হিসেবে পরিচিত।

কুরাইশ বংশের এই বিখ্যাত বনু হাশিম গোত্রে তাঁর জন্ম হয়, যে গোত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও জন্মগ্রহণ করেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পূর্ণ নসবনামা হলো-

আলী ইবনে আবু তালিব ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ ইবনে কা'ব।

তৎকালীন সময়ে কা'বা

---

[১১] আল কুরআন, ১০৫:১-৫।

[১২] আকবর শাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৫, হাফিয গুলাম সারোয়ার, প্রাগুক্ত,পৃঃ ১৮।

আলী -এর বংশতালিকা রাসূলুল্লাহ -এর সাথে সম্পর্কিত
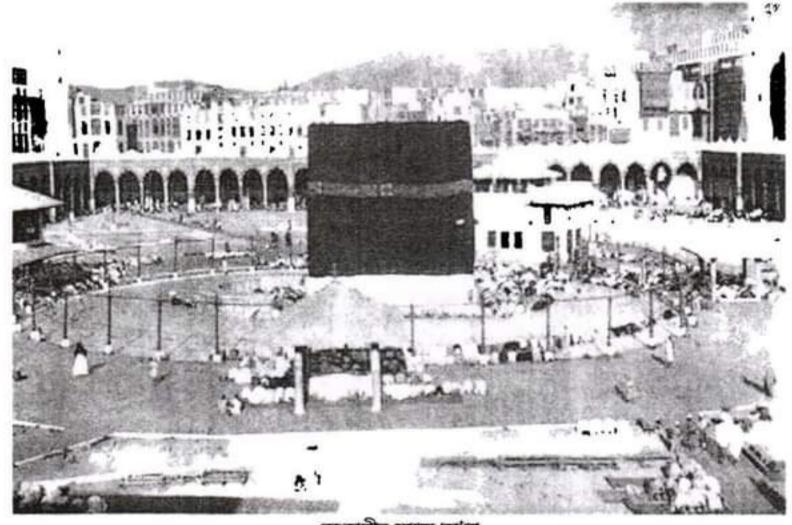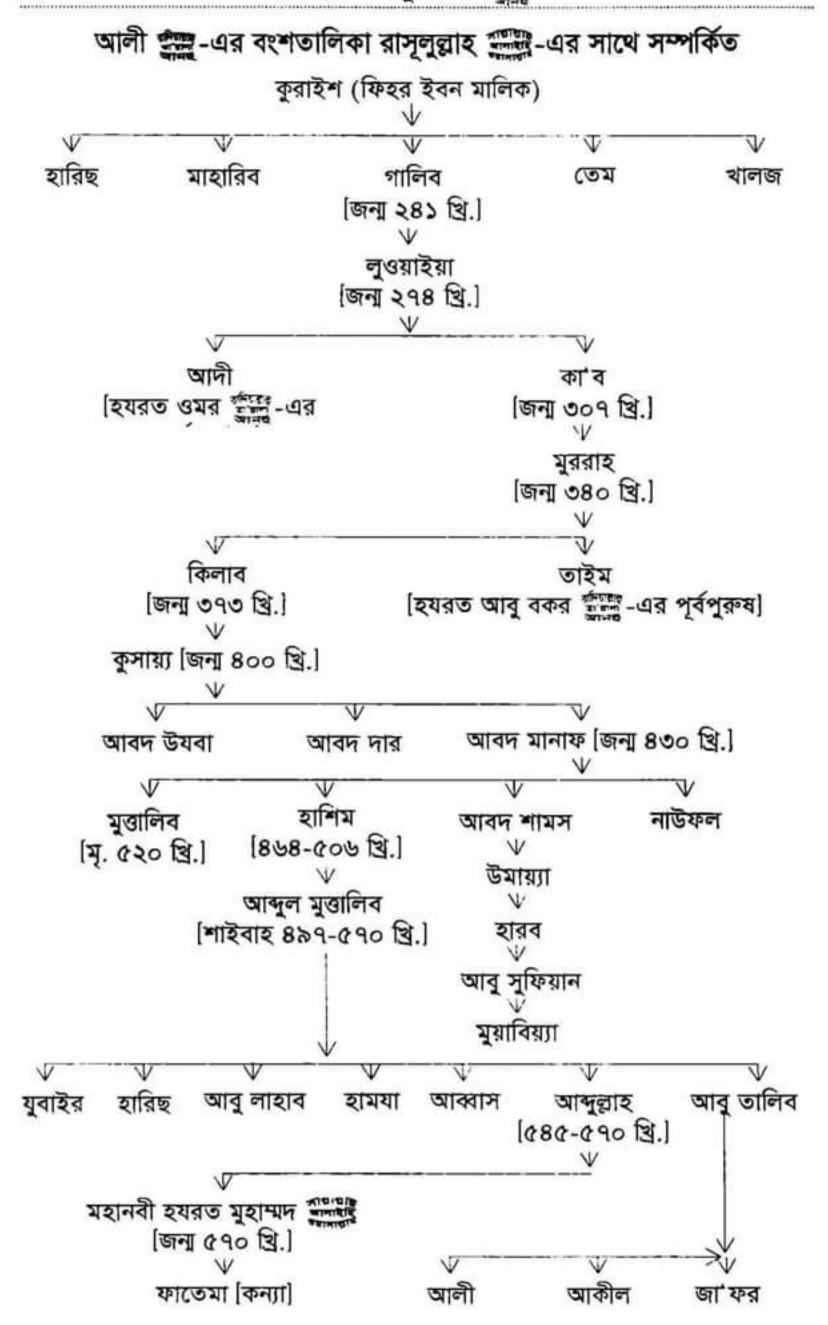
জন্মসন ও জন্মস্থান

মুহাম্মদ মুস্তাফা -এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে 'আলী জন্মগ্রহণ করেন।

মাওলানা নূরুর রহমান বলেন, আলী আবরাহা কর্তৃক কাবাঘর আক্রমণের তথা হস্তিবছরের ৩২ বছর পর ১৫/২৩ রজব তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

কেউ কেউ বলেন, আলী হাশিমীদের মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেছেন, কেউ বলেন, বাইতুল লাহ্মে, কারও মতে দামেস্কে; কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বর্ণনা এই যে, জাহেলিয়াতের যুগে রজবের ১৫ তারিখে কা'বা শরীফের দরজা খোলা হতো এবং এক দিন পুরুষ ও এক দিন স্ত্রীলোকদের জন্য খোলা থাকত। লোকেরা তখন কা'বা ঘরে প্রবেশের দুর্লভ সম্মান লাভ করে ধন্য হতো। এই তারিখটি নির্দিষ্ট করার কারণ এই যে, এই তারিখে ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন। আরববাসীদের মধ্যে এই দিবসটি 'ইয়াওমূল এস্তেফ্তাহ' অর্থাৎ, 'দ্বারোদঘাটন দিবস' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। স্ত্রীলোকদের যেয়ারতের জন্য নির্দিষ্ট দিনে ফাতেমা বিনতে আসাদও খানায়ে কা'বার যেয়ারতের জন্য গমন করলেন। আলী তখন তাঁর গর্ভে ছিলেন এবং প্রসবকালও আসন্ন হয়ে পড়েছিল, বছরে মাত্র একদিন কা'বা ঘরে প্রবেশের সুযোগ থাকায় দূর দূরান্তের স্ত্রী-পুরুষদের সমাগমে কা'বা গৃহে ভীষণ ভিড় লেগে যেত। এই ভিড় ঠেলে তিনি অতি কষ্টে কা'বা ঘরের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছলেন; কিন্তু ঘরে উঠবার কোনো সিঁড়ি না দেখে থমকে দাঁড়ালেন। কেননা, কা'বা গৃহের ভিত্তি দীর্ঘকায় একজন মানুষের সমান উঁচু ছিল। এত উপরে আরোহণ করার শক্তি তাঁর ছিল না, অবশেষে দুইজন পুরুষ টেনে তাঁকে কা'বা ঘরে পৌঁছে দিল, এই টানাটানির ফলে প্রসব বেদনা আরম্ভ হয়ে গেল। তিনি মনে করলেন, এ ব্যথা সাময়িক। নড়াচড়া ও টানাটানির কারণে দেখা দিয়েছে, শীঘ্রই সেরে যাবে। অতএব, তিনি যেয়ারতের আগ্রহে কা'বাগৃহ অভ্যন্তরে অগ্রসর হলেন। কিন্তু কয়েক কদম যেতেই প্রসব বেদনা তীব্র হয়ে উঠল, অপারগ হয়ে তিনি সেখানেই বসে পড়লেন, আর এখানেই সংগ্রামী মহাপুরুষ আলী এর জন্ম হলো।

মাম যয়নুল আবেদীন বর্ণনা করেন যে, ফাতেমা বিনতে আসাদের সহযাত্রিনী য়েদা বিনতে আজলান নামক জনৈক স্ত্রীলোক আমাকে বলেছে যে, "খানায়ে া'বার ভেতরে যখন ফাতেমা বিনতে আসাদের প্রসব বেদনা শুরু হলো, তখন

আবু তালিব তাঁর বেদনাক্লিষ্ট চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি প্রসবের লক্ষণ বোধ করছি। আবু তালিব তাঁকে কা'বা গৃহের এক কোণে নিয়ে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার নাম নিয়ে বসে পড়। তিনি ভালোভাবে না বসতেই আমরা দেখলাম, তাঁর গর্ভ হতে অতি সুদর্শন একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল। এমন রূপবান ছেলে তখন পর্যন্ত আমি আর কোথাও দেখিনি। আবু তালিব সেই ছেলেটির নাম রাখলেন, আলী। কিছুক্ষণ পরেই রাসূল সেখানে এলেন এবং ফাতেমা বিনতে আসাদকে ধরে ঘরে নিয়ে আসলেন।" তখন রাসূল -এর বয়স ছিল একত্রিশ বছর। এ ঘটনা হিজরতের একুশ/বাইশ বছর আগের ঘটনা।[১৩]

রাসূলের সান্নিধ্যে কাটানো বাল্যকাল

জন্মসূত্রে আলী রাসূল -এর চাচাতো ভাই। রাসূল -এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকালের পর তিনি চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানেই লালিত-পালিত হন। এভাবে আলী জন্ম থেকেই মহানবী মুহাম্মদ -এর সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। আবু তালিবের অসচ্ছল অবস্থার দরুন বালক 'আলী নবী করীম -এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। নবী করীম তাঁকে খুব স্নেহ করতেন।[১৪]

আলী -এর জন্মের পূর্ব থেকেই তিনি রাসূলুল্লাহ -এর স্নেহ পাওয়ার অঙ্গীকার পেয়েছেন। জন্মের পর থেকেই আলী রাসূলুল্লাহ -এর স্নেহে ধন্য হয়েছিলেন। ফাতেমা বিনতে আসাদ স্বয়ং বর্ণনা করেন, "আলী আমার গর্ভে থাকাকালে রাসূল প্রায়ই আমার ঘরে আসতেন এবং আমার অস্থিরতা ও অস্বস্তি দেখে জিজ্ঞেস করতেন, আম্মাজান! কেমন বোধ করছেন? আমি বলতাম, আপনি তো জানেন যে, আমি গর্ভবতী। তিনি বলতেন, এটি তো বড় আনন্দের কথা। যদি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে আমার নিকট বিবাহ দিবেন। আমার স্বামী একথা শুনে রাসূল কে বললেন, মেয়ে-সন্তান হলে আপনার বাঁদী আর পুত্র-সন্তান হলে আপনার গোলাম হবে। যখন পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করল, আবু

১৩ মাওলানা নূরুর রহমান, *হযরত আলী ইবন আবি* তালিব (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয় প্রা. লি ২০০৪), পৃ. ৬-৭

১৪ আল-আসকালানী, শিহাবুদ্দীন, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস-সাহাবা, খ. ৫, ৮ : (দারুল কুতুব ইলমিয়া, তা.বি.)।

তালিব আদেশ করলেন, একখণ্ড কাপড় দ্বারা শিশুকে জড়িয়ে রাখ মুহাম্মদ না আসা পর্যন্ত শিশুর মুখ খুলিও না। কিছুক্ষণ পরেই রাসূল এলেন এবং নিজের পবিত্র হাত দ্বারা শিশুর মুখের কাপড় উন্মোচন করলেন। আবরণমুক্ত পুত্রসন্তানের চাঁদমুখ দর্শনে তাঁর মুখমণ্ডল আনন্দে ঝলমল করে উঠল। তিনি নবজাতকের নাম রাখলেন, আলী। তিনি স্বীয় জিহ্বা দ্বারা শিশুর মুখে লালা নিঃসরণ করলেন। শিশুটি তাঁর জিহ্বা চুষতে লাগল এবং আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চুষতে থাকল। অতঃপর যখনই তিনি আগমন করতেন, ছেলেটিকে নিজের পবিত্র জিহ্বা চোষণ করতে দিতেন।"[১৫]

আব্দুল মুত্তালিবের দশ পুত্রের মধ্যে নবী -এর বাবা আব্দুল্লাহ এবং আবু তালিব ছিলেন সহোদর (আপন ভাই)।[১৬] সুতরাং আবু তালিব ছিলেন মুহাম্মদ -এর আপন চাচা। তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন এবং অত্যন্ত স্নেহশীল চাচা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেন, যিনি পুত্রের চাইতেও ভাতিজা নবী কে বেশি স্নেহ করতেন। আলী -এর জন্মের সময় রাসূল আলী -এর পিতা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তাই বাবার ন্যায় মুহাম্মদ -এর সান্নিধ্যে আলী বাল্যকাল থেকেই একজন ন্যায়নিষ্ঠ ও মহৎ মনের মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেন।

আলী রাসূলুল্লাহ -এর চাচাত ভাই। তিনি নবী করীম থেকে ত্রিশ বছরের ছোট। রাসূলুল্লাহ তাঁকে অনেক বেশি আদর-যত্ন করে লালন-পালন করতেন এবং অনেক বেশি ভালোবাসতেন। নবী করীম আলী কে নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসলেন এবং আলী রাসূল পরিবারের একজন ঘনিষ্ঠ সদস্য হয়ে গেলেন। স্বয়ং মুহাম্মদ তাঁকে লালন-পালনের ভার নিয়েছেন এটি আলী -এর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান আশীর্বাদ। এ সম্পর্কে ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন,

নবী করীম তাঁর চাচা আব্বাস কে বললেন, হে আমার চাচা আব্বাস! নিশ্চয়ই আপনার ভাই আবু তালিবের পরিবারটি বেশি সদস্যবিশিষ্ট। আর এখন খুব অভাব-অনটন চলছে। আসুন আমরা আবু তালিবের বাড়িতে গিয়ে দেখি তার

---

১৫ মাওলানা নূরুর রহমান, *হযরত আলী ইবন আবি* তালিব (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয় প্রা. লি., ২০০৪), পৃ. ৭

১৬ ইবনে হিশাম,প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৯: ইবনে জারীরুত তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৯।

পরিবারের বোঝা কিছুটা হালকা করতে পারি কিনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ কারণে এ কথা বলেছিলেন যে, আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আর্থিক অবস্থা অনেক ভালো ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচার সাথে পরামর্শ করে বললেন, আমি আবু তালিবের একটি সন্তান প্রতিপালন করব, আর আপনি একটি সন্তান প্রতিপালন করবেন। তখন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ঠিক আছে, চল। অবশেষে চাচা-ভাতিজা দুজনে আবু তালিবের কাছে এসে বললেন, আমরা দুজনে আপনার দুটি ছেলের দায়িত্ব নিতে চাই, যাতে করে আপনার পরিবারের বোঝা কিছুটা লাঘব হয়; এতে আপনার মতামত কী?

এ কথা শুনে আবু তালিব বললেন, ঠিক আছে, তোমরা আকিলকে রেখে বাকিদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নিয়ে যাও। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এবং আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে নিলেন। এরপর থেকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এবং জাফর আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে বেড়ে উঠতে লাগলেন।[১৭] এভাবে রাসূলের সান্নিধ্যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বড় হতে থাকেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সহোদরগণ

আলী ইবনে আবু তালিবের তিন ভাই ছিল– আলী, আকিল এবং জাফর। বোন ছিল দুইজন- উম্মে হানি এবং জুমানা। তারা সকলে ফাতেমা বিনতে আসাদ এর ছেলে-মেয়ে।

১৭ আস সিরাতুন নবুবিয়্যাহ, ইবনে হিশাম, খ. ১, পৃ. ২৪৬

অধ্যায়-২

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মাক্কীজীবন

ইসলাম গ্রহণ

মহানবী -এর নবুওয়াতের সূচনালগ্নে মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সার্বক্ষণিক ইসলামের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। ইবনে হিশামের মতে পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন আলী। তাবারীও এমন অনেক দলিল পেশ করেছেন যা আলী -এর সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণের ঘটনা প্রমাণ করে।[১৮]

আলী ইব্ন আবু তালিব -এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইব্ন ইসহাক রহ. বর্ণনা করেছেন : রাসূলুল্লাহ ও খাদিজা নামায পড়ছিলেন। এমন সময় আলী সেখানে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : হে মুহাম্মদ! এটা কী?. রাসূলুল্লাহ বললেন : এটি আল্লাহর দীন যা তিনি নিজের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তা প্রচার করার জন্য তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। আমি তোমাকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি, যাঁর কোনো শরিক নেই; তাঁর ইবাদত করো এবং লাত, ওয্যার ইবাদতকে অস্বীকার করো। তখন আলী বললেন : এটি এমন একটি বিষয় যা আমি আজকের পূর্বে কখনও শুনিনি। সুতরাং আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস না করে কোনো সিদ্ধান্ত নেব না। রাসূলুল্লাহ এটি পছন্দ করলেন না যে, দীন সম্পর্কে তাঁর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য ঘোষণার পূর্বে তা ফাঁস হয়ে যাক। অতএব তিনি বললেন : হে আলী! তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করতে না চাও তাহলে অন্ততপক্ষে তা গোপন রাখ।

এত অবস্থায় আলী রাত অতিবাহিত করলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে ইসলামের প্রতি আগ্রহ ঢেলে দিলেন। তিনি সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ -এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন : হে মুহাম্মদ! গতকাল আমাকে কী বলেছিলেন? রাসূলুল্লাহ বললেন : তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ বা মা'বুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই; আর লাত ও ওয্যাকে অস্বীকার করো এবং যেসব কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা হয় তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো। অতঃপর আলী তাই করলেন এবং ইসলাম

---

১৮ ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৫।

ধর্ম গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি আবু তালিবের ভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গোপনে আসা যাওয়া করতেন এবং নিজের ইসলাম গ্রহণকে গোপন রাখলেন, তা তিনি প্রকাশ করলেন না।[১৯]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের সময় হলে মক্কার অদূরে পাহাড়ে চলে যেতেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বাইরে যাওয়ার নাম করে পিতা আবু তালিব ও মক্কার লোকদের আড়াল করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী হতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এক সাথে নামায পড়ে মক্কায় ফিরে আসতেন। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী এভাবে কিছু দিন চলল।

অবশেষে নামাযরত অবস্থায় একদিন আবু তালিব দেখে ফেলল। তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আবার কোন ধর্ম অনুসরণ করছ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহর মনোনীত সেই ধর্ম যা আমাদের পিতা ইবরাহীম عَلَيْهِ السَّلَامُ-এর ধর্ম।

মহান আল্লাহ আমাকে পৃথিবীতে জনগণের কাছে এ ধর্মের দাওয়াত দিতে একজন নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। হে চাচা! আপনি আমার এ দাওয়াতের সর্বোত্তম সংরক্ষক। আপনি আমার এ দাওয়াতে সাড়া দিন এবং আমাকে সাহায্য করুন। উত্তরে আবু তালিব বললেন, আমি আমার বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারি না। তবে আমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত তোমাদের কোনো ক্ষতি হতে দেব না। পুত্রকে উদ্দেশ্য করে আবু তালিব বললেন– মুহাম্মদ তোমাকে সুন্দর ও কল্যাণের পথে আহ্বান করছে তুমি তাকে অনুসরণ কর।

মক্কায় ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ

তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচারে পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আদেশ এলো। মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ۔

"তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে দোযখের ভয় প্রদর্শন কর।"

তদনুযায়ী তিনি আলীকে আদেশ করলেন, "আমার আত্মীয়স্বজন তথা আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানগণকে আমার গৃহে আহারের জন্য দাওয়াত দিয়ে আস। আদে অনুযায়ী আলী দাওয়াত দিয়ে এলেন। যথাসময়ে প্রায় চল্লিশজন উপস্থিত হলে সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারে আরকাম নামক এক গৃহে বাস করতেন। পানাহ

১৯ মুসনাদে আহমাদ।

শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত মেহমানদের সম্মুখে মধুর ও তেজস্বিনী ভাষায় ইসলামের মর্ম তুলে ধরে বললেন, "সমগ্র বিশ্বের ও সমস্ত মাখলুকের খালেক এবং মালেক আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। আপনাদেরই হাতের তৈরি এ সমস্ত নিস্প্রাণ মূর্তি যাদের কোনোই ক্ষমতা নেই, এরা কোনোক্রমেই উপাস্য হতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সত্যিকারের উপাস্য। আমি তাঁরই প্রেরিত রাসূল। এর নাম ইসলাম ধর্ম, যা প্রচারের জন্য আমি প্রেরিত ও আদিষ্ট হয়েছি। আমি আপনাদের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলের জন্য একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে সদুপদেশ প্রদান করছি যে, আপনারা এই মিথ্যা ও অলীক দেবদেবীর পূজা পরিত্যাগ করে একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে আত্মনিয়োগ করুন। এতে পরকালের অনন্ত জীবনে মহাশান্তি ও সুখ ভোগ করতে পারবেন। অন্যথায় আপনাদেরকে দোযখের আগুনে অনন্তকাল ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। বলুন, আপনাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি এই সত্য ও শাশ্বত ধর্ম গ্রহণে রাজি আছেন? বলুন, আপনাদের কোন সৌভাগ্যবান দোযখের অনন্ত আযাব হতে নিজেকে রক্ষা করতে প্রস্তুত আছেন? বলুন, কোনো মহাপ্রাণ কোনো মহাব্যক্তি এই মহৎ কাজে আমাকে সাহায্য করতে রাজি আছেন?"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই পাষাণবিদীর্ণকারী মধুর ভাষণে সকলেই নীরব থাকল।

এটা দেখে তৎক্ষণাৎ বালক আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সকলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে ঘোষণা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনার পাশে থেকে আপনাকে সর্বপ্রকারের সহায়তা করতে প্রস্তুত আছি, মহান আল্লাহর শপথ! আজ হতে আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ করলাম।

আলী বলতে লাগলেন, সমবেত মেহমানগণ! একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কারও সম্মুখে মাথা অবনত করবেন না। জ্ঞান ও বিবেক খরচ করে একবার চিন্তা করুন, এই বিশাল দুনিয়া কার দান। এটি তো নিখিল বিশ্বের অবিনশ্বর অধিপতি মহান আল্লাহ্ তা'আলার দান। অতএব, একমাত্র তাঁরই ইবাদতে আত্মনিয়োগ করুন।

ওহে হাশিম মুত্তালিবের বংশধর! অভিশপ্ত শয়তানকে চিনতে চেষ্টা করুন। তার বিরুদ্ধাচরণে তৎপর হয়ে উঠুন। আর পরকালের মুক্তির পথ চিনে সে পথে চলার চেষ্টা করুন। সাবধান! শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সংসারের মায়া মোহে আকৃষ্ট হয়ে সত্য হতে দূরে সরে থাকবেন না। সত্যকে অবলম্বন করুন। অসত্যকে পরিহার করুন।

সকলে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু পুনরায় বলতে লাগলেন, দুনিয়ায় মানুষের জন্য তিনটি অমূল্য নেয়ামত লাভের সুযোগ এসেছে। আপনারা খুব

যত্নের সাথে এ নেয়ামতগুলো গ্রহণ করুন- (ক) ইসলাম ধর্ম কবুল করুন, (খ) আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করুন, (গ) আর তাঁর রাসূল -এর সহায়তা করুন।

এবারও সমবেত অতিথিবৃন্দ নীরব রইলেন। আলী পুনরায় বলতে লাগলেন, যে ব্যক্তি এলম ও দীন অর্জনের চেষ্টা করে, দীন তার জন্য জান্নাতে স্থান নির্ধারণ করে। পক্ষান্তরে, পাপাচারীর জন্য অনন্ত ও ভীষণ শাস্তিময় দোযখে স্থান নির্দিষ্ট হয়। সুতরাং হে লোকসকল! সর্বশক্তিমান, বিধাতা, বিশাল বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। এই শাশ্বত ধর্মের প্রচারকের সহায়তা করে সুখে দুঃখে তাঁর অনুগত থাকুন।

সমবেত লোকেরা আলী -এর হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। দীনের এই শাশ্বত বাণী কারও কারও হৃদয়কন্দরে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করল। তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে আলোকচ্ছটা দেখা দিল; কিন্তু পরিস্থিতি অনুমান করে আবু লাহাবসহ কতিপয় দুরাত্মা চমকে উঠল। তারা অশ্রুস্বজলে আবু তালেবের দিকে তাকিয়ে রইল এবং বলল, ভাতিজার কল্যাণে এখন বুঝি আপনাকেও এই পুত্ররত্নের অনুসরণ করে চলতে হবে? অতঃপর সকলে চলে গেল।[২০]

অপর এক বর্ণনা মতে, আলী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "যদিও আমার চক্ষু", আমার পা চিকন এবং এখানে উপস্থিত সকলের মধ্যে আমিই সর্বকনিষ্ঠ, তারপরও ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার পাশে দাঁড়াব!"[২১]

এভাবে মক্কায় ইসলাম প্রচারে আলী প্রকাশ্যে আত্মনিয়োগকারী সর্বপ্রথম মুসলিম হিসেবে বিবেচিত হন।

মক্কায় আগতদের ইসলাম গ্রহণে সহায়তা

আলী মক্কায় আগত লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণে সহায়তা করতেন। আলী -এর সহায়তায় যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আবু যার গিফারী অন্যতম। তিনি ইয়াসরিবে বসবাস করতেন। যখন সুআইদ বিন সামেত ও ইয়াস বিন মুয়াযের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ -এর আবির্ভাবের কথা শুনলেন।[২২] তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস এর বর্ণনা মতে আবু যার বলেছেন: "আমি ছিলাম গিফার

---

২০ মাওলানা নূরুর রহমান, *হযরত আলী ইবন আবু* তালিব (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয় প্রা. লি., ২০০৪), পৃ. ২০-২১

২১ ইবন জারীরুত তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২১; শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত,পৃ: ২১১।

২২এ আকবর শাহ নাজীরাবাদী, তারীখে ইসলামে, ১ম খ. ১২৮ পৃ.।

গোত্রের একজন লোক। আমি জানতে পারলাম যে, মক্কায় এমন একজন লোকের আবির্ভাব হয়েছে, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করছেন। আমি আপন ভাইকে বললাম: তুমি লোকটির নিকট গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বল এবং খবর নিয়ে আস। সে সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর ফিরে এল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী খবর এনেছ? সে বলল, 'আল্লাহর শপথ, আমি এমন মানুষ দেখেছি, যিনি ভালোর জন্য আদেশ এবং মন্দের জন্য নিষেধ করছেন। আমি বললাম, তুমি সন্তোষজনক উত্তর দিলে না। শেষ পর্যন্ত আমি নিজেই কাঁধে খাদ্যের ঝুলি এবং হাতে লাঠি নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা করলাম। সেখানে পৌঁছে তো গেলাম, কিন্তু তাঁকে চিনতাম না এবং তাঁর সম্পর্কে কাউকেও জিজ্ঞেস করব তাও সাহস পাচ্ছিলাম না।

ফলে আমি যমযমের পানি পান করতাম এবং মসজিদুল হারামে পড়ে থাকতাম। শেষ পর্যন্ত একদিন আমার নিকট দিয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন, "লোকটিকে অপরিচিত মনে হচ্ছে।" আমি তাঁর সঙ্গে চললাম। তাঁর সঙ্গে নেহাৎই মামুলী গোছের কিছু কথাবার্তা হলো। তিনি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। যে উদ্দেশ্যে আসার আগমন সে সম্পর্কে আমিও তাঁকে তেমন কিছু বললাম না। এভাবে রাত অতিবাহিত হলো।

সকাল হতে না হতেই আমি এ উদ্দেশ্যে মসজিদুল হারামে গেলাম যে, সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করব। কিন্তু সেখানে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি তাঁর সম্পর্কে কিছু বলবেন। শেষ পর্যন্ত দেখলাম- আবারও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখান দিয়ে যাচ্ছেন। আমাকে দেখে তিনি কতকটা যেন নিজে নিজেই বললেন: "এই লোক তো দেখছি এখনো তাঁর ঠিকানা জানতে পারেননি।"

আমি বললাম, "জ্বি না"।

তিনি বললেন: "ভালো, আপনি আমার সঙ্গে চলুন।" এক পর্যায়ে তিনি আমাকে বললেন: "আচ্ছা বলুনতো আপনার ব্যাপারটা কী? কী উদ্দেশ্যে আপনি এ শহরে এসেছেন?"

আমি বললাম: "আমার আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি যা বলব আপনি যদি তা গোপন রাখেন তাহলে আমি বলব?" তিনি বললেন: "ঠিক আছে আমি তাই করব।"

তখন আমি বললাম, "আমি জানতে পেরেছি যে, এখানে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে, যিনি নিজেকে আল্লাহর নবী বলে দাবি করছেন। আমি আমার ভাইকে পাঠিয়েছিলাম এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিয়ে কথাবার্তা বলার জন্য। কিন্তু সে ফিরে

গিয়ে সন্তোষজনক কোনোকিছুই বলতে পারেনি। এজন্য আমি ভাবলাম যে, নিজে গিয়েই সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলে আসি।"

আলী বললেন: "ভাই তুমি সঠিক জায়গাতেই পৌছেছ। দেখ আমার যাত্রা তাঁর দিকেই। আমি যেখানে প্রবেশ করব তুমিও সেখানে প্রবেশ করবে। আর যদি এমন কোনো লোক দেখি যে, তোমার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে, তাহলে আমি তখন কোনো প্রাচীরের গায়ে এমনভাবে থাকব, যাতে মনে হবে যেন আমি আমার জুতো ঠিক করছি। তুমি কিন্তু তখন পথ চলতেই থাকবে।"

এরপর আলী যাত্রা শুরু করলেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ এর দরবারে উপস্থিত হলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হয়ে আরজ করলাম "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট ইসলাম পেশ করুন।" হৃদয়স্পর্শী ভাব ও ভাষার মাধ্যমে তিনি আমার নিকট ইসলামের মূল বক্তব্য পেশ করলেন। বিষয় ও বক্তব্যে অভিভূত হয়ে আমি তখনই ইসলাম গ্রহণ করলাম। এরপর আমি মসজিদুল হারামে এলাম। কুরাইশ গোত্রের কিছুসংখ্যক লোকজন সেখানে উপস্থিত ছিল। আমি তাদের লক্ষ করে বললাম:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"[২৩]

একাদশ নবুওয়াত বর্ষে হজের মৌসুমে মক্কায় আগত হাজিদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদানে আলী রাসূলুল্লাহ -এর সাথে থাকতেন। একরাতে রাসূলুল্লাহ আবু বকর ও আলী কে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। বনু যোহাল ও বনু শায়বান বিন সালাবাহদের বাসস্থানের নিকট দিয়ে যাবার সময় ইসলাম সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বললেন। এ সময় তাদের সাড়া খুব অনুকূল বলে মনে হলেও ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে সিদ্ধান্তমূলক কোনোকিছুই তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া গেল না। এ সময় আবু বকর ও বনু যোহালের এক ব্যক্তির সঙ্গে বংশ পরম্পরা সম্পর্কে খুব হৃদ্যতাপূর্ণ কথাবার্তা হলো।[২৪]

২৩ সহীহ বুখারী বাবু কিসসাতে যমযম, খ. ১, ৪৯৯, ৫০০, "বাবু ইসলামে আবী যার" ১ম খ. ৫৪৪-৫৪৫।

২৪শাইখ আব্দুল্লাহ মুখতাসারুস সীরাহ, ১৫০-১৫২ পৃ.।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গীদের নিয়ে মিনার পথ ধরে অতিক্রম করছিলেন। এমন সময় অদূরে কিছুসংখ্যক লোকের কথোপকথন তাঁর কানে এল।[২৫] কাজেই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তিনি সেদিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের নিকট গিয়ে পৌছলেন। এ দলে ছিলেন ইয়াসরিবের খাযরাজ গোত্রের ছয় জন তরুণ যুবক। তাঁদের নাম-

(১) আসয়াদ বিন যুরারাহ,

(২) আউন বিন হারিস বিন রিফাআহ (ইবনে আফরা),

(৩) রাফে' বিন মালিক বিন আজলান,

(৪) কুতবা বিন আমের বিন হাদীদাহ,

(৫) উকবা বিন আমের বিন নাবী,

(৬) হারিস বিন আব্দুল্লাহ বিন রিআব। এদের গোত্রের নাম ছিল যথাক্রমে বনু নাজ্জার, বনু যুরাইক, বনু সালমা, বনু হারাম বিন কা'ব ও বনু উবাইদ গানাম।

এটা ইয়াসরিববাসিগণের সৌভাগ্য যে তাঁরা তাঁদের মিত্র ইহুদিদের নিকট থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, এ যুগে একজন নবী প্রেরিত হবেন। শীঘ্রই তা প্রকাশ পেয়ে যাবে। ইহুদিরা বলতেন যে, "আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে তাঁর সঙ্গে তোমাদেরকে ইরামের আদ জাতির মতো হত্যা করব।"[২৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ চলতে গিয়ে তাঁদের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন: "আমরা খাযরাজ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত।" তিনি বললেন: "অর্থাৎ ইহুদিদের মিত্র?" তাঁরা বললেন: 'জী হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "আপনারা বসুন, কিছু কথাবার্তা বলা যাক।"

রাসূলুল্লাহর ﷺ একথা শোনার পর তাঁরা বসে পড়লেন। তিনি তাঁদের সামনে ইসলামের তাৎপর্য বর্ণনা করার পর কুরআন শরীফ থেকে তিলাওয়াত করে শোনালেন আর ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত পেশ করলেন। এরপর তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে মদিনা ফিরে যান এবং মদিনায় ইসলাম প্রচার শুরু করেন। যার ফলে সেখানে ঘরে ঘরে রাসূলের দাওয়াত প্রসার লাভ করতে থাকে।[২৭] এভাবে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আকাবার প্রথম শপথের দায়ীদের একজন হিসেবে গৌরব লাভ করেন।

২৫রাহমাতুল্লিল আলামীন, খ. ১, পৃ. ৮৪পৃ.।

২৬ যাদুল মা'আদ, প্রাগুক্ত, ২য় খ., ৫০ পৃ., ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খ. ৪২৯ ও ৫৪১ পৃ.।

২৭ ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, ১ম খ. ৪২৮ ও ৪৩০ পৃ.।

হিজরতের সময় ত্যাগস্বীকার

আলী ইসলামের জন্য নানা ধরনের ত্যাগস্বীকার করেন। আলী ইসলাম প্রচার-প্রসারে সর্বদা রাসূলুল্লাহ -এর অনুসরণ করতেন। তায়েফে নিষ্ফল যাত্রা থেকে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ দৃঢ়ভাবে অনুভব করলেন মক্কা তাঁর বসবাসের জন্য অনুপযুক্ত। এদেশের মূর্তিপূজারিরা সত্যের এ দূত রাসূলুল্লাহ কে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকৃতি জানাল।

আবু তালিবের মৃত্যুর পর মক্কার মূর্তিপূজারিরা মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে উদগ্রীব হয়ে উঠল। এমনকি মুসলিম সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকার সুযোগটুকু ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। সারা দুনিয়া যখন মুসলমানদের জন্য এতটুকু আশ্রয় দিতে চাইল না, ঠিক তখন আল্লাহ তা'আলা মদিনার (তৎকালীন ইয়াসরিব) বুক প্রশস্ত করে দিলেন। মদিনার লোকেরা তাঁদেরকে আলিঙ্গন করে নিল। এরপর রাসূলুল্লাহ সবাইকে সেখানে হিজরত করার জন্য অনুমতি দিলেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে আকাবার দ্বিতীয় অঙ্গীকারের আনুমানিক আড়াই মাস পর ১৪ নবুওয়াত বর্ষের ২৬শে সফর মোতাবেক ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার[২৮] দিবসের প্রথমভাগে 'মক্কার সংসদ' বলে পরিচিত 'দারুন নাদওয়াতে' কুরাইশ-মুশরিকগণ ইতিহাসের সব চাইতে ভয়াবহ নিকৃষ্ট অধিবেশন অনুষ্ঠিত করে। এতে সকল কুরাইশগোত্রের নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

এ বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল এমন এক অকাট্য পরিকল্পনা তৈরি করা যাতে যত শীঘ্র সম্ভব ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহী নবী মুহাম্মদ কে হত্যার মাধ্যমে ইসলামের অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা। এ ভয়াবহ অধিবেশনে যে সকল গোত্রীয় কুরাইশ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

নাম	গোত্রের নাম
১. আবু জাহল বিন হিশাম	বনী মাখযুম গোত্র থেকে
২. যুবায়ের বিন মুতয়েম, তুয়াইমা বিন আদী এবং হারিস বিন আমির	বনী নওফাল বিন আবদে মানাফ থেকে

২৮এই দিনক্ষণ বা তারিখ আল্লামা সোলায়মান সালমান মানসুরপুরী (র) গবেষণার আলোকে নির্দিষ্ট করা হলো। রাহমাতুল্লিল আলামীন ১ম খ. পৃ. ৯৫, ৯৭, ১০২, ২য় খ. ৪৭১ পৃ.।

৩. শাইবাহ বিন রাবীয়াহ, উৎবা বিন রাবীয়াহ এবং আবু সুফিয়ান বিন হারব, বিন 'আবদে শামস্	বিন আবদে মানাফ থেকে।
৪. নযর বিন হারেস	বনী আবদুদ্‌দার থেকে
৫. আবুল বুখতারী বিন হিশাম, যময়া বিন আসওয়াদ ও হাকীম বিন হিযাম	বনী আসাদ বিন আব্দুল 'উযযা থেকে।
৬. নবীহ বিন হাজ্জাজ ও মুনাব্বাহ বিন হাজ্জাজ	বনী সহম থেকে
৭. উমাইয়া বিন খালফ	বনী জুমাহ থেকে।

এ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো নবী করীম থেকে মক্কাবাসীকে মুক্ত করার একমাত্র পথ হচ্ছে তাঁকে হত্যা করা। যাহোক আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মদকে জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দিলেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে বলা হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম নিকট এ সভার সংবাদ এনেছিলেন এবং তাঁকে হিজরতের অনুমতির সংবাদ দিলেন। হযরত 'আয়িশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস থেকে জানা যায় যে, নবী (স) ঠিক দুপুরে হযরত আবু বকর-এর গৃহে এসে বললেন: আমাকে হিজরতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সৃষ্টিজগতে সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি। তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন– আমি অতিশীঘ্রই মদিনায় হিজরত করতে যাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মক্কার লোকদের বিশ্বস্ত; তারা তাঁর কাছে ধন-সম্পদ আমানত রাখত। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট গচ্ছিত মক্কার লোকদের আমানতগুলো তার মালিকের হাতে ফেরত দেওয়া পর্যন্ত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিছানায় অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করলেন। এরপর নবী করীম ﷺ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ঐ রাতে তাঁর নিজ বিছানায় ঘুমাতে বললেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন: "তুমি আমার এই সবুজ হাযরামী[২৯] চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় ঘুমিয়ে থাক। তারা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ চাদর গায়ে দিয়েই শুয়ে থাকতেন।"[৩০]

অতঃপর নবী করীম ﷺ ঘরের বাইরে গমন করলেন এবং মুশরিকদের কাতার ফেড়ে এক মুষ্টি কংকরযুক্ত মাটি নিয়ে তাদের মাথার ওপর ছড়িয়ে দিলেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের দৃষ্টি ধরে রাখলেন, যার ফলে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আর দেখতে পেল না। এ সময় তিনি এই আয়াতে কারীমাটি পাঠ করছিলেন-

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ

"আমি তাদের সামনে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করালাম এবং তাদের পেছনে প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করালাম। অতঃপর আমি তাদের আচ্ছন্ন করে ফেললাম এবং তারা দেখতে পেল না।"[৩১]

এদিকে ষড়যন্ত্রকারীরা সকলে একসাথে মুহাম্মদ ﷺ-এর বাড়ি ঘেরাও করল। শত্রুরা যাকে হত্যা করার জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন ঠিক সেই মুহূর্তে এমন কারও সাহস আছে! যে তাঁর বিছানায় নিশ্চিন্তে অবস্থান করবে?

তিনি জানতেন এ মুহূর্তে যদি মুহাম্মদ ﷺ-এর বিছানায় ঘুমাই তাহলে নিশ্চিত তাঁকে শাহাদাতবরণ করতে হবে। কেবল বীর, অধিক সাহসী এবং আল্লাহ ও তাঁর

২৯হাযমারাউতের (দক্ষিণ ইয়েমেনের) তৈরি চাদরকে হাযরামী চাদর বলা হয়।

৩০ইবনে হিশাম ১ম খ. ৪৮২ ও ৪৮৩ পৃ.।

৩১ আল-কুরআন, সূরা ইয়াসিন ৩৬ : ৯।

রাসূল -এর প্রতি অগাধ বিশ্বাসীরাই এরূপ ঝুঁকি নিতে পারেন। আর এজন্য আল্লাহ তা'আলা আলী কেই বাছাই করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ আলী কে ঘুমানোর জন্য একটা চাদর দিলেন। রাসূলুল্লাহ বললেন, আমার বিছানায় ঘুমাও এবং গায়ে এ সবুজ রঙের চাদরটি জড়িয়ে রাখ। আল্লাহর ওপর ভরসা করে এর ভিতর ঘুমিয়ে থাকবে, তাহলে কোনো বিপদ তোমাকে স্পর্শ করবে না।

মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে আলী শুয়ে থাকেন এবং ঘুমিয়ে পড়েন। এদিকে নবী করীম শত্রুদের চোখ ফাঁকি দিয়ে তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেলেন। শত্রুরা সকাল বেলা আলী কে রাসূলুল্লাহ -এর বিছানায় দেখে বুঝতে পারল যে, মুহাম্মদ আর নেই- তিনি হিজরতের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন।

আলী ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তিনি মুহাম্মদ -এর জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। রাত কাটানোর জন্য নবী করীম -এর বিছানা ছাড়া বিকল্প কোনো কিছু করেননি। যদিও তিনি জানতেন কুরাইশদের তরবারি তাঁর গরদান বিচ্ছিন্ন করে দিবে।

জীবনের এ ঝুঁকিপূর্ণ সময়েও তিনি নিজের নিরাপত্তার চিন্তা করেননি; বরং তাঁর নিকট এটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, আলল্লাহর নবী বেঁচে থাক এবং তাঁকে যেন সামান্যতম আঘাতও স্পর্শ না করে। আলী নিজ জীবনের চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কে অধিক ভালোবাসতেন। রাসূল -এর নিরাপত্তাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিতেন।

পরের দিন সকালে আলী ইবনে আবু তালিব ঘর থেকে বের হন। কুরাইশরা তাৎক্ষণিক তাকে চিনতে পারে এবং বুঝতে পারে যে, মুহাম্মদ তাদের চোখে ধুলা দিয়ে চলে গেছেন।

হাতের শিকার হাতছাড়া করে রাগান্বিত হয়ে তারা আলী কে গ্রেপ্তার করল এবং টেনে কা'বা ঘরে নিয়ে আসল। তারা তাঁকে গালিগালাজ করল ও তাঁকে সামান্য সময়ের জন্যও মুক্তি দিতে অস্বীকার করল। আলী ধৈর্যসহকারে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের এই নির্দয় আচরণ সহ্য করে নিলেন। তিনি আল্লাহর নবীর নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং আনন্দিত হন এ কারণে যে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল -এর জন্য সকল কষ্ট সহ্য করে চলেছেন। অবশেষে শত্রুরা আলী কে হত্যা করতে উদ্যত হলে, আবু জাহল ভাবল- আলী কে হত্যা করলে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। তাই তারা আলী কে মুক্তি দিয়ে রাসূল কে খোঁজার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

দুশমনরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবর্তে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শয্যার উপরে দেখে বিস্মিত ও হতাশ হলো। তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে এসেছিল, কিন্তু আশা ভঙ্গ হওয়ায় অগত্যা ফিরে গেল।[৩২]

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি নবীর আদেশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গচ্ছিত আমানতের মালিকদের খোঁজ করলেন এবং তাদের হাতে তাদের আমানত সোপর্দ করলেন। এজন্য তিনি মক্কায় তিনদিন অবস্থান করেন। এ কাজ সমাধা করার পর মদিনার উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে একত্রিত হন।

হিজরতের সময়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকতেন এবং রাতের বেলায় পায়ে হেঁটে চলতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মদিনায় পৌছালেন। কারণ তাঁর কাছে কোনো ঘোড়া, উট বা গাধা ছিল না। সমগ্র দূরত্ব তাকে হাঁটতে হয়েছে, ফলে তাঁর পা ফুলে গেল এবং চামড়া ফেটে যেতে লাগল।

দিনের বেলা তাপমাত্রা এত তীব্র ছিল যে, এ সময়ে হেঁটে চলা তাঁর জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁকে সাহায্য করার জন্য কোনো বন্ধু বা সাথী ছিল না। শুধু আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম ঈমান ছিল যা তাঁকে চলতে সাহায্য করেছিল। মদিনায় প্রিয় সাথী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে প্রকৃত নিরাপত্তা ও আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন। সর্বশেষ মদিনায় পৌছালে বনু আমির ইবনে আউফ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। কুলসুম বিন হাদামের বাড়িতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আমন্ত্রিত মেহমান হলেন। সময়টি ছিল রবিউল আওয়াল মাস। তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবায় থাকতেন। হিজরতের সময় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বয়স ছিল ২৩ বছর।

এ সম্পর্কে তারীখে ইবনে সা'দ-এর বর্ণনা নিম্নরূপ– "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুবা নামক স্থানে তিনদিন অবস্থান করে একদিন দেখলেন যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সাওয়ারী চালিয়ে আসছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতি আদরে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্বাগতম জানালেন এবং নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে নিলেন। তাঁর কপালে চুমু দিলেন এবং নিজের হাতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দেহ এবং পোশাক থেকে ধুলাবালি পরিষ্কার করতে লাগলেন।"[৩৩]

---

৩২ History of the Arabs. p. 182-184.

৩৩ মোহাম্মদ গরীবউল্লাহ মাসরুর, *কাতেবীনে ওহী* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ১৫৬

অধ্যায়-৩

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর মদিনা জীবন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ভ্রাতৃত্বের নব বন্ধন

মদিনায় আগমন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দিলেন। মুসলমানদের মধ্যে এমন অপূর্ব এক ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন, যার তুলনা মানবজাতির ইতিহাসে কোথাও মিলে না। মুসলমানদের এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে "মুহাজির ও আনসারগণের ভাই ভাই বন্ধন" নামে অভিহিত করা হয়েছে। ইবনুল কায়্যিম লিখেছেন-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর ঘরে মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে ভাই ভাই বন্ধন স্থাপন করিয়েছিলেন। এ সভায় নব্বই জন মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। অর্ধেক-সংখ্যক ছিলেন মুহাজির এবং অর্ধেক-সংখ্যক আনসার।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাজিরগণ যখন মদিনায় আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এবং সা'আদ বিন রাবী'র মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিলেন। এর পর সা'আদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আব্দুর রহমানকে রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, "আনসারদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। আপনি আমার সম্পদ দুই ভাগে ভাগ করে অর্ধেক গ্রহণ করুন। তাছাড়া, আমার দুজন স্ত্রী রয়েছে। দুজনের মধ্যে যাকে আপনার পছন্দ হয়- আমাকে বলুন। আমি তাকে তালাক দিব। ইদ্দত পালনের পর তাকে বিবাহ করবেন।"

আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, "আল্লাহ্ আপনার ধন-জন ও মালমাত্তায় বরকত দিন। আপনাদের বাজার কোথায়?" তাঁকে বনু কাইনুকার বাজার দেখিয়ে দেওয়া হলো। তিনি যখন বাজার থেকে ফিরে এলেন তখন তাঁর নিকট অতিরিক্ত কিছু পনির ও ঘি ছিল। এরপর তিনি প্রত্যহ বাজারে যেতে থাকলেন। অতঃপর একদিন যখন তিনি বাজার থেকে ফিরে এলেন, তখন তাঁর শরীরে হলুদ রঙের চিহ্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কী?" তিনি বললেন, "আমি বিবাহ করেছি।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "স্ত্রীকে মোহর দিয়েছ তো?" তিনি বললেন, "একটি খেজুরের বীচি পরিমাণ স্বর্ণ (অর্থাৎ সোয়া ভরি) দিয়েছি।"[৩৪]

---

৩৪ সহীহ বুখারী, ১ম খ. ৩৫৫ পৃ.।

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে এরূপ একটি বর্ণনা এসেছে যে, আনসারগণ রাসূলুল্লাহর নিকট এই বলে আবেদন পেশ করলেন যে, "আপনি আমাদের এবং মুহাজিরীন ভাইদের মধ্যে আমাদের খেজুর বাগানগুলো ভাগ-বন্টন করে দিন।" তিনি বললেন, 'না'।

আনসারগণ বললেন, "তবে আপনারা অর্থাৎ মুহাজিরগণ আমাদের কাজ করে দেবেন এবং তাদেরকে আমরা ফলের অংশ দিব।" তারা বললেন- "ঠিক আছে, আমরা কথা শোনলাম ও মান্য করলাম।"[৩৫]

এভাবে আনসার মুহাজির সকলে ভাই ভাই হয়ে গেল। এই ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে আলী (রা.) বাদ পড়ে গেল। সম্ভবত রাসূল (সা.) ইচ্ছা করেই এরূপ করেছিলেন। কারণ, তখন পর্যন্ত তিনি নবী করীম (সা.)-এর পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাঁর ভরণ-পোষণের ভার রাসূল (সা.)-এর ওপরই ন্যস্ত ছিল, মদিনায় আসার পরও সেই একই অবস্থা বিরাজমান ছিল। কাজেই রাসূল (সা.) আলী (রা.)-এর জন্য কোনো স্বতন্ত্র চিন্তাই করেননি; কিন্তু মুহাজিরগণ প্রত্যেকেই কোনো না কোনো আনসারের ভাই হয়ে গেলেন। আলী রাসূলূল্লাহ্ (সা.)-এর খেদমতে আরয করলেন, "সকলেই ভাই প্রাপ্ত হলো; কিন্তু আমার কেউ ভাই হলো না।" রাসূল (সা.) স্বস্নেহে বললেন, আলী! এটি কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয় যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ তোমার ভাই?" এ উত্তরে আলী (রা.) কতখানি আনন্দিত হয়েছিলেন, তা সাধারণ লোকের পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নয়। ফলে আলী (রা.) মদিনার জীবনেও রাসূল (সা.)-এর পরিবারভুক্তই থেকে গেলেন।[৩৬]

মসজিদে নববী নির্মাণে অংশগ্রহণ

মদিনায় মুসলমানরা স্বাধীনভাবে ইসলাম প্রচার ও অনুশীলন করতে পারত। মুসলমানদের ইবাদতের জন্য একটি মসজিদ খুবই প্রয়োজন ছিল। অবশেষে হিজরতের ৬/৭ মাস সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। এ নির্মাণে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবিগণ অংশগ্রহণ করেন। আলী (রা.) ইট ও চুন-সুরকির যোগান দিতেন। এসময় আলী (রা.) নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন,

যে মসজিদ নির্মাণ করে দাঁড়িয়ে
আর যে বসে বরদাশ্ত করে এই কষ্ট;
তাদের সমকক্ষ হতে পারে না কোনো দিন সেই ব্যক্তি

---

৩৫ সহীহ বুখারী, বাবু ইযা কালা আকফেনী মোউনাতান নাখলি ১ম খ. ৩১২ পৃ.।

৩৬ মাওলানা নূরুর রহমান, *হযরত আলী ইবন আবি* তালিব (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয় প্রা. লি., ২০০৪), পৃ. ২৮-২৯

যে ধূলি মলিন হবার ভয়ে
বরাবর এ কাজে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে।

গাযওয়ায়ে সাফওয়ানের পতাকাবাহী আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

এ গায্ওয়া সংঘটিত হয় হিজরি দ্বিতীয় বর্ষের রবিউল আউয়াল মাস মোতাবেক সেপ্টেম্বর, ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে। এ গাযওয়ার কারণ ছিল এই যে, কুরয ইবনু জারীর ফাহরী মুশরিকদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে মদিনার চারণভূমির ওপর আক্রমণ চালায়। আর কিছু গবাদিপশু লুট করে নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৭০ জন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করেন। বদর প্রান্তরের পার্শ্ববর্তী সাফওয়ান উপত্যকায় গিয়ে পৌছেন। কিন্তু কুরয ও তার সঙ্গীরা অত্যন্ত দ্রুতবেগে তাঁদের নাগালের বাইরে চলে যেতে সক্ষম হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাহিনীসহ মদিনা ফিরে আসেন। এই গাযওয়ায় শত্রু পক্ষের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার কোনো সুযোগই সৃষ্টি হয়নি। কেউ কেউ এ গাযওয়াকে গাযওয়ায়ে 'বদরে উলা' বা 'বদরের প্রথম যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেন। এই গাযওয়ায় যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়িদ ইবনু হারিসাহকে রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনার আমির নিযুক্ত করেন। এই গাযওয়ায় পতাকার রঙ ছিল সাদা এবং পতাকাবাহী ছিলেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু।

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ হলো বদরের যুদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদর অভিযানের জন্য পুরোপুরি তৈরি হলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন তিন শতাধিক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিন শতাধিক বলতে সে সংখ্যাটি হতে পারে ৩১৩, ৩১৪ কিংবা ৩১৭। যাঁদের মধ্যে ৮২, ৮৩ কিংবা ৮৬ জন ছিলেন মুহাজির। আর সবাই ছিলেন আনসার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম বাহিনীকে দুটি দলে বিভক্ত করেন। এর মধ্যে একদল মুহাজিরদের সমন্বয়ে গঠিত। অন্যদল আনসারদের সমন্বয়ে গঠিত, মুহাজির দলের পতাকা দেওয়া হয় আলী ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আর আনসার দলের পতাকা দেওয়া হয় সা'দ ইবনু মু'আযকে রাদিয়াল্লাহু আনহু।

সেনাবাহিনীর ডান দিকের দলপতি নিযুক্ত করা হয়- যুবায়ের ইবনু আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। আর বাম দিকের দলপতি নিযুক্ত করা হয় মিক্দাদ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। কারণ হচ্ছে এই যে, গোটা বাহিনীর মধ্যে মাত্র এই দুজনই ছিলেন ঘোড়সওয়ার। সেনাবাহিনীর পেছনের দিকের দলপতি নিযুক্ত হন কায়েস ইবনু আবী সা'সাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু আর প্রধান সেনাপতি হিসেবে সমগ্র বাহিনীর নেতৃত্বদান

করেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[৩৭]

এ যুদ্ধে মুসলমানদের দুটি কালো পতাকা ছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে অন্যটি ছিল আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে।[৩৮] সার্বিক নেতৃত্বের পতাকা প্রদান করা হয় মুসআব ইবনু উমায়েরকে রাদিয়াল্লাহু আনহু। এ পতাকার রং ছিল সাদা।
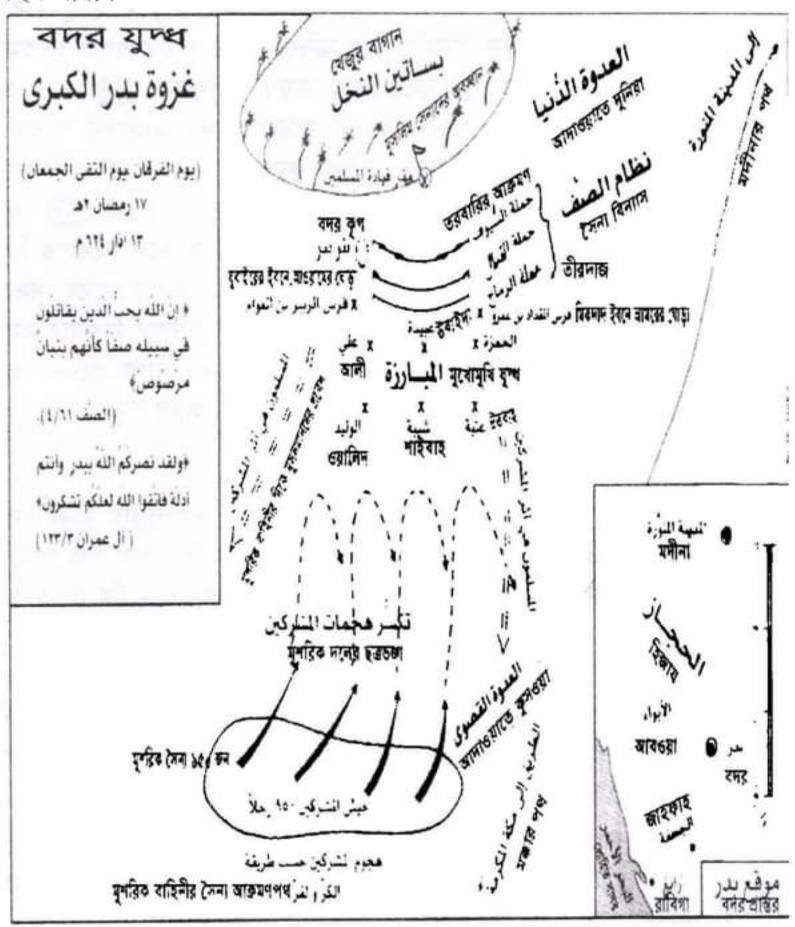
বদর যুদ্ধের ময়দানে হযরত আলী

৩৭ আর রাহীকুল মাখতূম, পৃ...

৩৮ মোহাম্মদ গরীবউল্লাহ মাসরূর, *কাতেবীনে ওহী* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ১৫৮।

এ যুদ্ধ সম্পর্কে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর নামে শপথ করে বলতেন, "এ আয়াতটি আমাদেরই ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়-

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ

"এ দুটি দল, যারা তাঁদের প্রতিপালকের ব্যাপারে ঝগড়া করেছে।"[৩৯]

তখন নিয়ম ছিল যে, যুদ্ধ শুরুর আগে প্রত্যেক পক্ষের বিখ্যাত বীর পুরুষরা রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়ে অন্যপক্ষকে সমরে আহ্বান করত। তখন ঐ পক্ষের নির্বাচিত কয়েকজন খ্যাতনামা বীর এ আহ্বানের উত্তর প্রদানের জন্যে বীরদর্পে অগ্রসর হতো। এক্ষেত্রেও তাই হলো।

অভিমানে ক্ষুব্ধ উৎবা ও তার সহোদর শায়বা পুত্র ওয়ালিদসহ চিৎকার করতে লাগল। "কে আসবি আয়, আমাদের তরবারির খেলা দেখে যা।" তার এ আহ্বান শুনে তিনজন আনসার বীর খোলা তরবারি হাতে সেই দিকে ধাবিত হলেন। তাঁরা হলেন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুআব্বিয্ রাদিয়াল্লাহু আনহু, এঁরা দুজন হারিসের পুত্র ছিলেন। তাঁদের মাতার নাম ছিল আফরা। তৃতীয় জন হলেন আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু। কুরাইশরা তাঁদের জিজ্ঞেস করল, তোমরা কে? তাঁরা বললেন, "আমরা আনসার।" তারা বলল! "আপনাদের আমরা চাচ্ছি না, আমরা আমাদের চাচাতো ভাইদের চাচ্ছি। তাদের একজন চিৎকার করে বলতে লাগল, "হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মদিনার এ চাষাগুলোর সাথে যুদ্ধ করা আমাদের পক্ষে অসম্মানজনক, আমাদের যোগ্য যোদ্ধা পাঠাও।" তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ তিনজন আনসার বীরকে তাদের স্ব-স্ব স্থানে ফিরে যেতে বললেন। অতঃপর তিনি নিজের পরমাত্মীয়দের মধ্য হতে হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, উবাইদাহ বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমরা তাদের মোকাবিলায় অগ্রসর হও।" তাঁরা অগ্রসর হলে কুরাইশগণ বলল: "তোমরা কে"? তাঁরা তাঁদের পরিচয় দান করলেন। কাফেররা তাঁদেরকে আক্রমণ করল। ওয়ালিদের সাথে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর, শায়বার সাথে হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এবং উৎবার সাথে উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুদ্ধ বেঁধে গেল।[৪০] মুহূর্তের মধ্যে শায়বাহ্ ও ওয়ালিদের মাথা মাটিতে পড়ে গেল। উবাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তখন সবার চেয়ে বৃদ্ধ। তিনি উৎবার তরবারির আঘাতে গুরুতররূপে আহত হয়ে পড়লেন। ইতোমধ্যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ

---

৩৯ সূরা ২২ : ১৯

৪০ ইবনু হিশাম, মুসনাদে আহমদ এবং সুনানে আবী দাউদের বর্ণনা এটা হতে ভিন্নরূপ তথা হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে উৎবা এবং হযরত উবায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে শায়বার যুদ্ধ হয়। মিশকাত, ২য় খ. ৩৪৩ পৃ.।

নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করে এসে উৎবাকে হত্যা করে উবাইদাকে রাদিয়াল্লাহু আনহু তুলে আনলেন। উৎবার আঘাতে উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মুখের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ক্রমাগতভাবে বন্ধই থাকল। শেষ পর্যন্ত ৪র্থ বা ৫ম দিন যখন মুসলমানরা মদিনার দিকে ফিরে চললেন এবং সাফরা নামক উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন, ঐ সময় উবাইদাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন।[৪১]

বদরের যুদ্ধে বীরত্বের জন্য তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে 'জুলফিকার তরবারি' লাভ করেছিলেন।

ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

বদর যুদ্ধের বছর পূর্ণ হতে না হতেই কুরাইশদের রণ প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেল। তিন হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনীর সঙ্গে ১৫ জন মহিলাও গিয়েছিল। কুরাইশ নেতৃবর্গের ধারণায় মেয়েদেরকে সঙ্গে রাখলে তাদের মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য বেশি করে বীরত্ব প্রকাশ করার ও আমরণ লড়াই করে যাওয়ার প্রেরণা লাভ করা যায়। সওয়ারীর জন্য তাদের সঙ্গে ছিল তিন হাজার উট। যুদ্ধের জন্য ছিল দশটি ঘোড়া।[৪২] এটিই প্রশিদ্ধ মত, কিন্তু ফাতহুল বারীর বর্ণনায় ঘোড়ার সংখ্যা 'একশ' বলা হয়েছে।[৪৩] ঘোড়াগুলোকে তাজা রাখার জন্য সেগুলোর পিঠে আরোহণ করা হয়নি। প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র-শস্ত্রের মধ্যে সাতশটি ছিল লৌহবর্ম। পূরো বাহিনীর জন্য আবু সুফিয়ানকে সেনাপতি নির্বাচন করা হয়। খালিদ ইবনু ওয়ালিদকে অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। আর ইকরামা ইবনু আবু জাহলকে তার সহকারী বানানো হয়। প্রথানুযায়ী নির্দিষ্ট পতাকা বনু আবদিদ্দার গোত্রের হাতে দেওয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৭০০ জন মুসলমানদের ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে শত্রুবাহিনীর দিকে ধাবিত হলেন। শত্রুদের শিবির তাঁর মাঝে ও উহুদের মাঝে কয়েক দিক থেকে বাধা সৃষ্টি করছিল। তাই, তিনি প্রশ্ন করলেন, "শত্রুদের পাশ দিয়ে গমন ছাড়াই ভিন্ন কোনো পথ দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে এমন কেউ আছে কী?" এই প্রশ্নের জবাবে আবু খাইসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরয করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এ খিদমতের জন্যে আমি হাযির আছি।" তিনি এক সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করলেন, যা মুশরিক বাহিনীকে পশ্চিম দিক ছেড়ে দিয়ে বনু হারিসা গোত্রের শস্যখেতের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছিল।

---

৪১ ইবন হিশাম-ঐ-পৃ. ৬২৫; ইবন খালদুন-প্রাগুক্ত-পৃ. ৭৫২; তাবারী-প্রাগুক্ত পৃ. ৪৪৫।

৪২ যাদুল মা'আদ ২য় খ. পৃ. ৯২।

৪৩ ফাতহুল বারী, খ. ৭, পৃ. ৩৪৬।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হয়ে উপত্যকার শেষ মাথায় অবস্থিত উহুদ পাহাড়ের ঘাঁটিতে অবতরণ করেন। সেখানে মুসলিম বাহিনীর শিবির স্থাপন করেন। সামনে ছিল মদিনা এবং পেছনে হলো সুউচ্চ উহুদ পাহাড়। এভাবে শত্রুদের বাহিনী মুসলমান ও মদিনার মাঝে পৃথককারী সীমানা হয়ে গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাবাহিনীর শ্রেণি-বিন্যাস করেন এবং সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি সারিতে বিভক্ত করেন। সুনিপুণ তীরন্দাজদের একটি দলও নির্বাচন করা হয়। তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় পঞ্চাশ জন। আব্দুল্লাহ ইবনু জুবায়ের ইবনু নু'মান আনসারী দাওসী বদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দলের অধিনায়ক পদে নিয়োজিত হন। তাঁর দলকে কানাত উপত্যকার দক্ষিণে মুসলিম বাহিনীর ক্যাম্প থেকে পূর্ব-দক্ষিণে একশত পঞ্চাশ মিটার দূরত্বে একটি ছোট পাহাড়ের নিকটে অবস্থান গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়। ঐ পাহাড়টি এখন 'জাবালে রুমাত' নামে প্রসিদ্ধ। ঐ পর্বতমালার মধ্যে একটি গিরিপথ ছিল। শত্রু সৈন্যরা যাতে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে না পারে এজন্য এই পঞ্চাশ জন তীরন্দাজকে ঐ গিরিপথ পাহারার জন্যে নিযুক্ত করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের অধিনায়ককে সম্বোধন করে বলেন, "অশ্বারোহীদেরকে তীর মেরে আমাদের থেকে দূরে রাখবে। তারা যেন পেছন থেকে কোনোক্রমেই আমাদেরকে আক্রমণ করতে না পারে। সাবধান, আমাদের জয়-পরাজয় যাই হোক না কেন, তোমাদের দিক থেকে যেন আক্রমণ না হয়।"[৪৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় অধিনায়ককে সম্বোধন করে বললেন, "তোমরা আমাদের পেছন দিক রক্ষা করবে। যদি তোমরা দেখ যে,আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছি, তবুও তোমরা আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসবে না। আর যদি দেখতে পাও যে, আমরা গনিমতের মাল একত্রিত করছি তবে তখনও তোমরা আমাদের সাথে শরিক হবে না।[৪৫]" সহীহ বুখারীর শব্দ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, "তোমরা যদি দেখ যে, পক্ষীকুল আমাদেরকে ছোঁ মারছে, তথাপিও তোমরা নিজেদের জায়গা ছাড়বে না, যে পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে ডেকে না পাঠাই।"

"আর যদি তোমরা দেখতে পাও যে, আমরা শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করেছি এবং তাদেরকে পদদলিত করেছি,তবুও তোমরা নিজেদের জায়গা হতে সরবে না, যে পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে ডেকে না পাঠাই।"[৪৬]

---

৪৪ ইবনু হিশাম, ২য় খ, ৬৫৩ ও ৬৬ পৃ.

৪৫ মুসনাদে আহমদ, তাবারানী ও হাকিম, হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড ৩৫০ পৃষ্ঠা।

৪৬ সহীহ বুখারী, খ, ১, কিতাবুল জিহাদ, ৪২৬ পৃষ্ঠা।

এ যুদ্ধে জাবালে রুমাতের তীরন্দাজ দল যুদ্ধের গতি মুসলমানদের অনুকূলে আনার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কুরাইশ অশ্বারোহীরা খালিদ ইবনু ওয়ালিদের নেতৃত্বে এবং আবু আমির ফাসিকের সহায়তায় মুসলিম সৈনিকদের বাম বাহু ভেঙে দেওয়ার জন্যে তিনবার ভীষণ আক্রমণ চালায়। কিন্তু মুসলিম তীরন্দাজগণ তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাদেরকে এমনভাবে ঘায়েল করে দেন যে, তাদের তিনটি আক্রমণই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।[৪৭]

রাসূলুল্লাহ তীরন্দাজ বাহিনীকে যেকোনো অবস্থায় তাঁদের স্থান ত্যাগ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তা তাঁরা বেমালুম ভুলে গিয়ে গনিমত সংগ্রহের জন্য যুদ্ধের ময়দানের দিকে ছুটে যেতে লাগলেন। তাঁদের অধিনায়ক আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর তাঁদেরকে বারণ করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। তিনি তাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ-এর কঠোর নিষেধের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর অধীনস্থ সৈনিকগণ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বলতে লাগলেন, "এখন আমাদের সম্পূর্ণ জয় হয়েছে, সুতরাং এখন আর এখানে বসে থাকব কিসের জন্যে?"[৪৮] এই বলে তাঁদের অধিকাংশ সৈনিকই স্থান ত্যাগ করে ময়দানের দিকে ছুটে গেলেন।

মুশরিকরা এই সুযোগে মুসলমানদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায়। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ জখম হন; তাঁর পবিত্র দাঁত শহিদ হয় এবং তাঁর পবিত্র চেহারা হতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত ঝরতে থাকে। এ সময় পেছনে সরে আসাকালে তিনি একটি গর্তে পড়ে যান। এই সুযোগে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ্-র ওপর প্রবল আক্রমণ চালায়। মুস'আব ইবনে উমাইর প্রাণপণে মোকাবিলা করে রাসূলুল্লাহ্কে রক্ষা করেছেন, কিন্তু ঘটনাস্থলেই তিনি শহিদ হন। তখন তাঁর হাতেই ছিল ইসলামের পতাকা। তাঁর শাহাদতের সাথে সাথেই আলী পতাকা তুলে ধরেন। তখন আবু সা'দ ইবনে আবু তালহা আলীকে আক্রমণ করলে আলী-এর প্রতি-আক্রমণে আবু সা'দও নিহত হয়। এদিকে আলী রাসূলুল্লাহ্কে ধরে পর্বতের উপর নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেলেন। তিনি ঢালে করে পানি এনে ফাতেমা-এর সাহায্যে ক্ষতস্থান ধৌত করলেন এবং মাদুর জ্বালানো ছাই দিয়ে রক্ত বন্ধ করলেন। এই যুদ্ধে আলী-র অতুলনীয় বীরত্বের কথা ইতিহাস বিখ্যাত।[৪৯]

---

৪৭ ফতহুল বারি ৭ম খ. ৩৪৬ পৃ.।

৪৮এ কথা সহীহ বুখারীতে বারা ইবনে আযিব কর্তৃক বর্ণিত আছে। ১/৪২৬ পৃষ্ঠা.

৪৯ মোহাম্মদ গরীবউল্লাহ মাসরুর, *কাতেবীনে ওহী* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ. ১৯৮৬), পৃ. ১৫৯-১৬০
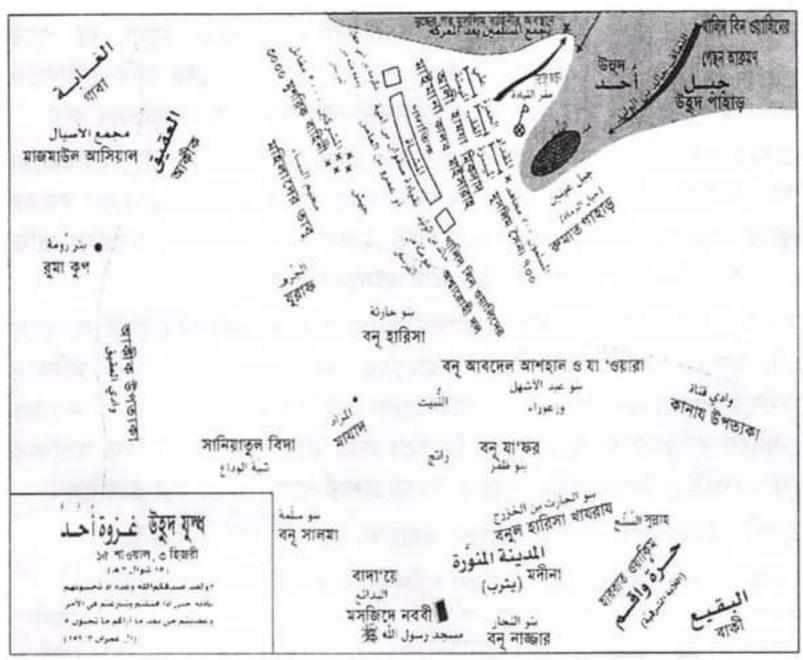
উহুদ ময়দানে হযরত আলী

খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

আহজাব-এর যুদ্ধ ৫শাওয়াল/ জিলকা'দ মাস মোতাবেক ফেব্রুয়ারি/ মার্চ ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে খ্রিস্টান এবং কুরাইশদের পাশাপাশি আরবের প্রধান গোত্রগুলোও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। গাফতান, বনু সুরা, বনু ফাজারা, আসজা, বনু সুলাইম, বনু সা'দ, বনু আসাদ এবং কিছু ছোট গোত্র।[৫০] তারা সকলেই মুসলমানদের আরব থেকে বিতাড়িত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। কিছুসংখ্যক ইতিহাসবিদের মতে, জোটভুক্তদের অথবা দুষ্কর্মে সহযোগীদের সংখ্যা ছিল ১০,০০০। অন্যদের ভাষ্যমতে সৈন্যসংখ্যা ছিল ২৪,০০০-এর মতো। আবু সুফিয়ান ছিলেন জোটভুক্ত বাহিনীর প্রধান ঘোষক।[৫১] যেহেতু তারা মদিনার দিকে অগ্রসর হলো। বনু সাদ এবং বনু আসাদ (তালহা বিন খালিদ আল আসাদি-এর নেতৃত্বাধীন) ও তাদের সাথে যুক্ত হলেন, যাদের সংখ্যা ১০,০০০ এ

৫০ ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১৯; ইবনে সা'দ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৬; ফাতহুল বারী", ৭ম খণ্ড: পৃ: ৩০১; (শিবলী নুমানী, ইবনে সা'দ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৬; মুহাম্মদ যুরকানী, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২১।

৫১ ইবনে সা'দ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৬; মুহাম্মদ যুরকানী, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২১।

হলো যা আরবের অপ্রতিরোধ্য সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হলো যা পূর্বে আরববাসীরা কখনও দেখেনি। তাছাড়া তাদের পক্ষে আরবের অবিশ্বাসীদেরও সমর্থন ছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল মুসলমানদেরকে আকস্মিক আক্রমণ করা।

শত্রুদের প্রস্তুতির খবর মদিনায় আসতে শুরু করল এবং মহানবী সময়মতো খবর পেলেন। যদিও কিছুসংখ্যক মুসলমান সকল আরব এবং খ্রিস্টানদের তাদের বিরুদ্ধে সমবেত হওয়ার কথা শুনে ভীত হলেন, তবুও তাদের আল্লাহর প্রতি অগাধ আস্থা ছিল, সর্বশক্তিমান এবং তাঁর দাসদের রক্ষাকারী।

মহানবী যথারীতি তাঁর সাথীদের সাথে আলাপ করলেন। সেই আলাপে তিনি সালমান ফারসি -এর মতামতের প্রশংসা করলেন। তিনি মদিনার চারদিকে পরিখা খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন এটা সুরক্ষিত রাখার জন্য। শহরের তিনদিকে বাড়িগুলোর সারি সুরক্ষা হিসেবে কাজ করে। শুধু একটি দিক অরক্ষিত ছিল। একটি ৫ ইয়ার্ড গভীর এবং ৫ ইয়ার্ড প্রশস্ত পরিখা খনন করা হয়েছিল।

মহানবী নিজে সীমানা নির্ধারণ করলেন এবং সাধারণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করলেন। তিন শত সাহাবী ২০ দিনে পরিখাটি খনন কাজ সম্পন্ন করলেন।[৫২]

খন্দক যুদ্ধে পরিখার চিত্র
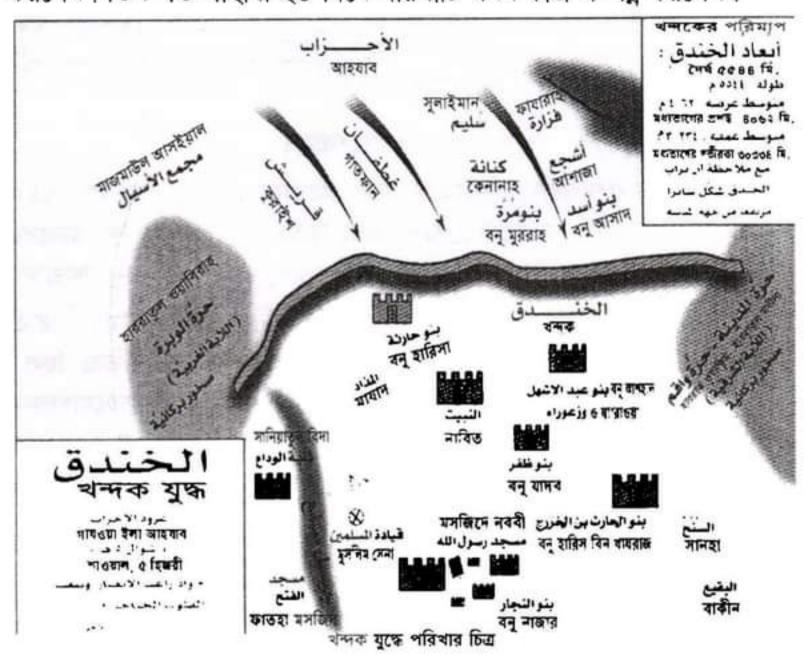
৫২ শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২১।

আবু সুফিয়ানের সংঘবদ্ধ বাহিনী শহরে ঢোকার মুখে একটি বিস্ময় আবিষ্কার করল- একটি পরিখা খনন করা ছিল চতুর্দিকে। তারা কেউই-এর আগে এমন কিছু দেখেনি, যদিও তারা সংখ্যায় অনেক ছিল, তাই তারা সিদ্ধান্তও নিল পথ না ছাড়ার যাতে মুসলিমরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মারা যায়। মুসলিমরা সংখ্যায় ৩,০০০ ছিল। তারা পালাক্রমে পরিখা পাহারা দিল।[৫৩]

এই পাহারা দীর্ঘ এক মাস স্থায়ী হয়েছিল। মুসলিমদের ফিরে যেতে হলো কোনো খাবার আর আশ্রয় ছাড়া তারা সবাই ক্ষুধা নিবারণের জন্য পেটে পাথর বেঁধেছিল। তাদের সাথে একাত্ম হবার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও পেটে পাথর বেঁধেছিলেন।

এ সময় তিনজন বিখ্যাত যোদ্ধা আমর বিন আবদাউদ, জুবাইরাহ এবং দিবার বিন খাত্তাব ঐ পরিখা পার হতে সফল হয়েছিলেন। আর বিখ্যাত আমর বিন আবদউদ, যিনি একাই এক হাজার ঘোড়সওয়ারের সমান ছিলেন। তিনিই প্রথম পরিখাটি পার হন। তিনি মুসলমানদেরকে এককভাবে লড়াই করার চ্যালেঞ্জ ছোঁড়েন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন; কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এই বলে থামান যে, এই ব্যক্তি যে সে নয়, আমর-বিন আবদউদ, আরবের সবচেয়ে সাহসী লোক। এতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বসে যান। আমর বিন আবদাউদ আবারো চ্যালেঞ্জ ছোঁড়েন; কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া কেউ তা গ্রহণ করেনি এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আবারো থামিয়ে দেন। এরকম তিনবার ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনুমতি দেন লড়াই করার। তিনি তাঁকে একটি তরবারি হাতে দেন এবং একটি পাগড়ি তাঁর মাথায় পরিয়ে দেন।[৫৪] আলীকে দেখে আমর বলে ওঠেন " আমি তোমাকে হত্যা করতে চাই না।" কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি চাই।" লড়াই সংঘটিত হয় এবং প্রথম চোটেই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করে ফেলেন।[৫৫] আমর বিল আবদাউদ-এর মৃত্যুর পর দিরার ও জুবাইরাহ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আক্রমণ করে কিন্তু সফল হতে পারেন নি। নওফেল নামক আরেক কাফের একটি গর্তে পড়ে যায় এটি পার হবার সময়। মুসলমানরা তার দিকে তীর-ধনুক তাক করলে সে একটি সম্মানজনক মৃত্যুর প্রত্যাশা ব্যক্ত করে। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই নালার কাছে যান ও তাকে হতা করেন।[৫৬]

---

৫৩ ইবনুল জারীরুত তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭০; ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, পৃ: ২২০।

৫৪ ইবনে সা'দ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৮।

৫৫ ইবনে কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০২০৩, ইবনে কায়্যিম, প্রাগুক্ত।

৫৬ শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২৮; মুহাম্মদ যুরকানী, প্রাগুক্ত।

এ দৃশ্য অবলোকনে আমরের সঙ্গীরা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। শত্রুদের মনে আলী -এর ভয় এমনই বসেছিল যে, ২০ হাজার শত্রু প্রাণ হাতে নিয়ে পলায়ন করল। এমনকি তাদের নিজেদের অশ্বের পদতলে তাদের অনেক যোদ্ধা দলিত মথিত হলো। আলী বিজয় পতাকা উত্তোলন করে রাসূলুল্লাহ -এর খিদমতে উপস্থিত হলেন।[৫৭]
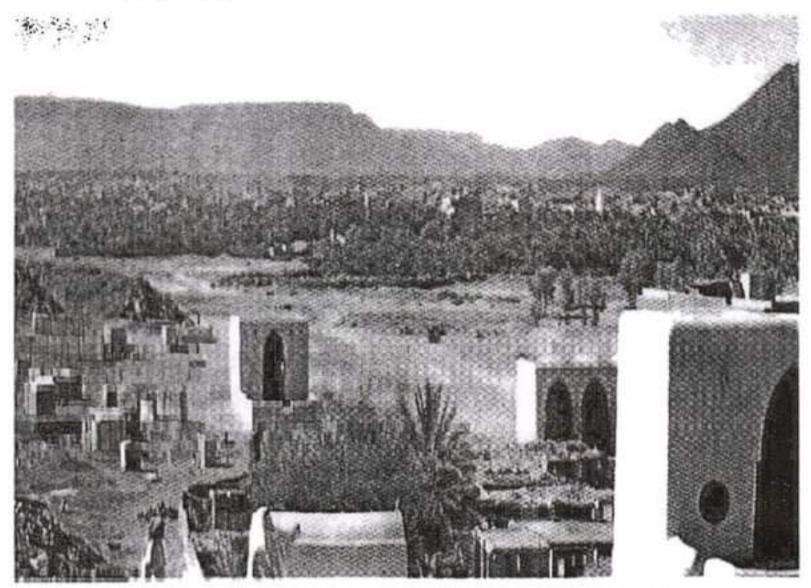
খন্দক যুদ্ধে আবু বকর, আলী ও সালমান ফারসী -এর অবস্থানস্থলে নির্মিত তিনটি মসজিদ

বনু কুরাইযা অভিযানে আলী

খন্দকের যুদ্ধে বনু কুরাইযা গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে অবস্থান নেয়। যুদ্ধ পরবর্তী তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে আলী অংশগ্রহণ করেন। বনূ কুরায়যা গোত্রের ইহুদিদের সাথে রাসূলুল্লাহ এই শর্তে সন্ধি করেছিলেন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না। কিন্তু পরিখা যুদ্ধের সময় দেখা গেল যে, তারা মুসলিম শত্রুপক্ষের সাহায্য করেছে। তাই রাসূলুল্লাহ পরিখা যুদ্ধশেষে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। মদিনা হতে রাসূলুল্লাহ সাহাবীদেরকে নিয়ে বনু কুরাইযার দিকে যখন অভিযান করেন তখন ইসলামী পতাকা ছিল আলী -এর হাতে। তখন বনু কুরায়যা সম্প্রদায় পলায়ন করল।

---

৫৭ মোহাম্মদ গরীবউল্লাহ মাসরূর, *কাতেবীনে ওহী* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ১৬০

সুতরাং বিনা রক্তপাতেই আলী (রা) তাদের কিল্লা দখল করলে কিল্লা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) আসরের নামায আদায় করলেন।[৫৮]
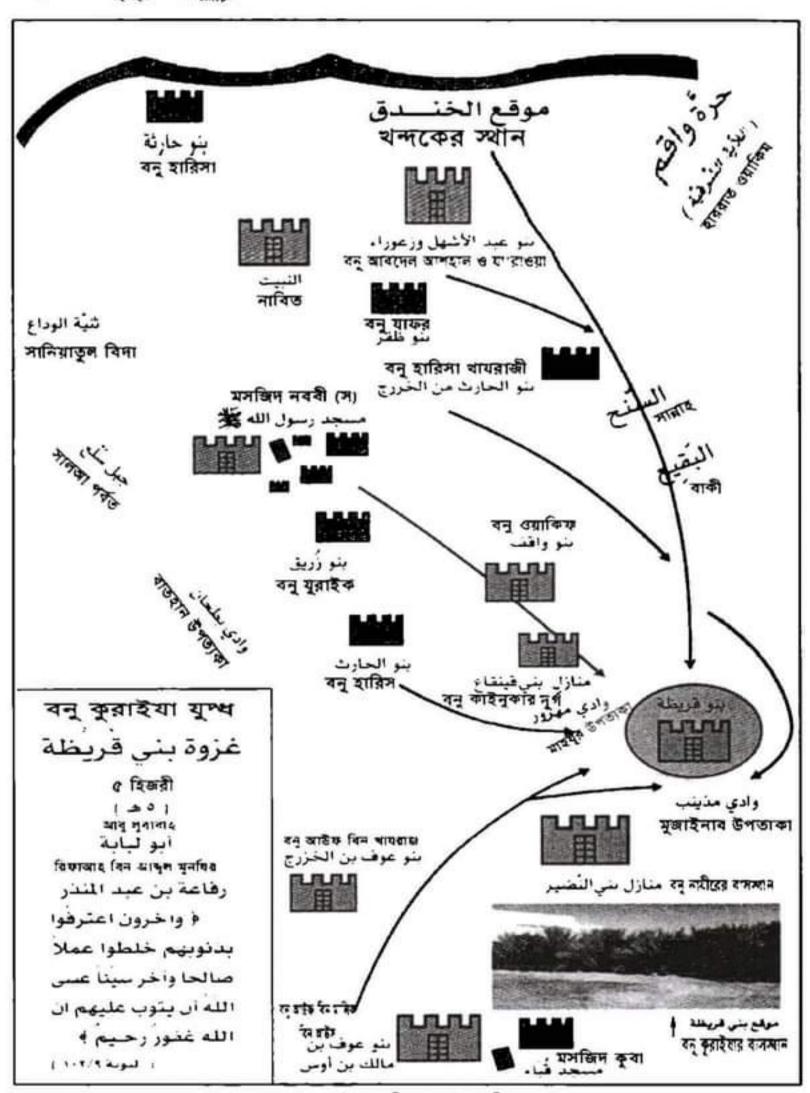
বনু কোরাইযা অভিযানের সৈন্যবিন্যাস

৫৮ মোহাম্মদ গরীবউল্লাহ মাসরূর, *কাতেবীনে ওহী* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ১৬০

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ

ঐতিহাসিক হুদায়বিয়া সন্ধির সময় তিনি চুক্তি লেখকের দায়িত্ব পালন করেন। জিলকদ মাসের ৬ তারিখে (মার্চ, ৬২৮) মহানবী ﷺ ১৪০০ জন সাহাবী নিয়ে উমরাহর উদ্দেশে রওনা দেন।[৫৯]

মহানবী ﷺ হুদাইবিয়া নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করে এবং তাঁর পাঠানো সংবাদের উত্তর জানার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কুরাইশদের মধ্যে কিছু কিছু বিজ্ঞ ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর শান্তিপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করতে চাইলেন। তারা জানতেন যে, তাঁকে যদি পবিত্র কা'বা ঘরে উমরাহ পালন করতে দেওয়া না হয় তাহলে-এর ফলে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। তাছাড়া মহানবী ﷺ-এর সাথে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলে মক্কার কুরাইশরা সিরিয়ার সাথে তাদের বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃচালু করতে পারবে। কারণ মদিনার ওপর দিয়ে যাওয়া এই বাণিজ্য পথটি মুসলমানদের দখলে রয়েছে। অতএব কুরাইশরা তাদের মুখপাত্র হিসেবে উরওয়া ইবনে মাসউদকে মহানবী ﷺ-এর নিকট এই সন্ধি চুক্তির শর্ত নির্ধারণের জন্য প্রেরণ করলেন। উরওয়া মহানবী ﷺ-এর নিকট আসলেন। কিন্তু উভয় পক্ষের আলোচনাকালে মহানবী ﷺ-এর অনুসারীদের সম্পর্কে তার অপ্রীতিকর ও শত্রুভাবাপন্ন মন্তব্যের কারণে চুক্তিতে পৌঁছতে সফল হননি। তবে উরওয়া মহানবী ﷺ-এর ওপর তাঁর সাহাবীদের প্রগাঢ় ভক্তি, ভালোবাসা ও আস্থা লক্ষ করেন এবং মক্কায় ফিরে গিয়ে তিনি কুরাইশদেরকে তা অবহিত করেন, "আমি কেসরা, সিজার (কাইসার) ও নেগাস-এর দরবার দেখেছি। কিন্তু মুহাম্মদ যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা তার অনুসারীদের নিকট থেকে লাভ করেন তেমনটি আর কোথাও দেখিনি।[৬০]

এরই মাঝে মহানবী ﷺ সন্ধি সম্পর্কে কথা বলতে উসমান (রা.)-কে তাদের কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু উসমান হত্যার গুজব শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই মর্মাহত হন। এবং সকল সাহাবীকে নিয়ে উসমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে শপথ করেন। সকল সাহাবীর শপথ গ্রহণ শেষ হলে মহানবী ﷺ তাঁর ডান হাত বাম হাতের ওপর আঘাত করে উসমানের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে শপথ নিলেন।[৬১]

---

৫৯ ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড: পৃ: ৩১১; ইবনে সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড: পৃ: ৯৬; ইবনুল জারীরুত তাবারী, প্রাগুক্ত, ২য় পৃ: ৬২২- ২৫।

৬০ ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড: পৃ: ৩১৪।

৬১ ইবনে সা'দ, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড: পৃ; ৯৬; ইবনে আবদুল বারর, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৬।

ফলে কুরাইশরা বুঝতে পারল যে, এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও বিস্ময়করভাবে একান্ত অনুগত ভক্ত সমন্বয়ে গঠিত এই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা সফলকাম হতে পারবে না। তাদের অবিস্মরণীয় অতীত ও শোচনীয় পরাজয়ের স্মৃতি এখন তাদের মনে স্পষ্ট হয়ে আছে। তাই তারা সুহাইল ইবনে আমরকে মুসলমানদের নিকট সন্ধি করার জন্য দূত পাঠাল। তার সাথে কিছু আলাপ-আলোচনার পর উভয়পক্ষে একটি যুদ্ধবিরতিতে পৌছান সম্ভবপর হলো। উভয় পক্ষ দশ বছরের জন্য শান্তি বজায় রাখতে সন্ধিতে সম্মত হলো।[৬২]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সন্ধির দফাগুলো লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন লিখ: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

এ সময় সোহাইল বলল: 'রহমান' বলতে যে কী বোঝায় আমরা তা জানি না। আপনি এভাবে লিখুন, "বিস্‌মিকা আল্লাহুম্মা" (হে আল্লাহ তোমার নামে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেভাবেই লিখতে বললেন এবং তিনি সেভাবেই তা লিখলেন।

নবী করীমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু লিখলেন, "এগুলো হচ্ছে সেসব কথা, যার ওপর ভিত্তি করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধি করলেন।"

এ সময় সোহাইল বলল: "আমরা যদি জানতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহলে আপনাকে আল্লাহর ঘর যেয়ারতে বিরত রাখতাম না এবং আপনার সঙ্গে যুদ্ধও করতাম না। কাজেই, আপনি লিখুন "মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলেও এ এক মহাসত্য যে, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।"

'রাসূলুল্লাহ' কথাটি মুছে ফেলে তার পরিবর্তে 'মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ' লিখার জন্য তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' কথাটি মুছে ফেলার ব্যাপারটিকে কিছুতেই যেন মেনে নিতে পারছিলেন না। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মুবারক হাত দ্বারাই কথাটি মুছে ফেললেন। তারপর পুরো চুক্তিটি লিপিবদ্ধ করা হয়।

---

৬২ ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড: পৃ: ৩১৬; ইবনুল জারীরুত তাবারী, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড: পৃ: ৬৩৬; শিবলী নুমানী, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড: পৃ: ৪৫৫; আরও দ্র: সহীহ মুসলিম ও সহীহ বুখারী।
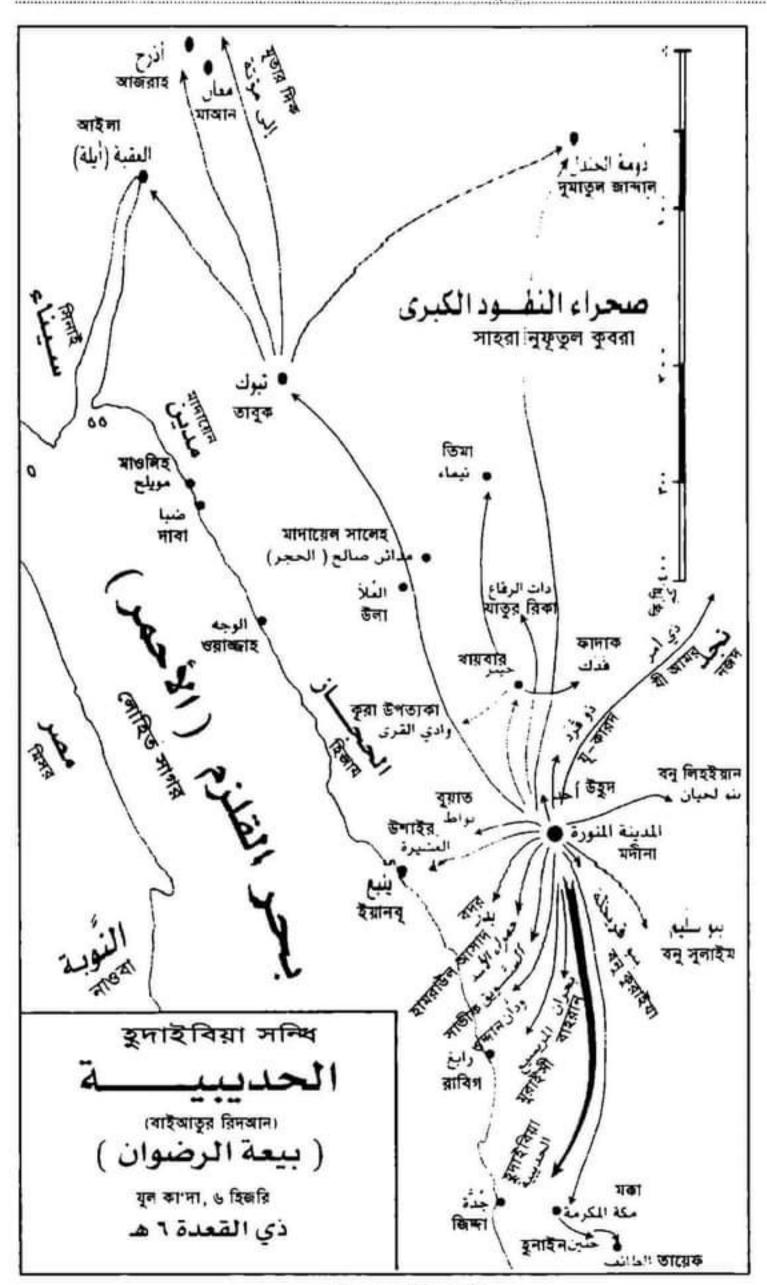
চিত্র : হুদায়বিয়ার সন্ধি

খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হিজরি ষষ্ঠ সনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জানতে পারলেন যে, বনু সা'দের লোকেরা খায়বরের ইহুদিদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একশত মুজাহিদের একটি দলের ওপর আলী (রাঃ)কে সেনাপতি নিযুক্ত করে বনু সা'দকে শায়েস্তা করার জন্য প্রেরণ করলেন। শা'বান মাসে আলী (রাঃ) একশত জন মুজাহিদ নিয়ে মদিনা হতে রওয়ানা হন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বনু সা'দর শক্তিব্যূহ ভেঙে দেন। বনু সা'দ নিজেদের শক্তিমত্তার ওপর অহংকার করত; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আলী (রাঃ)-র সাথে যুদ্ধ করতে সাহস করল না। আলী (রাঃ) দুই হাজার বকরী, পাঁচশত উট এবং অপরাপর বহু মূল্যবান গনিমতসহ বিজয় পতাকা উত্তোলন করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে এসে উপস্থিত হলেন।[৬৩]

সপ্তম হিজরি সনের সফর মাসে খায়বরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খায়বরে ছোট-বড় কয়েকটি কিল্লা ছিল। ইহুদিদের বিরাট একটা দল পরিখা যুদ্ধের পর এখানে এসে শক্তি অর্জন করছিল। খায়বর মদিনা হতে নব্বই মাইল দূরে অবস্থিত। তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) চৌদ্দ শত মুজাহিদকে সাথে নিয়ে খায়বর অভিমুখে রওনা হলেন এবং খায়বরের নিকটে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। পরদিন ফজরের নামাযের পর খায়বর আক্রমণের জন্য রওয়ানা হলেন। মুসলমানদের আগমন সংবাদ পেয়ে ইহুদি সম্প্রদায় শহর ত্যাগ করে কিল্লায় আশ্রয় নিল। মুসলমানরা ছোট ছোট কিল্লাসমূহ জয় করে ফেললেও কামুস নামক কিল্লা জয় করা সম্ভব হয়নি। আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) প্রমুখ প্রত্যেকেই শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তা জয় করা কোনোভাবেই সম্ভবপর হলো না।

তখন নবী করীম (সাঃ) খায়বর সীমানায় প্রবেশ করে বললেন, "আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা প্রদান করব, যিনি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) প্রতি ভালোবাসা রাখেন। যাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন। রাত শেষে যখন সকাল হলো, তখন সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। প্রত্যেকেরই আশা পতাকা তাঁর হাতেই আসবে। রাসূলে করীম (সাঃ) বললেন, "আলী ইবনে আবু তালিব কোথায়?" সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! তাঁর চোখের পীড়া হয়েছে।"[৬৪]

---

৬৩ মোহাম্মদ গরীবউল্লাহ মাসরুর, *কাতেবীনে ওহী* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ১৬০

৬৪ সেই অসুখের কারণে তিনি পেছনে পড়েছিলেন, অতঃপর তিনি সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

আজরাহ
أذرح
معان
মাআন
আইলা
العقبة (أيلة)
দুমাতুল জান্দাল
دومة الجندل
صحراء النفود الكبرى
সাহরা নুফুদ আল-কুবরা
تبوك
তাবুক
তিমা
تيماء
মাওলিহ
مويلح
ضبا
দাবা
মাদায়ান সালেহ
مدائن صالح (الحجر)
العلا
উলা
الوجه
ওজ্জাহ
ذات الرقاع
যাতুর রিকা
খায়বার
خيبر
فدك
نجد
নজদ
কুরা উপত্যকা
وادي القرى
মিসর
مصر
বনু লিহয়ান
بنو لحيان
উহুদ
বুয়াত
بواط
উশাইর
العشيرة
المدينة المنورة
মদীনা
ينبع
ইয়ানবু
বদর
بدر
بنو سُلَيم
বনু সুলাইম
النوبة
নাওবা
رابغ
রাবিগ
جدة
জিদ্দা
مكة المكرمة
মক্কা
حنين
হুনাইন
الطائف
তায়েফ
খায়বার যুদ্ধ
غزوة خيبر
ফাদাক ও ওয়াদিউল কুরা
و فدك و وادي القرى
المحرم ٧ هـ
মুহাররাম, ৭ হিজরী

চিত্র : খায়বার যুদ্ধ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাঁকে ডেকে নিয়ে এস।" তাঁকে ডেকে আনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মুখ থেকে লালা নিয়ে তা তাঁর চোখে লাগিয়ে দিয়ে দোয়া করলে তিনি এমনভাবে আরোগ্য লাভ করলেন, যেন তাঁর পীড়াজনিত কোনো যন্ত্রণাই ছিল না। অতঃপর তাঁর হাতে পতাকা প্রদান করা হলো। তিনি আরয করলেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি তাদের সঙ্গে ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করব যেন তারা আমাদের মতো হয়ে যাবে।"

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "শান্তির সঙ্গে চল এবং তাদের ময়দানে অবতরণ কর। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও এবং ইসলামের মধ্যে আল্লাহর যে সমস্ত প্রাপ্য রয়েছে যা তাদের কর্তব্য সে সম্পর্কে তাদেরকে জানাও। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাধ্যমে যদি একজনকেও হিদায়েত দেন, তাহলে তোমাদের জন্য তা লাল উটের চাইতেও উত্তম হবে।"[৬৫]

আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমান সৈন্যদের নিয়ে নায়েম দুর্গের সামনে গিয়ে পৌছলেন এবং ইহুদিদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। তারা এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করল এবং তাদের সম্রাট মারহাবের পরিচালনাধীনে মুসলমানদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান জানাল। মারহাবের সাথে যুদ্ধ করে আমেরের রাদিয়াল্লাহু আনহু আহত হওয়ার পর 'মারহাবের' সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু গমন করেন। সালমা বিন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, "সে সময় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি কবিতার এ চরণ আবৃত্তি করছিলেন-

أَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَهْ

كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهْ

أُوفِيهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ

"আমি সে ব্যক্তি, আমার মাতা যার নাম রেখেছিলেন হায়দার (বাঘ), বনের বাঘের মতো ভয়ঙ্কর আমি, তাদেরকে 'সা'এর বিনিময়ে বর্শার দ্বারা তাদের মাপ পূর্ণ করে দিব।"

এরপর তিনি 'মারহাবের' মাথার উপর তরবারি দ্বারা এমনভাবে আঘাত করলেন যে, সে সেখানেই স্তূপ হয়ে গেল। এভাবে আলীর রাদিয়াল্লাহু আনহু হাতেই বিজয় অর্জিত হলো।

---

৬৫ সহীহ বুখারী খায়বর যুদ্ধ ২য় খ. ৬০৫ ও ৬০৬ পৃ.।

খায়বার যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করে বিখ্যাত কামুস দুর্গ জয় করে অসাধারণ শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করেন। তাঁর বীরত্বে ও রণ-নৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'আসাদুল্লাহ' বা আল্লাহর সিংহ উপাধিতে ভূষিত করেন।

খায়বার যুদ্ধে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বীরত্ব সম্পর্কে হাদিসে আরও বর্ণিত হয়েছে, বিশুদ্ধ সনদে ইব্‌নে আবু শায়বা লায়ছ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একবার আবু জাফরকে দেখতে গেলাম। তিনি নিজের গুনাহ ও আযাবের কথা ভেবে কাঁদছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খায়বার যুদ্ধের দিন দুর্গদ্বার উপড়ে ফেলেছিলেন। পরে মুসলমানগণ দুর্গ দখল করেছিলেন, আর জাবির নিজে চেষ্টা করে দেখেছেন। কিন্তু চল্লিশ জনের কমে তা ওঠানো সম্ভব হয়নি।[৬৬]

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন হাসানের সূত্রে, তিনি তাঁর কোনো নিকটজনের সূত্রে ও তিনি আবু রাফে (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এক ইহুদির আঘাতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত থেকে ঢাল পড়ে গেল। তখন তিনি দুর্গের একটি দরজাকেই ঢালরূপে তুলে নিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে খায়বারের বিজয় দান করা পর্যন্ত ঐ দরজা তাঁর হাতেই ছিল। পরে তিনি তা ফেলে দিয়েছিলেন। আবু রাফে বলেন, এখনো আমার চোখের সামনে সে দৃশ্য ভাসছে। খায়বার যুদ্ধের দিন আমরা আটজন মিলে সেই দরজাটি উল্টাতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারিনি। পক্ষান্তরে, লায়ছ আবু জাফরের সূত্রে আর তিনি জাবিরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, চল্লিশ জনে মিলে ঐ দরজা ওঠাতে পেরেছিল।[৬৭]

মক্কা বিজয়ে অংশগ্রহণ ও মহান গুপ্তচর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

অষ্টম হিজরিতে কুরাইশদের হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গের তিন দিন আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সফরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গোপনে সম্পন্ন করার জন্য আদেশ দেন। কিন্তু এ খবর কেউই জানতেন না। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন প্রস্তুতি পর্বে ব্যাপৃত ছিলেন তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, "কন্যা! এ কিসের প্রস্তুতি?"

উত্তরে তিনি বললেন: 'আল্লাহর কসম! আমি জনি না'।

---

৬৬ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৯-১৯০; উদ্ধৃত, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, মাওলানা আবূ তাহের মেসবাহ অনূদিত, *হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবন ও খিলাফত* (ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০১৫). পৃ. ৫৯

৬৭ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২২৫; উদ্ধৃত, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, মাওলানা আবূ তাহের মেসবাহ অনূদিত, *হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবন ও খিলাফত* (ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০১৫). পৃ. ৬০

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: 'এত বনু আসফার অর্থাৎ রোমকদের সাথে যুদ্ধের সময় নয়। তাহলে রাসূলুল্লাহর ইচ্ছা আবার কোন দিকের? আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমার জানা নেই।'

এভাবে খুব গোপনীয়তার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

এদিকে 'হাতিব বিন আবু বালতা' কুরাইশদের নিকট এক পত্র লিখে এ সংবাদ প্রেরণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। বিনিময় প্রদানের প্রতিশ্রুতিসাপেক্ষে তিনি এক মহিলার মাধ্যমে পত্রটি প্রেরণ করেন। মহিলা তাঁর চুলের খোঁপার মধ্যে পত্রটি রেখে পথ চলছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমান হতে অহীর মাধ্যমে হাতিবের সে গতি প্রকৃতি ও কাজের ব্যাপারে জানতে পারেন। এজন্য তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু মুরশেদ গানাভীকে এই বলে প্রেরণ করলেন যে, তোমরা 'খাখ' নামক উদ্যানে গিয়ে সেখানে একটি হাওদা নশীন মহিলাকে দেখতে পাবে। ঐ মহিলার নিকট কুরাইশদের জন্য লিখিত ও প্রেরিত একটি পত্র আছে। সে পত্রটি তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে হবে।' সাহাবিগণ ঘোড়ার পিঠে আরোহণপূর্বক ক্ষীপ্র গতিতে মহিলার নাগাল পাওয়ার জন্য ছুটে চললেন। তাঁদের অগ্রাভিযানের এক পর্যায়ে তাঁরা উটের পিঠে আরোহণকারিণী মহিলাটির নাগাল পেলেন। তাঁরা তাকে উট থেকে অবতরণ করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তার কাছে কোনো পত্র আছে কি-না। কিন্তু সে তার নিকট পত্র থাকার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। তার উটের হাওদা তল্লাশি করেও তাঁরা কোনো পত্র না পাওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা বলেন নি। কিংবা আমরাও মিথ্যা বলছি না। হয় তুমি পত্রখানা বের করে দেবে, নতুবা আমরা তোমাকে একদম উলঙ্গ করে তল্লাশি চালাব। সে যখন তাদের দৃঢ়তা অনুধাবন করল তখন বলল, 'আচ্ছা তাহলে তোমরা অন্য দিকে মুখ ফিরাও।' তারা অন্য দিকে মুখ ফেরালে মহিলা তার খোঁপা থেকে পত্রখানা বের করে তাঁদের নিকট সমর্পণ করল। তাঁরা পত্রখানা নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়ে পৌছলেন। পত্রখানা খুলে পড়া হলো। তাতে লেখা ছিল। হাতিব বিন বালতায়ার পক্ষ হতে কুরাইশদের প্রতি- অতঃপর কুরাইশগণকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়েছিল।[৬৮] পরবর্তীতে সে ভুল স্বীকার করায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরী সাহাবী হিসেবে তাকে ক্ষমা করে দেন।

৬৮ ফতহুল বারী ৭ম খ. ৫২১ পৃ.।

অবশেষে মহানবী (সা.) ৮ম হিজরি ১০ রমজান ১০,০০০ সাহাবী সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন।[৬৯] মক্কা থেকে সামান্য দূরে মার-উর-জাহরান নামক স্থানে তাঁবু গাড়েন। মহানবী (সা.) প্রত্যেকটা তাঁবুতে অনেক বাতি জ্বালাতে বললেন। এটা কুরাইশদের বুঝিয়েছে যে, মুসলিমরা অনেক শক্তিশালী। আবু সুফিয়ান এবং অন্য নেতারা পাহাড়ের উপরে উঠল মুসলিমদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে এবং পরে বুঝতে পেরে নবী (সা.)-এর কাছে আসল। তিনি আবু সুফিয়ানকে নম্রভাষায় বললেন, "তুমি কি মনে করো মহান আল্লাহর চাইতে তোমার শক্তি বেশি।[৭০] আবু সুফিয়ান লজ্জা পেল। মহানবী (সা.) বলল তোমার সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে এবং একজন যে তোমার ঘরে প্রবেশ করেছে সেও নিরাপদ। মক্কা ফিরে গিয়ে আবু সুফিয়ান মক্কাবাসীদের নিরাপত্তার কথা জানালেন যা মহানবী (সা.) নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন এবং তাদের মুসলমান সৈন্যদের শক্তি সম্পর্কে বললেন। পরেরদিন সকালে মহানবী (সা.) মক্কায় গমন করলেন। তিনি মুসলমানদের কোনো রক্ত ঝরাতে নিষেধ করলেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ ব্যতীত সকল মুসলমান শান্তিতে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

যখন খালিদ মক্কায় প্রবেশ করলেন কুরাইশ এবং বনু বকরের মধ্যে কিছু কুরাইশ সাফওয়ান, শুহাইল এবং ইকরামাসহ মুলমানদের ওপর তীর ছুঁড়তে লাগল। দুইজন মুসলমান এতে শহীদ হলেন। খালিদ মুসলমানদের-এর উত্তর নিতে বললেন। একটি ছোট যুদ্ধ সংঘটিত হলো শত্রুদের নেতা তাদের ১২ জন মৃত সঙ্গীকে রেখে পালিয়ে গেল।[৭১] এভাবে মক্কা বিজিত হলো।

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) যখন দশ হাজার অনুগামীসহ শহরে প্রবেশ করেন, তখন আলী (রা.) সাদের হাত থেকে ইসলামী পতাকা বহন করেন। তিনি আবু সুফিয়ানের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন-

اَلْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ   اَلْيَوْمُ تَسْتَحِلُّ الْحُرْمَةِ-

"আজ রক্তক্ষরণ এবং মারপিটের দিন, আজ হারামকে হালাল করা হবে।"

রাসূল (সা.) এটা জানতে পেরে বললেন, 'সা'দ! এরূপ বলিও না; বরং আজ কা'বার গৌরবের দিন। আজ কা'বা নিজের পূর্ণ মর্যাদা ও মহিমার সাথে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।"

---

৬৯ ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, ৩/৪ খণ্ড: পৃ: ৪০০; সহীহ বুখারী (কিতাবুল মাগাযী)
৭০ ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, ৩/৪ খণ্ড: পৃ: ৪০৩; সহীহ বুখারী (কিতাবুল মাগাযী)।
৭১ ইবনে হায়্যাম, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড: পৃ: ৪০৭-৪০৮; জকাদ আল সাদ।

অতঃপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ প্রদান করলেন, সা'দ ইবনে ওবাদা হতে পতাকা গ্রহণপূর্বক সসৈন্যে নগরে প্রবেশ কর। তদনুযায়ী আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সৈন্য-সামন্তসহ মক্কায় প্রবেশ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্বিঘ্নে মক্কায় প্রবেশ করলেন। কোনো প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ এবং রক্তপাত ছাড়াই মক্কা বিজিত হলো। পবিত্র মক্কা নগরী তার প্রকৃত মর্যাদা ফিরে পেল। এভাবে বিনা রক্তপাতে সংঘটিত হলো ইতিহাসের সবচেয়ে কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠ বিজয়।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিগণসহ কা'বা শরীফে গমন করে তার চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে সকলে সমস্বরে তকবির ধ্বনি করে মক্কার আকাশ-বাতাস মুখরিত করতে লাগলেন। এভাবে সকলে তকবির উচ্চারণ করতে করতে সাতবার কা'বা শরীফ প্রদক্ষিণ করলেন। এর পর কা'বা গৃহের ভেতরে প্রবেশ করে প্রাণ ভরে উচ্চৈঃস্বরে তকবির ধ্বনি করলেন। অতঃপর দৃষ্টি পড়ল কা'বা শরীফের অভ্যন্তরস্থ প্রস্তর মূর্তিসমূহের প্রতি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লাঠি নিয়ে সেগুলোর মস্তকে আঘাত করতে লাগলেন, আর মুখে বলতে লাগলেন :

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا -

অর্থাৎ, "সত্য সমাগত, মিথ্যা পরাভূত। মিথ্যা অবশ্যই ধ্বংসশীল।"

অতঃপর ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর প্রতিমূর্তিসহ সমস্ত মূর্তিই বাইরে ফেলে দেওয়া হলো। কিন্তু তাম্র নির্মিত একটি বিরাটকায় মূর্তি লোহার চৌপায়ার ওপর এত উপরে স্থাপিত ছিল যে, মাটি হতে সেটি নাগাল পাওয়া যাচ্ছিল না। অতএব, আলী অগ্রসর হয়ে অবনত হয়ে বললেন, রাসূল! আপনি আমার পিঠে আরোহণ করে একে ভেঙে ফেলুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নবুওয়াতের ভার আমার ওপর অর্পিত রয়েছে। সুতরাং আমার ভার তুমি কখনও বহন করতে পারবে না। তুমি আমার কাঁধে উঠে মূর্তিটিকে চূর্ণ করে ফেল। আলী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাঁধে আরোহণপূর্বক মূর্তিটিকে নিয়ে এক আছাড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললেন।

মক্কার চতুস্পার্শ্বে মুজাহিদদের ছোট ছোট দল প্রেরণ করে সেখানকার মূর্তিগুলোও ভেঙে ফেলা হলো। চতুর্দিকে অবস্থান এবং সেখানে বসবাসকারী গোত্রসমূহের নিকট ইসলামের দাওয়াত পাঠানো হলো। তারাও দলে দলে ইসলাম কবুল করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে বনু খুযায়মা গোত্রের সাথে খালিদ ইবনে ওলিদের কিছু ভুল বুঝাবুঝির দরুন উক্ত গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক তাঁর হাতে বন্দি ও নিহত হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা জানতে পেরে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রচুর অর্থসহ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠালেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে গমনপূর্বক ক্ষতিপূরণ

প্রদান করলেন এবং সদ্ব্যবহারের গুণে তাদের সাথে সম্প্রীতি স্থাপন করে ফিরে এলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কার্যদক্ষতায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই সন্তুষ্ট হলেন।
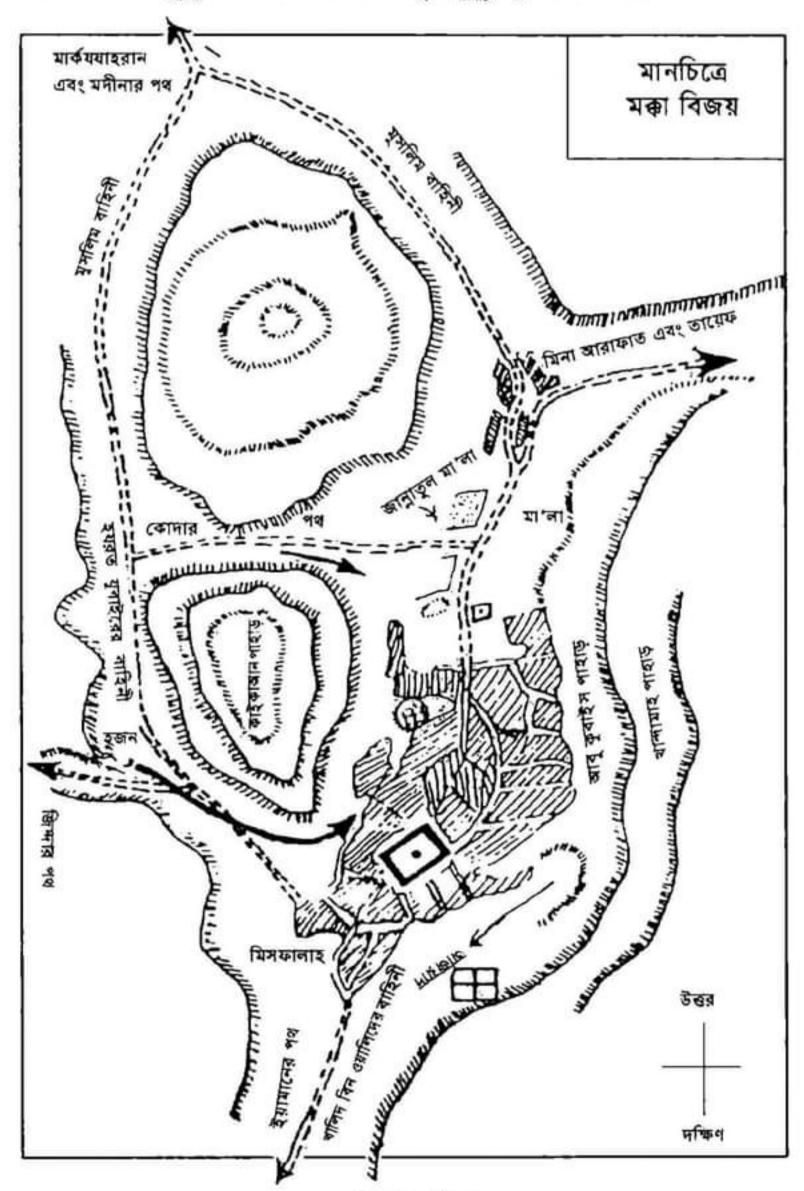
চিত্র : মক্কা বিজয়

হুনায়েনের যুদ্ধে পর্বতসম দৃঢ়তা প্রদর্শন

হুনায়েনের যুদ্ধেও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুসলমানদের মক্কা বিজয় ছিল এক আকস্মিক অভিযানের ফলশ্রুতি। যার ফলে আরব গোত্রসমূহ প্রায় হতভম্ব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তাদের এবং পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহের এতটুকু ক্ষমতা ছিল না যে, তারা এই আকস্মিক অভিযানকে প্রতিহত করতে পারে। এ কারণে কতিপয় জেদি, অপরিণামদর্শী গোত্র ছাড়া আর সব গোত্রই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল। এ জেদি গোত্রগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল হাওয়াযিন এবং সাকীফ গোত্র। এদের সঙ্গে মুদার জুশাম এবং সায়াদ বিন বকরের গোত্র ও বনু হিলালের কতিপয় লোকও ছিল। এসব গোত্রের সম্পর্ক ছিল কাইসে আইলানের সঙ্গে। পরাজয় স্বীকারপূর্বক মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করাকে তারা খুবই অপমানজনক বলে মনে করছিল। এ কারণে ঐ সকল গোত্র মালিক বিন আওফ নাসরীর নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, তারা মুসলমানদের আক্রমণ করবে।[৭২]

৮ম হিজরির ৬ই শাওয়াল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হতে রওয়ানা হলেন। এটি ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কা আগমনের উনিশতম দিবস। হযরতের সঙ্গে ছিল বারো হাজার সৈন্য। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি সঙ্গে এনেছিলেন দশ হাজার সৈন্য এবং মক্কার নও মুসলিমদের মধ্য হতে সংগ্রহ করেছিলেন আরও দুই হাজার সৈন্য। এ যুদ্ধের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফওয়ান বিন উমাইয়ার নিকট হতে একশত লৌহ বর্ম নিয়েছিলেন এবং আত্তাব বিন আসীদকে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন।

হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের যোদ্ধারা পূর্বেই হুনায়েনের ঘাঁটিসমূহে ওঁতপেতে বসেছিল। মুজাহিদ বাহিনীর আগমনমাত্রই তারা অতর্কিতে আক্রমণ করল। প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করে জোরদার পাল্টা আক্রমণে মুজাহিদ বাহিনী কাফের বাহিনীকে হটিয়ে দিল। কাফেরগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে লাগল। এমতাবস্থায় মুজাহিদগণ যুদ্ধলব্ধ মাল জমা করতে উদ্যত হলো। কাফেরগণ দূর হতে মুসলমানদেরকে শত্রুর প্রতি অমনোযোগী দেখে বিপুল বিক্রমে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাফেরদের তীরবৃষ্টির সম্মুখে মুসলমানগণ দাঁড়াতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। বিপুলসংখ্যক যোদ্ধার মধ্যে অল্পসংখ্যক বিশিষ্ট ও প্রধান সাহাবীই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে টিকে থাকল। তাঁদের মধ্যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অন্যতম। এ কঠিন মুহূর্তে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন

---

৭২ আর রাহীকুল মাখতূম

করেছিলেন ইতিহাসে এর তুলনা অতি দুর্লভ। তাঁর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের ফলে যুদ্ধের পরিস্থিতি মুসলিম বাহিনীর অনুকূলে এসে পড়ল। তিনি শত্রুর পদাতিক বাহিনীর সেনাপতিকে ভূতলশায়ী ও নিহত করে ফেলতেই পদাতিক সৈন্যগণ পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে লাগল। ইতোমধ্যে ছত্রভঙ্গ আনসার এবং মুহাজিরগণও রাসূল ﷺ-এর আহ্বানে পুনরায় একত্র হয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। ফলে শত্রুপক্ষ চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলো। হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের প্রায় ছয় হাজার নর-নারী মুসলমানদের হাতে বন্দি হলো। বহুসংখ্যক উট, ছাগল, মেষ ও প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্যও মুসলমানদের হস্তগত হলো। এ যুদ্ধে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বীরত্ব পরাজয়মুখী মুসলিম বাহিনীকে সুসংহত ও বিজয় মাল্যে ভূষিত করেছিল।[৭৩]
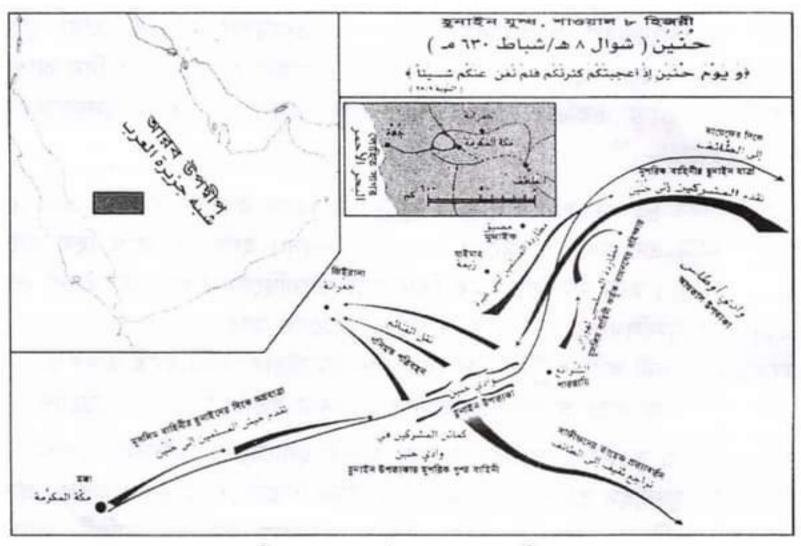
চিত্র ৪৫ : হুনাইন যুদ্ধের মানচিত্র

রাসূল ﷺ কর্তৃক যাকাত আদায়কারী হিসেবে নিয়োগ

মক্কা বিজয়ের পর ৮ম হিজরির শেষ ভাগে রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনা ফিরে আসেন। ৯ম হিজরির মুহাররমের চাঁদ উদিত হওয়ার পর পরই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন গোত্রের মুসলমানদের নিকট থেকে সাদাকাহ ও যাকাত আদায়ের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করেন। এদের মধ্যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। নিচে যাকাত আদায়কারীদের তালিকা উপস্থাপন করা হলো–

৭৩ মাওলানা নূরুর রহমান, *হযরত আলী ইবনে আবি তালিব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২

কর্মকর্তা / কর্মচারিগণের নাম	যে গোত্র থেকে সাদাকাহ ও যাকাত আদায় করা হয়েছিল
১. উওয়ায়না বিন হিস্ন	বনু তামীম
২. ইয়াযিদ বিন হোসাইন	আসলাম এবং গেফার গোত্র
৩. আব্বাদ বিন বাশির আশহালী	সোলাইম এবং মোযাইনা গোত্র
৪. রাফে বিন মাকীস	জোহাইনা গোত্র
৫. আমর বিন আস	বনু ফাযারা
৬. যাহহাক বিন সুফিয়ান	বনু কিলাব
৭. বাশীর বিন সুফিয়ান	বনু কা'ব
৮. ইযনুল লুতবিয়াহ আযদী	বনু যুবিয়ান
৯. মুহাজের বিন আবি উমাইয়াহ	সানয়া শহর (তাঁদের উপস্থিতিতে তাঁদের বিরুদ্ধে আসওয়াদ আনসী সানয়ায় মিথ্যা নবী দাবি করেছিল)।
১০. যিয়াদ বিন লাবীদ	হাযরা মাউত অঞ্চল
১১. আদী বিন হাতিম	তাঈ এবং বনু আসাদ গোত্র
১২. মালিক বিন নোওয়াইরাহ	বনু হানযালাহ গোত্র
১৩. যবরকান বিন বদর	বনু সা'দ (এর একটি শাখা)
১৪. কাইস বিন আসিম	বনু সা'দ (এর অন্য একটি শাখা)
১৫. আলা' বিন হাযরামী	বাহরাইন অঞ্চল
১৬. আলী ইবনে আবী তালিব	নাজরান অঞ্চল (যাকাত এবং কর আদায় করার জন্য)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফরমান প্রচার

তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের নবম হিজরিতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমিরে হজ বানিয়ে মক্কায় পাঠালেন। এ সময় সূরায়ে বাড়াআত নাযিল হলো। লোকেরা বলল : হজের সময় এ সূরাটি লোকদেরকে পড়ে শুনিয়ে দেবার জন্য আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে ভালো হতো। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমার পক্ষ থেকে কেবল আমার খান্দানের কোনো লোকই এর প্রচার

করতে পারে। তিনি আলী (রা.)-কে ডেকে এনে হুকুম দিলেন : মক্কায় গিয়ে লোকদেরকে এ সূরাটি শোনাও এবং তাদেরকে সাধারণ ঘোষণা শুনিয়ে দাও যে, কোনো কাফের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এ বছরের পর থেকে আর কোনো মুশরিক হজ করতে পারবে না এবং কোনো ব্যক্তি উলঙ্গ অবস্থায় কা'বাগৃহ তওয়াফ করতে পারবে না। আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে যার কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার সে চুক্তি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে।[৭৪]

মদিনার গভর্নর আলী (রা.)

৯ম হিজরির রজব মাসে তাবুক অভিযান ঘটেছিল, যা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের সবচেয়ে তৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ইসলামের ইতিহাসের গতিধারায় এ অভিযানের ছিল এক সুদূরপ্রসারী ফল। যখন অধিকাংশ মুসলিম মুজাহিদ এ যুদ্ধে যায় তখন নবী করীম (সা.) আলী (রা.)-কে মদিনার গভর্নরের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর পরিবারকে দেখাশুনার দায়িত্ব আলী (রা.)-এর ওপর নিশ্চিন্তে দেন যে, তাহলে তাদের ওপর কোনো বিপদ আসবে না।

মুনাফেকরা এটাকে গুজব ও অপবাদ ছড়ানোর সুযোগ হিসেবে নিল। মুহাম্মদ (সা.) বুঝতে পারলেন যে, আলী (সা.) নিজেকে কঠিনভাবে সংযত করলেন এবং প্রতিশোধের অপেক্ষায় থাকলেন। মুনাফেকরা বিবাদের বীজ বপন করত এবং তারা তাদেরকে সামান্য কোনো বিষয় দেখলেই মুনাফেকি আচরণ করত এবং মুসলমানদেরকে নাযেহাল করে আনন্দে ফেটে পড়ত।

আলী (রা.) তাদের এসব বিদ্বেষমূলক কথা দ্বারা এত কষ্ট পেতেন যে, তিনি মনে করতেন এখনোই আমি সামরিক বর্ম পরিধান করে অস্ত্র হাতে তাদের পাকড়াও করি। কিন্তু নবী করীম (সা.)-এর অনুমতি ছাড়া তো যুদ্ধ করা যায় না; তাই তিনি তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার জন্য অনুমতি চাইলেন। কারণ মুনাফেকদের বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ সীমা ছাড়িয়ে গেছে। নবী করীম (সা.) মুচকি হাসলেন এবং বললেন, তারা মিথ্যা বলছে। আমি তো তোমাকে আমার অনুপস্থিতিতে আমার পরিবারের কল্যাণের জন্যই মদিনায় থাকতে বলেছি।

হে আলী! তুমি কি আনন্দিত হও যে, "মূসা (আ.)-এর কাছে তার ভাই হারূন (আ.)-এর যে মর্যাদা ছিল, আমার কাছেও তোমার তেমন মর্যাদা। তবে আমার পরে কোনো নবী আসবে না।"

---

৭৪ মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (রহ.), হায়াতুস সাহাবা (ঢাকা : বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ২০১৪)

ইয়ামনে ইসলাম প্রচার

দশম হিজরিতে ইসলাম প্রচারের জন্য রাসূলে করীম (সাঃ) বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন অভিযাত্রী দল প্রেরণ করলেন। ইয়ামন অভিযানে খালিদ ইবনে ওলিদ (রাঃ)কে পাঠালেন। কিন্তু ছ'মাসব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার পরও ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সাফল্য দেখা গেল না। কাজেই দশম হিজরির রমযান মাসে রাসূলে করীম (সাঃ) আলী (রাঃ)কে ইয়ামনে যাওয়ার হুকুম দিলেন। আলী (রাঃ) আবেদন করলেন : হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন এক জাতির মধ্যে পাঠানো হচ্ছে যাদের মধ্যে আমার চেয়ে অনেক বেশি বয়স্ক ও অভিজ্ঞ লোক বর্তমান রয়েছে। তাদের বিবাদের মীমাংসা করা আমার জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। রাসূলে করীম (সাঃ) তাঁর বুকে হাত দিয়ে বললেন, হে আল্লাহ তাদের হৃদয়কে হিদায়েতের আলোকে আলোকিত কর। অতঃপর তিনি নিজের হাতে আলী (রাঃ)-এর মাথায় পাগড়ি বেঁধে দিলেন এবং তাঁর হাতে কালো ঝাণ্ডা দিয়ে তাঁকে ইয়ামনের দিকে রওয়ানা করে দিলেন।

আলী (রাঃ)-এর ইয়ামন পৌছার সাথে সাথেই সেখানকার হাওয়া পালটে গেল। যারা খালিদ ইবনে ওলিদ (রাঃ)-এর ছ'মাসের অনবরত প্রচেষ্টার পরও ইসলামের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারছিল না, তারা আলী মুর্তজা (রাঃ)-এর মাত্র কয়েকদিনের শিক্ষা-দীক্ষায় ইসলামের পরম ভক্তে পরিণত হলো এবং সমগ্র হামদান গোত্র মুসলমান হয়ে গেল।

বিদায় হজে অংশগ্রহণ

দশম হিজরিতে রাসূলে করীম (সাঃ) শেষ হজ করলেন। আলী (রাঃ)-ও ইয়ামন থেকে এসে এই চিরস্মরণীয় হজে শরিক হলেন। বিদায় হজে রাসূল (সাঃ) গাদীরে খুমে এক বিখ্যাত ভাষণ প্রদান করেন।

এই গাদীরে খুমেই এক পর্যায়ে রাসূল (সাঃ) আলী (রাঃ)-এর হাত ধরে সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা কি জান না যে, আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজেদের সত্তার চেয়েও উত্তম? সকলে সমস্বরে বললেন, হ্যাঁ। তোমরা কি জান না যে, প্রত্যেক মু'মিনের জন্য আমি তার সত্তা হতে উত্তম? সকলে বলিল, হ্যাঁ। অতঃপর বললেন, "ইয়া আল্লাহ! আমি যার বন্ধু, আলীও তার বন্ধু, ইয়া আল্লাহ! যে ব্যক্তি আলীকে ভালোবাসে আপনিও তাকে ভালোবাসুন। আর যে ব্যক্তি আলীকে শত্রু মনে করে, আপনিও তাকে শত্রু মনে করুন।" এর পর ওমর (রাঃ) আলী (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে মোবারকবাদ দিলেন, এবং বললেন হে

আলী ইবনে আবি তালিব! আপনি আজ হতে প্রত্যেকটি মুসলিম নর-নারীর বন্ধু হয়ে গেলেন।[৭৫]
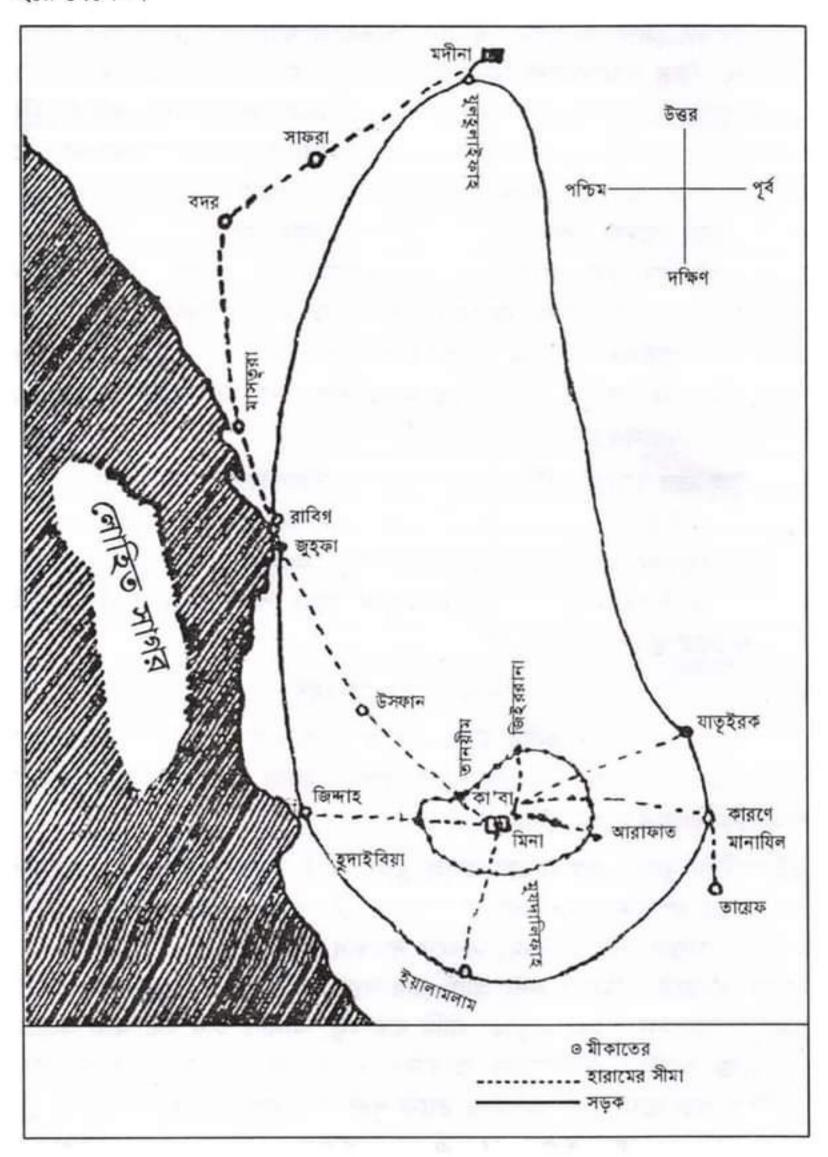
৭৫ মাওলানা নূরুর রহমান, *হযরত আলী ইবনে আবু তালিব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

রাসূলুল্লাহ -এর ইন্তেকালে আলী -এর শোক প্রকাশ

রাসূলে করীম হজ থেকে ফিরে আসার পর ১১শ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের প্রথমদিকে রোগাক্রান্ত হলেন। আলী মন-প্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করলেন। অন্তিম দিনগুলোতে রাসূলুল্লাহ -এর অসুস্থতা অত্যন্ত বেড়ে গেল। একদিন বেলাল আযান দিয়ে রাসূল কে ডাকতে আসলে তিনি বললেন, "বেলাল! আবু বকরকে নামায পড়াতে বল।"

মসজিদে এসে বেলাল আবু বকর –কে ইমাম হয়ে নামায পড়ানোর জন্য রাসূল -এর নির্দেশ জানালেন। এটা শুনে হযরত আবু বকর বিমূঢ় হয়ে পড়লেন এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাসূল সেই ক্রন্দনের আওয়াজ শুনে জিজ্ঞেস করলেন, ফাতেমা ! তারা ক্রন্দন করতেছে কেন? ফাতেমা উত্তর দিলেন, ইমামের স্থানে আপনাকে না দেখে তাঁরা ক্রন্দন করছে।

একথা শুনে তিনি আলী ও ফযল -এর কাঁধে ভর করে মসজিদে গমনপূর্বক আবু বকর -এর পাশে বসে নামায আদায় করলেন। অতঃপর উপস্থিত মুসল্লীবৃন্দকে কিছু নসীহত করে পুনরায় আলী ও ফযল -এর কাঁধে ভর করে আয়িশা সিদ্দীকা -এর হুজরায় চলে গেলেন।[৭৬]

একদিন আলী বাইরে এলে লোকেরা তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ -এর অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। আলী নিশ্চিন্ততা প্রকাশ করলেন। আব্বাস তাঁর হাত ধরে বললেন : আল্লাহর কসম, আমি মৃত্যুর সময় আব্দুল মুত্তালিবের খান্দানের লোকদের চেহারা দেখে বুঝতে পারি। এসো আমার সাথে, আমরা রাসূলুল্লাহ -এর কাছে গিয়ে আমাদের জন্য খিলাফতের অসিয়ত করে যাবার আবেদন করি। আলী জবাব দিলেন : আল্লাহর কসম, যদি তিনি অস্বীকার করেন তাহলে ভবিষ্যতে তা লাভ করার আর কোনো অবকাশই থাকবে না।

রাসূল -এর পবিত্র দেহ গোসল দেওয়ার জন্য আবু বকর রাসূল -এর আত্মীয়স্বজনকে বললেন। রাসূল তাঁর অন্তিম শয্যায় একদিন বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মীয়স্বজনরাই যেন আমাকে গোসল দেয়। সেই নির্দেশ অনুসারে আলী রাসূল -এর গোসল দেওয়ার ভার গ্রহণ

---

৭৬ মাওলানা নূরুর রহমান, *হযরত আলী ইবনে আবি তালিব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

করলেন। যিনি ছিলেন তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় এবং আপন। আজ তাঁর মৃতদেহ নিয়ে নাড়াচাড়া করা এবং তাঁকে গোসল দেওয়া তাঁর জন্য ছিল এক অসহনীয় কাজ। তবুও গোসল দিতেই হলো। গোসলের কাজ শেষ করে তিনি রাসূল সাঃ-এর সারাদেহে সুগন্ধি দ্রব্য মাখিয়ে দিলেন। তিন খণ্ড কাপড় (কাফন) দ্বারা রাসূল সাঃ-এর মোবারক দেহ আচ্ছাদিত করা হলো। অতঃপর জানাযার নামায পড়া হলো। প্রথমে হাশেম বংশীয়গণ, অতঃপর মুহাজির এবং আনসারগণ, অতঃপর অন্যান্য সকল মুসলমানগণ পর্যায়ক্রমে রাসূল সাঃ-এর জানাযার নামায পড়লেন। অপরদিকে সকলের আগে পুরুষগণ, তারপর স্ত্রীলোকগণ, তারপর বালক-বালিকাগণ নামায পড়লেন।

আর যারা তাঁকে কবরে রাখেন তাঁদের একজন আলী রাঃ। তাঁর কবরে মাটি দেন আল ফযল, কাতাম ইবনে আব্বাস ও শুকরান রাঃ যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর মুক্ত করা দাস।

অধ্যায়-৪

পূর্ববর্তী খলিফাদের শাসনামলে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

আবু বকর -এর খিলাফতকালে আলী

রাসূলুল্লাহ -এর ইন্তেকালের পর তাৎক্ষণিক মুসলিম উম্মাহর খিলাফতের দায়িত্ব দেওয়া হয় আবু বকর কে। আলী প্রথমেই তাঁর হাতে আনুগত্যের শপথ নিলেন। তিনি ছিলেন আবু বকর -এর উপদেষ্টা।

১. আলী -এর বায়আত গ্রহণ

আলী -এর বায়আত গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন অভিমত দিয়েছেন। হাকিম আবু বকর আল-বায়হাকী নিজস্ব সনদে আবু সাঈদ আল-খুদরী হতে বর্ণনা করেছেন, আবু বকর মিম্বরে দাঁড়িয়ে সমবেত লোকদের মাঝে আলী কে দেখতে না পেয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং অভিযোগের সুরে বললেন, হে নবীর পিতৃব্য পুত্র ও তাঁর কন্যার জামাতা! আপনি কি মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল দেখতে চান? তিনি বললেন, হে খলীফাতুর রাসূল! কোনো তিরস্কার নয়। এরপর তিনি আবু বকর -এর হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন।[৭৭]

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, বিশুদ্ধতম মতে নবী -এর ইন্তেকালের প্রথম বা দ্বিতীয় দিনেই আলী বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। জীবনের কোনো মুহূর্তেই আবু বকর কে সঙ্গ দান ও তাঁর পেছনে নামায আদায় হতে তিনি বিরত থাকেননি।[৭৮]

তবে প্রসিদ্ধতম মত এই যে, ফাতেমা -এর কিছুটা মন রক্ষার জন্য প্রথম দিকে তিনি বায়আত গ্রহণ করেন নি। নবী -এর ইন্তেকালের ছয় মাস পর যখন তাঁর ইন্তেকাল হলো তখন তিনি জনসমক্ষে বায়আত করেছেন।

তবে ইব্‌ন কাছীর ও অন্যান্য বহু 'আহলে ইলম' মনে করেন যে, এটা ছিল প্রথম বায়আতের নবায়নমাত্র। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে এর অনুকূলে কিছু বর্ণনাও রয়েছে।[৭৯]

---

৭৭ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৯

৭৮ প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৪৯

৭৯ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৪৬

২. খিলাফত প্রশ্নে প্রথম পরীক্ষা ও অবিচলতা

শুরুতেই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন এক নাজুক অবস্থার সম্মুখীন হলেন যাতে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর আন্তরিকতা, খলিফা ও খিলাফতের প্রতি তাঁর আনুগত্য এবং জাহেলিয়াতের অহংবোধ ও গোত্রপ্রীতি থেকে তাঁর পবিত্রতার কঠিন পরীক্ষা হয়ে গেল এবং তাতে তিনি সফলভাবে উত্তীর্ণও হলেন। সুয়াঈদ ইব্‌ন গাফলাহ-এর সূত্রে ইব্‌ন আসাকির বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু আলী ও আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, হে আলী! আর তুমি হে আব্বাস! বলো দেখি, খিলাফতের এ কেমন দুর্গতি যে, কুরায়শের হীনমত এক গোত্রে তা কুক্ষিগত হলো! আল্লাহ্‌র কসম! যদি চাও তাহলে অশ্বদল ও পদাতিক দলের পদভারে তাঁকে কাঁপিয়ে দেব। কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তা চাই না। কেননা আবু বকর উপযুক্ত না হলে আমরা তাঁকে ছাড় দিতাম না। হে আবু সুফিয়ান, মু'মিনগণ হিতাকাঙ্ক্ষী সম্প্রদায়। দেশ ও গোত্রে ঊর্ধ্বে পরস্পরের প্রতি তারা সম্প্রীতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে, মুনাফেকেরা হলো ধূর্ত সম্প্রদায়। পরস্পরের প্রতি প্রতারণা তাদের জন্মগত।

নাহজুল বালাগা-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইব্‌ন আবিল হাদীদ বলেন, আবু সুফিয়ান আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে বায়আত হওয়ার অনুমতি চাইলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, তুমি এমন বিষয় আবদার করছ যা আমাদের জন্য নয়। তাছাড়া আল্লাহ্‌র রাসূল আমাকে এক ওয়াদায় আবদ্ধ করে গিয়েছেন, আমি তাতে অবিচল থাকতে চাই। আবু সুফিয়ান তখন আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের ঘরে তাঁর সাথে দেখা করে বললেন, হে আবু ফাযল, আপন ভ্রাতুষ্পুত্রের উত্তরাধিকারের আপনিই অধিক হকদার। সুতরাং হস্ত প্রসারিত করুন, আমি বায়আত হবো। আমার বায়আতের পর কেউ আপনার বিরুদ্ধাচরণ করবে না।

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হেসে বললেন, হে আবু সুফিয়ান! আলী যা অগ্রহণ করছেন আমি তা গ্রহণ করব? আবু সুফিয়ান তখন নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন।[৮০]

ইব্‌ন আবুল হাদীদের বর্ণনায় আরও আছে যে, ফযল ইব্‌ন আব্বাস যখন বললেন, হে বন্ধু তায়ম! নবুয়তের কল্যাণেই তোমরা খিলাফত পেয়েছ, অথচ তোমরা নও, আমরাই তার হকদার। আবু লাহাব ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিবের এক পুত্র এ সম্পর্কে কবিতাও রচনা করল।

---

৮০ ইব্‌ন আবুল হাদীদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮

যোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু লোক পাঠিয়ে তাকে বারণ করলেন এবং পূর্ণ সংযম পালনের আদেশ করে বললেন, আমাদের কাছে দীনের নিরাপত্তা অন্য সব কিছুর উর্ধ্বে।

৩. প্রথম খলিফার প্রতি আন্তরিক সহযোগিতা

দুই বছরের পূর্ণ খিলাফতকালে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আচরণ ছিল খুবই আন্তরিক ও হিতাকাঙ্ক্ষীপূর্ণ। কেননা তাঁর কাছে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ চিন্তাই ছিল একক অগ্রাধিকারের বিষয়। অবশ্য তাঁর 'বংশ গরিমা ও স্বভাব মহিমার কাছে এটাই ছিল প্রত্যাশিত।

এই আন্তরিকতা, কল্যাণ চিন্তা এবং উম্মাহর ঐক্য ও খিলাফতের অস্তিত্বের প্রশ্নে তাঁর সংবেদনশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায় যিল-কিসসার ঘটনায়। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, এমনকি যিল-কিসসা অভিমুখে যাত্রাও করেছিলেন। কিন্তু এতে একদিকে যেমন ছিল খলিফার প্রাণের ঝুঁকি, তেমনি ছিল খিলাফতের অস্তিত্বের প্রশ্ন।

দারে কুতনির নিজস্ব সনদের বর্ণনায় ইব্ন কাছীর (র) বলেন, ইব্ন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন যিল-কিসসা অভিমুখে যাত্রা করলেন তখন আলী ইব্ন আবু তালিব উটের লাগাম ধরে বললেন, হে খলিফাতুর রাসূল! কোথায় চলেছেন? ওহুদের দিন আল্লাহ্‌র রাসূল আপনাকে যা বলেছিলেন আমিও তাই বলি, হে আবু বকর! তোমার শোকে আমাদের বিদ্ধ করো না।

হে খলিফাতুর রাসূল! মদিনায় ফিরে আসুন। আল্লাহ্‌র কসম! আপনাকে হারালে আর কখনো ইসলামের কোনো শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠবে না।

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনায় ফিরে এলেন। যাকারিয়া আস-সাজী ও যুহরী আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।[৮১]

আল্লাহ না করুন, তিনি যদি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি 'প্রসন্ন' না হতেন এবং তার বায়'আত যদি আন্তরিক না হতেন তাহলে এটা তো ছিল এক সুবর্ণ সুযোগ। একটি 'দুর্ঘটনা' আশায় তিনি তো খলিফাকে তাঁর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিতে পারতেন! এতে তাঁর খিলাফত লাভের পথ নিষ্কণ্টক হওয়ার একটা সুযোগও থাকত।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি তাঁর ঘৃণা ও বিদ্বেষ এতই যদি ফেনায়িত হয়ে থাকে এবং এই 'বিপদ' থেকে নিস্তার লাভের চিন্তা এতই যদি প্রবল হয়ে থাকে

---

৮১ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৪-৩১৫

(আল্লাহ্‌র সাক্ষী, এমন নীচতা থেকে তিনি পবিত্র) তাহলে অতি সহজেই তো ঐ যুদ্ধে তিনি গুপ্তঘাতকের আশ্রয় নিতে পারতেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যেমন করে থাকে ক্ষমতা ও রাজনীতির 'কুশলী' খেলোয়াড়রা!

মুসলমানদের শাসক ও আল্লাহ্‌র রাসূলের খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি তাঁর অসাধারণ আন্তরিকতা ও সহমর্মিতা এবং উম্মাহর কল্যাণ সাধন ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁর সর্বোচ্চ সহযোগিতার কথা বাদ দিলেও ইতিহাসের পাতায় চোখ রেখে স্থির প্রত্যয়ের সাথে আমরা বলতে পারি যে, সুখে-দুঃখে ও সুসময়ে-দুঃসময়ে সর্বাবস্থায় উভয়ের মাঝে প্রীতি ও সম্প্রীতির এক সুনিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। যেমন থাকে একই পরিবারের দুই সদস্যের মাঝে। এক কথায় তারা ছিলেন رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (সূরা ফাতহ্ : ২৯)-এর জীবন্ত নমুনা।

হাশেমী আলাবী পরিবারের বিশিষ্ট সদস্য মুহম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হুসায়নের বর্ণনায়ও এ অনন্য সম্পর্কের কথা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, একবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কোমরের ব্যথার উপশমের জন্য আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আগুনে নিজের হাত গরম করে তাঁর কোমরে সেঁক দিয়েছিলেন।[৮২]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাঝে দৃঢ় ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। তিনি সবসময় তাঁর পাশেই অবস্থান করতেন। খুব দীর্ঘ সময় তাঁকে ছেড়ে থাকতেন না। তিনি প্রত্যেক নামায আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পেছনে পড়ার চেষ্টা করতেন। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সার্বিক কল্যাণের জন্য তিনি কাজ করতেন।

৪. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকাল ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শোক প্রকাশ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের মাত্র দু'বছর পর প্রথম খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকাল গোটা উম্মাহর জন্য ছিল সবচেয়ে শোকাবহ ঘটনা। আর উম্মাহর এক নিবেদিতপ্রাণ সদস্য হিসেবে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও দারুণভাবে শোকাভিভূত হয়েছিলেন। সে সময় তিনি যে মর্মস্পর্শী ভাষায় তাঁর শোক প্রকাশ করেছিলেন।

ইন্তেকালের সংবাদ শুনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়লেন এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় ছুটে এলেন এবং অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় শ্রদ্ধা নিবেদন করে বললেন, "আবু বকর! আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন, ইসলাম গ্রহণে আপনি ছিলেন সবার আগে। ঈমানের পূর্ণতায়, তাকওয়ায় উচ্চতায় ও নবীর প্রতি সজাগ সতর্কতায় আপনি ছিলেন সবার ওপরে। সত্যনিষ্ঠায়, চরিত্রের পবিত্রতায় এবং ভাবগম্ভীরতা ও গুণ বিশিষ্টতায় আপনিই ছিলেন আল্লাহ্‌র নবীর

---

৮২ আর-রিয়াদুন নাদরা, ১ম খণ্ড, দুররে মানসুর, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০১

নিকটতম এবং সবার মাঝে তাঁর আস্থাভাজন ও প্রিয়তম। সুতরাং ইসলামের পক্ষ হতে আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, মানুষ যখন মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে আপনি তখন সত্য বলে রাসূলকে গ্রহণ করেছিলেন। তাই আল্লাহ আপনাকে 'সিদ্দীক' বলে উল্লেখ করেছেন।

وَالَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ بِهٖ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ -

"যারা সত্য এনেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তারাই তো মুত্তাকী।"[৮৩]

সবাই যখন পিছিয়েছিল এবং বসে পড়েছিল আপনি তখন সান্ত্বনা হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, কঠিন মুহূর্তে সবাই যখন সরে গিয়েছিল আপনি তখন দরদি হয়ে তাঁকে সঙ্গ দিয়েছিলেন। আর তা ছিল দু'জনের দ্বিতীয় জন হিসেবে মহত্তম সঙ্গ। গারে ছাওরে আপনি তাঁর সঙ্গী এবং হিজরতের সাথী। সর্বোপরি আপনি ছিলেন তাঁর হৃদয়ের প্রশান্তি।

উম্মতের মাঝে আপনি তাঁর সর্বোত্তম খলিফা হয়েছিলেন। আপনার সাথীদের দুর্বলতা ও ভেঙে পড়ার মুখেও আপনি অনমনীয় দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছিলেন। যখন তারা হিশশিম খেয়ে থেমে গেছে তখন আপনি নিজ কাঁধে দায়িত্ব তুলে নিয়ে দৃঢ় পদে এগিয়ে গিয়েছিলেন। যেমন দীর্ঘ নীরবতায় তেমনি বাকনৈপুণ্যে আপনি ছিলেন অনন্য। হিম্মতে ও মনোবলে অতুলনীয় এবং আখলাকে ও আমলে সবার অনুকরণীয়। আল্লাহ্‌র রাসূল যেমন বলেছেন, তুমি ছিলে শারীরিকভাবে দুর্বল কিন্তু আল্লাহ্‌র ব্যাপারে অতি সবল। নিজের চোখে নিজে তুচ্ছ কিন্তু আল্লাহর কাছে অতি উচ্চ। আসমানে ও যমীনে সবার প্রিয়। সুতরাং আমাদের পক্ষ হতে ও ইসলামের পক্ষ হতে আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।[৮৪]

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে আলী

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাঝে পারস্পরিক আস্থা, শ্রদ্ধার, তাকওয়া ও পুণ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতার সুমধুর সম্পর্ক ছিল ।

নাফে আল-আব্‌সী (র) বলেন, একবার আমি ওমর ইব্‌নুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে সাদাকার উট রাখার 'আস্তাবলে' প্রবেশ করলাম। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ছায়ায় বসে বিবরণ লিখে যাচ্ছিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বক্তব্য তাঁকে বলে দিচ্ছিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর গায়ে ছিল দু'টি কালো চাদর।

---

৮৩ সূরা যুমার : ৩৩
৮৪ আল-জাওহিরাহ ফী নাসাবিন নাবী # ওয়া আসহাবিহিল আশারা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২৬

একটি পরিধানে, অন্যটি মাথায় পেঁচানো। তিনি প্রচণ্ড রোদ ও গরমে দাঁড়িয়ে গণনা করছিলেন এবং রং ও দাঁতের বিবরণ লিখে যাচ্ছিলেন। এ পটভূমিতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে রয়েছে!

يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ-

"হে পিতা, তাকে মজদুর রাখুন। কেননা সবল ও বিশ্বস্তই মজদুরির জন্য উত্তম।" অতঃপর তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, আমাদের মাঝে ইনিই হলেন 'সবল ও বিশ্বস্ত'।[৮৫]

এই সুগভীর আন্তরিকতা ও হিতাকাঙ্ক্ষীর কারণেই বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটকালে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সুচিন্তিত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। একবার তো ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এমনও বলেছেন,

لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ-

"আলী না হলে ওমর হালাক হয়ে যেত।"[৮৬]

আর ইতিহাস ও সাহিত্য গ্রন্থের একটি স্বীকৃত প্রবাদ হলো,

قَضِيَّةٌ وَلَا أَبَا حُسَيْنٍ لَهَا (এমন সংকট, অথচ কোনো আবুল হাসান নেই!)

সর্বোপরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ বিচার জ্ঞানে আলী তাদের সর্বোত্তম।"

বায়তুল মাকদিস গমনকালে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করে যান। আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে তাঁর কন্যা উম্মু কুলসুমকে বিবাহ দানের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সম্পর্ক গড়ার বিষয়টি ফুটে ওঠে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আন্তরিকতা এবং ইসলাম ও মুসলিম সংস্কারে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সংস্কারমূলক কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. পরামর্শ গ্রহণে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ওপর আস্থা

আল ফারূক গ্রন্থে 'আহলে বায়তের হক ও আদব রক্ষা' শিরোনামে আল্লামা শিবলী নোমানী (র) বলেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। পক্ষান্তরে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও

---

৮৫ তারীখে কামিল, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫-৫৬

৮৬ ইস্তিআব, পৃষ্ঠা ১৫-২০

পূর্ণ ইখলাস ও আন্তরিকতা সহকারে পরম হিতাকাঙ্খি হিসেবে পরামর্শ দিতেন। নিচে আলী -এর কয়েকটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো–

নেহাবন্দ যুদ্ধের সময় পরামর্শ : ভাগ্য- নির্ধারণী নেহাবন্দ যুদ্ধের সময় মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস প্রথমে পত্রযোগে এবং পরে সশরীরে উপস্থিত হয়ে ওমর কে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বললেন, কুফাবাসী অগ্রাভিযানের জন্য আপনার অনুমতিপ্রার্থী যাতে প্রথম আঘাতের সুযোগে শত্রুশিবিরে ত্রাস সৃষ্টি করা যায়। ওমর মজলিশ ডেকে বিশিষ্ট সাহাবা-কিরামের পরামর্শ চাইলেন এবং স্বাগত বক্তব্য রেখে বললেন, এ যুদ্ধের গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। তাই আমার পরিকল্পনা এই যে, যতটা সম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করে পশ্চাদ্‌শক্তিরূপে আমি শহরদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান গ্রহণ করি। তারপর অগ্রাভিযানের নির্দেশ প্রদান করি যেন আল্লাহ্ প্রত্যাশিত বিজয় দান করেন। আলী ওমর কে যুদ্ধের দায়িত্ব কোনো স্থলবর্তীর হাতে ছেড়ে দিয়ে তাঁকে মদিনায় অবস্থান করার পরামর্শ দিলেন এবং বসরাবাসীদের নামে পত্র প্রেরণপূর্বক মুসলিম বাহিনীকে ইরাক অভিমুখে প্রেরণের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। তদুপরি প্রশাসকগণকে নিজ নিজ প্রদেশে বহাল রাখার পরামর্শ দিয়ে তিনি এ মর্মে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে, আমীরুল মু'মিনীনের কোনো দুর্ঘটনা হয়ে গেলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অটুট শক্তি এমনভাবে বিধ্বস্ত হবে যে, তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হবে না। অতঃপর তাঁর কোনো মর্যাদা অবশিষ্ট থাকবে না এবং পুনঃঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপায়ও থাকবে না। ওমর বললেন, এটাই সঠিক মত।

পারস্য যুদ্ধের সময় পরামর্শ : একইভাবে ওমর যখন পারসিকদের বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধযাত্রার ব্যাপারে আলী -এর নিকট পরামর্শ চাইলেন তখন আলী বললেন, ইসলামের জয়-পরাজয় সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাল্পতা দ্বারা নির্ধারিত হয়নি। কেননা ইসলাম হলো আল্লাহ্‌র দীন, যাকে আল্লাহ্ প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং সাহায্য করেছেন। ফলে তারা এত দূর-দূরান্তে পৌঁছেছে এবং এত দিগ-দিগন্তে তাদের সৌভাগ্যসূর্য উদিত হয়েছে। আমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত আর আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করবেন এবং তাঁর সৈনিকদের অবশ্যই সাহায্য করবেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় পরামর্শ : ইয়ারমুক যুদ্ধের পূর্বে যখন ওমর স্বয়ং রোম অভিযানে গমনের বিষয়ে আলী -এর পরামর্শ চেয়েছিলেন। ইয়ারমুক যুদ্ধ ছিল সিরিয়ার বৃহত্তম যুদ্ধ, যার ওপর সিরিয়ার বিজয়াভিযানে মুসলিম বাহিনীর ভাগ্য নির্ভর করছিল। সিরিয়ায় মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক আবু ওবায়দা দূত প্রেরণ করে ওমর কে অবহিত করলেন যে, জল ও স্থল- উভয় পথে

রোমক বাহিনী বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো এগিয়ে আসছে। তখন ওমর (রাঃ) মুহাজির ও আনসারদের জমায়েত করে আবু ওবায়দা (রাঃ)-এর পত্র পড়ে শোনালেন। পত্রের মর্ম অবগত হয়ে সাহাবা কিরামের পক্ষে আত্মসংবরণ করা সম্ভব হলো না। ভাবাতিশয্যে তাঁরা কেঁদে ফেললেন এবং আবেগোদ্দীপ্ত ভাষায় আহ্বান জানিয়ে বললেন, আমীরুল মু'মিনীনকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলছি, তিনি আমাদেরকে সিরিয়া অভিমুখে অভিযানের অনুমতি প্রদান করুন। আমরা সিরিয়ায় জিহাদরত আমাদের ভাইদের জন্য রক্তের শেষ বিন্দুটুকু উৎসর্গ করতে চাই। এভাবে আনসার মুহাজিরদের জোশউদ্দীপনা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। অবশেষে আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রাঃ) প্রস্তাব করলেন, আমীরুল মু'মিনীন স্বয়ং যেন সিরিয়ার মুজাহিদীনদের সমর্থনে সাহায্যকারী বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং আপন উপস্থিতি দ্বারা তাদের মনোবল ও শক্তি বৃদ্ধি করেন।

কিন্তু আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রাঃ) এ মতের বিরোধিতা করে বললেন, এই দীনের অনুসারীদেরকে আল্লাহ্ কেন্দ্রের সুরক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ করেছেন। আর যে আল্লাহ্ তাদেরকে এমন কঠিন সময়েও সাহায্য করেছেন যখন তারা ছিল অতি অল্প এবং বিজয় ছিল অকল্পনীয়, তাদেরকে সুরক্ষিত করেছেন যখন তারা ছিল নগণ্য এবং তাদের সুরক্ষা ছিল অসম্ভব। সেই আল্লাহ্ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই।

আপনি যখন এই শত্রুবাহিনীর মোকাবিলায় উপস্থিত হবেন তখন অতি বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি হবে। মুসলমানদের ভূখণ্ডের শেষ সীমানায় গিয়ে তাদের আশ্রয় কেন্দ্র হওয়া আপনার উচিত নয়। কেননা আপনার পরে তাদের আশ্রয় গ্রহণের আর কোনো স্থান থাকবে না। সুতরাং সিরিয়া অভিমুখে একজন অভিজ্ঞ সেনানায়ককে প্রেরণ করুন এবং তাঁর সাথে নিবেদিতপ্রাণ ও পরীক্ষিত যোদ্ধাদের প্রেরণ করুন। অতঃপর আল্লাহ্ যদি বিজয় দান করেন তাহলে তো আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো! আর অন্য কিছু হলে আপনি তখন হবেন মুসলমানদের আশ্রয় ও অবলম্বন।[৮৭]

বায়তুল মুকাদ্দাস সফরের পরামর্শ : খ্রিস্টান শক্তি যখন আবেদন জানাল যে, ওমর (রাঃ) বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে সন্ধিপত্র লিখে দিন। তারা তাঁর হাতেই পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাসের চাবি অর্পণ করবে। এদিকে মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক আবু ওবায়দা (রাঃ) পত্রযোগে আমীরুল মু'মিনীনকে জানালেন যে, তাঁর শুভাগমনের ওপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় নির্ভর করছে। তখন তিনি এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য বিশিষ্ট সাহাবা-কিরামকে একত্র করলেন।

---

৮৭ নাহজুল বালাগা, পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৩

উসমান ইব্‌ন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পরামর্শ ছিল এই যে, (পরাজিত শত্রুর দাবি মেনে) আমীরুল মু'মিনীনের সেখানে গমন করা উচিত হবে না, যাতে তারা অধিক অপদস্থ এবং অধিক শায়েস্তা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বায়তুল মুকাদ্দাস সফরের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন। কেননা এটা ইতিহাসের এমন এক অমর মর্যাদা যা সবসময় সবার ভাগ্যে জোটেনি। তদুপরি এতে মুসলিম বাহিনীও স্বস্তি লাভ করবে। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পরামর্শ পছন্দ করলেন এবং সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ১৬ হিজরির রজব মাসে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খিলাফতের যাবতীয় বিষয়ে স্থলবর্তী করে তিনি সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন।[৮৮]

২. হিজরি বর্ষ গণনার সূচনা

ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব যতদিন পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান থাকবে ততদিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি কীর্তি ও স্মৃতি অমর হয়ে থাকবে। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যামানায় দিন, তারিখ ও বর্ষ গণনার বিষয়ে মানুষের মাঝে মতভেদ দেখা দিল। একদল পারসিকের রাজপরিবারকেন্দ্রিক বর্ষ গণনার অনুরূপ কিংবা রোমকদের বর্ষ গণনার অনুরূপ বর্ষ গণনা শুরু করতে চাইল। অন্য দল বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম লাভ বা নবুয়ত প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে বর্ষ গণনা শুরু করো। কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু পরামর্শ দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্ষ গণনা করা হোক।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবা-কিরাম এ মতামত পছন্দ করলেন এবং হিজরতের ঘটনা থেকে বর্ষ গণনার আদেশ জারি করলেন।[৮৯]

৩. ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক পরবর্তী খলিফাদের মনোনীত তালিকায় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

দ্বিতীয় খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর আয়ু শেষ হয়ে আসছে, তিনি আর বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারবেন না, তখন তিনি নিজের স্থলাভিষিক্ত ও পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। সেজন্য তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তিনি ছয়জন শ্রেষ্ঠ ও নেতৃস্থানীয় সাহাবীর সমন্বয়ে একটি 'মনোনয়ন বোর্ড' নির্বাচন করলেন। অন্যান্যদের ছাড়াও উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমাও এ বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে এ ছয়জনই খিলাফতের জন্য যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

---

৮৮ তারীখে কামিল, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৯-৪০২

৮৯ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৭৫

৪. ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকালে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শোক প্রকাশ

২৩ হিজরির ২৯ যিলহজ তেষট্টি বছর বয়সে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর ওপর হামলা হয়েছিল ২৬ যিলহজ তারিখে অর্থাৎ ঘটনার তিন দিন পর তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন এবং ২৪ হিজরির ১ মুহররম রোজ শনিবার তিনি সমাধিস্থ হয়েছিলেন।

আবু জুহায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জানাযার নিকট ছিলাম। জানাযা চাদরে আচ্ছাদিত ছিল। এমন সময় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত হলেন এবং মুখমণ্ডল হতে কাপড় সরিয়ে একনজর দেখে বললেন, "হে আবু হাফস! আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর তুমি ছাড়া এমন কেউ নেই যার আমলনামা নিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে হাযির হওয়া আমার নিকট অধিকতর প্রিয় হতে পারে।"[৯০]

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত বরণ করার সময় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অস্বাভাবিকভাবে কেঁদেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ওমরের মৃত্যুতেই আমি কাঁদছি। কেননা তাঁর মৃত্যু ইসলামের প্রাসাদে এমন এক ফাটল সৃষ্টি করেছে যা কিয়ামত পর্যন্ত আর মেরামত করা যাবে না।[৯১]

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

১. ফিতনা মোকাবিলায় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

মিশরে একটি দল উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত এবং তাঁর সম্পর্কে অশালীন কথাবার্তা বলত। একদল বিশিষ্ট সাহাবাকে বরখাস্ত করে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য কিংবা অযোগ্য লোকদেরকে প্রশাসনে নিযুক্ত করেছেন বলে তাঁর তীব্র সমালোচনা করত। তাছাড়া আমর ইবনুল আ'স রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্থলে নিযুক্ত আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন আবু সারাহ-এর প্রতিও মিশরবাসী ক্ষুব্ধ ছিল। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সাদ পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ও বারবারীদের এলাকাসহ স্পেন ও আফ্রিকা বিজয়ের কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকার কারণে বিক্ষোভ সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে অমনোযোগী ছিলেন। ইত্যবসরে সাহাবা তনয়দের একটি দল মিশরে আত্মপ্রকাশ করল যাঁরা মানুষকে তাঁর বিরোধিতার জন্য ঐক্যবদ্ধ ও প্ররোচিত করতে লাগলেন। এ বিষয়ে মুহাম্মদ ইব্‌ন আবু বকর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন হোযায়ফা ছিলেন সর্বাধিক তৎপর। অবশেষে তাঁরা ছয়'শ সওয়ারের একটি দলকে রজব মাসে

---

৯০ মুসনাদে আহমাদ ও মুসনাদে আলী ইব্‌ন আবু তালিব

৯১ আল-ফুতুহাতুল ইসলামিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪২৯

উমরার বেশে মদিনার উদ্দেশে রওয়ানা করিয়ে দিলেন যাতে তারা উসমান-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এদিকে আব্দুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ (সরকারি পত্রযোগে) উসমানকে জানিয়েছিলেন যে, এ সমস্ত লোক তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে উমরার বেশে মদিনায় এসেছে।

তারা যখন মদিনার নিকটবর্তী হলো তখন উসমান আলীকে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি মদিনায় প্রবেশ করার পূর্বেই তাদেরকে বুঝিয়ে নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এমনও কথিত আছে; বরং উসমান বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এ দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তখন আলী নিজেকে পেশ করলেন। উসমান তাঁকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। বিশিষ্ট লোকদের একটি জামাতও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল। আলী জুহফা এলাকায় তাদের সাথে মিলিত হলেন। তারা তাঁকে অতিমাত্রায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। তিনি তাদেরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে ফিরিয়ে দিলেন। তখন তারা আত্মতিরস্কার করে বলতে লাগল, এই ব্যক্তির জন্য তোমরা আমিরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছ এবং তার বিরুদ্ধে এর নাম ব্যবহার করছ (অথচ ইনি তা থেকে মুক্ত)।

আলী তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের অসন্তোষের কারণ কী? তখন তারা কিছু কিছু বিষয় উল্লেখ করল আর তিনি উসমান-এর পক্ষ হতে কৈফিয়তমূলক উত্তর দিলেন। তাদেরকে আপন সম্প্রদায়ের নিকট ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে তারা বিফলমনোরথ হয়ে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেল। তাদের আশা ও উদ্দেশ্য বিন্দুমাত্র পূরণ হলো না।

আলী ফিরে এসে উসমানকে তাদের চলে যাওয়ার সংবাদ দিলেন এবং তাঁকে কিছু পরামর্শ দিলেন। উসমান তাঁর আন্তরিক পরামর্শ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করলেন এবং অম্লান বদনে মেনে নিলেন।

২. উসমানকে রক্ষায় আলী-এর প্রশংসনীয় ভূমিকা

বিদ্রোহীরা উসমানকে আপন বাসগৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল এবং কঠোর অবরোধ আরোপ করে তাঁর জীবনধারণ দুর্বিষহ করে ফেলল। সাহাবা কিরামের অনেকেই স্ব স্ব গৃহে বসে গেলেন। হাসান-হুসাইন, আব্দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র ও আব্দুল্লাহ ইব্‌ন ওমর-সহ সাহাবা-তনয়গণের একটি দল তাঁদের পিতাগণের নির্দেশে উসমান-এর বাসগৃহে পৌছে গেলেন। বিদ্রোহীদেরকে তাঁরা তাঁর পক্ষ হতে বোঝাতে চেষ্টা করলেন এবং প্রাণপণ সংগ্রামে নিয়োজিত হলেন যাতে কেউ তাঁর নিকটেও পৌছতে না পারে।

এভাবে উসমান মসজিদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। আর এ অবরোধ যিলকদ মাসের শেষ ভাগ হতে যিলহজ মাসের আঠারো তারিখ রোজ শুক্রবার

পর্যন্ত অব্যাহত থাকল। এর একদিন পূর্বে উসমান বাসগৃহে তাঁর নিকট উপস্থিত প্রায় সাত শত আনসার-মুহাজিরকে লক্ষ করে বললেন, তাঁদের মাঝে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন ওমর, আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র, হাসান-হুসাইন ও আবু হুরায়রা তাঁর একদল আযাদকৃত গোলামসহ উপস্থিত ছিলেন। উসমান তাঁদেরকে সুযোগ দান করলে অবশ্যই তাঁরা তাঁকে রক্ষা করতে সক্ষম হতেন। কিন্তু তিনি তাঁদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বললেন, যাদের ওপর আমার কোনো-না-কোনো হক রয়েছে তাঁদেরকে আমি শপথ দিয়ে বলছি, তারা যেন নিজেদের হাত গুটিয়ে রাখে এবং নিজ নিজ গৃহে ফিরে যায়, অথচ তখনও তাঁর নিকট বিশিষ্ট সাহাবা ও তাঁদের পুত্রদের এক বিরাট জামাত উপস্থিত ছিল, এমনকি উসমান আপন গোলামদের উদ্দেশ্যে বললেন, যে তার তলোয়ার খাপবদ্ধ রাখবে সে স্বাধীন। বর্ণিত আছে, উসমান এভাবে চলে যাওয়ার কসম দেওয়ার পর সর্বশেষে যিনি উসমান-এর বাসগৃহ ত্যাগ করেছেন তিনি হলেন হাসান ইব্ন আলী।[৯২]

আলী তাঁর পক্ষে অস্ত্র ধারণ করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তখন উসমান বললেন, যে কেউ তার ওপর আল্লাহ্র হক রয়েছে বলে মনে করে এবং তার ওপর আমার হকও স্বীকার করে তাকে আমি আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলি, আমার জন্য যেন নিজের কিংবা অন্যের এক ফোঁটা রক্তও প্রবাহিত না করে। আলী পুনঃআবেদন জানালে তিনি একই জবাব দিলেন। অতঃপর নামাযের সময় আলী মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন লোকেরা বলল, হে আবুল হাসান! অগ্রসর হোন এবং নামায পড়ান। আলী বললেন, ইমাম অবরুদ্ধ অবস্থায় আমি তোমাদের নামায পড়াতে পারি না; বরং আমি একা নামায পড়ব। অতঃপর তিনি একা একা নামায পড়ে ঘরে ফিরে গেলেন।[৯৩]

এদিকে উসমান-এর সংকটাবস্থা চরমে পৌছল এবং সঞ্চিত পানি ফুরিয়ে গেল। তিনি মুসলমানদের নিকট পানির ফরিয়াদ জানালেন। তখন আলী স্বয়ং পানির মশক নিয়ে উটে সওয়ার হলেন এবং অনেক চেষ্টার পর তাঁর নিকট পানির মশকগুলো পৌছালেন।

অবশেষে শত্রুরা উসমানকে আক্রমণ করল। সে সময় বাসগৃহের কতিপয় লোক শহীদ হলেন, সেই পাপাচারীদের কতিপয় লোকও নিহত হলো। আব্দুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র ক্ষত-বিক্ষত হলেন এবং হাসান ইব্ন আলী-ও আহত হন।

---

৯২ ইব্ন কাছীর, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮১

৯৩ উসমান ইব্ন আফ্ফান যুন্নুরাইন, পৃষ্ঠা ২১৮-২১৯

আনসাবুল আশরাফ গ্রন্থে বালাযুরী লিখেছেন, দুষ্কৃতকারীরা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ করে তীর বর্ষণ করল, এমনকি হাসান ইব্ন আলী ও দোরগোড়ায় রক্তাক্ত হয়ে গেলেন এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-র মুক্ত দাস কানবারও মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন।

আবু মুহাম্মদ আল-আনসারী বলেন, আমি উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর বাসভবনে অবরুদ্ধ অবস্থায় দেখেছি। হাসান ইব্ন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে রক্ষার জন্য লড়াই করছিলেন। শেষে তিনি আহত হন। যারা তাঁকে আহত অবস্থায় বহন করে নিয়ে গিয়ে ছিল আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।[৯৪]

দুষ্কৃতকারীরা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-র নিকট খিলাফত পরিত্যাগের দাবি জানাল। কিন্তু তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন, এটা তোমাদের বিষয়। সুতরাং তোমরা যাকে ইচ্ছা নির্বাচন করো। কিন্তু তাদের কথামতো দায়িত্ব পরিত্যাগ করা, সে অসম্ভব। কেননা আল্লাহ্ আমাকে যে পোশাক পরিধান করিয়েছেন তা আমি নিজে খুলে ফেলতে পারি না।[৯৫]

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এ সিদ্ধান্ত ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একটি উপদেশের আলোকে। কেননা তিরমিযি শরীফে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

يَا عُثْمَانُ اَنَّهُ لَعَلَّ اللّٰهُ يُقَمِّصُكَ قَمِيْصًا فَاِنْ اَرَادُوْكَ عَلٰى خَلْعِهٖ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ

"হে উসমান! আল্লাহ তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবেন। লোকেরা যদি তোমাকে তা খুলে ফেলতে চাপ দেয় তবে তুমি তা খুলো না।"

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী নায়েলা বলেন, অবরোধকালে যেদিন তাঁকে শহীদ করা হয় সেদিন তিনি রোযাদার ছিলেন।[৯৬]

নাফে (র) ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, ভোরে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের নিকট বর্ণনা করছিলেন, আমি স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দর্শন লাভ করেছি। তিনি আমাকে বলেছেন, হে উসমান! আমাদের কাছে এসে ইফতার করো। তাই তিনি ভোর থেকে রোযা রাখলেন এবং সেদিনই শহীদ হন (পূর্বোক্ত বরাত)। তাঁর

---

৯৪ আনসাবুল আশরাফ, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯২-৯৫

৯৫ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা -১৮৪

৯৬ বিদায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৩

৩. উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকালে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শোক প্রকাশ

খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্মান্তিক শাহাদাত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং অন্যান্য সাহাবীর হৃদয়ে আঘাত করেছিল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়ির চারদিকে পাহারা দিচ্ছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা অন্যদিক থেকে দেওয়াল টপকিয়ে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে প্রবেশ করে এবং নির্মমভাবে তাকে শহিদ করে।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের খবর যখন পৌছাল তখন সাহাবীরা অনেকেই মসজিদে অবস্থান করছিলেন। দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পুত্রদের নিকট জানতে চাইলেন তোমরা দরজায় পাহারারত থাকা অবস্থায় এটা কীভাবে ঘটল? রাগান্বিত হয়ে তিনি পুত্র হাসানের গালে একটা থাপ্পড় মেরে দেন। হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদ্রোহীদের দ্বারা আহত হয়েছিলেন এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বুকেও বিদ্রোহীরা আঘাত করে।

তারপর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে চলে গেলেন। চিৎকার করে বলেন– হে আল্লাহ! আমি নিজেকে নির্দোষ হিসেবে ঘোষণা করছি। তার শাহাদাতের ব্যাপারে আমার কোনো অংশগ্রহণ নেই এবং কোনোভাবেই আমি এটা সমর্থন করতে পারি না।

৯৭ পূর্বোক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৪-১৮৫

অধ্যায়-৫

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খিলাফতকাল

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি আনুগত্যের শপথ

খলিফা উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩৫ হিজরি ১৮ যিলহজ/৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে একদল দুর্বৃত্তের হাতে শাহাদাতবরণ করেন। বিভিন্ন অঞ্চল এবং উপজাতির সমন্বয়ে গঠিত দুর্বৃত্তের এ দলটি মদিনায় এসেছিল। ইসলামের প্রতি কোনো প্রকার আত্মত্যাগের মনমানসিকতা তাদের ছিল না। এ পৃথিবীতে কোনো কল্যাণ সাধিত হোক এটাও তারা চাইত না। শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অন্যায়ভাবে এবং কোনো বিচার-বিবেচনা ছাড়াই তারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নির্মমভাবে হত্যা করে।

যে সকল নেতৃস্থানীয় সাহাবী মদিনায় উপস্থিত ছিলেন তারা পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য সমবেত হন। সকল সাহাবী সর্বসম্মতভাবে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ঐ সময় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চেয়ে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। তাই তারা নতুন খলিফা হিসেবে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হতে আগ্রহী ছিলেন না। শুধু মদিনায় উপস্থিত সাহাবীদের জোর অনুরোধে তিনি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হতে সম্মত হন। কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, এ মুহূর্তে যদি তিনি খিলাফতের হাল না ধরেন তাহলে বিপর্যয় আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তা দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়বে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কয়েকজন সাহাবী আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন– বিশ্বাসীদের নেতা শহিদ হয়েছেন। আর তাই জনগণের একজন খলিফা নিয়োগ করা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু আমরা আপনাকে ছাড়া অন্য কোনো যোগ্য, বয়োজ্যেষ্ঠ অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকতর নিকটস্থ কাউকে দেখি না।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইতস্তত বোধ করে বললেন- না এটা করো না; বরং আমি নেতা হওয়া থেকে তোমাদের উপদেষ্টা হওয়াই ভালো মনে করি। সাহাবীরা অনুরোধ করে বললেন- না, না, আল্লাহর শপথ! আমরা আপনার নিকট আনুগত্যের বায়আত না নেওয়া পর্যন্ত কোনোকিছুই করব না।

আলী উত্তরে বললেন, তাহলে গোপনে বায়আত গ্রহণ করা উচিত নয়; বরং মুসলমানদের সম্মতিক্রমেই বায়আত হওয়া উচিত।

যখন আলী মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন মুহাজির ও আনসার সাহাবী সকলেই সমবেত হলেন এবং তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ নিলেন। তারপর অবশিষ্ট লোকেরা শপথ নিলেন।

উসমান -এর অবরোধকালে তিনি সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে তাকে রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন; এজন্যে তিনি কখনো খলিফা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন না। যদিও তিনি সবচেয়ে বেশি যোগ্য ছিলেন। পরামর্শ সভার সদস্য, বিশিষ্ট সাহাবীরাসহ মুহাজির ও আনসাররা সকলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে, পরবর্তী খলিফা হওয়ার জন্য আলী সবচেয়ে বেশি যোগ্য। তাঁরা তাঁর নিকট গিয়ে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করার জন্য পীড়াপীড়ি করলে শেষ পর্যন্ত তিনি দয়া করে সম্মত হন।

শুধু একারণেই তিনি আনুগত্যের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন যে, তিনি উপলব্ধি করলেন- মূলত ঐ সময়ের অবস্থাটাই তাঁকে বাধ্য করেছিল এবং মুসলিম উম্মাহকে মহাবিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

ঐ সময়ে খিলাফত লাভের জন্য অবশ্যই আলী ছিলেন সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত এবং যোগ্য ব্যক্তি।

প্রকৃতপক্ষে জনগণ যদি খুব দ্রুত তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ না নিতেন, তাহলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও ভাঙন দেখা দিত। আলী -এর পক্ষেও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় বলে মনে করা হতো।

মদিনায় উপস্থিত একজন সাহাবীও তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ নেওয়া থেকে বিরত থাকেন নি; বরং সকল সাহাবী মিলে খলিফা নির্বাচন করেন।

যোগ্য চার খলিফা হলেন আবু বকর , ওমর উসমান ও সর্বশেষ আলী ইবনে আবু তালিব । তাঁদের খলিফা হওয়ার পেছনে শুধু সাহাবীদের পক্ষ থেকেই স্বীকৃতি তাই নয়; বরং স্বয়ং মুহাম্মদ কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

এখানে যে বিষয়টি জেনে রাখার উচিত তা হলো, আলী খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন জাতির সাধারণ সম্মতিক্রমে এবং সকল সাহাবীর ঐকমত্যের ভিত্তিতে।

উসমান -এর মৃত্যুর পর আলী ছিলেন খলিফা পদের জন্য একমাত্র যোগ্য এবং পছন্দীয় ব্যক্তি। কারণ তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী ও

হিজরতকারীদের মধ্যে একজন। তিনি যুদ্ধের ময়দানে দৃষ্টান্তমূলক সাহস ও বীরত্ব দেখিয়েছেন এবং প্রতিক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

বিচারিক ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবচেয়ে জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় তিনি ছিলেন সবচেয়ে যোগ্য। সত্যকে আঁকড়িয়ে ধরার জন্য তিনি ছিলেন অবিচল।

ইতিহাসের ঐ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এসব বৈশিষ্ট্যই আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে উপযুক্ত বানিয়ে ছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মসজিদে প্রবেশ করে মিম্বরে আরোহণ করলেন। তাঁর পরিধানে ছিল বড় তহবন্দ ও রেশমি পাগড়ি। জুতো জোড়া ছিল তাঁর হাতে, আপন ধনুকের ওপর ভর দিয়ে তিনি দাঁড়ানো ছিলেন। তখন সর্বস্তরের জনসাধারণ তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করল। সেদিন ছিল পঁয়ত্রিশ হিজরির যিলহজ মাসের উনিশ তারিখ রোজ শনিবার।[৯৮]

খিলাফত গ্রহণের পর আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর প্রথম খুতবা

পরবর্তী জুমার দিন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিম্বরে আরোহণ করলেন। যারা ইতঃপূর্বে বায়'আত হয়নি তারা বায়আত গ্রহণ করল। এই বায়আত অনুষ্ঠিত হয়েছিল যিলহজ মাসের পঁচিশ তারিখে।

প্রথম খুতবায় তিনি আল্লাহ্‌র হামদ ছানা ও প্রশংসা বর্ণনার পর বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা পথ প্রদর্শক এক কিতাব নাযিল করেছেন যাতে ভালো ও মন্দ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তোমরা যা ভালো তা গ্রহণ কর এবং যা মন্দ তা পরিহার কর।

আল্লাহ্ তা'আলা অনেক কিছু হারাম করেছেন। তন্মধ্যে মুসলমানের (জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু) হুরমতকে সকল হুরমতের ওপর অগ্রাধিকার দান করেছেন এবং ইখলাস ও তাওহীদের বন্ধন দ্বারা মুসলমানদের হকসমূহকে সুদৃঢ় করেছেন।

পূর্ণ মুসলমান সেই ব্যক্তি যার হাত ও মুখ থেকে অন্য সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে, তবে হক ও সত্যের খাতিরে হলে ভিন্ন কথা। কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া কোনো মুসলমানের জন্য হালাল নয়, তবে শরীয়তের বিষয় হলে ভিন্ন কথা।

---

৯৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৬-২২৭

বিশিষ্ট- সাধারণ সকল মানুষের যাবতীয় বিষয়ের প্রতি সত্বর যত্ন লও। কেননা পূর্বসূরিগণ তোমাদের সম্মুখে আর সেই মহামুহূর্ত তোমাদের হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে। সুতরাং দ্রুত ধাবিত হও, তাহলে (তাদের সঙ্গে) যুক্ত হতে পারবে। কেননা আখিরাত মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে।

আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র বান্দাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কেননা তোমাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে, এমনকি পশু-প্রাণী সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে।

অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর তার নাফরমানি কর না। যদি কল্যাণ ও ভালো কিছু দেখ তবে তা গ্রহণ কর আর যদি অকল্যাণ ও মন্দ কিছু দেখ তবে বর্জন কর।

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

“ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর যখন পৃথিবীতে তোমরা (সংখ্যায়) অল্প ও (শক্তিতে) দুর্বল ছিলে এবং এ আশঙ্কা করছিলে যে, লোকেরা তোমাদেরকে থাবা মেরে নিয়ে যাবে। তখন তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দান করেছেন এবং আপন সাহায্য দ্বারা তোমাদের শক্তি যুগিয়েছেন এবং উত্তম খাদ্য দ্বারা তোমাদের রিযিক দান করেছেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।”[৯৯]

বলাবাহুল্য, আমীরুল মু'মিনীনের এ খুতবা ছিল পূর্ণ স্থান-কাল উপযোগী। ঠিক সংবেদনশীল স্থানটিতেই তিনি আঘাত করেছিলেন এবং মূল ব্যাধিস্থলটিতেই অঙ্গুলি স্থাপন করেছিলেন। কেননা ইতিহাসের সেই ক্রান্তিকালে মুসলিম উম্মাহ সবচেয়ে ভয়াবহ যে ব্যাধির শিকার হয়েছিল তাহলো মুসলমানের জান-মাল ও আবরু-ইজ্জতের অসম্মান ও নিরাপত্তাহীনতা। খলিফাতুল মুসলিমীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এই মহাফিতনারই লক্ষ্যস্থল হয়েছিলেন এবং তা রাসূলের শহরে, তাঁর মসজিদ ও রওযার পার্শ্বে মানুষের চোখের সামনেই ঘটেছিল। সুতরাং মুসলমানদের শাসনভার লাভকারী খলিফার অবশ্য কর্তব্য ছিল মুসলমানের সম্মান রক্ষা করা এবং এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌কে ভয় করা। আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র বান্দাদের ব্যাপারে। এমনকি পশু-পাখিদের ব্যাপারেও আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত করার জন্য সকল প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করা।

---

৯৯ সূরা আনফাল : ২৬

তদুপরি অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও হিকমতের সঙ্গে মানুষকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, নতুন খিলাফতকে কোনো নীতি ও কর্মপন্থার মাধ্যমে বরণ করতে হবে। তাই তিনি বললেন, কল্যাণ ও ভালো কিছু দেখতে পেলে তা তোমরা গ্রহণ কর আর অকল্যাণ ও মন্দ কিছু দেখতে পেলে তা বর্জন কর।

অতঃপর তিনি واذكروا اذا انتم আয়াত দ্বারা তাঁর বক্তব্যের ইতি টানলেন। কেননা এ আয়াতটির মর্মবাণী মানুষের অন্তরে তখন জাগরূক থাকার প্রয়োজন ছিল যাতে মানুষ নিজেদের ইসলাম-পূর্ব ও ইসলাম-পরবর্তী জীবনের মাঝের বিরাট পার্থক্য তুলনা করে বুঝতে পারে। কেননা এক সময় সংখ্যাল্পতা, শক্তিহীনতা, অখ্যাতি ও যিল্লতির এমন স্তরে তাদের অবস্থান ছিল, যেন এক টুকরো গোশত, যা যেকোনো সময় পাখি থাবা মেরে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তীতে এমন সংখ্যা, শক্তি, বিস্তার, ব্যাপ্তি, শান্তি-সমৃদ্ধি, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সম্পদ-প্রাচুর্য তারা লাভ করল যে, চারদিকে তাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হলো এবং বহু দেশ, বহু জাতি তাদের অনুগত হলো।[১০০]

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সময়ে সমস্যাসমূহ

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা হওয়ার পর নানা সমস্যার সম্মুখীন হলেন। এ সমস্ত সমস্যার মধ্যে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের রদবদল এবং উমাইয়াগণ কর্তৃক অন্যায়ভাবে দখলকৃত জায়গির ও ভূসম্পত্তি সরকারের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি উল্লেখযোগ্য।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারীদের শাস্তিদানের দাবি : উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে আরবের সর্বত্র খলিফার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের আওয়াজ উঠে। তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যাকারীদের শাস্তি বিধানের জন্য খলিফা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অনুরোধ জানান। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-ও উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে তৎক্ষণাৎ হত্যাকারীদের শনাক্ত করে শাস্তি প্রদান করা সহজ ছিল না। অধিকন্তু খিলাফতের এ সংকটময় পরিস্থিতিতে হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদান করা হলে খিলাফতের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে মনে করে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জানালেন যে, রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

---

১০০ সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবন ও খিলাফত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

বস্তুতপক্ষে খলিফা উসমান -এর হত্যাকাণ্ড কেবল কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের কার্য ছিল না যে, সহজেই তাদের শনাক্ত করে শাস্তি বিধান করা যাবে। তিনটি কেন্দ্রের বহুসংখ্যক লোক এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। প্রকৃত অর্থে উসমান -এর হত্যাকারীদের শাস্তির বিধান নিশ্চিত করার কাজটি সহজ ছিল না, কারণ-

প্রথমত হত্যাকারীদের কেউ চিনতে পারেনি। তার স্ত্রী নায়েলা হত্যাকারীদের দেখেছিলেন কিন্তু চিনতে পারেননি।

দ্বিতীয়ত মদিনা তখনও বিদ্রোহীদের কব্জায়। তারা আলী -এর সেনাবাহিনীর ভিতরে ঢুকে যায়।

কিন্তু আলী -এর এ অসহায় অবস্থা তৎকালীন অনেক মুসলমান উপলব্ধি করেননি। তারা তৎক্ষণাৎ উসমান হত্যার বিচার দাবি করেন। অপরদিকে আলী ও উসমান হত্যার বিচার চান, কিন্তু রাষ্ট্রের এ অবস্থায় বিচার করা বা শাস্তি দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এ অবস্থায় বিচার করলে মদিনায় বিদ্রোহীদের পুনরায় উৎপাত এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিনষ্ট হবে। তাই তিনি এ অবস্থায় বিচার থেকে বিরত থাকলেন।

আলী উসমান হত্যার সঠিক বিচার করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেছেন যে, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটু শান্ত হোক; সরকারিভাবে আমাদের সেনাবাহিনী আর একটু শক্তি অর্জন করুক। তারপর এ বিচার কাজ শুরু করা হবে। কিন্তু মুসলমানরা তাঁর এ প্রতিশ্রুতি বুঝতে পারেন নি। তারা তাৎক্ষণিক বিচার দাবি করেন।

প্রকৃতপক্ষে একটি বিচার কাজ করার আগে সত্যিকার অপরাধীকে শনাক্ত করা খুবই প্রয়োজন। অথচ কেউ হত্যাকারীকে চিনতে পারেনি। অপরদিকে বিদ্রোহীরা তখনও মদিনা ছেড়ে যায়নি। এটি কীভাবে সম্ভব যে, আলী কোনোরূপ বিচার-বিবেচনা ছাড়াই এই হত্যার শাস্তি বাস্তবায়ন করবেন। কিন্তু উসমান –এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকে কেন্দ্র করেই শেষ পর্যন্ত সিরিয়ার শাসনকর্তা আমিরে মুয়াবিয়ার সাথে আলী এর ঘোরতর মতানৈক্য দেখা দেয়। এ মতানৈক্যই পরে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের পরিবর্তন : আরবের রাজনৈতিক অঙ্গনের এরূপ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে আলী প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের রদবদল করতে মনস্থ করলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ ব্যবস্থায় বিদ্রোহীরা শাসনকর্তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং রাজ্যে শান্তি ফিরে আসবে। আলীর বন্ধুদের অনেকেই অন্তত আমিরে মুয়াবিয়াকে সিরিয়ার শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ না করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কেননা খলিফা ওমর এর আমল থেকে তিনি এ

পদে বহাল রয়েছেন। শাসক হিসেবেও তিনি বিচক্ষণ ও যোগ্য ছিলেন। অতএব, আলী তাঁর সাথে সদ্ভাব ও সৌহার্দ রক্ষা করে চললে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিতেন। ঐতিহাসিক মুইর বলেন, "খলিফার ঘাতকের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সিরিয়াবাসীকে কাজে লাগালে এবং গোষ্ঠীসমূহের ধূমায়মান বিদ্রোহ দমন করলেই আলী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেন। এভাবে তিনি মুয়াবিয়ার আকাঙ্ক্ষা বিনাশ করে উমাইয়াদের ক্ষমতা লাভের পথ রুদ্ধ করতে পারতেন।" কিন্তু আলী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তিনি কুফা, বসরা, মিশর ও সিরিয়ার শাসনকর্তাকে পদত্যাগের নির্দেশ দিলেন। উসমান বিন হানিফকে তিনি বসরায় আব্দুল্লাহ ইবনে আমিরের স্থলাভিষিক্ত করলেন। আব্দুল্লাহ বিন সাদের স্থলে কায়েস বিন সা'কে মিশরে নিয়োগ করলেন। কুফা ও সিরিয়ার শাসনকর্তাগণকেও পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হলো। কুফার শাসনকর্তা আবু মূসা পদত্যাগ করতে রাজি হলেন। কিন্তু সিরিয়ার শাসনকর্তা আমিরে মুয়াবিয়া খলিফার নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলেন। ফলে আলী ও আমিরে মুয়াবিয়ার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলো।

উমাইয়াদের স্বার্থহানি : আলী উমাইয়াগণ কর্তৃক অন্যায়ভাবে দখলকৃত সরকারি ভূ-সম্পত্তি সরকারের নিকট প্রত্যার্পণের নির্দেশ দেন। এর ফলে সিরিয়ার গভর্নর আমিরে মুয়াবিয়া ও অন্যান্য স্বার্থান্বেষী উমাইয়াদের স্বার্থহানি ঘটে। সুতরাং তারা খলিফার বিরুদ্ধাচরণ শুধু করে।

উষ্ট্রের যুদ্ধ

ইসলামের ইতিহাসের এক বেদনাদায়ক ঘটনা হলো উষ্ট্রের যুদ্ধ। মুসলমানগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার দৃষ্টান্ত উষ্ট্রের যুদ্ধেই প্রথমবার হলো। আত্মঘাতী যুদ্ধের এটাই শেষ নয়, আরম্ভ মাত্র। এরূপ রক্তক্ষয়ী অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ইসলামের ভিত্তিমূল ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

উষ্ট্রের যুদ্ধের কারণ

উসমান এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি : আলী কে খলিফা হিসেবে মেনে নিলেও তালহা ও জুবাই -এর দাবি ছিল যে, খলিফা তাৎক্ষণিকভাবে হযরত উসমান -এর হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদান করবেন। খলিফা এ ব্যাপারে তাদের আশ্বস্তও করেছিলেন। কিন্তু হযরত উসমান -এর হত্যা কোনো ব্যক্তিবিশেষের কাজ ছিল না। এর সাথে কুফা, বসরা ও মিশরের অনেক লোক জড়িত ছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদেরকে শনাক্ত করা সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া তখনকার পরিস্থিতি এমনিতেই ছিল জটিল ও সংকটময়। এ সম্পর্কে আল্লামা

ইবনে কাছীর বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বায়আত যখন সম্পন্ন হয় তখন তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যার বিচার দাবী ও কিসাস গ্রহণের দাবি জানান। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই বলে অপারগতা প্রকাশ করেন যে, এরা যথেষ্ট লোকবলের অধিকারী। ফলে এই মুহূর্তে তার পক্ষে তা সম্ভব নয়।[১০১] এতে হযরত তালহা ও হযরত জুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি মনোক্ষুণ্ন হন।

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর অসন্তুষ্টি : মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শত্রুগণও মুনাফেক প্রকৃতির দুই-একজন মুসলমান যখন হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর পূত-পবিত্র চরিত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করেছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পরামর্শ চাইলেন। তিনি হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এর দাসীকে জিজ্ঞেস করার জন্য আল্লাহর রাসূলকে পরামর্শ দেন। অবশেষে ওহী নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর চরিত্র সম্পর্কে জানিয়ে দেন। তখন থেকে হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন।

হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত উসমান হত্যার সময় মদিনায় ছিলেন না। তিনি হজ করতে মক্কায় গিয়েছিলেন। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত উসমান হত্যার খবর জানতে পারলেন এবং শুনলেন যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত উসমান হত্যার বিচার করতে রাজি নন। এমন বেদনাদায়ক খবর শুনে হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা দাবি করেন যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে অবশ্যই এখনই হযরত উসমান হত্যাকারীদেরকে শাস্তি দিতে হবে। হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর এ দাবির পক্ষে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ ও জোবায়ের ইবনে আউয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহুসহ বিশিষ্ট সাহাবীরাও মত দেন। তিনি মক্কার সাহাবীদেরকে বললেন, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মজলুম অবস্থায় শহিদ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও বিদ্রোহীদের শক্তি হ্রাস পাচ্ছে না। তোমরা মজলুম খলিফার রক্ত বৃথা যেতে দিও না। হত্যাকারীদের কাছ থেকে কিসাস নিয়ে ইসলামের মর্যাদা রক্ষা কর।

এদিকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু গভর্নরদের রদবদল করেন, ফলে হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর বিরুদ্ধে কিছুটা সন্দেহ করছিলেন। মক্কায় হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর এই আদেশ খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। আব্দুল্লাহ ইবনে হাযরামী, মারওয়ান ইবনুল হাকাম, সাঈদ ইবনুল আস ও উমাইয়া বংশের যারা মদিনা থেকে পলায়ন করে মক্কায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তারা এ আন্দোলনকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে বেগবান করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা একটি বিরাট দল গঠন করে রওয়ানা হলেন।

---

১০১ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ৭, পৃ. ২২৮।

তাদের উদ্দেশ্য ছিল বায়তুল মাল দখল করে অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন। অতঃপর বসরা, কুফা ও ইরাকের অন্য উপনিবেশগুলোর মধ্যে এ আন্দোলনের প্রসার ঘটিয়ে জনতাকে সংঘবদ্ধ করা।

হযরত আলী -এর ইরাক সফর এবং তালহা ও যুবায়ের -এর বসরা গমন : হযরত আলী হযরত আয়িশা -এর প্রস্তুতি শুনে বায়তুল মাল সংরক্ষণ ও ইরাকবাসীকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে বিরোধীদের পূর্বে সেখানে পৌছার জন্য ইরাক সফরের সংকল্প করলেন। আনসার সাহাবীরা হযরত আলী -এর এ সিদ্ধান্তের কথা শুনে বললেন, রাজধানী ছেড়ে যাওয়া কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়। হযরত ওমর -এর শাসনামলে বড় বড় অনেক যুদ্ধ হয়েছে; কিন্তু তিনি কখনো মদিনার বাইরে যাননি। তখন যদি খলিফার নির্দেশনামতে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, আবু উবাইদা, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও আবু মূসা আশআরী বিজয়ী হতে পারে। আজও আমাদের মধ্যে বীর সেনানীর অভাব নেই, যারা আপনার নির্দেশনা অনুসারে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারে। তাই মদিনা ছেড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু হযরত আলী বললেন, আমাদেরকে ইরাকের বায়তুল মাল রক্ষার্থে সেখানে যেতেই হবে। হযরত আলী ইরাকের উদ্দেশে রওয়ানা করলেন, মদিনার প্রায় সকল বিখ্যাত সাহাবীই হযরত আলী -এর সাথে ইরাকে যাত্রা করেন। কিন্তু হযরত আলী -এর ইরাক আগমনের পূর্বেই হযরত তালহা ও যুবায়ের বসরায় অবতীর্ণ হন এবং লোকদের উসমান হত্যার বিচারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন।

উষ্ট্রের যুদ্ধের ঘটনা

হযরত তালহা , হযরত যুবায়ের ও হযরত আয়িশা হযরত আলীর প্রতি আনুগত্যের শপথ থেকে বিস্মৃত হয়ে একটি জোট গঠন করেন। শীঘ্রই তাঁরা মক্কা, মদিনা ও ইরাক থেকে তিন সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করে বসরা আক্রমণ করেন। হযরত আয়িশা এর উপস্থিতিতে অধিকাংশ বসরাবাসী হযরত আলীর পক্ষ ত্যাগ করে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করে। বসরার শাসনকর্তা উসমান বিন হানিফ ত্রিশক্তির মোকাবিলা করে পরাজিত ও ধৃত হন। বিজয়ী বাহিনী হযরত উসমান -এর হত্যার সাথে জড়িত কতিপয় দুষ্কৃতকারীকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

হযরত আয়িশা -এর আগমনের খবর হযরত আলী -এর নিকট পৌছালে তিনি অনেক বেশি কষ্ট পান। তিনি মদিনা থেকে ৭০০ জনের এক বাহিনী পাঠান এবং ইমাম হাসান কুফা থেকে ৯০০০ জনের অস্ত্রসজ্জিত বাহিনী হযরত

আলী -এর পক্ষে বসরার উদ্দেশে রওয়ানা হয়। এদিকে বসরায় মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠল।

শান্তি আলোচনা

ইতোমধ্যে হযরত আলী বসরার উদ্ভূত পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য আমিরে মুয়াবিয়ার বিরুদ্ধে সিরিয়ায় অগ্রসর না হয়ে কুফার পথে বসরার দিকে রওয়ানা হলেন। কুফার শাসনকর্তা হযরত আবু মূসা আল-আশয়ারী বসরা আক্রমণে খলিফাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃত হলে তিনি পদচ্যুত হলেন। কিন্তু কুফার সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ দমনে খলিফার বাহিনীর সাথে মিলিত হলো। ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে হযরত আলী সৈন্য সমভিব্যাবহারে বসরায় উপস্থিত হন। স্বভাব-সুলভভাবে তিনি বিদ্রোহীদেরকে আত্মকলহ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য শান্তিপূর্ণ আলোচনার প্রস্তাব দেন। হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের শান্তি প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

বস্তুত হযরত আলী ও হযরত আয়িশা কেউই যুদ্ধ চাচ্ছিলেন না; তাঁরা চান একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান। কয়েকদিন যাবত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো যে, খলিফা প্রাথমিক বিপর্যয়গুলো কাটিয়ে ওঠে অনতিবিলম্বে হযরত উসমান -এর হত্যার সাথে জড়িত অপরাধীদের সমুচিত শাস্তির বিধান করবেন।

যুদ্ধের সূচনা

উভয় পক্ষ যুদ্ধের চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে শান্তিতে রাতযাপন করছিলেন। কিন্তু সাবেয়ী ও হযরত উসমান -এর হত্যাকারীরা ভাবলো সমঝোতা হলেই তো তাদের সর্বনাশ। তখন খলিফা উসমান -এর হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট কুফা, বসরা ও মিশরীয় বিদ্রোহিগণ উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তারা যেকোনো চক্রান্ত দ্বারা শান্তি আলোচনা বানচাল করতে বদ্ধপরিকর হলো।

সাবেয়ী ও উসমান হত্যাকারীরা রাতের আঁধারে হযরত আয়িশা -এর সৈন্যবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাল। এদিকে পাশাপাশি অবস্থান করা দুটি সৈন্যদল একটি আরেকটিকে প্রতারক ভাবে এবং বেঁধে যায় তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। হিজরি ৩৬ সনের জমাদিউস সানী মাসে এ যুদ্ধ হয়।[১০২]

যখন উষ্ট্রের যুদ্ধ শুরু হলো তখন হযরত আলী -এর সেনাবাহিনীতে ১২ হাজার সেনা ছিল।

---

১০২ সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, হযরত আলী জীবন ও খিলাফত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

রাতের অন্ধকারে আশতার, নাখয়ী ইবন সাওদা প্রমুখ বিদ্রোহী নেতা নগরের উপকণ্ঠে কোরায়বা নামক স্থানে উভয়পক্ষের শিবির আক্রমণ করল। তাই প্রকৃতপক্ষে কোনো পক্ষই জানার সুযোগ পেল না যে, কারা প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করেছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এটাই প্রথম যুদ্ধ। উভয় পক্ষই যুদ্ধে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়ল।

যুদ্ধের মূল কারণ জানতে পেরে হযরত আয়িশা তাঁর সেনাদলকে থামানোর চেষ্টা করলেন। হযরত আলী ঘোড়া অগ্রসর করে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে আসলেন। তিনি যুবায়েরকে ডেকে রাসূলুল্লাহ-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে বললেন।

অবশেষে হযরত আলী হযরত আয়িশাকে বুঝাতে সক্ষম হন। হযরত আয়িশা বসরা থেকে মদিনায় ফিরে যান। যুদ্ধের সময় হযরত আয়িশা উঠের পিঠে সওয়ার ছিলেন। তাই ইতিহাসে এ যুদ্ধ উষ্ট্রের যুদ্ধ নামে খ্যাত। এ যুদ্ধে উভয়পক্ষে মোট তেরো হাজার মুসলমান শহিদ হন।[১০৩] ইতোমধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের শিবিরের প্রত্যাগমনের পথে স্বার্থান্বেষী দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক নিহত হন। যুদ্ধশেষে হযরত আলী হযরত আয়িশাকে সসম্মানে তাঁর ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে মদিনায় প্রেরণ করেন।

উষ্ট্রের যুদ্ধের ফলাফল

উষ্ট্রের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম গৃহযুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে রক্তপাতের সূচনা করে এবং যুগ যুগ ধরে স্বার্থ-সংঘাত, গোত্রীয় দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক লিপ্সা প্রভৃতি কারণে এটা চলতে থাকে।

উষ্ট্রের যুদ্ধের অন্যতম ফলাফল ছিল এই যে, এর ফলে মক্কা, বসরা ও কুফার মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধের অবসান হয় এবং এতদাঞ্চলে হযরত আলী-এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত আলী বিদ্রোহ সমূলে উৎপাটিত করার জন্য প্রশাসনিক পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। কায়েস ইবন-সা'দ, সাহল ইবন-হানিফ এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবন-আব্বাসকে মিশর, হেজাজ ও বসরার শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করলেন।

উষ্ট্রের যুদ্ধের পর খলিফা হযরত আলী-এর অন্যতম প্রশাসনিক পদক্ষেপ ছিল মদিনা থেকে কুফায় রাজধানী স্থানান্তর। ইরাকিদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতিতে এবং বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যস্থলে রাজধানী প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে খলিফা ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে কুফাকে রাজধানীর মর্যাদা দান করলেন। কুফায় রাজধানী স্থানান্তরিত

---

১০৩ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ৭, পৃ. ২৪৫।

হলে ধর্মীয় কেন্দ্রস্থল হিসেবে মদিনার গুরুত্ব হ্রাস পেল। ফলে মদিনার জীবিত সাহাবীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগল। তাঁরা খিলাফতে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে দূরে সরে গেলেন। অপরদিকে কুফায় রাজধানী স্থানান্তরিত করে হযরত আলী -এর উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কারণ অস্থিরমতিত্ব, প্রতারক, ষড়যন্ত্রকারী কুফাবাসীদের ওপর তিনি অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়লে খুলাফায়ে রাশেদিনের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে।

খলিফা হযরত আলী ও আমির মুয়াবিয়ার মধ্যকার সংঘর্ষ : উষ্ট্রের যুদ্ধের পর মক্কা, মদিনা, ইরাক ও মিশরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত এবং সুষ্ঠু হলেও এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে খলিফা হযরত আলী -এর সাথে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়ার দ্বন্দ্ব ও তিক্ততা চলছিল। কুফায় রাজধানী স্থানান্তর করে এবং প্রশাসনিক রদবদল দ্বারা খলিফা আলী স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন এবং বিদ্রোহী শাসনকর্তাকে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে নির্দেশ দেন। একটি পত্রে খলিফা আলী সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়াকে ইসলামের স্বার্থে তাঁর আনুগত্য স্বীকারের আহ্বান জানান। কিন্তু চক্রান্তকারী ও উচ্চাভিলাষী মুয়াবিয়া খলিফার আদেশ অমান্য করেন। উপরন্তু তিনি নিহত খলিফা উসমানের রক্তে রঞ্জিত পোশাক ও তাঁর স্ত্রী নায়লার কর্তিত আঙুল প্রদর্শন করে পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে থাকেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, হযরত উসমান -এর হত্যাকারীদের বিচার না হলে তিনি খলিফার আনুগত্য স্বীকার করবেন না। এভাবে প্রতিষ্ঠিত খলিফার বিরুদ্ধে তিনি প্রায় ষাট হাজার সিরীয় সৈন্য গঠন করে হযরত উসমান হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ

হযরত আলী ও মুয়াবিয়া -এর মধ্যকার যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ নামে পরিচিত। নিচে এ যুদ্ধের কারণ তুলে ধরা হলো–

খলিফার বশ্যতা স্বীকার এবং শাসনক্ষমতা হস্তান্তরে মুয়াবিয়ার অসম্মতি : মাসুদী, পি.কে হিট্টি, সৈয়দ আমির আলী প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে, হযরত আলী খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েই হযরত উসমান কর্তৃক নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকে অপসারিত করে তাদের স্থলে উপযুক্ত শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। তিনি মনে করলেন যে, এ নীতি অবলম্বন করলে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষিত হবে। হযরত মুগিরা এবং হযরত ইবনে আব্বাস তাঁকে এরূপ দুঃসাহসিক নীতি গ্রহণ না করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু খলিফা হযরত আলী তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেননি। ফলে সাম্রাজ্যে

ঐক্য ও শান্তির পরিবর্তে সমস্যা আরও জটিল হলো। সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া ব্যতীত সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তা খলিফার আদেশ পালন করেন।

বায়তুল মালের প্রত্যার্পণ : খলিফা হযরত উসমান উমাইয়াগণকে যে সমস্ত জায়গির এবং সরকারি ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেছিলেন হযরত আলী তৎসমুদয় সরকারকে প্রত্যার্পণ করার নির্দেশ দিলেন। এতে মুয়াবিয়ার স্বার্থহানি ঘটে।

কুফায় রাজধানী স্থানান্তর : হযরত আলী উষ্ট্রের যুদ্ধের পর বসরায় ফিরে আসলেন। তিনি মদিনায় ফিরে না যেয়ে রাজধানী কুফায় স্থানান্তর করলেন। যাতে ইরাকের ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুমান করা হয় যে, হযরত আলী -এর খেলাফত লাভ ও উষ্ট্রের যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়টা ছিল ৫ মাস ২১ দিন। একমাস পর তিনি কুফায় আগমন করেন এবং এরও দুই অথবা তিন মাস পর সিফ্ফিনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। হযরত আলী সিরিয়ায় বেশি দিন অবস্থান করেননি।

তিনি চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বসরার গভর্নর ও যায়েদ ইবনে সাবিত কে কোষাধ্যক্ষ বানিয়ে কুফার উদ্দেশে যাত্রা করেন। হযরত আলী ৩৬ হিজরি ১২ রজব মোতাবেক হযরত উসমান হত্যার ৭ মাস পরে সোমবারে কুফায় প্রবেশ করেন। তখন পর্যন্ত কোনো খলিফা কুফায় ভ্রমণ করেননি। যখন তিনি পৌছান তখন ইরানিয়ান বাদশাহ কর্তৃক নির্মিত বাসায় থাকার জন্য বলা হয়। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব এখানে থাকতে পছন্দ করতেন না; তাই আমিও পছন্দ করি না।[১০৪]

মুয়াবিয়া -এর আনুগত্যের শপথ থেকে বিরত : হযরত মুয়াবিয়া হযরত ওমর ও হযরত উসমান -এর শাসনামলে সিরিয়ার শাসনকর্তা হন। যখন হযরত আলী খলিফা হলেন তখন তিনি হযরত মুয়াবিয়াকে সরিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর কে নিয়োগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এ দায়িত্ব না নিতে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এরপর হযরত আলী সাহল ইবনে হুনায়ফ কে হযরত মুয়াবিয়া -এর স্থলাভিষিক্ত করে পাঠান। সাহল সিরিয়ার সীমান্তে পৌছাতেই হাবিব ইবনে মাসলামা আল ফিহিরের নেতৃত্বাধীন মুয়াবিয়ার সেনাবাহিনীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। হাবিব ইবনে মাসলামা তাকে বললেন, যদি আপনি হযরত উসমান কর্তৃক প্রেরিত হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে ধন্যবাদ। আর যদি অন্য কারো কর্তৃক প্রেরিত হয়ে থাকেন তাহলে দয়া করে ফিরে যান। হযরত মুয়াবিয়া ও তার জনগণ হযরত আলী -এর

---

১০৪ সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, হযরত আলী জীবন ও খিলাফত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

আনুগত্য স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানান যতক্ষণ পর্যন্ত না হযরত উসমান হত্যাকারীদের বিচার করবে।

তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে, হত্যাকারীদের আশ্রয় দেওয়ায় আমরা তার নিকট যাকাত প্রদান করব না। ঐ সময় যারা হত্যার পেছনে জড়িত ছিল তারা আলী -এর সেনাবাহিনীর ভিতরে সর্বোচ্চ পদে ছিল বলে সাধারণ জনগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। কারণ যদি এর কোনো সমাধান না হয় তাহলে তাদের জীবন বিপন্ন হবে।

এখানে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে যে, হযরত আয়িশা ও তাঁর সমর্থকরা এবং মুয়াবিয়া ও তাঁর সমর্থকরা কিন্তু আলী -এর খেলাফতে আরোহণকে অস্বীকার করেননি। তারা বুঝত এবং স্বীকার করত যে, এটি হযরত আলী -এর দায়িত্ব। তাই তারা এ হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত শপথ নিবে না।

মুয়াবিয়া তার লোকজন নিয়ে সমাবেশ করে ভাষণ দেন যে, হযরত উসমান কে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহী কর্তৃক শহিদ করা হয়েছে। তাই আমরা হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আবেদন জানাচ্ছি। লোকজন এ বক্তব্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন দেয়। যদিও হযরত আলী সিরিয়ার গভর্নরের ব্যাপারে পুনরায় মুয়াবিয়ার নিকট চিঠি পাঠান।

হযরত মুয়াবিয়া কোনো উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। হযরত মুয়াবিয়া জনগণের দাবি মেনে নিতে চিঠি ফেরত পাঠান। বার্তাবাহক হযরত আলী কে বলল আমি জনগণের নিকট থেকে ফিরে এসেছি, তাদের একমাত্র দাবি হচ্ছে হত্যাকারীর শাস্তি দান। আমি ৬০ হাজার লোককে পেছনে রেখে এসেছি যারা উসমানের রক্তমাখা পোশাক সামনে নিয়ে কাঁদতে থাকে।

হযরত আলী অসহায়ভাবে দুঃখের সাথে বললেন- "হে আল্লাহ, আমি হযরত উসমান -এর রক্তের ব্যাপারে আপনার নিকট আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করছি।"

যেহেতু মুয়াবিয়া কোনোকিছু বুঝতে চেষ্টা করছেন না সেহেতু সংঘাত ছাড়া কোনো সমাধান হবে না।

তারা আরও প্রতিজ্ঞা করে- হযরত আলী যদি তাদের কথামতো না চলে তাহলে তারা আনুগত্য স্বীকার তো করবেই না, প্রয়োজনে হযরত আলী -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

উসমান হত্যার বিচার দাবি : হযরত উসমান -এর শাহাদাতের পরে উম্মুল মু'মীনিন হযরত হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান হযরত উসমান -এর পরিবারের নিকট বলে পাঠালেন যে, উসমানের শাহাদাতের রক্তমাখা পোশাক পাঠানোর জন্য। তারা রক্তমাখা পোশাক ও রক্তে ভিজা দাড়ি-চুল পাঠিয়ে দেন।

হযরত উম্মে হাবিবা নোমান ইবনে বসির রক্তমাখা পোশাক ও একটা চিঠি লিখে মুয়াবিয়া -এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। নোমান হযরত উসমান -এর স্ত্রী নায়েলা বিনতে ফারাকিয়ার একটা বিচ্ছিন্ন আঙুলও নিয়ে যায়। হযরত মুয়াবিয়া মসজিদের কার্পেটে তাকে বসতে বললেন। উপস্থিত লোকদেরকে দেখালেন। হযরত উসমান -এর রক্তমাখা জামার আস্তিনের ভিতরে নায়েলার কাটা আঙুলও দেখালেন, তারা ফুঁপে ফুঁপে কাঁদতে শুরু করল এবং প্রতিশোধের আগুনে ফেটে পড়ল। একজন মুয়াবিয়াকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করল যে, হযরত উসমান আমাদের খলিফা। আপনি যদি হত্যাকারীদের বিচারের কাঠগড়ায় নিয়ে আসতে সক্ষম হন তাহলে নিয়ে আসেন। আর যদি না পারেন তাহলে পদত্যাগ করেন। সিরিয়ার লোকজন শপথ নিল যে, তাঁরা বিছানায় ঘুমাবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত হত্যাকারীদের শনাক্ত করে কিসাস না নিবেন। একজন আত্মীয় হিসেবে এবং নবীর সাহাবী হিসেবে হযরত মুয়াবিয়াও একই প্রত্যাশা করলেন। হযরত উসমান হত্যার সংবাদটা তাদেরকে গভীরভাবে নাড়া দিল। চোখে পানি, গভীর শোক আবেগ তারা ধরে রাখতে পারল না। তাঁরা দাবি করল যে, আলী ইবনে আবু তালিব নিকট শপথ নেওয়ার পূর্বেই হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে।[১০৫]

যুদ্ধের প্রস্তুতি

আমিরুল মু'মীনুন হযরত আলী সিরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান পাঠানোর প্রস্তুতি নেন। তিনি ৫০,০০০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ইউফ্রেটিস নদী তীরে সিফ্‌ফিনের দিকে যাত্রা করলেন। এদিকে হযরত মুয়াবিয়া ও হযরত উসমান হত্যার বিচারের দাবিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি ৬০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং হযরত আলী -এর বাহিনীর সাথে চ্যালেঞ্জ করেন।

যখন হযরত আলী সিফ্‌ফিনে পৌছান তখন তিনি জানতে পারলেন যে, হযরত মুয়াবিয়া তাঁর বাহিনীসহ ইতোমধ্যে পৌছে গেছেন। হযরত মুয়াবিয়া -এর বাহিনী প্রাথমিকভাবে পানির সকল উৎস অবরুদ্ধ করে রেখেছে। যদিও তারা

---

১০৫ সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, হযরত আলী জীবন ও খিলাফত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪-১৭৫

উভয় বাহিনী স্থায়ী ঐকমত্যে পৌছান যে, তাদের সকলের পানি ব্যবহারের সমান অধিকার আছে।

প্রথমে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একটা ছোট গ্রুপ পাঠান কিছু দিকনির্দেশনা দিয়ে যে তারা প্রথমে আক্রমণ করবে না; বরং তাদের আনুগত্য স্বীকার করে নিতে আহ্বান জানাবে। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আগের শর্তে অটল থাকল।

এরপর জিলহজ মাসের শুরুতেই উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। তবে ছোট ছোট খণ্ড যুদ্ধ। এভাবে চলল প্রায় একমাস। উভয় পক্ষই চাচ্ছিল যুদ্ধ এড়িয়ে চলতে এবং একটি শান্তি চুক্তিতে পৌছাতে। যাতে মুসলমানদের জীবন ও রক্তপাত না হয়।

দেখতে দেখতে পবিত্র মুহররম মাস চলে এলে উভয় পক্ষের অনুভূতিতে আঘাত করল। উভয় দল তাৎক্ষণিক যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হলো। কিন্তু স্থায়ী কোনো সমাধানে পৌছাতে পারল না। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সিদ্ধান্তে অটল। এ মাস অতিক্রম করার পর উভয় পক্ষ আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল। কী ভয়ঙ্কর এ যুদ্ধ! যেখানে পিতার বিরুদ্ধে পুত্র, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই; পুত্রের বিরুদ্ধে পিতা-খালিদ ইবনে ওয়ালিদের দুই পুত্র দুই দিকে অবস্থান। উভয় দলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীরা অবস্থান করছেন। এমনকি যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরাও। আর যারা শান্তি চাচ্ছিলেন, যেমন- আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবু উমামা আল জাহিলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁরা সমঝোতার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার পর উভয় পক্ষ থেকে বিরত থাকেন।

সিফফিনের যুদ্ধের ঘটনা

ঘটনাক্রমে শান্তিপূর্ণ সমঝোতার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর ৩৭ হিজরি সফর মাসের ১ম রাতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সেনাবাহিনীকে হযরত মুয়াবিয়ার বাহিনীকে আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। সকালে উভয় বাহিনীর মাঝে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন যদি যুদ্ধের ময়দান থেকে কেউ পালিয়ে যায় বা দৌড় দেয়, তাহলে পেছন দিকে ধাওয়া করে তাকে হত্যা করবে না। মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধাদের নিরাপত্তা দিবে। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুও তাঁর বাহিনীকে এমন নির্দেশ দিলেন। যুদ্ধ চলছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধের উত্তেজনা বিরাজ করছিল। শুধু নামাযের জন্য কিছুক্ষণ বিরত নিল। নামাযে প্রত্যেক গ্রুপ নিজ নিজ শিবিরের জন্য দোয়া করল এবং শহিদদের জন্য দোয়া করল।

একজন সৈনিক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করল আমাদের মৃতব্যক্তিদের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? উত্তরে তিনি বললেন আমাদের থেকে যারাই ইন্তেকাল করবে এবং তাদের মধ্যে থেকেও, আর যারা আল্লাহর নিকট তওবা করবে তাঁরা জান্নাতে যাবে। উভয় বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে স্থির। কেউ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেনি। এভাবে দিনটি রক্তাক্ত, আহত ও নিহতের মধ্য দিয়ে পার হলো। সন্ধ্যায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করলেন। চিৎকার করে আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন, "হে প্রভু! তাদেরকে ও আমাকে ক্ষমা কর।"

পরের দিন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিলেন এবং বাহিনী পুনরায় সাজিয়ে নিলেন এবং কয়েকজন সেনাপতিকে রদবদল করলেন। দুজন সৈন্য পরস্পরের দিকে ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে গেল এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যূহ ভেদ করল। এদিকে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাহিনী আমৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করার সংকল্প করল। আস্তে আস্তে তারা বিজয়ের দিকে এগিয়ে গেল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন এক পর্যায়ে হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাহিনী পিছু হটতে শুরু করল।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির ছিলেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাহিনীর একজন সদস্য। তিনি বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। তিনি কালেমার পতাকা হাতে নিয়ে সৈন্যদেরকে বলতে লাগলেন- আমরা একটা কারণে যুদ্ধ করছি যে, আমরা সত্যের পথে আছি। তিনি শপথ করে বলেন- "আল্লাহর কসম যদি তারা আমাকে পিছু ধাওয়া করে ইয়ামেন পর্যন্ত নিয়ে যায়, তারপরও আমি নিশ্চিত থাকব যে, আমি সত্যের পথে আছি। আর তারা অন্যায়ের পথে আছে।"

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির প্রথম সারির সাহাবীদের একজন। তিনি প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করেন ও বদর যুদ্ধে অংশ নেন। তিনি ছিলেন অনেক বেশি শক্তিশালী যুবক। মসজিদে নববী তৈরির সময় তিনি অনেক কাজ একাই সমাধা করতেন। যখন প্রত্যেকেই একটি ইট বহন করছিল, তখন তিনি দুটি ইট বহন করেন। একটা নিজের অন্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথায় পবিত্র হাত রেখে বলেন- "হে সামাইয়ার পুত্র। তুমি দ্বিতীয় পুরস্কার পাবে। তোমার শেষ খাদ্য হবে দুধ এবং একটা বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।"

দ্বিতীয় দিন যখন সূর্য ডুবে গেল তখন আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু দুধ চেয়েছিলেন। তিনি বললেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন এই পৃথিবীতে তোমাকে শেষ পানি

পান করানো হবে দুধ। তিনি দুধ পান করলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। অবশেষে তিনি শহিদ হলেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে, যুদ্ধের তৃতীয় দিবসে মুয়াবিয়াকে বিপর্যস্ত করে তুললেন। মুয়াবিয়ার বাহিনী শোচনীয় পরাজয়ের মুখে রণে ভঙ্গ দিতে উদ্যত হলে সুচতুর সেনাপতি ও কূটনীতিবিদ আমর ইবন আল-আসের পরামর্শে মুয়াবিয়ার সৈন্যগণ বর্শার অগ্রভাবে পবিত্র কুরআন শরীফ বেঁধে যুদ্ধ বন্ধ করার এক অভিনব কৌশল গ্রহণ করে।

খলিফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুয়াবিয়ার এই রাজনৈতিক চালের তাৎপর্য বুঝতে পেরে বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সৈন্যদের মধ্যে যারা হাফিজ-ই-কুরআন ছিলেন, তাঁরা কুরআন শরীফের পবিত্রতা ও সম্মানার্থে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।[১০৬] তিনি তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, এটি শত্রুদের একটি রাজনৈতিক চালমাত্র। কিন্তু তারা তা বুঝতে চেষ্টা করেনি। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধ বিরতিতে সায় দেন।
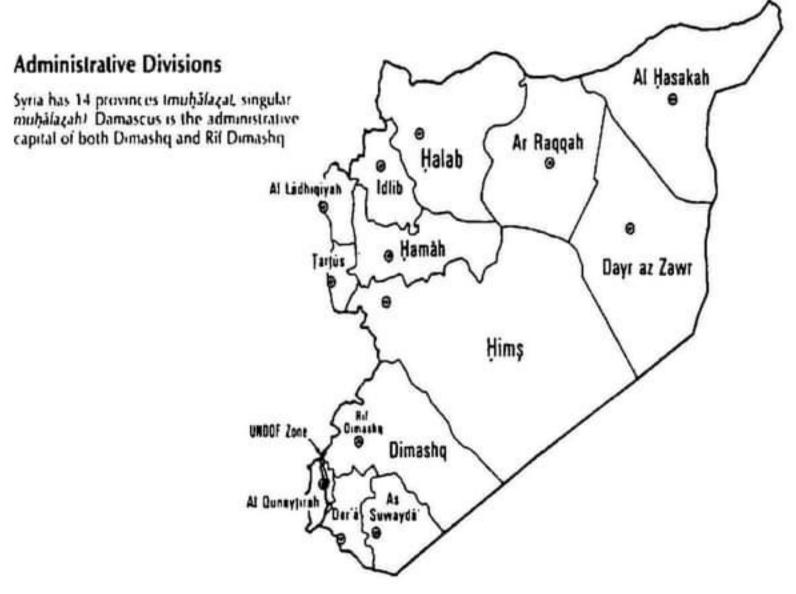
চিত্র : সিফফিন যুদ্ধস্থল (সিরিয়া)

---

১০৬ আল ইসাবা, খ.২, পৃ. ৫১৩

দুমাতুল জন্দলের মীমাংসা

যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু সালিশ নিযুক্ত হলেন। সিদ্ধান্ত হলো- এ দুইজন ব্যক্তির ফয়সালা উভয় বাহিনীই মেনে নিবে।

এরপর তারা সদলবলে কুফা থেকে বের হয়ে গেল এবং নাহরওয়ান অঞ্চলে সংঘবদ্ধ হলো। সালিশদ্বয় আবু মূসা ও আমর ইবনুল আ'স দাওমাতুল জান্দাল এলাকায় রমযান মাসে বৈঠকে মিলিত হলেন। মুসলমানদের কল্যাণ বিষয়ে তাঁরা যুক্তিতর্ক করলেন এবং যাবতীয় বিষয় মূল্যায়ন করলেন। অতঃপর এ মর্মে উভয়ে একমত হলেন যে, হযরত আলী ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়কে তারা অপসারিত করবেন। অতঃপর বিষয়টি মুসলমানদের শূরা বা পরামর্শের ওপর ন্যস্ত করবেন, তখন তারা সর্বোত্তম কল্যাণের ওপর একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু অবশ্য মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এককভাবে শাসন ক্ষমতায় বহাল রাখার ব্যাপারে আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সম্মত করাতে জোর চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাতে সম্মত হন নি। অতঃপর উভয়ে হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যুগপৎ অপসারণপূর্বক বিষয়টি মুসলমানদের পরামর্শের ওপর ন্যস্ত করার ব্যাপারে সমঝোতায় উপনীত হলেন যাতে তারা একমত হয়ে নিজেদের শাসক নির্বাচন করে নিতে পারে।

অতঃপর তারা লোকদের সমাবেশস্থলে উপস্থিত হলেন এবং হযরত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, হে আবু মূসা! উঠুন এবং জনসমাবেশের সামনে আমাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করুন। তখন হযরত আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু বক্তব্য পেশ করতে দাঁড়ালেন এবং প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার হামদ ও ছানা পাঠ করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দরূদ পাঠ করলেন, অতঃপর বললেন,

"হে লোক সকল! আমরা এ উম্মতের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি এবং যে সিদ্ধান্তে আমরা উভয়ে উপনীত হয়েছি উম্মতের জন্য তার চেয়ে উপযুক্ত কোনো সমাধান আমরা দেখতে পাইনি। আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, আলী ও মুয়াবিয়াকে আমরা অপসারিত করছি এবং বিষয়টি শূরা ও পরামর্শের ওপর ন্যস্ত করছি। উম্মত নিজে এই বিষয়টির সুরাহা করবে এবং নিজেদের জন্য তাদের পছন্দমতো শাসক নিযুক্ত করবে। সেই মতে আমি আলী ও মুয়াবিয়া উভয়কে অপসারিত করছি।"

এই বলে হযরত আবু মূসা সরে গেলেন। হযরত আমর ইবনুল আস তাঁর স্থানে এসে দাঁড়ালেন এবং হামদ-ছানার পর বললেন,

ইনি যা বললেন তা তোমরা শুনেছ। তিনি তাঁর নেতাকে অপসারণ করেছেন, তাঁর মতো আমিও তাঁকে অপসারিত করছি, তবে আমি আমার নেতা মুয়াবিয়াকে বহাল রাখছি। কেননা তিনি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান-এর অভিভাবক, তাঁর কিসাসের দাবিদার এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি।"[১০৭]

কথিত আছে, হযরত আবু মূসা হযরত ইবনুল আসকে তখন কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন এবং হযরত আমর-ও একই ভাষায় পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন। হযরত আবু মূসা আশআরী অত্যন্ত সহজ-সরল ছিলেন, তিনি এমন বিকৃত ভাষণে বিস্মিত হয়ে পড়েন। তিনি চিৎকার করে বললেন, বেঈমান- এ কেমন বিশ্বাসঘাতকতা।

অবশেষে শুরাইয়া ইবনে হানী আমর ইবনে আসকে বেত্রাঘাত শুরু করে দিল। প্রত্যুত্তরে আমর ইবনুল আসের পুত্র শুরাইহ্-এর ওপর আক্রমণ করল। পরে লোকদের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ এখানেই শেষ হলো। এদিকে আবু মূসা আশআরী মর্মাহত হয়ে মক্কায় চলে যান এবং নির্জনে নিরিবিলি জীবনযাপন করেন।

দুমাতুল জন্দলের রায়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ

পক্ষপাতহীন ও আবেগমুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সালিশির প্রস্তাব, বৈঠক এবং রায় এসবগুলোই নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে খিলাফতে উপবিষ্ট খলিফার স্বার্থের পরিপন্থি। এটি ছিল সুপরিকল্পিত, রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি ও নিকৃষ্টতম শঠতা। এটি কীভাবে হযরত আলী-এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে এবং মুয়াবিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তা নিচের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হবে।

(ক) হযরত আবু মূসা বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও আমরের তুলনায় ছিলেন সৎ, সরল, অকপট, নীতিজ্ঞানসম্পন্ন অপরদিকে আমর ছিলেন হঠকারী, বিশ্বাসঘাতক ও কপট। হযরত আবু মূসা আমরের চক্রান্তের শিকার হন। কারণ আমরই তাঁর নিকট উভয়কে পদচ্যুত করার জন্য প্রস্তাব দেন এবং বয়োজ্যেষ্ঠতার দোহাই দিয়ে আমর হযরত আবু মূসাকে প্রথমে রায় ঘোষণা করতে বলেন।

(খ) হযরত আবু মূসা খলিফাকে পদচ্যুত করলে হযরত আলী-এর মর্যাদাহানি হয়। কিন্তু এতে মুয়াবিয়ার শক্তি হ্রাস হয়নি কারণ, মুয়াবিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তা থাকায় তাঁকে খিলাফত থেকে অপসারিত করার কোনো প্রশ্নই আসে

[১০৭] ইবনে কাছীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৭, পৃ. ২৮৭

না। উপরন্তু তাঁকে সিরিয়ার শাসনকর্তার পদ থেকে অপসারণ করা হবে, এরূপ কোনো প্রস্তাব অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। অধ্যাপক পি.কে. হিট্টি বলেন, "উভয় মধ্যস্থ ব্যক্তি তাঁদের প্রভুদের পদচ্যুত করলে আলী ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। মুয়াবিয়ার পদচ্যুতির জন্য কোনো খিলাফত ছিল না। বস্তুত সালিশী তাঁকে আলীর সমকক্ষ করে তোলে এবং হযরত আলীকে একজন মিথ্যা দাবিদারের পর্যায়ে নামিয়ে ফেলে।" সুতরাং নির্বাচিত খলিফার সাথে একজন অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসনকর্তার খিলাফত ভাগের প্রশ্ন শুধু অবাস্তবই নয়, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবৈধ।

(গ) আমর ও হযরত আবু মূসা (রা.) উভয়ের সালিশ এ মর্মে চূড়ান্ত গ্রহণ করেন যে, তাঁরা তাদের নেতাদের পদচ্যুত করবেন এবং পরবর্তী খলিফা মুসলমানদের একটি সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। সুতরাং দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পুনরায় প্রার্থী হতে পারেন না। কিন্তু আমরের ছলচাতুরির ফলে মুসলমানদের একটি সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচন ছাড়াই খিলাফতে মুয়াবিয়ার কাল্পনিক দাবি প্রতিষ্ঠা ছিল সম্পূর্ণ নীতিবহির্ভূত এবং আইনত অগ্রহণযোগ্য।

(ঘ) সালিশির মূল বিষয় ছিল মুয়াবিয়া কর্তৃক উত্থাপিত হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার শাস্তি দাবি এবং হযরত আলী (রা.) কর্তৃক মুয়াবিয়ার অপসারণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ। কিন্তু আমরের চক্রান্তে রায় প্রদানের ব্যাপারে এ দুটি মূল বিষয় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় এবং তদস্থলে হযরত আলীর মনোনয়নের প্রকাশ্য সমালোচনা প্রাধান্য পায়।

(ঙ) কুরআনের পাতায় শরবিদ্ধ করে যুদ্ধ স্থগিত করা হয় সত্য; কিন্তু দুমাতুল জন্দলে আল্লাহর কুরআনকে শপথ ও অনুসরণ করে বিরোধ মীমাংসা করা হয়নি। এ কারণে খলিফা আলী (রা.) বিদ্রোহী শাসনকর্তার শঠতা ও কপটতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে এ সিদ্ধান্ত মানতে পারেন নি। তিনি ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম জাহানের খলিফার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর নৃশংস হত্যার পর মুয়াবিয়া নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন। ক্ষমতালোভী না হলে মুয়াবিয়া ৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে মিশর দখল করে চুক্তি মোতাবেক খলিফা আলীর জীবদ্দশায় আমর ইবন আল-আসকে মিশরের শাসকর্তা নিযুক্ত করতেন না।

হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে আপস-মীমাংসা : খিলাফতের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ও অশান্তি দেখা দিলে হযরত আলী (রা.) পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি চুক্তি করতে সম্মত হন। সন্ধি অনুযায়ী সিরিয়া ও মিশর মুয়াবিয়ার শাসনাধীনে থাকবে এবং সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ হযরত আলী (রা.)–এর শাসনে থাকবে। এভাবে খলিফা হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুয়াবিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল : হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুয়াবিয়ার মধ্যে যে নীতিগত বিরোধ ও সশস্ত্র সংঘর্ষ সংঘটিত হয় তার ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী। নিঃসন্দেহে এ বিবাদ ইসলামের সংহতি ও সমৃদ্ধির পক্ষে ঘোর অমঙ্গলজনক হয়েছিল।

সাম্রাজ্যের বিভক্তিকরণ সন্ধি : দুমার সালিশি এবং খারেজি বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুয়াবিয়ার সাথে ন্যক্কারজনক সন্ধি সম্পাদন করে খিলাফতকে সংকুচিত করেন। এ সন্ধির শর্ত অনুসারে সিরিয়া ও মিশরের যাবতীয় কর্তৃত্ব আমিরে মুয়াবিয়ার ওপরে ন্যস্ত হয়। সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কর্তৃক বজায় থাকে। ফলে খিলাফতের সংহতি বিনষ্ট হয়।

খিলাফতের মর্যাদা লোপ : হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মুয়াবিয়ার মধ্যে সাম্রাজ্য বন্টনের ফলে খিলাফতের বৈশিষ্ট্য ও বুনিয়াদ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে খলিফা ও খিলাফতের প্রতি জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লোপ পেতে থাকে। খলিফার নিয়ন্ত্রণে জাতীয় চেতনা ও ধর্মীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের মনে এ যাবত খলিফার কার্যকলাপের প্রতি যে সংশয় ছিল না, তা এখন সূচিত হয়।

বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ : মুয়াবিয়ার সৈন্যবাহিনী মক্কা ও মদিনা দখলের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। বসরাবাসিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সেখানকার শাসনকর্তা হযরত ইবন আব্বাসের সহকারী জিয়াদ এ বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন। আহওয়াজ ও কিরমানে বিদ্রোহ দেখা দিলে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সে বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু এবং গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা : খলিফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে খারেজি সম্প্রদায়ের আবদুর রহমান ইবনে মুলজাম কর্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই খিলাফতের অবসান ঘটে এবং মুয়াবিয়া খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ও ঐক্যে ফাটল ধরে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক পি. কে. হিট্টি বলেন, বংশানুক্রমে সংঘটিত যে সংঘর্ষসমূহ ইসলামের ভিত্তিমূলকে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত ও শক্তিহীন করে তার উৎপত্তি এখানেই নিহিত।

অধ্যায়-৬

খারেজিদের সাথে যুদ্ধ এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাহাদাত

খারেজিদের উদ্ভব ও আলী এর পক্ষ ত্যাগ

দুমাতুল জান্দালের কূটিলতাপূর্ণ বিচারের মাধ্যমে মুসলিম খেলাফত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এ সময়ে খারেজি নামে আরও একটি দলের জন্ম হয়। প্রথমে তারা হযরত আলী -এর সমর্থক ছিল। কিন্তু পরে তারা এ বিশ্বাস প্রচার করতে থাকে যে দীনের ব্যাপারে কোনো মানুষের সালিশ নিযুক্ত করা কুফরি কাজ। হযরত আলী হযরত আবু মূসা আশয়ারী কে সালিশ নিযুক্ত করে কুরআনের বিরোধী কাজ করেছেন। সুতরাং তিনি তাঁর খিলাফতের অধিকারী নয়। তারা হযরত আলী থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা ছিল অত্যন্ত চরমপন্থি। তাদের সাথে আলী -এর একটি যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে বহুলোক হতাহত হয়। এ যুদ্ধ 'নাহরাওয়ান' যুদ্ধ নামে পরিচিত।

আশ'আস ইব্‌ন কায়স বনী তামীম গোত্রের একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে সালিশ-বিষয়ক পত্র পড়ে শোনালেন। তখন উরওয়া ইব্‌ন ওয়ায়না তার দিকে অগ্রসর হয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে মানুষকে তোমরা বিচারক সাব্যস্ত করছ?

আলী -এর পক্ষত্যাগকারীরা উরওয়া নামক এ লোকটির উপরিউক্ত মন্তব্যকে নিজেদের প্রতীক ও শ্লোগানরূপে গ্রহণ করল এবং আওয়াজ তুলল, لَا حُكْمَ إِلَّا لِلّٰهِ "আল্লাহ্ ছাড়া কারো বিধান প্রদানের অধিকার নেই।"

এই ছিল প্রথম দলত্যাগ, যার ওপর ভিত্তি করে খারেজি সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং উপরিউক্ত শ্লোগানকে তারা সাম্প্রদায়িক পরিচয় ও আকীদারূপে গ্রহণ করেছে।[১০৮]

আলী কুফায় প্রত্যাবর্তন করলেন। শহরে প্রবেশের পূর্বমূহূর্তে তাঁর বাহিনীর প্রায় বারো হাজার সৈন্য দলত্যাগ করল। এরাই হলো খারেজি সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা 'হারুরা' নামক এলাকায় জমায়েত হলো। তখন হযরত আলী , হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস কে তাদের নিকট পাঠালেন। তিনি তাদেরকে যুক্তি

---

[১০৮] ইবনে কাছীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. ৭, পৃ. ২৮৭

দিয়ে বোঝালেন। ফলে তাদের অধিকাংশই ভুল স্বীকার করে প্রত্যাবর্তন করল। অবশিষ্টরা আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার-এর দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো। তারা এ মর্মে হযরত আলী (রা)-এর কঠোর সমালোচনা করল যে, আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে মানুষকে তিনি বিচারক সাব্যস্ত করেছেন, অথচ আল্লাহ্ ছাড়া কারো বিধান প্রদানের অধিকার নেই।

ইব্‌ন জারীর বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা) একদিন ভাষণ প্রদান করছিলেন, তখন খারেজি সম্প্রদায়ের একলোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আলী, আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে মানুষকে তুমি অংশীদার করেছ, অথচ আল্লাহ্ ছাড়া কারো বিধান প্রদানের অধিকার নেই। তখন চারদিক থেকে ধ্বনি উঠল,

لَا حُكْمَ اِلَّا اللّٰهُ لَا حُكْمَ اِلَّا اللّٰهُ

"আল্লাহ্ ছাড়া কারো বিধান প্রদানের অধিকার নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কারো বিধান প্রদানের অধিকার নেই।"

তখন হযরত আলী (রা) বলতে লাগলেন, هٰذِهٖ كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ "এটা ন্যায় কথা কিন্তু তার উদ্দেশ্য অন্যায়।"

ইতোমধ্যে খারেজি সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করল এবং আলী (রা)-এর সমালোচনায় সীমালঙ্ঘন করে স্পষ্ট ভাষায় তারা তাঁর কুফরির ঘোষণা দিল। এমনকি জনৈক নেতৃস্থানীয় খারেজি তাঁকে সম্বোধন করে বলে বসল :

"হে আলী! আল্লাহ্‌র শপথ! যদি তুমি আল্লাহ্‌র কিতাবের ব্যাপারে মানুষের বিচার পরিত্যাগ না করো তাহলে অবশ্যই আমি তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করব এবং এর মাধ্যমে আমি আল্লাহ্‌র রহম ও সন্তুষ্টির আশা করব।"

খারেজিরা আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন ওয়াহব রাসেদীর বাড়িতে সমবেত হলো। সে তাদের উদ্দেশ্যে এক সারগর্ভ ভাষণ দান করল এবং তাদের দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ, আখিরাত ও জান্নাতের প্রতি অনুরক্ত হতে উৎসাহিত করল এবং তাদেরকে আমরু বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করল। অতঃপর উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলল, চলো ভাই সকল, জালিমদের এই জনপদ হতে বের করে এই পাহাড়ি জনপদে কিংবা এই দিকের কোনো এক শহরে আমাদেরকে নিয়ে চলো। অতঃপর তারা মাদায়েন দখল করে সেখানে সুরক্ষিত আশ্রয় গ্রহণের বিষয়ে একমত হল। অতঃপর তারা মা-বাবা ও ভাই- বোনের মায়া ত্যাগ করে এবং সকল আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করে কুফা শহর থেকে বেরিয়ে গেল। তাদের[১০৯] বিশ্বাস ছিল এই ত্যাগ আসমান যমীনের প্রতিপালক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে।

---

১০৯ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৮৭

হযরত আলী -এর প্রতি খারেজিদের অবিচার

খারেজি সম্প্রদায় ও তাদের উগ্রতাবাদী আকীদা বিশ্বাস ও মন-মানসিকতা সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা ও ইতিহাসভিত্তিক বিচার সমালোচনার পূর্বে হযরত আলী -এর অবস্থান ও সমস্যা সম্পর্কে গবেষক আল আক্কাদের মন্তব্যের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরতে চাই। তিনি বলেন, "সালিশি প্রস্তাব গ্রহণের 'অপরাধে' যারা আলী -এর সমালোচনায় মুখর হয়েছে তাদের 'ত্বরিত সমালোচনার বহর' দেখে আমাদের মনে হয় যে, তিনি যদি দৃঢ়ভাবে সালিশ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন তবে সেই প্রত্যাখ্যানের অপরাধেও তারাই আগ বাড়িয়ে তাঁর সমালোচনা করত, অথচ সেটা করারও তার যুক্তিসঙ্গত অধিকার ছিল, অথচ তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ পরিত্যাগের মুখেও আপন শিবিরে সালিশি প্রস্তাবের সমর্থক ও বিরোধীদের মাঝে সংঘর্ষের আশঙ্কার মুখে অনন্যোপায় হয়েই তা মেনে নিয়েছিলেন।"

পক্ষান্তরে, যে সকল ঐতিহাসিক তাঁর সালিশি প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্তকে সঠিক কিন্তু আবু মূসা 'আশআরী -এর দুর্বলচিত্ততা ও সিদ্ধান্তহীনতার স্বভাব সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তাঁকে বিচারক নিযুক্ত করার সিদ্ধান্তকে ভুল আখ্যায়িত করে থাকেন, তারা আসলে ভুলে যান যে, সালিশি প্রস্তাব ও আবু মূসা -এর নিযুক্তি দুটোই এক সাথে তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন অর্থাৎ আবু মূসা আশআরী বা আশতার নাখয়ী কিংবা আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস যে-ই তাঁর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করুন না কেন, আমর ইবনুল আস তো কোনোক্রমেই মুয়াবিয়া কে অপসারণ ও আলী কে খিলাফতের দায়িত্বে বহাল রাখতে রাজি হতেন না। বেশির চেয়ে বেশি এই হতো যে, সালিশদ্বয় নিজ নিজ পক্ষের সমর্থনে সালিশি মজলিস ত্যাগ করত এবং পরিস্থিতি আগের অবস্থায় ফিরে যেত।

সুতরাং এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আলী অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে সমাধান গ্রহণ করেছিলেন সেটা তিনি ভুল মনে করেই গ্রহণ করে থাকুন কিংবা উভয় ক্ষেত্রেই ফলাফল অভিন্ন হবে মনে করেই গ্রহণ করে থাকুন, সমালোচক ঐতিহাসিকদের নিকট এর চেয়ে উত্তম কোনো সমাধান কিন্তু নেই।[১১০]

এ সম্প্রদায়ের স্বভাব প্রকৃতিতে স্থূলবাদিতা, পরমতঅসহিষ্ণুতা, উগ্রবাদিতা ও স্ববিরোধিতা এমন বিমূর্ত হয়ে উঠে ছিল যা বিগত ধর্মগুলোর কোনো সম্প্রদায় কিংবা ইসলামের ইতিহাসে আত্মপ্রকাশকারী কোনো দলের মাঝে দেখা যায়নি।

---

১১০ আল-আবকারিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৯২৫-৬

খারেজি সম্প্রদায়ের মূল উৎস হলো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সৈন্যবাহিনীর একটি বিদ্রোহী অংশ, যাদের অধিকাংশই ছিল বনু তামীম গোত্রীয়। এরা আল্লাহ্‌র কিতাবের ব্যাপারে মানুষকে বিচারক সাব্যস্ত করার অভিযোগ এনে দলত্যাগ করেছিল। তারা মনে করত যে, সালিশ নিয়োগ ছিল ভুল ও শরীয়তবিরোধী। কেননা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আল্লাহর হুকুম ও বিধান ছিল সুস্পষ্ট, অথচ সালিশ নিয়োগের অর্থ ছিল এই যে, যুদ্ধরত উভয় পক্ষ যেন সন্দিহান হয়ে পড়ল যে, কোনো পক্ষ সত্যের ওপর রয়েছে। তাদের হৃদয়ে আলোড়িত এ সকল চিন্তা-ভাবনাকেই তারা لاَ حُكْمَ اِلاَّ اللهُ এর মাধ্যমে ভাষা দান করেছিল, যা এ চিন্তায় বিশ্বাসী সকলের মাঝে বিদ্যুতের ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সর্বত্র তাতে বিপুল সাড়া পড়ে ছিল যা উক্ত সম্প্রদায়ের পরিচয় প্রতীকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। অবশ্য তাদেরকে اَلشُّرَاةُ (বিক্রয়কারী দল) নামে আখ্যায়িত করা হতো। এ নাম নিম্নোক্ত আয়াত হতে গ্রহণ করা হয়েছিল :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ـ

"মানুষের মাঝে এক সম্প্রদায় এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় প্রাণ বিক্রয় করে দিয়েছেন।"[১১১]

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যা নাহরোয়ান যুদ্ধ নামে খ্যাতি লাভ করেছে। সে যুদ্ধে তাদেরকে তিনি পরাজিত করেছিলেন এবং বহু সংখ্যককে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তাদের অস্তিত্ব ও চিন্তা-দর্শনকে তিনি নির্মূল করতে পারেন নি; বরং এর পরাজয় খারেজিদের অন্তরে আলী-বিদ্বেষ আরও বদ্ধমূল করে দিয়েছিল। ফলে তাঁকে হত্যার এক সুপরিকল্পিত চক্রান্ত তারা গ্রহণ করেছিল এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন মুলজাম খারেজির হাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

যদিও কিছুসংখ্যক মাওয়ালি খারেজি সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছিল, তা সত্ত্বেও খারেজি মতবাদ বহুল পরিমাণে ভালো ও মন্দ উভয় দিক থেকেই বেদুঈন প্রকৃতির ধারক ছিল। যেমন কথায় কথায় তারা নেতৃস্থানীয়দের সাথে মতবিরোধ করত এবং দলে-উপদলে বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ত। তারা ছিল খুবই স্থূলদৃষ্টির অধিকারী ও অদূরদর্শী। প্রতিপক্ষের মতামতের ব্যাপারে তাদের চিন্তা ছিল খুবই সংকীর্ণ। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তারা ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের সাহস ও শৌর্যবীর্যের অধিকারী।

---

[১১১] আল কুরআন, সূরা বাকারা ২ : ২০৭।

কথায় ও কাজে ছিল অতি স্পষ্টবাদী। আকীদা ও বিশ্বাসের জন্য জীবন বিসর্জন করা ছিল তাদের কাছে অতি সহজ বিষয়। খেজুর গাছের নিচে পড়ে থাকা একটি খেজুর খেতে তারা মালিকের অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে ইতস্তত করত এবং মুখ থেকে থুথু করে ফেলে দিত, অথচ মুসলমানদের রক্তপাতের ব্যাপারে ছিল দ্বিধাহীন। তাদের চিন্তায় বিশ্বাসী নয়, শুধু এই 'অপরাধে' যেকোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করার ব্যাপারে তারা মোটেও কুণ্ঠিত হতো না। আবদুর রহমান ইব্‌ন মুলজাম হযরত আলী ইব্‌নে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার পর দেখা গেল, দিনরাত সে শুধু কুরআন তিলাওয়াত করছে। যখন তার জিহ্‌বা কেটে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলো তখন সে অস্থির হয়ে গেল। অস্থিরতার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল, দুনিয়াতে আমি (কুরআন তিলাওয়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে) মরে যাওয়া অপছন্দ করি।

আবু হামদ আল খারেজি তাদের স্বভাবচিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে :

شَبَابٌ وَاللهِ مُكْتَهِلُوْنَ فِيْ شَبَابِهِمْ غَضِيْضَةٌ عَنِ الشَّرِّ أَعْيُنُهُمْ ثَقِيْلَةٌ عَنِ الْبَاطِلِ أَرْجُلُهُمْ أَنْضَاءُ عِبَادَةٍ وَإِطْلَاحُ سَهَرٍ

"যুবক, কিন্তু আল্লাহ্‌র শপথ! যুবক বয়সেই তারা প্রবীণ। মন্দ থেকে তাদের দৃষ্টি অবনত। বাতিলের পথে তাদের পদদ্বয় অচল। ইবাদত ও রাত জাগরণে তারা ক্লান্ত, শ্রান্ত।"[১১২]

নাহরাওয়ানের যুদ্ধ

খাওয়ারিজ সম্প্রদায়ের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সতর্ক। তিনি জানতেন যে, তারা মুসলিম উম্মাহর জন্য বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে। এভাবেই কুফা থেকে প্রায় ১০০ মাইল উত্তরে নাহরাওয়ান নামক স্থানে তিনি তাদেরকে পরাজিত করেন।

সেখানে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খাওয়ারিজ সম্প্রদায়ের একটি অংশকে উক্ত সম্প্রদায় পরিত্যাগ এবং তাঁর সাথে কুফায় ফিরে আসতে আহ্বান করেন।

যারা খলিফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, তাদেরকে দমন করতে হিজরি ৩৮ সালে তিনি এবং তাঁর সৈন্যবাহিনী নাহরাওয়ানে উপস্থিত হন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন, তাদের অনেকে নিহত হন এবং অনেকে বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে যায়।

---

১১২ আল-কামিল, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৬

কিন্তু বিদ্রোহীরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তাদের অস্থায়ী আস্তানা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন, তারা দৃঢ় ও অন্ধভাবে বিশ্বাস করত যে, তারাই একমাত্র সঠিক মুসলিম ও ইসলামের রীতি-নীতি পালনের দাবিদার। তাদের বিপদগামী অন্ধবিশ্বাস এবং মুয়াবিয়া-এর সাথে আলীর কথোপকথনের সম্মতিকে তারা মেনে নিতে পারেনি। অবশেষে এ সকল ঠুনকো অজুহাতে তারা মুসলমানদের সম্পদের ওপর হামলা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। হযরত আলী ইবনে আবু তালিব বুঝতে পারলেন যে, তাদের এ সকল ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডকে আর মেনে নেওয়া যায় না। তিনি এই বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং তাদেরকে পরাজিত করতে সমর্থ হন।[১১৩] যদিও তাদের বিরুদ্ধে এই জিহাদ-ই পরবর্তীতে খলিফার শাহাদাতের জন্য দায়ী।

নাহরাওয়ান যুদ্ধের পরিণাম

খাওয়ারিজ বিদ্রোহীদের বিশ্বাস ও যুদ্ধে সৈন্য-সামন্ত কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফ্ফিনের যুদ্ধ ও নাহরাওয়ান যুদ্ধের ফলে ইরাকের লোকজন বিরক্ত হয়ে উঠে। সিফ্ফিনের যুদ্ধে ইরাকের জনগণ বড় ধরনের ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ যুদ্ধের ফলে অনেক মহিলা বিধবা হন এবং অগণিত শিশু এতিম হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি নিষ্ফল যুদ্ধের পরিণতি। এদিকে হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া -এর বৈঠক আরও অচলাবস্থা তৈরি করে।

সিরিয়ার সীমান্তে পৌছার পরও হযরত আলী -এর বাহিনী ছিল অনেকটা যুদ্ধ মনোভাবাপন্ন এবং তারা কোনো প্রকার চুক্তির বিষয়ে অনিচ্ছুক ছিল। তাদের দাবি হযরত আলী -ই সঠিক পথে রয়েছেন। এ সকল সমস্যা আলীর খিলাফতকে মারাত্মকভাবে সমস্যা-সংকুল করে। নারওয়ান যুদ্ধের সাথে সাথে বনু নাজির গোত্রের আল-আহওয়াজও হযরত আলী -এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এ যুদ্ধের পর মুসলিম সাম্রাজ্যের অনেক জায়গায় হযরত আলী -এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিস্তার ঘটতে থাকে। খুব কম সময়ের মধ্যে আলী সামরিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হন।

হযরত আলী এর আপ্রাণ চেষ্টার পরও মুসলিম সাম্রাজ্যের ঐক্যকে সুসংহত করতে পারলেন না। হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া -এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব এ সম্মতির ওপর পরিসমাপ্ত হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া সিরিয়ার শাসন আর হযরত আলী ইরাক ও অন্যান্য অঞ্চল পরিচালনা করবেন। হিজরি ৪০ সালে উভয়ের সম্মতির মাধ্যমে বিদ্রোহের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটল।

---

[১১৩] ইবনে কাছীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৭, পৃ. ২৮৮-২৮৯

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রা. প্রতিটি মুহূর্তে বিদ্রোহের অরাজক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব ও কিছুটা অবাধ্যতা পরিলক্ষিত হয়। সাম্প্রতিককালের যুদ্ধের ভয়াবহতার দরুন ইরাকের জনতা প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে, সিরিয়রা এ বিষয়টি থেকে সুযোগ গ্রহণ করে এবং তাঁর অঞ্চলে হঠাৎ করে আক্রমণ করে।

পৃথিবীর অন্যতম ন্যায়পরায়ণ শাসক, নিঃস্বার্থ মানুষ, অধিক জ্ঞানী, স্রষ্টার প্রতি অনুগত এবং মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জনগণ তাঁকে পরিত্যাগ করে। এটা খুবই অস্বাভাবিক ও দুঃখজনক যে, আমীরুল মু'মিনীন আলী ইবনে আবু তালিব রা. মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছেন।

হঠাৎ তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন- "হে আল্লাহ! আমি এই জনতার ভারে ক্লান্ত আর তারাও আমার প্রতি হতাশ, তাই আমাকে তাদের থেকে মুক্ত কর। এ রক্তের খেলার পরিসমাপ্তি কী? একথা বলেই তিনি তার দাড়ি স্পর্শ করলেন এবং রাসূল সা.-এর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করলেন, নবী করীম সা. তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বলেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আলী রা.-এর দাড়ি তাঁর মাথার রক্ত দ্বারা রঞ্জিত না হবে ততক্ষণ তার মৃত্যু হবে না।

ষড়যন্ত্রকারীদের বৈঠক

তিনজন খাওয়ারিজি নেতা আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম, আল-বুরুক ইবনে আব্দুল্লাহ এবং আমর ইবনে বকর আত-তাইয়ি গোপনে মিলিত হয়। তারা হযরত আলী রা., হযরত মুয়াবিয়া রা. ও হযরত ইবনে আল-আস রা.কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। আর এটা হবে নাহরাওয়ান যুদ্ধে তাদের স্বজনদের হত্যার প্রতিশোধ।

এ ভয়াবহ বেদানাদায়ক সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করে। তাদের সেই বেদনাদায়ক পরিকল্পনাটি হলো- ৪০ হিজরি ১৭ রমজান শুক্রবার ফজরের নামাযের পর একই সময়ের মধ্যে কুফার প্রধান মসজিদ, দামেস্ক ও ফুস্তাতে (বর্তমান কায়রো) হযরত আলী রা., মুয়াবিয়া রা. ও আমর ইবনে আল-আস রা.কে হত্যা করা হবে।

তারা তাদের তরবারি নিয়ে প্রস্তুত হলো এবং তাদের জঘন্য কাজ সম্পাদনের জন্য শপথ নিল। তারা তিনজন আলাদা আলাদাভাবে তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেল।

আল বুরাক ইবনে আব্দুল্লাহ দামেস্কে মুয়াবিয়ার ওপর আক্রমণ করল। যদিও তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন, কিন্তু চিকিৎসকের নিবিড় তত্ত্বাবধানে তিনি

পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে উঠেন। আমর ইবনে বকর আত-তাইয়ি যে আমর ইবনে আল আসকে হত্যার চেষ্টা চালায়; কিন্তু আমর অসুস্থতার কারণে মসজিদে না আসায় তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে আমরের প্রতিনিধি খারিযা ইবনে হুযায়ফা তার স্থলে শহিদ হন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাত

পরিকল্পনা অনুযায়ী ইবনে মুলজাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আক্রমণ করে। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ফজরের নামাজের জন্য বের হলেন তখন ইবনে মুলযিম তাকে আঘাত করেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আহত হলে তিনি চিৎকার দিয়ে বলেন, ধরো তাকে। সাথে সাথে ইবনে মুলযিমকে আটক করা হলো। এমতাবস্থায় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জাদা ইবনে হোবায়রা ইবনে আবূ ওয়াহকে আগে বাড়িয়ে দিলেন, তিনি ফজরের নামাজ পড়ালেন। যখন মুলজামকে গ্রেফতার করা হলো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন মারাত্মক আহত ছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন মুলজামকে ইসলামী আইনে বিচার করা হোক। তিনি নির্দেশ আমার মৃত্যু হলে তাকে হত্যা করবে, আর আমি বেঁচে থাকলে আমি কি করবো আমিই ভালো বুঝবো।[১১৪] তবে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বিদ্রোহীকে ক্ষতবিক্ষতভাবে হত্যা করতে নিষেধ করলেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যেখানে শুয়ে ছিলেন। সেই স্থানকে ইঙ্গিত করে বললেন, "হে আব্দুল মোত্তালিবের সন্তানেরা! আমি তোমাদেরকে মুসলমানদের রক্তের খেলায় দেখতে চাই না। এ লোকটিকে ব্যতীত অন্য কাউকে তোমরা রাগেরবশত হত্যা করবে না। হে হাসান! যদি আমি তার রক্তের কারণে মারা যাই। তোমরা তাকে আঘাতের পর আঘাত করবে; তবে তার শরীরকে কেটে ছিঁড়ে টুকরা বানাবে না। কেননা, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি যে, "তোমরা কাউকে অঙ্গহানির বিষয়ে সতর্ক হও, এটা হচ্ছে বন্য কুকুর বা হায়েনার কাজ।"

এ কথার সাথে সাথে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর নাম নিতে থাকেন এবং শাহাদাতের স্বাদ গ্রহণ করেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃতদেহ তাঁর দুই পুত্র হাসান-হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর ভাতিজা আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর গোসল দেন। হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতার জানাযার নামায পড়ান। এর কিছু পরই ইবনে মুলজামের প্রাণদণ্ড নেওয়া হলো।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কবরের জায়গাটি অজানা রাখা হলো, কারণ লোকেরা এই আশঙ্কা করল যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শত্রুরা এই কবরকে অপবিত্র করে তুলবে অথবা অন্যরা একে মাজার হিসেবে ইবাদতের স্থান বানিয়ে নিবে। তবে

---

[১১৪] ইবনে কাছীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৭, পৃ. ৩২৮

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মতে, হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতাকে কুফার দূরবর্তী কোনো স্থানে কবর দেন, তবে সঠিক স্থানটি গোপন রাখা হয়েছে।

পরবর্তীতে ইরাকের নাযাফ শহরে অনেক কবর থেকে একটিকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কবর বলে ধরে নেওয়া হলো। তবে অধিকাংশ ইতিহাসবিদ এ কবরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্য সাহাবী আল মুগিরা ইবনে শুবা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কবর বলে মত দিয়েছেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতের সময়কাল ছিল ৪ বছর ৯ মাস ৩ দিন। তাঁর খিলাফত শুরু হয়েছি ৩৫ হিজরি ১৮ই জিলহজ। আর খলিফা হিসেবেই ৪০ হিজরি ২১ রমজান তিনি শাহাদাতবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।[১১৫]

আফগানিস্থানে অবস্থিত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাজার
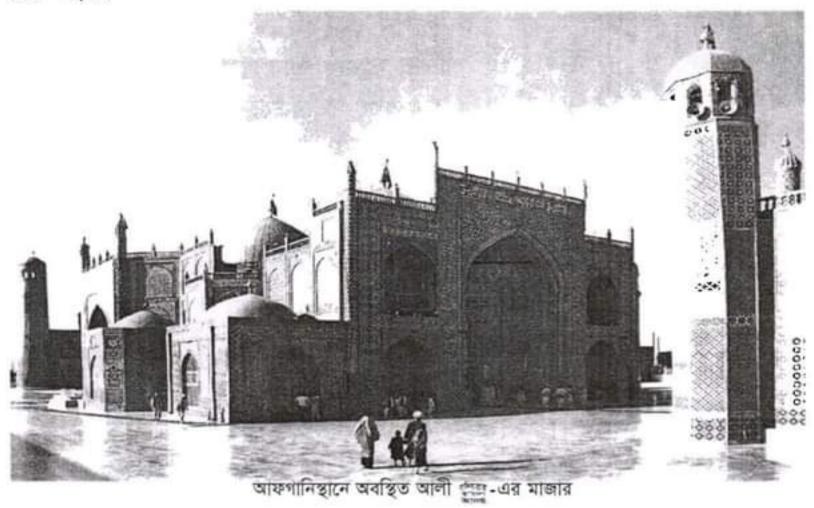
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকালে মুয়াবিয়ার প্রতিক্রিয়া

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু সংবাদ শুনে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে শুরু করলেন। তখন তাঁর স্ত্রী বলল তুমিতো তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলে; অথচ এখন কাঁদছ? তখন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, খুবই দুঃখজনক। তুমি কি জান না মানুষরা কি হারিয়েছে? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুতে আমরা জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে হারিয়েছি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও উৎকর্ষতায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক অবদান রাখেন। মুয়াবিয়ার খিলাফতকালে তিনি তাঁর এক সহযোগী দিবার আল আসাকিকে আলী

---

[১১৫] ইবনে কাছীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৭, পৃ. ৩৩০-৩৩১

সম্পর্কে বলতে বলেন। প্রথমে সে জানাতে অস্বীকৃতি জানায়, পরবর্তীতে হযরত মুয়াবিয়া -এর পীড়াপীড়িতে দিবার আলী ইবনে আবু তালিব সম্পর্কে এক প্রাঞ্জল বর্ণনা দেন, যা ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে-

"আলী ছিলেন প্রবল ইচ্ছা-শক্তি ও দৃঢ়চিত্তের মানুষ। ইসলামের পক্ষে তাঁর অবস্থান ছিল অনেক মজবুত। তিনি সদা সত্যের পথে চলতেন। তিনি ন্যায়বিচারে অটল ছিলেন। তিনি বিচারে সর্বদা উত্তম ও ন্যায়কে বিবেচনা করতেন। তাঁর থেকে যেন জ্ঞান প্রবাহিত হতো। তাঁর কথায় বিচক্ষণতার ভাব পরিলক্ষিত হতো। তিনি দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে পছন্দ করতেন না; বরং গভীর অন্ধকারে আল্লাহর কাছে কাঁদতেন। তাঁর পোশাক ও খাবার ছিল খুবই সাধারণ প্রকৃতির।

তিনি সাধারণ মানুষের মতোই জীবনযাপন করতেন, যখন কেউ তাঁকে কোনো প্রশ্ন করতেন; তখন তিনি খুবই মার্জিত ভাষায় তার উত্তর দিতেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট শুনলে তিনি বারবার কাঁদতেন এবং গভীর চিন্তায় মগ্ন হতেন। যখনই তাঁকে কোনো বিষয়ে অপেক্ষা করতে বলা হতো; তখনই তিনি সাধারণের মতো অপেক্ষা করতেন। যদিও তিনি আমাদের সাথেই থাকতেন; কিন্তু আমরা তাঁর সাথে সর্বোচ্চ সম্মানের সাথে কথা বলতাম। তাঁর আল্লাহর প্রতি নৈকট্যের বিষয়টি দেখে আমরা ভীত হয়ে যেতাম। ধর্মীয় ও পণ্ডিত লোকদের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান দেখাতেন। তিনি দরিদ্র মানুষের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর সক্ষমতা থেকে কখনো ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণ করেননি, দুর্বলরা তাঁর বিচারে কখনোই হতাশ হয়নি।

আমি তাঁকে প্রায় সময় গভীর রাতে নামাযে দাঁড়ানো দেখতাম; এ সময় তাঁর দাড়ি চোখের পানিতে ভিজে যেত এবং আর্তনাদ করে কেঁদে উঠতেন এবং বলতেন– "হে বিশ্বের সৌন্দর্য ও আরাম-আয়েশ তুমি কাউকে প্রলুব্ধ কর আর নাই করো আমাকে তোমার মোহে আবদ্ধ করার চেষ্টা করো না। তুমি কি মনে করো আমি তোমার মোহে পড়ে যাব? না আদৌ নয়; বরং আমি তোমার সাথে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করব। কেননা, তুমি হচ্ছ খুবই কম সময়ের। আমি তোমার মোহ ছেড়ে একাকি একটি লম্বা ও অনন্তে যাত্রা করব।"

এ বক্তব্য শুনে হযরত মুয়াবিয়া কেঁদে উঠলেন। তিনি বললেন মহান আল্লাহ আবুল হাসান (আলী)-এর সহায় হোক। আল্লাহর শপথ তিনি সত্যিই তোমার বর্ণনায় অনুরূপ ব্যক্তি ছিলেন। যদিও হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া -এর মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া হযরত আলী কে ভালোবাসতেন এবং সবসময়ই বলতেন আমি কখনোই তাঁর সমকক্ষ হতে পারি না।

অধ্যায়-৭

হযরত আলী-এর কৃতিত্ব

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ৬৫৬ খ্রি. থেকে ৬৬১ খ্রি. পর্যন্ত খিলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তিনি প্রথম থেকে গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হন বলে তাঁর পক্ষে খিলাফতের অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব হয়নি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের মধ্যে সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হযরত আলী-এর সাথে সিরিয়ার শাসনকর্তা আমিরে মুয়াবিয়ার এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিপক্ষের কূটকৌশলের কারণে তাঁর নিশ্চিত বিজয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তা খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনের অবসান ত্বরান্বিত করে এবং ইসলামী উম্মাহর শাসনব্যবস্থা রাজতন্ত্রের দিকে এক ধাপ এগিয়ে যায়। ঐতিহাসিক ভন ক্রেমার যথার্থই বলেন : If the conflict between Ali and Muawiah had never occured and the later days of Islam continued a cloud, the future of the Muslim would have been happier and perhaps more successful.

"যদি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মুয়াবিয়ার মধ্যে কোনো সংঘর্ষ না হতো, তাহলে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য আরও প্রীতিকর এবং সম্ভবত অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হতো।" হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অপেক্ষা আমিরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত কৌশলী সমরনায়ক ছিলেন। তাই তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কৌশলে পরাভূত করে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এর মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনের অবসান ঘটে, যা ইসলামের মৌলিক আদর্শে আঘাতস্বরূপ। ঐতিহাসিক পি. কে হিট্টি বলেন : With the death of Ali (661) what may termed the republication period of the caliphate, which began with Abu Bakr (632) came to a end. "৬৬১ খ্রি. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুর সাথে সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত ধরে খিলাফতের যে গণতান্ত্রিক যুগের সূচনা হয়েছিল তার অবসান ঘটে।[১১৬] হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কৃতিত্বের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো–

১. শাসনব্যবস্থায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অনুসরণ

দেশ শাসনের ক্ষেত্রে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে চেয়েছিলেন। তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামলের ব্যবস্থাপনায়

---

১১৬ সম্পাদনা পরিষদ, নিউজ লেটার (ঢাকা : ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ২০০৭ খ্রি.), সংখ্যা ৫ম, ২৯তম বর্ষ : পৃ. ৩-৭।

কোনো প্রকার পরিবর্তন সাধন করা পছন্দ করতেন না। একবার নাজরানের ইহুদিরা [যাদেরকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হিজায থেকে নির্বাসিত করে নাজরানে পাঠিয়েছিলেন] তাদেরকে তাদের পুরাতন স্বদেশ হিজাযে পুনর্বাসিত করার জন্য হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর কাছে অত্যন্ত বিনয়সহকারে আবেদন জানায়। কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই বলে তাদের আবেদন অগ্রাহ্য করেন যে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর চেয়ে অধিক সিদ্ধান্তগ্রহণকারী আর কে হতে পারেন?[১১৭]

২. শূরাভিত্তিক শাসন পরিচালনা

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর শাসনামলে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ব্যাপারে খলিফাকে সাহায্য করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিষদ ছিল যা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ বিভাগ মজলিশ-উশ-শূরা বা উপদেষ্টা পরিষদ নামে খ্যাত ছিল। মুহাজির, আনসারদের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ, বেদুইন নেতা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের নিয়ে আলোচনা হতো। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ মন্ত্রণা পরিষদের পরামর্শ অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাষ্ট্র পরিচালনার সময় বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি নিজেকে ও অন্যান্যদেরকে উপদেশ দিতেন এই বলে যে, পরামর্শ হচ্ছে সঠিক পথের দিশারি। যে পরামর্শ ছাড়া কাজ করে, সে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত হবে।[১১৮]

৩. শাসনকর্তাদের তত্ত্বাবধান

দেশের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শাসনকর্তাদের তত্ত্বাবধান। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ ব্যাপারে বিশেষ নজর দেন। কোনো শাসনকর্তা নিয়োগের সময় তিনি তাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান উপদেশ দান করতেন। মাঝে মাঝে শাসনকর্তা ও প্রশাসনিক দায়িত্বশীলদের কার্যধারা অনুসন্ধান করতেন। একবার হযরত ক্বাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এ দায়িত্ব দান করার সময় নিম্নোক্ত নির্দেশ দেন :

"তুমি নিজের সাথীদের একটি দল নিয়ে রওয়ান হয়ে যাও এবং ইরাকের প্রত্যেক জেলায় ঘুরে ঘুরে শাসকদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করো এবং তাদের চলাফেরা, উঠাবসা ও কার্যধারা গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করো।"

শাসকদের অমিতব্যয়িতা ও দুর্নীতির ক্ষেত্রে তিনি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। একবার ইরদেশের শাসনকর্তা মুসকালা বায়তুল মাল থেকে ঋণ নিয়ে পাঁচশ গোলাম ও বাঁদী আজাদ করেন। কিছুদিন পর এই অর্থ পরিশোধ করতে না পেরে

---

[১১৭] মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, খিলাফতে রাশেদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

[১১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

তিনি আমির মুয়াবিয়া -এর আশ্রয় নিলেন। হযরত আলী জানতে পেরে বললেন :

"আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুক, সে নেতার ন্যায় মহৎ কাজ করে গোলামের ন্যায় হীনভাবে পলায়ন করল এবং অবিশ্বাসীর ন্যায় খেয়ানত করল। যদি সে আত্মসমর্পণ করত তাহলে কারারুদ্ধ হওয়ার অধিক কোনো শাস্তিই সে লাভ করত না। আর তার কাছে কিছু অর্থ থাকলে গ্রহণ করা হতো, অন্যথায় মাফ করা হতো।"

এই হিসাব-নিকাশ থেকে তার নিজের আত্মীয়-স্বজনও বাদ পড়েনি। একবার তার চাচাত ভাই বসরার গভর্নর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বায়তুল মাল থেকে বেশ কিছু অর্থ গ্রহণ করেন। হযরত আলী তার কাছ থেকে এর হিসাব তলব করেন। জবাবে তিনি বলেন, এখনো আমি নিজের পুরো হক গ্রহণ করিনি। কিন্তু এই ওজর পেশ করা সত্ত্বেও তিনি ভীত হয়ে বসরা থেকে মক্কায় চলে গেলেন।

হযরত আলী সুন্দর, ন্যায় এবং স্বাধীন সমাজ উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সুন্দর, ন্যায় এবং স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি সারাজীবন কাজ করে গেছেন।

৪. রাজস্ব বিভাগ

হযরত আলী রাজস্ব বিভাগ বিশেষভাবে সংস্কার করেন। তাঁর পূর্বে বনজ এলাকা থেকে কোনো প্রকার অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করা হতো না; কিন্তু তিনি বনজ এলাকার ওপরও কর বসান। বরসের বনের ওপর বছরে চার হাজার দিরহাম কর বসান।

রাসূলে করীম -এর আমলে ঘোড়ার ওপর যাকাত ছিল না। কিন্তু হযরত ওমর -এর আমলে যখন সাধারণভাবে ঘোড়ার ব্যবসায় শুরু হলো তখন তিনি তার ওপরও যাকাত নির্ধারণ করলেন। হযরত আলী -এর মতে তামাদ্দুনিক ও সামরিক সুবিধার জন্য ঘোড়ার বিস্তারের অবাধ সুযোগ দেওয়া উচিত, তাই তিনি নিজের আমলে ঘোড়ার ওপর যাকাত মওকুফ করে দেন।

রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর মনোভাবসম্পন্ন হলেও প্রজাদের কল্যাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। তাই অক্ষম ও অভাবীদের ব্যাপারে কোনো প্রকার কঠোরতা অবলম্বন করতেন না।

হযরত আলী -এর অস্তিত্ব প্রজাদের জন্য আল্লাহর মহা অনুগ্রহস্বরূপ ছিল। বায়তুল মালের দরজা গরিব ও অভাবীদের জন্য উন্মুক্ত ছিল।[১১৭] বায়তুল মালে সংগৃহীত অর্থ অত্যন্ত উদারভাবে হকদারদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। জিম্মীদের

[১১৭] মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, খিলাফতে রাশেদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।

সাথেও তিনি অত্যন্ত কোমল ব্যবহার করতেন। ইরানে গোপন ষড়যন্ত্রের কারণে বারবার বিদ্রোহ হয়। কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এক্ষেত্রে অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের পরিচয় দেন।

৫. সামরিক ব্যবস্থাপনা

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেই একজন বিরাট অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিলেন। সামরিক বিষয়ে তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখতেন। তাই এ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তিনি সিরিয়া সীমান্তে বিপুলসংখ্যক সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেন। ৪০ হিজরিতে আমির মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন ইরাকের ওপর ব্যাপক হামলা চালান, তখন এই সীমান্ত ঘাঁটিগুলোই প্রথমে তাঁকে সম্মুখে অগ্রসর হতে বাধা দেয়। অনুরূপভাবে ইরানে বারবার বিদ্রোহ ও গোলযোগের কারণে বায়তুল মাল, নারী ও শিশুদের হিফাযতের জন্য তিনি সেখানে অত্যন্ত শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করেন। ওয়াসতাখার ও হাসান যিয়াদের দুর্গ এ উদ্দেশ্যেই নির্মাণ করেন। যুদ্ধসংক্রান্ত নির্মাণ কার্যের ব্যাপারে ফোরাত নদীর পুল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিফ্‌ফিন যুদ্ধে সামরিক প্রয়োজনে এ পুলটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

৬. বাজার নিয়ন্ত্রণ

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সৎ ও ন্যায় নিশ্চিত করার জন্য হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বাজার লেনদেনের জন্য দিকনির্দেশনা জারি করেন। তিনি বাজারে হেঁটে যেতেন, ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করতেন এবং বাজার ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করতেন।

যদি কেউ ইসলামী শরীয়াহ ও নীতির বাইরে সীমালঙ্ঘন করার চেষ্টা করত তাহলে সাথে সাথে তাদেরকে উপদেশ দিতেন এবং সুন্দর ও ন্যায়ের পথ দেখিয়ে দিতেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর লোকজনকে অন্যের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সৎপন্থা অবলম্বন ও আল্লাহভীতির উপদেশ দিতেন। ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরদের প্রজাদের সাথে ভালো আচরণ করার আদেশ দিতেন। যারা ইচ্ছাকৃত এর বাইরে যেত তাদেরকে তিনি শাস্তি দিতেন।

৭. প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সময়ে আরব সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধির ফলে রাজ্যকে প্রদেশে বিভক্ত করে শাসনকার্য পরিচালনার যে রীতি প্রচলিত ছিল তা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সময়েও প্রচলিত ছিল। তাঁর সময়েও সমগ্র সাম্রাজ্য ১৪টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশগুলো আবার জেলায় এবং জেলাগুলো আবার মহকুমায় বিভক্ত ছিল। ওয়ালি, আমিল কাজী, সাহিবুল খারাজ, পুলিশ প্রভৃতি দ্বারা প্রদেশ চালানো হতো। তিনি একটি সঠিক প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপন করেন। প্রশাসনে পুলিশ নিয়োগ দেন এবং জেলখানা তৈরি করেন। তিনি কুফা ও ইরাকের

জেলখানা নির্মাণ করেন। এটাকে বলা হতো 'মুকসি'। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা কয়েদিদের নিরাপত্তা, খাদ্য ও চিকিৎসার অনুমতি দিতেন। মৌসুমি খাদ্য খাওয়ানো, পরিষ্কার পানি ও জামা-কাপড় পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রাদেশিক গভর্নরদের ওপর সতর্ক দৃষ্টিতে রাখতেন এবং ঘুরে ঘুরে তাদের দায়িত্ব পর্যবেক্ষণ করতেন। তিনি তাদের ব্যাপারে নিয়মিত তদন্ত করতেন। তিনি শাসকদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে জনগণের নিকট পরিদর্শক পাঠাতেন। পরিদর্শকরা ছদ্মবেশে পরিদর্শন করতেন। তারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গোয়েন্দা রিপোর্ট পাঠাতেন।

পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দরজা সবসময় উন্মুক্ত ছিল। একবার কোনো এক গভর্নরের বিরুদ্ধে তাঁর নিকট অভিযোগ আসল। যখন এ অভিযোগ প্রমাণিত হলো তখন তিনি তাদেরকে লাঠি দ্বারা শাস্তি প্রদান করেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রাদেশিক গভর্নরদেরকে সবসময় চোখে চোখে রাখতেন। তিনি তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে চিঠি পাঠাতেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্ষমতাকে এককেন্দ্রিক রাখেননি। তাঁর নীতি ছিল ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ করা। তিনি বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরদের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করতেন।

৮. পুলিশ বাহিনী গঠন

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাসনামলে পুলিশ বাহিনী সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করত। পুলিশ বাহিনী অপরাধীদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দিত এবং প্রয়োজনে তাদেরকে গ্রেফতার করত। রাষ্ট্রের অসহায় মানুষের সেবা করাও ছিল পুলিশ বাহিনীর কাজ। এছাড়া পথহারা পথিককে পথ দেখানো এবং যেকোনো প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করাও ছিল তাদের মূল দায়িত্ব।

৯. জনগণের স্বাধীনতা সুরক্ষা

ইসলামী শাসনামলে জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা হচ্ছে সরকারের মূলনীতিসমূহের অন্যতম। এ নীতি দাবি করে যে, বিভিন্ন ধরনের মুক্তচর্চা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত হতে হবে এবং জনগণকে সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে।

ইসলাম স্বীকার করে যে, প্রত্যেক মানবতার মৌলিক অধিকার রয়েছে, আর ইসলামী রাষ্ট্র জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করবে। জীবনকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তার প্রয়োজন মেটাতে জনগণ যে সকল কাজ করতে চায়, ইসলামী রাষ্ট্র সে সকল কাজে কোনো রকম বাধা দিবে না। ইসলামী রাষ্ট্রে জনগণ স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চা করতে পারবে।

উদাহরণস্বরূপ– যদিও ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানের ওপর সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ফরয করেছে। আবার এটা নিষেধ করেছে যে, কাউকে

ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবনের সকল ক্ষেত্রে এ নীতি অনুসরণ করে চলেছেন।

১০. দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য ভাতা

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি জনহিতকর কার্য হলো, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা। তাঁর খেলাফত আমলে যুদ্ধবিগ্রহ ও বিশৃঙ্খলার কারণে বায়তুল মালের আয় খুবই কম ছিল। তবুও তিনি রাজ্যের প্রত্যেকটি মানুষকে বায়তুল মাল হতে ভাতা প্রদান করতেন। অবশ্য ভাতার পরিমাণ খুবই কম ছিল, বিশেষ সন্তোষজনক ছিল না। কিন্তু কমই হক আর বেশিই হক বায়তুল মালে কোনো স্থান হতে অর্থ সমাগম হওয়ামাত্র তিনি ঘোষণা করে দিতেন এবং সাথে সাথে লোকেরা এসে নিজ নিজ নির্ধারিত ভাতা নিয়ে যেত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তিনি দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্যও ভাতা নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন।

উম্মে আলা বলেন, আমার একান্ত শৈশবকালে আমার পিতা আমাকে কোলে করে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে নিয়ে গেলে তিনি আমার জন্য ভাতা নির্ধারিত করে বললেন, গোশ্‌ত এবং রুটিভোজী মানুষ যেরূপ ভাতা পেতে পারে, দুগ্ধপোষ্য শিশুও তদ্রূপ ভাতা পাওয়ার অধিকারী।

আবু ওবায়দা বলেন, এক ব্যক্তি আমাকে বলল, আমার একটি সন্তান জন্মিলে আমি তাকে কোলে করে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট গেলাম। তিনি আমার সন্তানের জন্য একশত দিরহাম ভাতা নির্দিষ্ট করে দিলেন।[১২০]

১১. কুরআন শিক্ষার প্রসার

আল কুরআনের শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রতি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম ওহী লেখক এবং কুরআনের শীর্ষস্থানীয় সংরক্ষক। এজন্য তিনি কুরআন শিক্ষা প্রসারের নানা প্রকার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি মসজিদে মসজিদে কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিভিন্ন উপায়ে কুরআনে পাকের শিক্ষালাভের জন্য তিনি মানুষকে উৎসাহিত করতেন। কেউ কুরআন শিক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি তার জন্য বৃত্তি নির্ধারণ করে দিতেন। বর্ণিত আছে যে, দুই হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থী কুআন শিক্ষার জন্য বৃত্তি পেত। এছাড়া তিনি নিজেও মানুষকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন। তাঁর খেলাফতের সম্পূর্ণ সময়টুকু বিবাদ ও নানা প্রকার অশান্তিতে পরিপূর্ণ থাকলেও তাঁরই প্রচেষ্টায় কুফার জামে মসজিদ দীনী ইল্‌ম হাসিল করার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। দূর দূরান্ত হতে বহু শিক্ষার্থী ও জ্ঞানপিপাসু এই মসজিদে এসে নিজেদের জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করত। কখনও ফজরের নামাযের পর, কখনও বা আসরের ও মাগরিবের নামাযের পর জ্ঞানপিপাসুগণ তাঁর সামনে

---

[১২০] মাওলানা নুরুর রহমান, হযরত আলী (রা.) (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০৪), পৃ. ২০৪

বসে যেত। তিনিও তখন সমস্ত কাজ ভুলে একাগ্র মনে কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা প্রদানে নিমগ্ন হতেন। মোটকথা, হযরত আলী নিজ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাজ্যের সর্বত্র কুরআন শরীফ শিক্ষা সম্প্রসারণের সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।[১২১]

১২. ন্যায় বিচারক হযরত আলী

হযরত আলী জীবনের বেশিরভাগ সময় মদিনায় অতিবাহিত করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর খিলাফতের পুরো সময়টি তিনি কুফায় অবস্থান করেছেন। এ কারণে তাঁর ফিকাহসংক্রান্ত মত ও ইজতিহাদ ইরাকেই বেশি প্রচার লাভ করেছে। হানাফী মাযহাবের ভিত্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের পরে হযরত আলী-এর মত ও তার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের ওপরই সংস্থাপিত হয়েছে। হযরত আলী-এর এ যোগ্যতার কারণে শরিয়াত অনুযায়ী মামলা-মোকদ্দমার বিচার করার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর দক্ষতাও সর্বজনস্বীকৃত ছিল। হযরত ওমর ফারূক বলেছেন:

আমাদের মধ্যে বিচারক হিসেবে অধিক যোগ্য ব্যক্তি হযরত আলী এবং অধিক কুরআন-বিশারদ হযরত উবাই ইবনে ক্বাব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন: 'আমরা পরস্পরে বলতাম যে, মদিনায় সর্বাধিক বিচার-ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত আলী।

স্বয়ং নবী করীম-ও অনেক সময় বিচারকার্যের দায়িত্ব হযরত আলী-এর ওপর অর্পণ করতেন। নবী করীম তাঁকে ইয়েমেনের বিচারপতির দায়িত্বে নিযুক্ত করলে তিনি নিজের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার কথা বলে সে দায়িত্ব গ্রহণ হতে নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিলেন। তখন নবী করীম বললেন:

আল্লাহ্ তা'আলাই তোমার মুখকে সঠিক পথে এবং তোমার দিলকে দৃঢ় ও ধৈর্যসম্পন্ন করে রাখবেন।

হযরত আলী নিজেও বলেছেন, "অতঃপর বিচারকার্যে আমি কখনও কোনোরূপ সংশয় বা কুণ্ঠাগ্রস্ত হইনি।"

---

[১২১] মাওলানা নূরুর রহমান, হযরত আলী (রা.) (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০৪), পৃ. ২০৪

বিচারকার্য পরিচালনা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বহু মূলনীতি ও নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। একবার তাঁকে বলেছিলেন, "হে আলী! তুমি যখন দুই ব্যক্তির বিবাদ মীমাংসা করতে বসবে, তখন কেবল একজনের কথা শুনেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না এবং দ্বিতীয় জনের বক্তব্য না শুনা পর্যন্ত তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখবে।"

মামলা বিচারের ক্ষেত্রে সন্দেহমুক্ত দৃঢ় প্রত্যয় লাভের জন্য মামলার দুইপক্ষ এবং সাক্ষীদের জেরা করা ও এ ব্যাপারে তাদেরকে প্রশ্ন না করা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সুবিচার নীতির অপরিহার্য অংশরূপে নির্দিষ্ট। অপরাধ স্বীকারকারী (confessor) বার বার প্রশ্ন ও জেরা করার পরও নিজের স্বীকৃতির ওপর অবিচল না থাকলে তিনি এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে তাকে কোনো শাস্তি দিতেন না। সাক্ষীদেরকে নানাভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করার পর সাক্ষ্য-উক্তিতে তাদের অবিচল না পেলে সে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তিনি কোনো ফয়সালা করতেন না।

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকে নিশ্চিন্ত করার লক্ষ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা সচেতন থাকতেন। বিচারব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার জন্য রাষ্ট্র-ক্ষমতার অপব্যবহারকে তিনি জঘন্য অপরাধ বলে মনে করতেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যেও কোনোরূপ ভেদনীতিকে প্রশ্রয় দিতেন না। এ ব্যাপারে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। একদা জনৈক ইহুদি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর লৌহবর্মটি চুরি করে নিয়ে গেল। দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ইনি সরাসরি এ ব্যাপারটি কোনো পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না; বরং প্রচলিত নিয়মানুযায়ী আদালতে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করলেন। আদালতের বিচারক তাঁকে অভিযোগের সপক্ষে দুজন সাক্ষী হাজির করার আদেশ দিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর দুই পুত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করলেন। কিন্তু বিচারক অভিযোগকারীর নিকটাত্মীয় বলে এদের সাক্ষ্য গ্রহণ না করে বরং মামলাটিই খারিজ করে দিলেন। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ইহুদি নিজেই তার অপরাধ স্বীকার করল এবং পবিত্র কালিমা পড়ে ইসলামের কাফেলায় শরিক হলো।[১২২]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিচার-ফয়সালা আইনের দৃষ্টান্তরূপে গণ্য। এ কারণে মনীষিগণ এটি লিপিবদ্ধ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে দুষ্ট লোকেরা এতে নানারূপ বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটায়। এর ফলে আইন বা বিচার জগতে এটি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়।

---

[১২২] হযরত আলী (রা.) : জীবন ও খিলাফত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

অধ্যায়-৮

হযরত আলী-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব ছিলেন রাসূল -এর অন্যতম সহযোগী যা তাঁর চারিত্রিক গুণাবলিকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। হযরত আলী ছিলেন একজন সৎ, অনাড়ম্বর প্রিয়, ন্যায়পরায়ণ, কর্তব্যপরায়ণ, দয়ালু, সংযমী, উদার শাসক। তাঁর মতো অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শাসক বিরল। তাঁর চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি ছিলেন সচ্চরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ। আল্লাহর দীন এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি যেমন ছিলেন নিষ্ঠাবান, তেমনি দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশায় ছিলেন অত্যন্ত কোমল। তিনি যেমনি ছিলেন সাহসী বীরযোদ্ধা, তেমনি ছিলেন জ্ঞানের মহাসমুদ্র। একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ, ভাষাবিদ, বৈয়াকরণ, কবি, সাহিত্যিক ও দক্ষ শিক্ষক। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব প্রায়ই বলতেন, "যদি আলী না থাকত তাহলে ওমর ধ্বংস হয়ে যেত। তিনি আরও বলতেন যে, জটিল ও কঠিন সমস্যাগুলো আলী -ই সমাধান করতে সক্ষম ছিলেন।"[১২৩]

১. শারীরিক গঠন

হযরত আলী স্বাভাবিক উচ্চতায় অধিকতর উঁচু ছিলেন। মুখমণ্ডলের আকার গোলাকার, আকর্ষণীয় এবং প্রশস্ত কালো চোখ। পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় তাঁর মুখমণ্ডল কিরণ দিত। তাঁর ঘাড় বেশ প্রশস্ত এবং হাত দু'টি লম্বা ছিল। অধিকাংশ সময় তিনি মাথা টাক করতেন। তাঁর দাড়ি লম্বা ও ঘন ছিল।[১২৪] তাঁর ঘাড়ের মেরুদণ্ড ছিল একটা শক্তিশালী সিংহের ন্যায়। তিনি যদি কোনো লোকের বাহু চেপে ধরতেন তাহলে সে লোকটির নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত। যুদ্ধের ময়দানে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন। তিনি ছিলেন খুব বেশি শক্তিশালী, সাহসী ও বীরযোদ্ধা।

---

১২৩ হযরত আলী ও তাঁর তাফসীর চর্চা (রাজশাহী : গবেষণা পত্রিকা, কলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১-০২) সংখ্যা ৭, পৃ. ১৩৯)

১২৪ আল্লামা জালাল উদ্দীন আহমদ আমজাদী, মীর মুহাম্মদ খায়রুল্লাহ অনূদিত, খোলাফায়ে রাশেদীন, পৃ. ১৩৭।

২. ধার্মিকতা

হযরত আলী মহৎ ও প্রভাবশালী বংশের লোক হযরত মুহাম্মদ -এর নিকট আত্মীয়দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর চরিত্র ছিল মহৎ এবং অনেক প্রশংসনীয় যোগ্যতার।

আল্লাহর নবী যাদেরকে দুনিয়ায় থেকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে হযরত আলী অন্যতম। রাসূল আরও বলেন- "একমাত্র ঈমানদাররা ছাড়া কেউ আলী কে ভালোবাসত না এবং মুনাফেকরা ছাড়া কেউ হযরত আলী কে ঘৃণা করত না।" তিনি আরও বলেন– "যে ব্যক্তি হযরত আলী কে গালি দিবে সে আমাকে গালি দিবে।"

হযরত আলী সাহাবীদের মধ্যে উন্নত চরিত্রের অধিকারী ও জ্ঞানী ছিলেন। তাঁকে অধিক জ্ঞানের অধিকারী হিসেবে বিবেচনা করা হতো, তাঁর জ্ঞানার্জনের আগ্রহ ছিল প্রবল। তিনি নিজেই বলতেন, আমার প্রভু আমাকে বুদ্ধিমত্তা ও স্পষ্ট ভাষা দান করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেসব অল্পসংখ্যক মুসলমান শিক্ষিত ছিলেন হযরত আলী তাঁদের অন্যতম। তিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন। সর্বোপরি হযরত আলী ছিলেন ওহী লেখক।

তিনি বলতেন– হাতের লেখার অনেক সংবাদ থাকে। সুতরাং সুন্দর লেখাই উত্তম। হযরত আলী যা কিছু শিখতেন তার ওপর অনেক বেশি অনুশীলন করতেন। তিনি বলতেন- তোমরা জ্ঞানার্জন করো তাহলে তুমি একজন সুপরিচিত মানুষ হবে। তোমরা এটা অনুসরণ করো তাহলে একজন জ্ঞানী মানুষ হবে।

তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে- একজন পণ্ডিতকে পণ্ডিত বলা যেতে পারে না যতক্ষণ না সে জ্ঞানের পরিপক্বতা অর্জন করবে। হযরত আলী তৎকালীন সময়ে সুন্নাহর ওপর সবচেয়ে পারদর্শী ছিলেন। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি সুন্নাহ অনুসরণ করতেন।

সরল-সহজ জীবন পরিচালনা হযরত আলী -এর অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাঁর সম্পদ অর্জন করার অনেক সুযোগ ছিল। অনেক বিলাসী জীবনযাপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সরল, সোজা, নমনীয় ও মধ্যম জীবন বেছে নিয়েছিলেন। লোকজন হযরত আলী কে নিঃস্বার্থ বিশ্বাস করতেন। জনগণের মাঝে তাঁর সম্মান মর্যাদায় ছিল অনেক বেশি। মুনাফেক ছাড়া তাঁকে সমালোচনা, দোষারোপ অথবা অভিযোগমূলক কোনো কথা কেউ বলেনি বললেই চলে।

মানুষের এরূপ মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও হযরত আলী সৎ জীবন ও সীমিত আশার প্রতিই জোর দিতেন। তিনি ছিলেন গভীর ধার্মিক ও অধিক সরল, সর্বদা

নমনীয় ও ভদ্রতায় বিশ্বাসী। তিনি বন্ধুভাবাপন্ন, উৎফুল্ল মেজাজ ও অধিক সম্মান বোধের অধিকারী ছিলের। তিনি ছিলেন সুঠাম দেহি ও আনন্দঘন চেহারার অধিকারী। তিনি কখনো গর্ব ও উদ্যত আচরণ করতেন না। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিজের দায়িত্ব নিজেই পালন করতেন। এমনকি তিনি খলিফা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর জন্য কোনো চাকর বা সাহায্যকারী রাখতেন না। তাঁর পদমর্যাদায় তাঁকে সবাই সম্মান করুক এটা তিনি চাইতেন না। এসব আচরণের মাধ্যমে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমদের জন্য মানবতার এক চরম ও উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

মহানুভবতা তাঁর চরিত্রের অনেক গভীরে পৌছেছিল। জনগণ জানত যে, যদি তারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট কোনোকিছু চাইত; আর যদি তিনি তা দিতে না পারতেন, তাহলে তিনি অনেক বেশি লজ্জাবোধ করতেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা। কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের ব্যাপারে তিনি অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

৩. অসাধারণ ব্যক্তিত্ব

একজন সত্যনিষ্ঠ খাঁটি মুসলমান ও অন্যান্য মানবিকতার দিক থেকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চরিত্র ছিল অনন্য উদাহরণ। তিনি যেমনি সাহসী তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে একজন বিচক্ষণ সৈন্য ও সেনাপতি ছিলেন। তিনি সকলের প্রতি নম্র-ভদ্র, দয়ালু ও উদার প্রকৃতির ছিলেন এমনকি তাঁর হত্যাকারীর প্রতিও।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দানশীলতায় ছিলেন উদার। তিনি কোনো ভিক্ষুক বা যারা তার কাছে কোনো সাহায্যের জন্য আসত তাদেরকে কখনো খালি হাতে ফিরিয়ে দেননি। যখন তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ দরিদ্রদের মাঝে বিলিয়ে দিলেন তখন কঠিন এক আর্থিক সংকটে পড়ে যান। পরবর্তীতে তাঁর ও তাঁর পরিবারের খাদ্য ব্যবস্থার জন্য নিজের অস্ত্রগুলো বিক্রি করে দিলেন। এমনকি যখন তাঁর কাছে খাদ্য ক্রয়ের আর একটি পয়সাও অবশিষ্ট থাকল না তখন তিনি তাঁর পেটে পাথর বেঁধে ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করলেন।

তিনি উল্লেখ করেন একদা আমি আমার তরবারি বিক্রি করতে গেলাম। আল্লাহর শপথ যদি আমার কাছে এক জোড়া পাজামা কিনার সামর্থ্যও থাকতো তাহলে কখনোই আমি তরবারি বিক্রি করতাম না।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু চাকচিক্যকে ঘৃণা করতেন এবং দানশীলতায় ছিলেন খুবই তৎপর। তিনি প্রায়ই বলতেন, সৌভাগ্যশীল বা সুখী তারাই যারা এই দুনিয়ার জীবনকে পরিত্যাগ করে পরকালকে গ্রহণ করে। তাঁর মৃত্যুর সময় তিনি কোনো

স্বর্ণ বা রৌপ্য রেখে যাননি- শুধু তাঁর পরিবারের জন্য ৭০০ দিরহাম রেখে গিয়েছিলেন।

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন খুবই সাধারণ প্রকৃতির। তিনি সহজ সরল জীবনযাপন করতেন। মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও আত্মবিমুখতা ছিল তাঁর জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁর বন্ধু ও শত্রু উভয়ের কাছেই একজন বিজ্ঞ পরামর্শদাতা ছিলেন।

যদিও কখনোই তিনি খলিফা হতে চাননি, কিন্তু যখন তিনি নির্বাচিত তখন নিজেকে দায়িত্বশীলতার জায়গা থেকে উৎসর্গ করেন। বৃহৎ এই সাম্রাজ্যের খলিফা হওয়ার পরও তিনি অতি সাধারণ জীবনযাপনেই অভ্যস্ত থাকেন।

তাঁর সততা বা আমানতদারিতা সকলের কাছেই স্পষ্ট ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা হিজরতের উদ্দেশে রওনা করলেন, তখন তাঁর কাছে গচ্ছিত সকল সম্পদ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে রেখে গেলেন, যাতে তিনি এগুলো যথাযথ মালিকের কাছে পৌছে দিতে পারেন।

হযরত আলী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই উপদেশকে বাস্তবায়নের জন্য এবং সকল বস্তুকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অটল ছিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কর্মকাণ্ডে মুসলমান জাতি তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাকবে। সততা ও বিশ্বস্ততা তাঁর জীবনকে মহান করে তুলেছে।

৪. কুরআন ও তাফসীরশাস্ত্রে হযরত আলী

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস কুরআন মজীদ। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কুরআনের মহাসমুদ্র মন্থন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। যে কয়জন সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় পূর্ণ কুরআন মজীদ মুখস্থ করে নিয়েছিলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের অন্যতম। কুরআনের কোন সূরা বা কোন আয়াতটি কী প্রসঙ্গে ও কোন সময় নাযিল হয়েছিল, এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি এ কথা নিজেই দাবি করে বলেছিলেন। এ কারণে কুরআনের মুফাসসিরদের উচ্চতম স্তরে তিনি পরিগণিত। উত্তরকালে রচিত বড় বড় তাফসীর গ্রন্থে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যাখ্যামূলক বর্ণনাসমূহ বিশেষভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বাল্যকাল থেকেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন বিধায় অপরাপর সাহাবী অপেক্ষা তাফসীরশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভে সক্ষম হন। তিনি একজন বিশিষ্ট কাতিবে ওহী (ওহী লেখক) ছিলেন। তাই আল-কুরআনের বিভিন্ন প্রকারের ইলম সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জনে সক্ষম হন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

ইন্তেকালের পর তিনিই আল-কুরআনের সূরাসমূহ নাযিলের ক্রমানুসারে সাজান।[১২৫]

হযরত আলী ছিলেন আল-কুরআনের অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্ম উদঘাটনে খুবই পারদর্শী। যেমন হযরত আবু তুফাইল বলেন, একদা আমি জুময়ার খুতবায় আলী কে বলতে শুনেছি, তোমরা আমাকে প্রশ্ন কর! শপথ আল্লাহর! আমি তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। তোমরা আমাকে আল-কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। শপথ আল্লাহর! এর প্রতিটি আয়াত দিবা-রাত্রি, পাহাড়-পর্বত, সমতল ভূমি যেখানেই নাযিল হয়েছে সে সম্পর্কে আমি অবগত আছি।[১২৬]

আল-কুরআন থেকে মাসআলা নির্গত করার ক্ষেত্রে হযরত আলী খুবই পারদর্শী ছিলেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর জনৈক পাগলিনীকে যেনার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেন। হযরত আলী এর প্রতিবাদ করে বলেন, কুরআনের বিধানমতে, পাগলের কার্যকলাপ ধর্তব্য নয়। সঙ্গে সঙ্গে হযরত ওমর তাঁর রায় প্রত্যাহার করে বললেন, যদি আলী না থাকত, ওমর ধ্বংস হয়ে যেত।[১২৭] একদা হযরত আলী বললেন, আমি কি তোমাদেরকে আল-কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত কোনটি তা বলে দিব না? তা হলো নিম্নরূপ :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيرٍ -

"তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে তা তো তোমাদের কার্যকলাপেরই ফল। আর তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি আপনা থেকেই ক্ষমা করে দেন।"[১২৮]

হযরত আলী বলেন, আমি নবী করীম -এর নিকট এ আয়াতের তাফসীর এভাবে শুনেছি যে, তিনি বলেন, "দুনিয়াতে তোমাদের ওপর কোনো শাস্তি, রোগ-ব্যাধি অথবা কোনো বিপদ তোমাদের কৃতকর্মের কারণেই আপতিত হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে শাস্তির পুনরাবৃত্তি করার ক্ষেত্রে অধিক করুণাময়। পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলা যে অপরাধের শাস্তি দান করেন, আখিরাতে তিনি সে শাস্তির পুনরাবৃত্তি করবেন না।"[১২৯]

---

১২৫ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০-৫০।

১২৬ জালালুদ্দীন সুয়ূতী আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, বৈরুত ১৯৮৭ খ্রি., দারু ইহ্য়াইল 'উলূম, খ. ২, পৃ. ৫২৮-৫৩০।

১২৭ ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন, হযরত আলী ও তাঁর তাফসীর চর্চা (রাজশাহী : গবেষণা পত্রিকা, কলা অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১-০২) সংখ্যা ৭, পৃ. ১৩৯)

১২৮ সূরা শূরা : ৩০

১২৯ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল-মুসনাদ, (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ১০৫-১০৮)

জনৈক ব্যক্তি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে তাঁর পরে সর্বাপেক্ষা বড় 'আলিম হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তবে কুরআন ছাড়া অন্য কোনো ইলম আপনার কাছে আছে কি? উত্তরে বললেন, নেই। তবে কুরআন বোঝার যেসব ইলম প্রয়োজন তা আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন।[১৩০] তিনি সমসাময়িক সাহাবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুফাসসির হিসেবে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর থেকে আমরণ তাফসীর শিক্ষাদানে নিয়োজিত ছিলেন।

ড. শাওকী দায়েফ বলেন, মুফাস্সির হিসেবে তিনি এত প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, তৎকালের শ্রেষ্ঠ দশজন তাফসীরকারের মধ্যেই তিনি পরিগণিত হন।

খারেজি ফির্কার লোকেরা নিতান্ত আক্ষরিক অর্থে কোনো ব্যক্তিকে মীমাংসাকারী বা পারস্পরিক বিবাদ মিটানোর জন্য মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাল এবং তারা দলিল হিসেবে কুরআনের আয়াত,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

'এক আল্লাহ্ ছাড়া মীমাংসাকারী আর কেউ হতে পারে না'।

পেশ করল, তখন তিনি এরূপ যুক্তি উপস্থাপনের অযৌক্তিকতা ও অবান্তরতা প্রমাণ করে বললেন: 'আল্লাহই যে চূড়ান্ত বিচারক তাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই যখন জনসমাজের লোককে সালিশ মানবার জন্য নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

"স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিরোধের আশঙ্কা দেখা দিলে স্বামীর পক্ষ হতে একজন এবং স্ত্রীর পক্ষ হতে একজন মীমাংসাকারী প্রেরণ কর।"[১৩১]

তখন মুসলিম জাতি ও জনতার পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসার জন্য জনসমাজ হতেই কাউকে নিযুক্ত করা ও মেনে নেওয়া হলে সেটি অন্যায় বা কুরআন-বিরোধী কাজ হবে কেন? আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও সর্ববিষয়ে তাঁর চূড়ান্ত ক্ষমতা তো কোনো-না-কোনো মানুষের দ্বারাই কার্যকর ও বাস্তবায়িত হবে। গোটা মুসলিম জাতির পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের ব্যাপারটি কি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের তুলনায়ও নগণ্য ব্যাপার? বস্তুত কুরআনের তাফসীর ও আয়াতসমূহের

---

১৩০ ড. শওকী দায়িফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, মিশর : দারুল নাহজাত প্রকাশনী, তা. বি.), পৃ. ৮৬
১৩১ সূরা নিসা, ৪ : ৩৫

তাৎপর্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পর্যায়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এত মূল্যবান বর্ণনাসমূহ উদ্ধৃত হয়েছে যে, সেটি একত্রে সন্নিবেশিত করা হলে একখান বিরাট গ্রন্থের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কথার শুরুতে যে শপথ করেছেন, এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর এ কথা হতে বোঝা গেল, কুরআনের আয়াতসমূহ আঁটি ও দেহের মতো। আর এর অর্থ, তাৎপর্য ও তত্ত্ব বৃক্ষের মতো- যা সেই আঁটি ও বীজ হতে নির্গত হয়। আর এটি সেই প্রাণের মতো, যা দেহে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ একটা ক্ষুদ্রাকার বীজ ও আঁটি হতে যেমন শাখা-প্রশাখা সমন্বিত একটি বিরাট বৃক্ষের উদগম হতে পারে-যা মূলত সেই বীজ ও আঁটির মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল; আর প্রাণশক্তি হতে-যা দেহে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে-যেমন সমস্ত মানবীয় কর্ম ও কীর্তিকলাপ প্রকাশিত হয়, কুরআনের শব্দসমূহ হতেও-যা দেহের মতোই-বিপুল অর্থ ও তাৎপর্য বের হতে পারে।

বস্তুত হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যে কুরআনের তত্ত্ব ও দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন, এটি তাঁর উক্ত কথাটি হতেই প্রমাণিত হয়।[১৩২]

৫. হাদিসশাস্ত্রে হযরত আলী

হাদিসের ক্ষেত্রেও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মনীষা ও পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ, বিশাল ও গভীর মহাসমুদ্র সমতুল্য। বাল্যকাল হতে পূর্ণ ত্রিশটি বছর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্যে ও নিবিড় সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। এ কারণে ইসলামের পূর্ণ আইন-বিধান ও রাসূলের বাণী সম্পর্কে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পর তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিশারদ। এ ছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর সমস্ত বড় বড় সাহাবীর মধ্যে তিনিই সর্বাধিক বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর প্রায় ত্রিশটি বছর পর্যন্ত তিনি কুরআন, হাদিস এবং দীন ও শরীয়ত প্রচারে নিরন্তর ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। প্রথম তিনজন খলিফার আমলেও এ দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। তাঁর নিজের খিলাফত আমলেও নানা ফিতনা-ফাসাদ ও রক্তাক্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্ত্বেও জ্ঞান বিস্তারের এ স্রোত কখনো বন্ধ হয়নি; বরং এটি অব্যাহত ধারায় প্রবহমান ছিল। এ কারণে প্রথম তিনজন খলিফার তুলনায় হাদিস বর্ণনায় অধিক সুযোগ তিনিই লাভ করেছেন। নবুওয়াতের জমানায় যে কয়জন সাহাবী হাদিস লিখে রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও একজন।

---

১৩২ খোলাফায়ে রাশেদীন, আব্দুর রহীম

আবূ তুফায়ল আমির ইবনে ওয়াসিল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে বিশেষভাবে কোনো জিনিস দান করিয়াছেন কি? জবাবে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে আমাকে এমন কোনো জিনিস দিয়ে যাননি, যা সকল লোককে সাধারণভাবে দেননি। তবে আমার এই তরবারীর খাপের মধ্যে যা লিখিত অবস্থায় আছে, তা আমাকে তিনি বিশেষভাবে দান করেছেন।"

তাঁর লিখে রাখা হাদিস সম্পদকে তিনি 'সহীফা' নামে উল্লিখিত করতেন এবং এ 'সহীফা' তাঁর তরবারির খাপের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতেন।[১৩৩]

সহীফায়ে আলীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো এ সহীফা-এর মধ্যে কি কি লিখিত আছে? তিনি বললেন : এতে রক্ত পাতের বদলা, বন্দি মুক্তিদান ও কাফির হত্যার শাস্তি স্বরূপ মুসলিম নিহিত হবে না– এসব কথাগুলো লিখিত আছে। এ সহীফার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বুখারি শরীফের বর্ণনা নিম্নরূপ–

"ইয়াযীদ ইবনে শরীফ বলেন : আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একদিন 'আজুর' নামক স্থানে মিম্বারে দাঁড়িয়ে আমাদের সামনে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর স্কন্ধে ঝুলানো তরবারীতে এক খানা সহীফা লটকানো ছিল। তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব ও এই সহীফা ব্যতীত আমার নিকট পাঠ যোগ্য কোন কিতাব নেই। এই বলে তিনি সহীফা খানি খুলে ধরলেন, তাতে উষ্ট্রের দাত রক্ষিত দেখলাম এবং লিখিত দেখলাম : মদিনা 'আইব' নামক স্থান হতে অমুক পাহাড় পর্যন্ত হারাম। এ স্থানে যদি কেহ কোন বিদ'আত করে তবে তার উপর আল্লাহ, ফিরিশতা ও সমগ্র মানুষের অভিশাপ। আল্লাহ তার কোন অর্থ ব্যয় বা বিনিময় কবুল করবেন না। উহাতে আরো লিখা ছিল : সকল মুসলিমের যিম্মা এক, এর জন্য তাদের সকলেই চেষ্টা করবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সহিত কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবে তাদের উপর আল্লাহ, ফিরিশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ। যে ব্যক্তি স্বীয় পৈত্রিক সম্পর্ক ব্যতীত অপর কারো সহিত পৈত্রিক সম্পর্ক স্থাপন করবে, তার উপরও আল্লাহ, ফিরিশতা ও মানবকুলের অভিশাপ। তার কোন ব্যয় বা বদলা গ্রহণ করা হবে না।"

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এ সহীফায় কি ধরনের হাদিস লিপিবদ্ধ ছিল তার উল্লেখ পাওয়া গেলেও এর হাদিস সংখ্যা কত ছিল তা জানা যায়নি।

হাদিস বর্ণনায় তিনি অত্যন্ত বেশি সতর্ক ও কঠোর প্রকৃতির ছিলেন। এ কারণে তাঁর বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা খুব বেশি হয়নি। মাত্র ৫৮৬টি হাদিস তাঁর সূত্রে গ্রন্থাবলিতে উদ্ধৃত হয়েছে।[১৩৪]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের সংখ্যা ৫৮৬টি। তন্মধ্যে ২০৭টি সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। ৯টি হাদিস কেবল বুখারীতে এবং

---

১৩৩ ইবনুল কায়্যিম, ইলামুল মুওয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামীন, (বৈরুত : লেবানন, দারউল জীল ১৯৭৩ খ্রি.) খ. ১. পৃ. ১২।

১৩৪ খোলাফায়ে রাশেদীন, আব্দুর রহীম

১৫টি হাদিস সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে এবং বাকিগুলো অন্যান্য কিতাবে উক্ত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রতিকূল অবস্থার দরুন তাঁর হাদিসগুলো যথাযথভাবে সংকলিত হয়নি বিধায় আমরা তাঁর ইলমে হাদিসের বিশাল ভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত।

৬. ফিকাহশাস্ত্রে হযরত আলী

ফিকাহ ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত। বড় বড় সাহাবিগণ- এমনকি তাঁর বিরুদ্ধবাদীরাও-বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর নিকট হতে শরীয়াতের সিদ্ধান্ত জেনে নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তির বড় কারণ এই ছিল যে, তিনি নিজে অনেক বিষয়ে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন। কুরআন মজীদ হতে ব্যবহারিক জীবনের জন্য জরুরি আইন-বিধান বের করা এবং বিভিন্ন জটিল বিষয়ে ইসলামের নির্দেশ ও সিদ্ধান্ত জানার জন্য ইজতিহাদ করা তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ও প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত।[১৩৫] ইমাম ইবনে হাযম (রাঃ) বলেন, সাতজন সাহাবী সবচেয়ে বেশি ফাতাওয়া প্রদান করেছেন। তাঁরা হলেন :

১. হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ)।
২. হযরত আলী বিন আবু তালিব (রাঃ)।
৩. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)।
৪. হযরত যায়দ বিন সাবিত (রাঃ)।
৫. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)।
৬. হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)।
৭. হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ)।[১৩৬]

এতেই প্রতীয়মান হয় যে, সর্বাধিক ফাতওয়া বর্ণনাকারী সাহাবা মাত্র ৭ জন। তন্মধ্যে হযরত আলী (রাঃ)-এর অবস্থান দ্বিতীয়। আর খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে একমাত্র হযরত আলী (রাঃ)-ই সর্বাধিক ফাতাওয়া বর্ণনাকারী সাহাবী।

আলী (রাঃ) ইজমা ও কিয়াসের মাধ্যমে এসব বিষয়ে সমাধান দিতেন। জীবিত পুড়িয়ে হত্যা করার শাস্তি মাত্র কতিপয় নাস্তিকের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) যখন তাঁকে জানালেন যে, রাসূলে করীম (সাঃ) এহেন শাস্তি প্রদান নিষিদ্ধ করেছেন তখন তিনি নিজের কাজে লজ্জিত হন। শরাব পানের

---

১৩৫ খোলাফায়ে রাশেদীন, আব্দুর রহীম

১৩৬ আবুল ফিদা, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (বৈরুত : মাকতাবাতুল মা'আরিফ' ১৯৭৪ খ্রি.), খ. ৭, পৃ. ৩৫৯-৬০।

শাস্তির ক্ষেত্রে কোড়ার সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এজন্য আশি কোড়া নির্ধারণ করেন।

তাঁর সময়ে এক ব্যক্তি রমজানে শরাব পান করলে তাকে ৮০ পরিবর্তে ১০০ কোড়া মারা হয়। কারণ সে শরাব পান করার সাথে সাথে রমজানেরও অমর্যাদা করেছিল।

যারা কোড়া মারতো তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, চেহারা ও লজ্জাস্থান ছাড়া শরীরের সর্বত্র কোড়া মারতে পারবে। মেয়েদেরকে বসিয়ে শাস্তি দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং এ সময় তাদের শরীর কাপড় দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ না হয়। অনুরূপভাবে রজম করার সময়ও মেয়েদেরকে নাভি পর্যন্ত মাটির মধ্যে গেড়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

অপরাধের স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে কেবল একবার স্বীকারোক্তিকে যথেষ্ট মনে করা হতো না। একবার এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, আমীরুল মু'মিনীন! আমি চুরি করেছি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন এবং তাকে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু সে পুনর্বার যখন উপস্থিত হয়ে নিজের অপরাধ স্বীকার করল, তখন তিনি বললেন- এবার তুমি নিজেই নিজের অপরাধ প্রমাণ করে দিয়েছ। অতঃপর তিনি তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন।

তার মূলনীতি ছিলো কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য নিছক অপরাধের সংকল্প যথেষ্ট নয়, মূল অপরাধ-কার্যে লিপ্ত হওয়াও জরুরি। একবার এক ব্যক্তি একটি গৃহে সিঁদ কাটল; কিন্তু কোনোকিছু চুরি করার পূর্বে সে ধরা পড়ল। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে তাকে পেশ করা হলে তিনি তাকে কোনো প্রকার শাস্তি দিলেন না।

দশ দিরহামের কম চুরি করলে হাত কাটার বিধান ছিল না। অপরাধী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকলে নেশা ছুটে যাওয়ার অপেক্ষা করা হতো।

৭. আরবি সাহিত্যে হযরত আলী

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আরবি সাহিত্যের দিগন্তে এক দীপ্তিমান নক্ষত্র। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন জ্ঞানের আকর এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাঁর প্রবেশদ্বার।[১৩৭] আরবি সাহিত্যের গদ্য ও পদ্য উভয় শাখায় হযরত আলীর রাদিয়াল্লাহু আনহু পদচারণা ছিল। তাঁর মুখনিঃসৃত বক্তৃতামালা,

---

১৩৭ Benton, William. THE NEW Incyclopaedia Britannica (Chicago : marcropedia' 1984) v. 1, p. 575-574.

হৃদয়গ্রাহী খুতবা ও জ্ঞানগর্ভ বাণী, উচ্চাঙ্গের পত্রাদি এবং মূল্যবান উপদেশমালা 'আরবি গদ্য সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তাঁর এ সকল সাহিত্যকর্ম নাহজুল বালাগাহ' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। আরবি গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন দিক ছাড়াও তাঁর বহু কবিতা আরবি গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে রচিত তাঁর এসব কবিতা দিওয়ানু আলী গ্রন্থে সংরক্ষিত হয়েছে।[১৩৮]

ভাষা, খুতবা ও বক্তৃতা প্রদানে সকল খলিফার মধ্যে হযরত আলী রা. ছিলেন প্রচার শীর্ষে। তাঁর বক্তৃতামালা ছিল ভাষালংকারে পরিপূর্ণ। অতি অল্প কথায় ব্যাপক ভাব প্রকাশে তিনি ছিলেন পারদর্শী। ভাব, ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি, উপমা, অলংকার, রচনাশৈলী উপস্থাপনা প্রভৃতি দিক দিয়ে তাঁর খুতবা ছিল হৃদয়গ্রাহী। এসব বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ খুতবা শ্রবণে শ্রোতাবৃন্দ তন্ময় হয়ে যেত।[১৩৯]

হযরত আলীর লিখিত পত্রাবলি আরবি সাহিত্যে এক বিরাট স্থান দখল করে রয়েছে। বিভিন্ন স্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিভিন্ন লোকের নিকট উপদেশসহ পত্র পাঠিয়েছেন। পথভ্রষ্ট লোকদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে ফিরে আসার জন্য পত্রের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন। উন্নত ভাব, ভাষা, অকাট্য যুক্তি ও অমূল্য উপদেশ সমৃদ্ধ তাঁর এসব চিঠিপত্র আরবি সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁর রচিত এসব চিঠিপত্রকে 'নাহজুল বালাগাহ' গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে।[১৪০]

হযরত আলী রা. বিভিন্ন সময়ে যেসব জ্ঞানগর্ভ বাণী প্রদান করেছেন, সেগুলো আরবি সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদরূপে বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর বাণী সমষ্টিকে সাহিত্যিকগণ বিভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথকভাবে সংকলন করেছেন। তাঁদের সংকলিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে নাহজুল বালাগাহ, গুরারুল হিকাম ওয়া দুরারুল কালিম, আলফু কালিমাহ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৪১]

আরবি গদ্য সাহিত্যের ন্যায় পদ্য সাহিত্যেও হযরত আলী রা.-এর অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি যেসময় জন্মগ্রহণ করেন, তখন আরবে কাব্যচর্চার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। অতি উন্নত মানের কাব্য সৃষ্টিতে তদানীন্তন আরব কবিগণ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আরম্ভ করে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই কবিতার মাধ্যমে

---

১৩৮ Siddiqi, Dr. Amir Hasan, Islamic State (Karachi : The Jamiyatul Falah Publications), p. 113-115.
১৩৯ হান্না আল-ফাকুরী, তারীখুল আদাবিল আরাবী, (বৈরুত : দারুল জিল ১৯৮৬ খ্রি.) পৃ. ৩৩৪-৩৪৫।
১৪০ আশ-শরীফ আল-রাযী, আবুল হাসান, মুহাম্মদ, নাহজুল বালাগাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯১-৪৩।
১৪১ R.A.Nicholsor, A Literary History of the Arabs (Cambridge : The University Press' 1962)

তারা নিজেদের মনের ভাব ব্যক্ত করতেন। নবুওয়াত লাভের পর আল-কুরআন নাযিল হতে থাকলে আরব কবিগণ কুরআন চর্চায় নিমগ্ন হন। ফলে এ সময় তাদের কাব্যচর্চায় কিছুটা ভাটা পড়ে। কিন্তু পরবর্তীতে বিধর্মীরা তিরস্কারমূলক কবিতার মাধ্যমে মুসলমানদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে থাকে। ফলে কবিতার মাধ্যমে বিধর্মীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জবাব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবিতার মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করার ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান। তাতে একদল সাহাব কাব্যচর্চা শুরু করেন এবং পৌত্তলিকদের বিদ্রূপের সমুচিত জবাব দিতে থাকেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি কাব্যের ছন্দে ভাবের যে অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন, তা মানসম্পন্ন কবিতা হিসেবে বিবেচিত। তিনি বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে যেসব কবিতা রচনা করেছেন, সেগুলো দিওয়ানু আলী' গ্রন্থে সংরক্ষিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে অনেক সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে, গ্রন্থটিতে সংকলিত সকল কবিতা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর রচিত নয়। তবে অধিকাংশ আরব পণ্ডিত মনে করেন যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন এবং এ গ্রন্থটির অনেক কবিতা তাঁর নিজের রচিত।[১৪২] বংশ গৌরব পুঁজি করে নিষ্ক্রিয় থাকাকে ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। তবে মানুষের মধ্যে সদাচরণ লালনের জন্য বংশের একটি ভূমিকা অবশ্যই আছে। বংশের প্রভাবে নম্রতাকে কেউ যেন দুর্বলতা না ভাবে তার ওপর আলোকপাত করে আমির মুয়াবিয়াকে উদ্দেশ্য করে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর রচিত কবিতাটি তাঁর বাস্তববাদিতার প্রমাণ বহন করে।

আধুনিক আরবি গদ্য সাহিত্যের ন্যায় প্রাচীন গদ্য সাহিত্যের পরিধি ব্যাপক ছিল না। সে যুগে আরবি গদ্য সাহিত্য কুরআন, তাফসীর, খুতবা, বক্তৃতা, ওসীয়াত, চিঠিপত্র ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তৎসময়ে তিনি আরবি সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় পদচারণা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি বিশুদ্ধ ভাষা ও অলংকারপূর্ণ শব্দ ব্যবহারে ছিলেন পারদর্শী[১৪৩] বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল কাসিম মুহাম্মদ কাররু আব্দুল্লাহ গুরাইহ বলেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর রচিত নাহজুল বালাগাহ ছাড়াও আরও ১১টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।[১৪৪] যেমন :

---

১৪২ শরফুদ্দীন, হাজী মুহাম্মদ, দিওয়ানু আমীরিল মু'মিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু (কানপুর : মাতবাউ কাইয়ুম' তা. বি.), পৃ.২০–২২।

১৪৩ আবুল কাসিম মুহাম্মদ কাররু আবদাল্লাহ গুরাইহ, শাখসিয়াতুন আদাবিয়্যাহ মিনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিব (বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হায়াত' ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ১৫৭-১৬০।

১৪৪ যায়দান জুরজী, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরবিয়া (কয়রো : দারুল হিলাল ১৯৫৭ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২২৩-২২৫।

১. আলফু কালিমাহ : নাহজুল বালাগাহ গ্রন্থের পাদটীকায় ইবনু আবীল হাদীদ এ গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এটি ১৯১১ খ্রি. বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

২. নাসরুল লালী : আরবি বর্ণমালার ক্রমানুসারে এ গ্রন্থে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অনেক মূল্যবান জ্ঞানগর্ভ বাণী ও প্রবাদ বাক্য সন্নিবেশিত হয়েছে। তাতে মোট তিনশতের কাছাকাছি বাণী সন্নিবেশিত হয়েছে।

৩. গরারুল হিকাম ওয়া দুরারুল কালিম : এটিও আরবি বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজিয়েছেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আব্দুল ওয়াহিদ বিন মহাম্মদ যা বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণিত। তাতে প্রায় সাড়ে পাঁচশত জ্ঞানগর্ভ বাণী এবং বেশকিছু প্রবাদ বাক্য স্থান পেয়েছে।

৪. বা'দুল আমছাল : এটি রূপায়ণ করেন বিখ্যাত সাহিত্যিক আবুল ফযল আহমদ বিন মুহাম্মদ আন-নিশাপুরী। এতে প্রায় ৫০টি প্রবাদ বাক্য রয়েছে, যেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন বিখ্যাত পণ্ডিত আবুল ফযল আল-মাদয়ানী। উপরে উল্লিখিত ৪টি গ্রন্থ অক্সফোর্ড থেকে ১৮০৬ খ্রি. ল্যাটিন ভাষায় টীকাসহ অনূদিত হয়।

৬. দুস্তরু মাআলিমিল হিকাম ওয়া মা'ছুরু মাকারিমিশ শিয়াম : এটি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খুতবা ও জ্ঞানগর্ভ বাণীর একটি সংকলন, যা সাহিত্যিক আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বিন সালামাহ আল-কিতায়ী' নামে সংকলন করেছেন।

৭. বা'দু হিকাম : ১৯০২ খ্রি. ফাদার লুইস মাজাল্লাতুল মাশরিক নামক সাময়িকীতে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। ৭৬৭ হি. সনে লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে তিনি উদ্ধৃত করেছেন।

৮. খুতাবু ওয়া মাওয়ায়িয : এটি ১৯২৩ খ্রি. লেবাননের 'সাইদা' নামক স্থান থেকে প্রকাশিত হয়, যা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আস-সায়্যিদ আহমদ রিদা 'মাজাল্লাতুল 'ইরফান' নামক সাময়িকীতে প্রকাশ করেছেন।

৯. কিতাবুল মিয়াহ : এটি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একশটি মহামূল্যবান বাণী সংবলিত একটি গ্রন্থ, যা লেবাননের প্রসিদ্ধ কবি আমীন নাখলাহ ১৯২০ খ্রি. আল-'ইরফান' নামক প্রেস থেকে প্রকাশ করেন।

১০. মুতাফাররিকাত : এটি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অনেক মূল্যবান খুতবা এবং বাণী স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থের অনেকাংশেই আল-মাসউদী রচিত 'মুরূজুয যাহাব', ইবনু আবদি রাব্বিহি রচিত 'আল-ইকদুল ফারীদ' এবং বাহাউদ্দীন আল-আমিলী রচিত 'আল-কাশকুল' প্রভৃতি সাহিত্যগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

১১. আল-জাফর ওয়াল জামিয়াহ : এ গ্রন্থে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে, যা আরবি বর্ণমালার ক্রমানুসারে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৮. আরবি ব্যাকরণে

আরবি ব্যাকরণ আরবি সাহিত্যের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। ব্যাকরণ ব্যতীত আরবি ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। একদা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে ভুল ইরাবসহ কুরআন পড়তে শোনেন। তাতে তাঁর মনে চিন্তার উদয় হয় যে, এমন কোনো নিয়মনীতি উদ্ভাবন করতে হবে, যার ফলে প্রত্যেকে ইরাবসহ বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করতে পারে। তাই তিনি কতিপয় সাধারণ নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে সেগুলোর আলোকে একটি গ্রন্থ রচনা করার জন্য আবুল আসওয়াদ আদ-দুয়ালীকে নিযুক্ত করেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর তত্ত্বাবধানে আবুল আসওয়াদ সর্বপ্রথম আরবি ব্যাকরণ রচনা করেন। এভাবে আরবি ব্যাকরণের উদ্ভব ঘটিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আরবি ভাষা ও সাহিত্যকে সহজপাঠ্য করে তোলেন।[১৪৫]
এতেই বোঝা যায় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যাঁরা আরবি সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে ব্রতী ছিলেন, হযরত আলী ছিলেন তাঁদের অগ্রদূত। তিনি আরবি কবিতার সাথে সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় উৎকর্ষ সাধন করে আরবি সাহিত্যে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। আরবি সাহিত্যের অনুশীলন যতদিন অব্যাহত থাকবে, ততদিন আরবি সাহিত্যাকাশে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নাম উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় ভাস্বর হয়ে থাকবে।

৯. সতেরো উটের ঘটনা

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খিদমতে তিনজন ব্যক্তি আসল। তাদের সাথে ছিল সতেরোটি উট। ওই লোকগুলো তাঁকে বলল, এ উটগুলো আপনি আমাদের মধ্যে ভাগ করে দিন। এতে আমাদের মধ্যে একজন অর্ধেক, দ্বিতীয় জন এক-তৃতীয়াংশ এবং তৃতীয়জন এক-নবমাংশের অংশীদার। কিন্তু শর্ত হলো প্রত্যেকে যেন পরিপূর্ণ উট পায়। বন্টন করার সময় যেন কেটে ভাগ করা না হয়, আর না কাউকে অর্থ দেওয়া হয়।
বড় বড় জ্ঞানীরা তাঁরপাশে বসা ছিল। তারা পরস্পর বলাবলি করলেন, এটা কোনোভাবে হতে পারে যে, কর্তন করা বা অর্থ দিয়ে সমঝোতা ছাড়া পুরো প্রত্যেকে কীভাবে পাবে। কারণ, যে অর্ধেক অংশীদার সে সতেরোর মধ্যে সাড়ে আটটি পাবে আর যে এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার সে পাবে পাঁচটির চেয়ে কিছু বেশি। অর্থাৎ সতেরোটি থেকে পূর্ণ ছয়টি সেও পাবে না। আর যার অংশ এক-নবমাংশ সেও সতেরো থেকে দুটির কম পাবে। এমতাবস্থায় একটি দুইটি নয় বরং তিনটি উট যবেহ করে সতেরোটি উটের বন্টন করা ব্যতীত আর কোনো উপায় নেই।

---

১৪৫ History of the Arabs, p. 182-184.

কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জ্ঞান-গরিমার ওপর উৎসর্গ হোন! তিনি কোনো চিন্তা করা ছাড়াই তাদের উটগুলোকে এক লাইনে দাঁড় করাতে নির্দেশ দিলেন এবং খাদেমকে বললেন, আমার একটি উটকে এ লাইনের শেষে দাঁড় করাও। যখন তাঁর উট মিলিয়ে আঠারোটি উট হলো, তখন যে ব্যক্তি অর্ধেক অংশের দাবিদার তাকে ১৮টি থেকে ৯টি, যে এক-তৃতীয়াংশের দাবিদার তাকে ৬টি এবং যে এক-নবমাংশের দাবিদার তাকে ১৮টি থেকে ২টি দিলেন। অতঃপর নিজের উটটি তার জায়গায় রয়েগেল। (অতিরিক্ত উটটি অতিরিক্ত হিসেবেই থেকে গেল।)

এক্ষেত্রে না তাঁকে কোনোটি কাটতে হয়েছে, আর না কাউকে নগদ অর্থ দিয়ে সমঝোতা করতে হয়েছে। এভাবে সতেরোটি উটকে তাদের অংশানুযায়ী ভাগ করে দিলেন, যাতে কোনো ব্যক্তিই আপত্তি করতে পারল না।

তাঁর এ ধরনের সমাধান দেখে উপস্থিত সকলে আশ্চর্যান্বিত হয়ে একই সূরে বলে উঠল, নিশ্চয় আপনার বক্ষ মোবারক ফয়েয ও পরিপূর্ণতার ধন-ভাণ্ডার। প্রতিভা ও ন্যায়পরায়ণতার তরী এবং নবুয়তের জ্ঞানের শহর। আল্লাহই তাঁকে সম্মানিত করেছেন।[১৪৬]

১০. আট রুটির ঘটনা

দুই ব্যক্তি এক সফরে আহার করতে বসলেন। তাদের মধ্যে একজনের পাঁচটি এবং অপর জনের তিনটি রুটি ছিল। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি তাদের পাশ দিয়ে গমনকালে সে উভয়কে সালাম দিল। তাকেও নিজেদের সাথে খাওয়াতে বসালেন এবং সকলে মিলে রুটিগুলো খেলেন। খাওয়ার পর তৃতীয় ব্যক্তিটি আট দিরহাম দিয়ে বলল, নিজেরা বণ্টন করে নিও। যখন ওই ব্যক্তি চলে গেল, তখন পাঁচটি রুটির অধিকারী ব্যক্তি বলল, আমি পাঁচ দিরহাম নেব কেননা আমার পাঁচটি রুটি ছিল। তুমি তিন দিরহাম নেবে যেহেতু তোমার তিনটি। তিনটি রুটির অধিকারী বলল, অর্ধেক আমার এবং অর্ধেক তোমার। কারণ, আমরা উভয়ে মিলে তাকে আহার করিয়েছি। এজন্য দু'জনের অংশই চার চার দিরহাম হবে। যখন দু'জনের মধ্যে এ বিষয়টির সমাধান হলো না, তখন ঝগড়ার সমাধানের জন্য তারা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর দরবারে গেল। তিনি সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে তিনটি রুটির অধিকারী ব্যক্তিকে বললেন, তোমার সাথী তোমাকে যে তিন দিরহাম দিচ্ছে তা নিয়ে নাও। কারণ, তোমার রুটি কম ছিল। তিনটি রুটিওয়ালা বলল, আমি এরূপ অন্যায় বিচারে সন্তুষ্ট হবো না। তিনি বললেন

---

১৪৬ আল্লামা জালাল উদ্দীন আহমদ আমজাদী, মীর মুহাম্মদ খায়রুল্লাহ অনূদিত, খোলাফায়ে রাশেদীন, পৃ. ১৪৯।

এটা অন্যায় বিচার নয়। হিসাবে তুমি এক দিরহাম পাচ্ছ। লোকটি বলল, আপনি যদি আমাকে হিসাব বুঝিয়ে দেন, তাহলে আমি এক দিরহাম নেব।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কান খুলে শুন! তোমার তিনটি রুটি ছিল এবং তার পাঁচটি, মোট আটটি। আর ভক্ষণকারী ছিল তিন জন। যদি ওই রুটিগুলোকে তিন তিন করে টুকরো করা হয় তাহলে ২৪ টুকরো হবে। যদি ওই ২৪ টুকরোকে তিন জনের মধ্যে ভাগ করে দাও, তাহলে প্রত্যেকের ভাগে ৮ টুকরো করে পড়বে। অর্থাৎ তুমি আট টুকরো, তোমার সাথী আট টুকরো এবং তৃতীয় ব্যক্তি আট টুকরো খেয়েছে। খুব মন দিয়ে শুন! তোমার তিনটি রুটিকে তিন তিন করে টুকরো করলে তখন নয় টুকরো হবে। তুমি তোমার নয় টুকরো থেকে আট টুকরো নিজে খেয়েছ। আর তোমার একটি টুকরো অবশিষ্ট ছিল, যা তৃতীয় ব্যক্তি খেয়েছে। এজন্য তুমি শুধু এক দিরহাম পাবে। আর তোমার সাথী তার পনেরো টুকরো থেকে নিজে আট টুকরো খেয়েছে এবং তার বাকি সাত টুকরো তৃতীয় ব্যক্তি খেয়েছে। এজন্য সাত দিরহাম তার। এটা শুনে তিনটি রুটিওয়ালা চিন্তায় পড়ে গেল। বাধ্য হয়ে তাকে এক দিরহাম নিতে হলো। আর মনে মনে বলতে লাগল, আফসোস! আমি যদি তিন দিরহাম নিতাম তাহলে ভালো হতো।[১৪৭]

১১. দুনিয়াবিমুখতা ও মোহহীনতা

তাঁর জীবনের সর্বাধিক সমুজ্জ্বল গুণ-বৈশিষ্ট্য ছিল অতি উচ্চ পর্যায়ের যুহদপূর্ণ জীবন, অথচ সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের উপায়- উপকরণ ছিল অতি সুলভ, ক্ষমতা ছিল একচ্ছত্র, আর মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল এমন যে, কোনো রকম সমালোচনা ও কৈফিয়তের ঊর্ধ্বে ছিল তাঁর অবস্থান।

ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুঈন আলী ইব্‌ন জা'আদ হতে এবং তিনি হাসান ইব্‌ন সালিহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ওমর ইব্‌ন আবদুল আযীয রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মজলিসে একবার যাহিদগণের আলোচনা হলো। তখন তিনি বললেন, দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ যাহিদ হলেন আলী ইব্‌ন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু।[১৪৮]

দুনিয়ার প্রতি তাঁর যুহদ ও নির্মোহতার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হচ্ছে, বস্তুত এগুলো হলো অসংখ্য থেকে নগণ্য।

আবু ওবায়দা হযরত আনতারাহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'খোরনক' অঞ্চলে অবস্থানরত হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিদমতে আমি হাযির হলাম। তিনি

---

১৪৭ আল্লামা জালাল উদ্দীন আহমদ আমজাদী, মীর মুহাম্মদ খায়রুল্লাহ অনূদিত, খোলাফায়ে রাশেদীন, পৃ. ১৫০।

১৪৮ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫

একটিমাত্র কম্বল গায়ে জড়িয়ে শীতে কাঁপছিলেন। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তো এই সরকারি কোষাগারে আপনার ও আপনার পরিবারের জন্য হিসসা রেখেছেন, অথচ গরম বস্ত্রের অভাবে আপনি শীতে কাঁপছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ। আমি তোমাদের মাল থেকে কিছুই নেই না। আর মদিনা থেকে এ কম্বলটাই শুধু সঙ্গে করে এনেছিলাম।[১৪৯]

১২. শিক্ষা ও দীক্ষা দানকারী সংশোধক ইমাম

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিছক একজন প্রশাসনিক প্রধান কিংবা সাধারণ অর্থে মুসলমানদের খলিফা মাত্র ছিলেন না, যেমনটি হয়েছিল উমাইয়া ও আব্বাসী খলিফাদের ক্ষেত্রে; বরং তিনি ছিলেন প্রথম দুই খলিফার নীতি ও আদর্শের অনুসারী। ফলে একদিকে তিনি যেমন ছিলেন মুসলমানদের শাসক ও তত্ত্বাবধায়ক তেমনি অন্যদিকে ছিলেন মুসলমানদের শিক্ষা ও দীক্ষা দানকারী একজন আধ্যাত্মিক মুরব্বি। উম্মাহর সামনে নব্বী জীবন চরিতের এক উত্তম নমুনা। মুসলমানদের দীন, ঈমান, আমল-আখলাক ও জীবনযাত্রায় তাঁর প্রতি অতি সতর্ক দৃষ্টি ছিল, যেন ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুমহান আদর্শ থেকে চুল পরিমাণও বিচ্যুতি না ঘটে ইসলামী উম্মাহর। বিজিত দেশ ও জাতিসমূহের স্বভাব-প্রকৃতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতি যেন তাদের ওপর প্রভাববিস্তার করতে না পারে।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে তিনি মুসলমানদের ইমামতি করতেন। তাদেরকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও ধর্ম শিক্ষা দান করতেন। দুনিয়ার জীবনে মুসলমানদের কাছ থেকে আল্লাহ্ কী চান এবং কী অপছন্দ করেন সে সম্পর্কে তিনি তাদের জ্ঞান দান করতেন। মসজিদে বসে তিনি তাঁদের খোঁজ-খবর নিতেন এবং কুশল জিজ্ঞেস করতেন। তাদের দীন ও দুনিয়া সম্পর্কিত যাবতীয় জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন এবং সমস্যার সমাধান পেশ করতেন। বাজারে ঘুরে ঘুরে তিনি তাদের বেচাকেনা ও লেনদেন প্রত্যক্ষ করতেন এবং উপদেশ দিয়ে বলতেন : আল্লাহ্কে ভয় করো এবং মাপ ও পরিমাপ পূর্ণ কর। মানুষকে তার প্রাপ্য জিনিসে ঠকিও না। নিজের ব্যাপারে তিনি পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতা, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মর্যাদা এবং রক্ত ও বংশকৌলিন্যের বিন্দুমাত্র 'সুবিধা' তিনি গ্রহণ করেন নি। প্রয়োজনীয় কিছু ক্রয় করতে হলে তিনি অপরিচিত কোনো বিক্রেতা তালাশ করে তার কাছ থেকে

---

[১৪৯] হযরত আলী (রা.) : জীবন ও খিলাফত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪-২২৫।

কিনতেন। এটা তাঁর খুবই পছন্দ ছিল যে, আমীরুল মু'মিনীন পরিচয়ে কোনো বিক্রেতা তার সঙ্গে কিছুমাত্র রেয়ায়েতমূলক আচরণ করবে। কথায় ও কাজে এবং ভাগ-বাঁটোয়ারা ও সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের সঙ্গে সমতা রক্ষার ব্যাপারে তিনি নিজে যেমন অতি যত্নবান ছিলেন, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত প্রশাসকদের থেকেও তিনি অনুরূপ আচরণ ও নীতির অনুসরণ প্রত্যাশা করতেন। তাই তাদের প্রতি তিনি কঠোর দৃষ্টি রাখতেন। মাঝে মধ্যে প্রশাসকদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া এবং তাদের প্রতি জনসাধারণের মনোভাব ও মতামত জানার জন্য গোপন পর্যবেক্ষক দল পাঠাতেন। তারা সরেজমিনে সব খোঁজ-খবর জেনে আমীরুল মু'মিনীনের নিকট রিপোর্ট পেশ করতেন। এ কারণে তাঁর অধীনস্থরা তাঁকে খুব ভয় করত। প্রয়োজন হলে তাদের প্রতি তিনি কঠোর তিরস্কার ও সতর্কবাণী উচ্চারণ করতেন। প্রশাসকদের নামে লেখা তাঁর পত্রাবলিতে এর বহু প্রমাণ রয়েছে।

প্রশাসকদের প্রতি তাঁর এ সতর্ক দৃষ্টি শাসনকার্য ও ইসলামী আইনের বিধি-বিধান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তাদের ব্যক্তিজীবন ও দৈনন্দিন আচার-আচরণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আল্লাহ্‌কে ভয়কারী, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত ও আদর্শ অনুসরণকারী প্রশাসকদের মান উপযোগী নয় এমন কোনো আচরণে তিনি তাদেরকে কঠোর কৈফিয়তের সম্মুখীন করতেন।

১৩. দানশীলতা

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আজীবন দরিদ্র অবস্থায় কাটিয়েছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি এত দানশীল ছিলেন যে, কোনো প্রার্থী তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনা করে খালি হাতে ফিরেনি। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে মাত্র চারটি দিরহাম ছিল। জনৈক ভিক্ষুকের প্রার্থনায় তিনি চারটি দিরহামই তাকে দিয়ে ফেলেন।

শাফেঈ বর্ণনা করেন, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এত দানশীল ছিলেন যে, কোনো প্রার্থনাকারীকেই তিনি 'না' বলে ফিরিয়ে দেননি। সারাদিন তিনি ইহুদিদের বাগানে পানি সিঞ্চন করে যা পেতেন, সন্ধ্যার সময় তিনি তার বেশিরভাগই দান করে ফেলতেন। কোনো কোনো দিন এমনও দেখা গেছে যে, সর্বস্ব দান করে নিজে ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে পেটে পাথর বেঁধে রাত কাটিয়েছেন। কেউ কিছু প্রার্থনা করলে তাঁর এ খেয়াল মনে থাকত না যে, এ বস্তুটি দান করে ফেললে তাঁকে কষ্ট বা বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

একবার কাফেরদের বিরুদ্ধে কোনো এক যুদ্ধে গমন করলে জনৈক কাফের তাঁকে বলল, আপনার তরবারিখানা আমাকে দিন। তৎক্ষণাৎ তিনি তরবারিখানা তাকে দিলেন। কাফের ব্যক্তি তরবারি হাতে নিয়ে বলল, আমি চাওয়ামাত্র আপনি আপনার তরবারি আমাকে দিয়ে দিলেন, এখন আপনার উপায়? হযরত আলী বললেন, তুমি প্রার্থী হয়ে আমার নিকট হাত বাড়িয়েছ, আমি কেমন করে তোমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেই?

এ সমস্ত ঘটনা হতে বোঝা যায় যে, হযরত আলী নিজে নিতান্ত অসচ্ছল অবস্থায় জীবনযাপন করেও কোনো সময় কোনো প্রার্থীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেননি।

১৪. শালীনতা

শালীনতা ও মানবতাবোধ হযরত আলী -এর চরিত্রের আর একটি ভূষণ। তিনি মহাবীর ছিলেন; কিন্তু এর জন্য কখনও অহংকারী হননি। তাঁর যে সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতা ছিল, তা বিন্দুমাত্র প্রয়োগ করলে তিনি নিজের জন্য বিপুল পরিমাণ পার্থিব ধনসম্পদ সংগ্রহ করতে পারতেন; কিন্তু তিনি কখনও এমন কামনা করেননি, আদর্শ এবং লক্ষ্য হতে তিনি কখনও বিচ্যুত হননি; বরং বীরত্ব ও ক্ষমতাকে যথোচিত স্থানে প্রয়োগ করে তিনি মানবকুলে এক অপূর্ব ও চির অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অভদ্রতা, বর্বরতা এবং অমানবিক আচরণকে তিনি সর্বদা কঠোরভাবে পরিহার করে চলতেন। শালীনতাবোধ তাঁর এত অধিক ছিল যে, কেউ তাঁকে গালি দিলেও তার প্রতিউত্তরে তাকে গাল দেওয়া তিনি পছন্দ করতেন না।

এক সময় হযরত আলী জানতে পারলেন যে, হাজার ইবনে আদী ও ওমর ইবনুল হাকাম মুয়াবিয়া এবং তাঁর সঙ্গী সিরিয়াবাসীদেরকে গালিগালাজ করে থাকেন। তিনি উভয়কে ডেকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেসা করলে তাঁরা উত্তর দিলেন, "আমরা কি সত্যের অনুসারী নই? আর তারা কি বিপথগামী নয়?" হযরত আলী বললেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্! নিশ্চয়ই, আমরা সত্যের অনুসারী, তবুও আমি পছন্দ করি না যে, তোমরা শালীনতা হারিয়ে গালিগালাজ করতে থাক। তোমরা অশ্লীল ভাষা প্রয়োগের পরিবর্তে আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রার্থনা কর। তিনি যেন আমাদের মধ্যকার রক্তপাত বন্ধ করে তাদেরকে হেদায়েত করেন এবং সঠিক পথের অনুসারী হওয়ার তওফীক দান করেন। এরূপই ছিল হযরত আলী -এর শালীনতাবোধ।[১৫০]

---

[১৫০] মাওলানা নুরুর রহমান, হযরত আলী (রা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

১৫. মেহমানদারী

মেহমানদারী ছিল হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। মেহমানকে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা ছিল অতুলনীয়। মেহমান দেখলে তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। মেহমান আসলে তিনি তাঁর ঘরে যা কিছু থাকত, সবকিছুই এনে মেহমানের সামনে উপস্থিত করতেন। যেদিন কোনো মেহমান পেতেন না, সে দিন তাঁর মনে কোনো আনন্দই থাকত না।

একদিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কাঁদতে দেখে কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "আজ সাত দিন পর্যন্ত আমার বাড়িতে কোনো মেহমান আসতেছে না। আমার ভয় হচ্ছে, হয়ত আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।" হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এই উক্তির মধ্যেই মেহমানদারীর প্রতি তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ও অনুরাগের পরিচয় স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রিযকের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। যেখানে যার রিযক তিনি নির্দিষ্ট করে দেন, সে ব্যক্তি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতে বাধ্য। আমার হাঁড়িতে কারও রিযক আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্ট করে থাকলে, তিনি অবশ্যই আমার বাড়িতে উপস্থিত হবেন। এমতাবস্থায় গৃহস্বামী মেহমানের রিযকের আমানতদার। অতএব, মেহমানের আপ্যায়নের দায়িত্ব অবশ্যই তাঁকে সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে। গৃহস্বামী এতে সামান্য গাফলতি করলেও আমানতে খেয়ানত করা হবে, এটা অত্যন্ত পাপকাজ। মেহমানের আগমনে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এখনও আল্লাহ্ তা'আলা গৃহস্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। এজন্যই মেহমানের আগমন এক সপ্তাহ বন্ধ থাকায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষের ভয় করে কাঁদছিলেন।[১৫১]

১৬. জ্ঞানের দরজা হযরত আলী

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বাল্যকাল হতেই নবুওয়্যাতের শিক্ষা অঙ্গন হতে সরাসরি জ্ঞান অর্জন ও প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ পেয়েছিল। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর যে গভীরতর সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁরই দৌলতে তিনি এ পর্যায়ের অন্যান্য সকলের তুলনায় অধিক সুযোগ লাভ করেছিলেন। ঘরে-বাইরে ও বিদেশ যাত্রাকালে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিবিড়তর নৈকট্য লাভ করতে পেরেছিলেন

[১৫১] মাওলানা নুরুর রহমান, হযরত আলী (রা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

বিধায় দীন-ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞানলাভ করা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ হয়েছিল। নবী করীম (সা.) নিজেও তাকে এ বিশেষ জ্ঞান দান করার জন্য গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি নিজে তাঁকে কুরআন মজীদ শিক্ষা দিয়েছেন এবং কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের সঠিক তাৎপর্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ কারণে অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের তুলনায় তাঁর মনীষা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীরতর। রাসূলে করীম (সা.) তাঁর এই মনীষার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন,

'আমি জ্ঞানের নগরী আর আলী দ্বারবিশেষ'।

একটি হাদিস হিসেবে সনদ ইত্যাদির বিচারে এ কথাটি গ্রহণযোগ্য না হলেও এর বাস্তবতা অবশ্যই স্বীকৃতব্য। সাধারণ লেখাপড়া হযরত আলী (রা.) বাল্যকালেই শিখে নিয়েছিলেন এবং অহী লেখকদের তালিকায় তাঁর নামও শামিল রয়েছেন। রাসূলে করীম (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বহু রাষ্ট্রীয় ফরমানসহ হুদাইবিয়ার সন্ধিনামা হযরত আলী (রা.)-এর হাতেই সুলিখিত হয়েছিল।

এখানে আমরা হযরত আলী (রা.)-এর অসাধারণ প্রজ্ঞা, অতি উচ্চ অলংকার-সমৃদ্ধ ও সাহিত্যরসপূর্ণ ভাষা ও নীতিকথার কিছু নমুনা পেশ করব যার উদাহরণ অন্যান্য ভাষার সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবে তাঁর পূর্বে ওস্তাদ আহমদ হাসান যাইয়াত রচিত 'আরবি সাহিত্যের ইতিহাস'-এর অংশবিশেষ ধারণ করে এখানে তুলে ধরতে চাই। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মাঝে হযরত আলী (রা.)-এর চেয়ে বিশুদ্ধ ভাষী ও বক্তৃতা পারদর্শী আর কারো কথা আমাদের জানা নেই। তিনি ছিলেন মহাপ্রজ্ঞাবান যাঁর বক্তব্যের প্রতিটি শব্দ থেকে প্রজ্ঞা উৎসারিত হতো এবং আদর্শ বক্তা যাঁর জিহ্বা থেকে ভাষা অলংকারের যেন ফুলকি ঝরতো! তিনি সফল উপদেশদাতা যাঁর উপদেশ কর্ণপথে হৃদয়ের গভীরে গিয়ে রেখাপাত করত এবং অসাধারণ পত্র-লেখক যাঁর প্রতিটি ছত্রে অতলান্ত যুক্তির প্রকাশ থাকত। আদর্শ আলোচক যিনি যেকোনো বিষয়ে ইচ্ছানুরূপ কথা বলতে পারতেন। সর্বসম্মতভাবেই তিনি ছিলেন মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ বক্তা ও সৃজনশীলদের শিরোমণি।[১৫২]

গবেষক আল-আক্কাদ-এর বলেন, হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ হতে যে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ 'বাণী' বর্ণিত হয়েছে সেগুলো এমন অপূর্ব রীতি ও শৈলীমণ্ডিত যে, প্রচলিত প্রবাদ ও সুপ্রকাশিত ভাষা অনুসরণের ক্ষেত্রে এর চেয়ে উত্তম কোনো রীতি ও শৈলী আর হতে পারে না। এখানে হযরত আলী (রা.)-এর জ্ঞানগর্ভ কয়েকটি বাণী তুলে ধরা হলো–

---

152 তারীখুল আদাব আল-আরাবী, পৃষ্ঠা -১৭৪

১. قِيْمَتُ كُلِّ امْرِئٍ مَا يُحْسِنُهُ প্রতিটি মানুষের মূল্য তার যোগ্যতায়।

২. كَلِّمُوا النَّاسَ عَلٰى قَدْرِ عُقُوْلِهِمْ اَتُحِبُّوْنَ اَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُوْلَهُ

মানুষের সাথে তাদের বুদ্ধি পরিমাণ কথা বলো। তোমরা কি চাও আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মিথ্যা সাব্যস্ত হোন?

৩. عَحْذِرِ طَوْلَتِ الْكَرِيْمِ اِذَا جَاءَ وَصُوْلَةَ اللَّئِيْمِ اِذَا شَبِعَ অভিজাত লোকের হামলা সম্পর্কে সতর্ক হও যখন সে ক্ষুধার্ত হয়। আর ইতর লোকের হামলা হতে সতর্ক হও যখন সে পূর্ণ উদর হয়।

৪. اَجْمِعُوا هٰذِهِ الْقُلُوْبَ وَالْتَمِسُوْا لَهَا طَرْفَ الْحِكْمَتِ فَاِنَّهَا تَمَلُّ كَمَا تَمُلُّ الْاَبْدَانِ

হৃদয়সমূহ একত্র করো এবং তা ধরে রাখতে হেকমতের আশ্রয় গ্রহণ করো। কেননা শরীরের ন্যায় হৃদয়ও ক্লান্তি ও একঘেয়েমি বোধ করে।

৫. اَلنَّفْسُ مَوْثُوْبٌ لِلْهَوٰى تَخِذَةٌ بِالْهُوَيْنِىْ جَامِحَةٌ اِلَى اللَّهْوِ اَمَارَةٌ بِالسُّوْءِ مُسْتَوْطِنَةٌ لِلْفُجُوْرِ طَالِبَتٌ لِلرَّاحَةِ نَافِرَةٌ عَنِ الْعَمَلِ فَاِنْ اَكْرِهْتَهَا اَنْضَيْتَهَا وَاِنْ اَهْمَلْتَهَا اَرْدِيَتَهُ

নফস হলো প্রবৃত্তির পূজারি। সহজগামী আমোদ-প্রমোদের অভিলাসী, কু-প্ররোচনায় অভ্যস্ত, পাপাচারে আসক্ত, আরামপ্রিয় ও কর্মীবিমুখ। যদি তাকে বাধ্য কর তাহলে সে দুর্বল হয়ে পড়বে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

৬. اَلَا لَا يَرْجُوْنَ اَحَدُكُمْ اِلَّا رَبَّهُ وَلَا يَخَافَنَّ اِلَّا ذَنْبَهُ وَلَا يَسْتَحْيِىْ اَحَدُكُمْ اِذَا لَمْ يَعْلَمْ اَنْ يَتَعَامَ وَاِذَا سُئِلَ عَمَلٍ لَا يَعْلَمُ اَنْ يَقُوْلَ لَا اَعْلَمُ

তোমাদের কেউ যেন আপন প্রতিপালক ছাড়া অন্য কারো আশা না করে এবং তাঁর 'শাস্তি' ছাড়া অন্য কিছুকে ভয় না করে। তোমাদের কেউ যেন যা জানে না তা শিখতে এবং না জানা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে 'জানি না' বলতে সংকোচ বোধ না করে।

৭. اَلْفَقْرُ يُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ حُجَّتِهِ وَالْمُقَاغَرِيْبٌ فِيْ بَلْدَتِهٖ অভাব বিচক্ষণ ব্যক্তিকেও যুক্তিক্ষেত্রে নির্বাক করে দেয়। অভাবী নিজ দেশেই যেন প্রবাসী।

৮. اَلْعِجْزُ اٰفَةٌ وَالصَّبْرُ شُجَاعَةٌ وَالزُّهْدُ ثَرْوَةٌ وَالْوَرَعُ جُنَّةٌ অক্ষমতা একটি বিপদ, ধৈর্যের অর্থ সাহসিকতা, ভোগ-বিলাসিতার নির্মোহ অমূল্য সম্পদ এবং ধর্মানুরাগ জান্নাত লাভের মাধ্যম।

৯. اَلْاٰدَابُ حِلَلٌ مُجَدَّدَةٌ وَالْفِكْرُ مِرَاٰةٌ صَافِيَةٌ শিষ্টাচার হলো চিরনতুন পোশাক এবং চিন্তা হলো স্বচ্ছ আয়না।

১০. اِذَا اَقْبَلَتِ الدُّنْيَا عَلٰى اَحَدٍ اَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَيْرِهٖ وَاِذَا اَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهٖ দুনিয়া যখন কারো প্রতি প্রসন্ন হয় তখন অন্যের গুণাবলিও তাকে ধার দেয়, কিন্তু যখন অপ্রসন্ন হয় তখন তার নিজস্ব গুণাবলিও ছিনিয়ে নেয়।

১১. مَا اَضْمَرَ اَحَدٌ شَيْئًا اِلَّا ظَهَرَ فِيْ فَلَتَاتِ لِسَانِهٖ وَصَفَحَاتِ وَجْهِهٖ (অন্তরে) যে যা-ই গোপন করে তা তার জিহ্বার ফাঁকে বের হয়ে পড়ে এবং মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তিতে ধরা পড়ে।

১২. وَقَدْ جَعَلَكَ اللّٰهُ حُرًّا لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ আল্লাহ্ যখন তোমাকে স্বাধীন বানিয়েছেন তখন তুমি অন্যের গোলাম হয়ো না।

১৩. اِيَّاكَ وَالْاِتِّكَالَ عَلَى الْمُنٰى فَاِنَّهَا بِضَاعُ النَّوْكٰى স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষার ওপর ভরসা করে বসে থেকো না। কেননা এটা হলো মূর্খ মানুষের পুঁজি।

১৪. اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِالْعَالِمِ كُلَّ الْعِلْمِ \ مَنْ لَمْ يُزَيِّنْ لِعِبَادِ اللّٰهِ مَعَاصِى اللّٰهِ وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ وَلَمْ يُؤَيِّسْ مِنْ رَوْحِهٖ তোমাদের কে কি আদর্শ আলিমের পরিচয় বলব না? যিনি আল্লাহ্র বান্দাদের সামনে আল্লাহ্র নাফরমানিকে মনোহররূপে তুলে ধরেন না এবং তাঁর 'পাকড়াও' সম্পর্কে তাদেরকে নিরুদ্বিগ্ন করে দেন না, এবং তাঁর রহমত সম্পর্কে হতাশ করে দেন না।

১৫. الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا মানুষ সব বুঝে বেঘোর, মৃত্যু আসা মাত্র তারা জেগে উঠবে।

১৬. اَلنَّاسُ اَعْدَاءُ مَا جَهِلُوْا মানুষ যা জানে না তার প্রতি বিরূপ হয়ে থাকে।

১৭. اَلنَّاسُ بِزَمَانِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِاٰبَاءِهِمْ যুগের (স্বভাব প্রকৃতির) সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য পিতৃ সাদৃশ্যের চেয়ে অধিক।

১৮. اَلْمَرْءُ مَخْبُوْءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ মানুষ তার জিহ্বার নিচে লুক্কায়িত থাকে।

১৯. مَا هَلَكَ اِمْرُؤٌ عَرَفَ قَدْرَهُ যে মানুষ আপন মর্যাদার সীমা বোঝে তার কোনো ধ্বংস নেই।

২০. رُبَّهُ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً কখনো কখনো একটিমাত্র শব্দ বিরাট বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[১৫৩]

২১. كُلُّ امْرِئٍ عَاقِبَةُ حَلْوَةٍ اَوْ مَرَّةٍ "প্রতিটি মানুষের শেষ পরিণতি রয়েছে, হয় তা সুখকর হবে অথবা তিক্ত (দুঃখজনক)।"

২২. لِكُلِّ مُقْبِلٍ اَدْبَارٌ وَمَا اَدْبَرَ كَاَنْ لَمْ يَكُنْ "অগ্রসরমান যাবতীয় বস্তুর পশ্চাৎপদতা রয়েছে, আর যা কিছু পশ্চাদমুখী হয় (বিগত হয়ে যায়) কার্যত তা যেন হয়নি।" (অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর বাহ্যত মনে হয় এগুলো যেন সংঘটিতই হয়নি।)

২৩. لَا يَعْدِمُ الصَّبُوْرُ الظَّفَرَ وَاِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ "সংযমী অকৃতকার্য হয় না, যদিও দীর্ঘ সময় লাগে।"

২৪. اَلرَّاضِىُ بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ فِيْهِ مَعَهُمْ وَعَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فِىْ بَاطِلٍ اِثْمَانِ : اِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ وَاِثْمُ الرِّضَا بِهِ "কোনো সম্প্রদায়ের কর্মে সমর্থনদানকারী ঐ কর্ম সম্পাদনকারীর সাথে কর্মে শরিক হিসেবে পরিগণিত। আর যে কেউ দুষ্কর্মে প্রবেশ করে তার দু'টি পাপ হয়, কর্ম সম্পাদনের পাপ এবং পাপ কাজে সম্মত হবার পাপ।"

২৫. اِعْتَصِمُوْا بِالذِّمَمِ فِىْ اَوْتَادِهَا "দায়িত্বশীলগণ চুক্তি ও প্রতিজ্ঞাসমূহ এদের খুঁটির সাথে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রাখো (এগুলো পূরণে তৎপর হওয়া)।"

---

১৫৩ সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪-২১৬

২৬. قَدْ بَصُرْتُمْ اِنْ بَصُرْتُمْ وَقَدْ هُدِيْتُمْ اِنْ اِهْتَدَيْتُمْ وَاسْمَعْتُمْ اِنْ اِسْمَعْتُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ "তোমাদেরকে অবশ্যই দেখার শক্তি দান করা হয়েছে, যদি তোমরা তোমাদের চক্ষু উন্মোচন কর। আর যদি তোমরা পথ পেতে চাও, তবে তোমাদেরকে অবশ্যই পথ প্রদর্শিত করা হয়েছে। আর যদি তোমরা শ্রবণ করতে চাও তবে অবশ্যই তোমাদেরকে শ্রবণশক্তি দেওয়া হয়েছে।"

২৭. عَاتِبْ اَخَاكَ بِالْاَحَاسِنِ اِلَيْهِ وَارْدُدْ شَرَّهُ بِالْاَنْعَامِ عَلَيْهِ "আপন ভ্রাতার প্রতি করুণা করে তাকে বিদ্বেষমুক্ত কর। আর তার প্রতি বদান্যতা প্রদর্শন করে তার অনিষ্টতার প্রতিকার কর।"

২৮. مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ فَلَا يَلُوْمَنَّ مَنْ اَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ "অভিযুক্ত হবার মতো অবস্থানে যে নিজেকে দাঁড় করায় সে যেন তার প্রতি অন্যায় ধারণা পোষণকারীকে তিরস্কার না করে।"

২৯. مَنْ مَلَكَ اِسْتَاسَرَ وَمَنْ اِسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ وَمَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِى عقولها "যে অধিকার পায় সে নিজের অভিমতকে প্রাধান্য দেয়। যে স্বমতে যুক্তিহীনভাবে অটল থাকে সে ধ্বংস হয়ে যায়। আর যে লোকজনের সাথে পরামর্শ করে সে তাদের সাথে অংশীদার হয়।"[১৫৪]

১৯. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা

عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا فَقَالَ أَتُخَلِّفُنِي فِي الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ قَالَ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي

"সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধাভিযানে রওনা হন। আর 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করেন। 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আপনি কি আমাকে শিশু ও মহিলাদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার কাছে সে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত মূসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে যে মর্যাদায়

---

১৫৪ নাহজুল বালাগাহ, বাণী, ১৪৩-১৫২।

অধিষ্ঠিত ছিলেন হারূন عَلَيْهِ السَّلَامُ। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, হারূন عَلَيْهِ السَّلَامُ নবী ছিলেন আর আমার পরে কোনো নবী নেই।"[১৫৫]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى فَغَدَوْا وَكُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى فَقَالَ أَيْنَ عَلِيٌّ فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَأَمَرَ فَدُعِيَ لَهُ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

"সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি খায়বারের যুদ্ধের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দেব, যাঁর হাতে বিজয় আসবে। অতঃপর কাকে পতাকা দেওয়া হবে, সেজন্য সকলেই আশা করতে লাগলেন। পরদিন সকালে সকলেই এ আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, হয়ত তাকে পতাকা দেওয়া হবে। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কোথায়? তাঁকে জানানো হলো যে, তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত। তখন তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে আনতে বললেন। তাকে ডেকে আনা হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখের লালা তাঁর উভয় চোখে লাগিয়ে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এরূপ সুস্থ হয়ে গেলেন যে, তাঁর কোনো রোগই ছিল না। তখন 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো হয়ে যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি সোজা এগিয়ে যাও। তুমি তাদের প্রান্তরে হাজির হলে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করো এবং তাদের কর্তব্য সম্পর্কে তাদের জানিয়ে দাও। আল্লাহর কসম, যদি একটি ব্যক্তিও তোমার দ্বারা হিদায়েত লাভ করে, তবে তা তোমার জন্য লাল রঙের উটের চেয়েও উত্তম।"[১৫৬]

হযরত আলী সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا
"আমি জ্ঞানের মহানগরী আর আলী তার রাজতোরণ।"[১৫৭]

---

১৫৫ সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৪৪১৬।
১৫৬ সহীহ বুখারী, হাদিস নং ২৯৪২।
১৫৭ কানযুল উম্মাল, ১১ : ৬১৪ / ৩২৯৭৭।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, أَعْلَمُ أُمَّتِيْ مِنْ بَعْدِيْ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ

"আমার পরে আলী হলো আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী।"[১৫৮]

এতেই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কত উঁচুমাপের জ্ঞানী এবং সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, إِنَّ عَلِيًّا مِنِّيْ وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ مُؤْمِنٍ بَعْدِيْ

"নিশ্চয়ই 'আলী আমার থেকে আর আমি আলী থেকে। আর সে আমার পরে সকল মুমিনের অভিভাবক।"[১৫৯]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, رْحَمِ اللهُ عَلِيًّا اَللّٰهُمَّ أَدْرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ إ

دار "আল্লাহ, আলীর উপর রহমত বর্ষণ করুন! হে আল্লাহ! আলী যেখানেই থাকে সত্যকে তাঁর সাথে ঘুরাও।"[১৬০]

হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ سَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ سَبَّنِيْ.

'যে আলীকে গালি দিল সে মূলত আমাকে গালি দিল।'[১৬১]

হযরত আবু তোফায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একদিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি খোলা ময়দানে অনেককে একত্রিত করে বললেন, আমি আল্লাহর শপথ করে তোমাদের কাছে জিজ্ঞেস করছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গদীরেখুমের দিন আমার ব্যাপারে কী বলেছেন। ওই মজলিসে ত্রিশজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ.

আমি যার মাওলা, আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ! যে আলীকে ভালোবাসে, তাকে তুমি ভালোবাস এবং যে আলীকে ঘৃণা করে, তাকে তুমিও ঘৃণা কর।[১৬২]

---

১৫৮ আল-কামিল ফিত-তারীখ, খ. ২, পৃ. ৬৪।

১৫৯ তাবারানী, আল-মু'জমুল কবীর, খ. ১৮, ১২৮/২৬৫।

১৬০ সুনানে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৬৩৩ হাদিস নং ৩৭১৪।

১৬১ সুয়ূতী : তারিখুল খোলাফা, পৃ. ৭০;

১৬২ আহমদ ইবনে হাম্বল : আল্ মুসনাদ, ২/৪১২।

তাবরানী ও বায্যার হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে তিরমিযী ও হাকেম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔

আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী তার (জ্ঞানের) দরজা।[১৬৩]

আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী বলেন এ হাদিসটি হাদিসে হাসান। যারা এ হাদিসকে মওযু বলে তারা ভুল বলে।[১৬৪]

৬. হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

مَنْ اَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ اَحَبَّنِىْ. وَمَنْ اَحَبَّنِىْ فَقَدْ اَحَبَّ اللهَ. وَمَنْ اَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ اَبْغَضَنِىْ. وَمَنْ اَبْغَضَنِىْ فَقَدْ اَبْغَضَ اللهَ۔

– যে আলীকে ভালোবাসল, সে মূলত আমাকে ভালোবাসল। আর যে আমাকে ভালোবাসল, সে আল্লাহকে ভালোবাসল। আর যে আলীর সাথে দুশমনী করল, সে মূলত আমার সাথে দুশমনী করল। আর যে আমার সাথে দুশমনী করল, সে মূলত আল্লাহর সাথে দুশমনী করল।[১৬৫]

---

১৬৩ হাকিম : আল মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, ১০/৪৪৩

১৬৪ আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী : তারিখুল খোলাফা, পৃ. ১১৬;

১৬৫ তাবরানী : আল মু'জামুল কবীর, ১/১৯৮; সুয়ূতী : তারিখুল খোলাফা, পৃ. ৭০;

অধ্যায়-৯

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর পারিবারিক জীবন

হযরত ফাতেমার সাথে বিবাহ

হিজরির প্রথম অথবা দ্বিতীয় সালে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কন্যা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন।[১৬৬] বিয়ের নয় মাস পরে তাঁদের বাসর হয়। বিয়ের সময় ফাতেমার রাদিয়াল্লাহু আনহা বয়স পনেরো বছর সাড়ে পাঁচ মাস এবং আলীর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বয়স একুশ বছর পাঁচ মাস।[১৬৭] ইবন 'আবদিল বার তাঁর 'আল-ইসতী'আব' গ্রন্থে এবং ইবনে সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ফাতেমাকে রাদিয়াল্লাহু আনহা বিয়ে করেন রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আসার পাঁচ মাস পরে রজব মাসে এবং বদর যুদ্ধ থেকে ফেরার পর তাঁদের বাসর হয়। ফাতেমার বয়স তখন আঠারো বছর। তাবারীর তারীখে বলা হয়েছে, হিজরি দ্বিতীয় সনে হিজরতের বাইশ মাসের মাথায় জিলহাজ মাসে আলী-ফাতেমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বাসর হয়। বিয়ের সময় 'আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ফাতেমার চেয়ে চার বছরের বড় ছিলেন।[১৬৮]

১৬৬ আল-আসকালানী, শিহাবুদ্দীন, আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস-সাহাবা, খ. ৫, ৮ : (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, তা.বি.)।

১৬৭ আ'লাম আন-নিসা' -৪/১০৯

১৬৮ প্রাগুক্ত; তাবাকাত-৮/১১; নিসা' মাবাশশারাত বিল জান্নাহ্-২০৮

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমরের রাদিয়াল্লাহু আনহু মতো উঁচু মর্যাদার অধিকারী সাহাবিগণও ফাতেমাকে রাদিয়াল্লাহু আনহা স্ত্রী হিসেবে পেতে আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট প্রস্তাবও দেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। হাকিমের মুসতাদরিক ও নাসাঈর সুনানে এসেছে যে, আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়ে ফাতেমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে বলেন : সে এখনো ছোট। একটি বর্ণনায় এসেছে, আবু বকর প্রস্তাব দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আবু বকর! তাঁর ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কর। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা ওমরকে রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন : তিনি তো আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারপর আবু বকর ওমরকে রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন : এবার আপনি রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট ফাতেমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রস্তাব দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে যে কথা বলে ফিরিয়ে দেন, ওমরকেও ঠিক একই কথা বলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকরকে সে কথা বললে তিনি মন্তব্য করেন : ওমর, তিনি আপনার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আলীকে রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আপনিই ফাতেমার উপযুক্ত পাত্র। 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার সম্পদের মধ্যে এই একটি বর্ম ছাড়া তো আর কিছুই নেই।

তাবাকাতে ইবন সা'দ ও উসুদুর গাবা'র গ্রন্থের একটি বর্ণনা মতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমরের কথামতো রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যান এবং ফাতেমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে নিজ উদ্যোগে আলীর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে ফাতেমাকে বিয়ে দেন। এ খবর ফাতেমার কানে পৌঁছলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমার কাছে যান এবং তাঁকে লক্ষ করে বলেন : ফাতেমা! আমি তোমাকে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, সবচেয়ে বেশি বিচক্ষণ এবং প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়েছি। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রস্তাব দানের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ফাতেমা!'আলী তোমাকে স্মরণ করে। ফাতেমা কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেন।

ফাতেমার সাথে কীভাবে বিয়ে হয়েছিল সে সম্পর্কে আলীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা এ রকম : রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট ফাতেমার বিয়ের পয়গাম এল। তখন আমার এক দাসী আমাকে বললেন : আপনি কি একথা জানেন যে, রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট ফাতেমার বিয়ের পয়গাম এসেছে?

বললাম : না।

সে বলল : হ্যাঁ, পয়গাম এসেছে। আপনি রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট কেন যাচ্ছেন না? আপনি গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমাকে আপনার সাথেই বিয়ে দিবেন।

বললাম : বিয়ে করার মতো আমার কিছু আছে কি?

সে বলল : যদি আপনি রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট যান তাহলে তিনি অবশ্যই আপনার সাথে তাঁর বিয়ে দিবেন।

'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : আল্লাহর কসম! সে আমাকে এভাবে আশা-ভরসা দিতে থাকে। অবশেষে আমি একদিন রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট গেলাম। তাঁর সামনে বসার পর আমি যেন বোবা হয়ে গেলাম। তাঁর মহত্ত্ব ও তাঁর মধ্যে বিরাজমান গাম্ভীর্য ও ভীতির ভাবের কারণে আমি কোনো কথাই বলতে পারলাম না। এক সময় তিনিই আমাকে প্রশ্ন করলেন : কি জন্য এসেছ? কোনো প্রয়োজন আছে কি? আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : আমি চুপ করে থাকলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নিশ্চয় ফাতেমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে এসেছ?

আমি বললাম : হ্যাঁ। তিনি বললেন : তোমার কাছে এমন কিছু আছে কি যা দ্বারা তুমি তাকে হালাল করবে? বললাম : আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নেই। তিনি বললেন : যে বর্মটি আমি তোমাকে দিয়েছিলাম সেটা কি করেছ?

বললাম : সেটা আমার কাছে আছে। আলীর জীবন যে সত্তার হাতে তার কসম, সেটা তো একটি 'হুতামী' বর্ম। তার দাম চার দিরহামও হবে না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি তারই বিনিময়ে ফাতেমাকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম। সেটা তার কাছে পাঠিয়ে দাও এবং তা দ্বারাই তাকে হালাল করে নাও।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : এই ছিল ফাতেমা বিনত রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোহর।[১৬৯]

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব দ্রুত বাড়ি গিয়ে বর্মটি নিয়ে আসেন। কনেকে সাজগোজের জিনিসপত্র কেনার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি বিক্রি করতে বলেন।[১৭০] বর্মটি উসমান ইবন 'আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু চার শত সত্তর (৪৭০) দিরহামে কেনেন। এ অর্থ রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে দেওয়া হয়। তিনি তা বিলালের রাদিয়াল্লাহু আনহু হাতে দিয়ে কিছু আতর-সুগন্ধি কিনতে বলেন, আর বাকি যা থাকে উম্মু সালামার রাদিয়াল্লাহু আনহা হাতে দিতে বলেন। যাতে তিনি তা দিয়ে কনের সাজগোজের জিনিস কিনতে পারেন।

সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের ডেকে পাঠান। তাঁরা উপস্থিত হলে তিনি ঘোষণা দেন যে, তিনি তাঁর মেয়ে ফাতেমাকে চার শত মিছকাল রুপোর বিনিময়ে আলীর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাথে বিয়ে দিয়েছেন। তারপর আরবের

---

১৬৯ দালায়িল আন-নুবুওয়াহ্-৩/১৬০; উসুদুল গাবা-৫/২৫০; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-৩/৩৪৬; তাবাকাত-৮/১২

১৭০ সহীহ আল-বুখারী, কিতাব আল-বুয়ূ; সুনানে নাসাঈ, কিতাব আন-নিকাহ; মুসনাদে আহমাদ-১/৯৩, ১০৪, ১০৮

প্রথা অনুযায়ী কনের পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ ও বর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে সংক্ষিপ্ত খুতবা দান করেন। তারপর উপস্থিত অতিথি সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে খুরমা ভর্তি একটা পাত্র উপস্থাপন করা হয়।[১৭১] এবং বিয়ের পর সকলের মাঝে খুরমা বিতরণ করা হয়।

এভাবে অতি সাধারণ ও সাদাসিধেভাবে 'আলীর সাথে নবী দুহিতা ফাতেমাতুয যাহরার শাদী মুবারক সম্পন্ন হয়। অন্য কথায় ইসলামের দীর্ঘ ইতিহাসের সবচেয়ে মহান গৌরবময় বৈবাহিক সম্পর্কটি স্থাপিত হয়।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর স্ত্রীকে উঠিয়ে নেওয়ার জন্য একটি ঘর ভাড়া করতে সক্ষম হন। সে ঘরে বিত্ত-বৈভবের কোনো স্পর্শ ছিল না। সে ঘর ছিল অতি সাধারণ মানের। সেখানে কোনো মূল্যবান আসবাবপত্র, খাট-পালঙ্ক, জাজিম, গতি কোনোকিছুই ছিল না। আলীর ছিল কেবল একটি ভেড়ার চামড়া, সেটি বিছিয়ে তিনি রাতে ঘুমাতেন এবং দিনে সেটি মশকের কাজে ব্যবহার হতো। কোনো চাকর-বাকর ছিল না।[১৭২] আসমা বিনত উমাইস রাদিয়াল্লাহু আনহা যিনি আলী-ফাতেমার রাদিয়াল্লাহু আনহা বিয়ে ও তাঁদের বাসর ঘরের সাজ-সজ্জা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, বলেছেন, খেজুর গাছের ছাল ভর্তি বালিশ-বিছানা ছাড়া তাদের আর কিছু ছিল না। আর বলা হয়ে থাকে আলীর রাদিয়াল্লাহু আনহু ওলীমার চেয়ে ভালো কোনো ওলীমা সে সময় আর হয়নি। সেই ওলীমা কেমন হতে পারে তা অনুমান করা যায় এই বর্ণনা দ্বারা : আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর একটি বর্ম এক ইহুদির নিকট বন্ধক রেখে কিছু যব আনেন।[১৭৩] তাঁদের বাসর রাতের খাবার কেমন ছিল তা এ বর্ণনা দ্বারা অনুমান করতে মোটেই কষ্ট হয় না।

তবে বনু আবদিল মুত্তালিব এই বিয়ে উপলক্ষ্যে জাঁকজমকপূর্ণ এমন একটা ভোজ অনুষ্ঠান করেছিল যে, তেমন অনুষ্ঠান নাকি এর আগে তারা আর করেনি। সাহীহাইন ও আল-ইসাবার বর্ণনা মতে তাহলো, হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু যিনি মুহাম্মদ ﷺ ও আলী উভয়ের চাচা, দুটো বুড়ো উট যবেহ করে আত্মীয়-কুটুম্বদের খাইয়েছিলেন।[১৭৪]

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে আগত আত্মীয়-মেহমানগণ নব দম্পতির শুভ ও কল্যাণ কামনা করে একে একে বিদায় নিল। রাসূল ﷺ উম্মু সালামাকে রাদিয়াল্লাহু আনহা

---

১৭১ তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়ত আন-নুবুওয়াহ্-৬০৭

১৭২ আ'লাম আন-নিসা' -৪/১০৯; তাবাকাত-৮/১৩; সাহাবিয়াত-১৪৮

১৭৩ তাবাকাত-৮/২৩

১৭৪ তারাজিমু বায়ত আন-নুবুওয়াহ্-৬০৭

ডাকলেন এবং তাঁকে কনের সাথে আলীর বাড়িতে যাওয়ার জন্য বললেন। তাঁদেরকে একথাও বলে দিলেন, তাঁরা যেন সেখানে তাঁর (রাসূল সা.) যাওয়ার অপেক্ষা করেন।

বিলাল রা. ঈশার নামাযের আযান দিলেন। রাসূল সা. মসজিদে জামা'আতের ইমাম হয়ে নামায আদায় করলেন। তারপর আলীর রা. বাড়ি গেলেন। একটু পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলে কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে তাতে ফুঁক দিলেন। সেই পানির কিছু বর-কনেকে পান করাতে বললেন। অবশিষ্ট পানি দিয়ে রাসূল সা. একটি পাত্রের মধ্যে ওযু করলেন। সেই ওযু করা পানি তাঁদের দু'জনের মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। তারপর তিনি এই দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তাদের দু'জনের মধ্যে বরকত দান কর। হে আল্লাহ! তুমি তাদের দু'জনকে কল্যাণ দান কর। হে আল্লাহ! তাদের বংশধারায় সমৃদ্ধি দান কর।'

ফাতেমা চোখের পানি সম্বরণ করতে পারেননি। পিতা কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর পরিবেশকে হালকা করার জন্য অত্যন্ত আবেগের সাথে মেয়েকে বলেন : আমি তোমাকে সবচেয়ে শক্ত ঈমানের অধিকারী, সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, সবচেয়ে ভালো নৈতিকতা ও উন্নত মন-মানসের অধিকারী ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রেখে যাচ্ছি।[১৭৫]

সহজ-সরল পারিবারিক জীবন

পিতৃগৃহ থেকে ফাতেমা যে স্বামী গৃহে যান সেখানে কোনো প্রাচুর্য ছিল না; বরং সেখানে যা ছিল তাকে দারিদ্র্যের কঠোর বাস্তবতাই বলা সঙ্গত। সেক্ষেত্রে তাঁর অন্য বোনদের স্বামীদের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলক অনেক ভালো ছিল। যায়নাবের বিয়ে হয় আবুল আসের রা. সাথে। উম্মে কুলসুম ও রুকাইয়ার বিয়ে হয় মক্কার বড় ধনী ব্যক্তি আব্দুল উযযা ইবন আবদিল মুত্তালিবের দুই ছেলের সাথে। ইসলামের কারণে তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর একের পর একজন করে তাঁদের দু'জনেরই বিয়ে হয় উসমান ইবনে আফফানের রা. সাথে। আর উসমান রা. ছিলেন একজন বিত্তবান ব্যক্তি। তাঁদের তুলনায় আলী রা. ছিলেন একজন নিতান্ত দরিদ্র মানুষ। তাঁর নিজের অর্জিত সম্পদ বলে যেমন কিছু ছিল না, তেমনি উত্তরাধিকার সূত্রেও কিছুই পাননি। তাঁর পিতা মক্কার সবচেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তবে তেমন অর্থ-বিত্তের মালিক ছিলেন না। আর সন্তান ছিল অনেক। তাই বোঝা লাঘবের জন্য মুহাম্মদ সা. ও তাঁর চাচা আব্বাস তাঁর দুই ছেলের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। এভাবে আলী রা. যুক্ত হন মুহাম্মদের সা. পরিবারের সাথে।

---

১৭৫ তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তে আন-নুবুওয়াহ্-৬০৮

ফাতেমা আঠারো বছরে স্বামী গৃহে যান। সেই ঘরে গিয়ে পেলেন খেজুর গাছের ছাল ভর্তি চামড়ার বালিশ, বিছানা, এক জোড়া যাঁতা, দু'টো মশক, দু'টো পানির ঘড় আর আতর-সুগন্ধি। স্বামী দারিদ্র্যের কারণে ঘর-গৃহস্থালির কাজ-কর্মে তাঁকে সহায়তা করার জন্য অথবা অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজগুলো করার জন্য কোনো চাকর-চাকরানী দিতে পারেননি। ফাতেমা একাই সব ধরনের কাজ সম্পাদন করতেন। যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে তাঁর হাতে কড়া পড়ে যায়, মশক ভর্তি পানি টানতে টানতে বুকে দাগ হয়ে যায় এবং ঘর-বাড়ি ঝাড়ু দিতে দিতে পরিহিত কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে যেত।[১৭৬] তাঁর এভাবে কাজ করা আলী মেনে নিতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর করারও কিছু ছিল না। যতটুকু পারতেন নিজে তাঁর কাজে সাহায্য করতেন। তিনি সব সময় ফাতেমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকতেন। কারণ, মক্কী জীবনে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থায় তিনি যে অপুষ্টির শিকার হন তাতে বেশ ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়েন। ঘরে-বাইরে এভাবে দু'জনে কাজ করতে করতে তাঁরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

হযরত ফাতেমা -এর ইন্তেকাল

হযরত ফাতেমার অপর তিন বোন যেমন তাঁদের যৌবনে ইন্তেকাল করেন তেমনি তিনিও হযরত রাসূলে করীমের ইন্তেকালের আট মাস, মতান্তরে সত্তর দিন পর ইহলোক ত্যাগ করেন। অনেকে রাসূলুল্লাহর ইন্তেকালের দুই অথবা চার মাস অথবা আট মাস পরে তাঁর ইন্তেকালের কথাও বলেছেন। রাসূলুল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী- 'আমার পরিবারের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে'- সত্যে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহর নবুওয়াত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে যদি হযরত ফাতেমার জন্ম ধরা হয় তাহলে মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৯ বছর। আর কেউ বলেছেন যে, নবুওয়াত লাভের এক বছর পর ফাতেমার জন্ম হয়, এই হিসাবে তাঁর বয়স ২৯ বছর হবে না। যেহেতু অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ মনে করেন, মৃত্যুকালে ফাতেমার বয়স হয়েছিল ২৯ বছর, তাই তাঁর জন্মও হবে নবুওয়াতের পাঁচ বছর পূর্বে।[১৭৭]

আল-ওয়াকিদী বলেছেন, হিজরি ১১ সনের ৩ রমাদান ফাতেমার ইন্তেকাল হয়। হযরত আব্বাস জানাযার নামায পড়ান। হযরত আলী, ফযল ও 'আব্বাস কবরে নেমে দাফন কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর অসীয়াত মতো রাতের বেলা তাঁর দাফন করা হয়। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, আলী, মতান্তরে

১৭৬ তাবাকাত-৮/১৫৯; আল-ইসাবা-৪/৪৫০
১৭৭ সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা' -২/১২৭

আবু বকর জানাযার নামায পড়ান। স্বামী আলী ও আসমা বিনত উমাইস তাঁকে গোসল দেন।[১৭৮]

হযরত আলী -এর সন্তান-সন্ততি

হযরত ফাতেমা হাসান, হুসাইন, উম্মু কুলছুম ও যায়নাব- এ চার সন্তানের মা হন। তিনি শিশু হাসানকে দুহাতের উপর রেখে দোলাতে দোলাতে নিচের চরণটি আবৃত্তি করতেন, আমার সন্তান নবীর মতো দেখতে, 'আলীর মতো নয়।' নিচে হযরত আলী ও ফাতেমা -এর চার সন্তান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

১. হযরত হাসান

তৃতীয় হিজরি সনের রমযান মাসের ১৫ তারিখ, ৩/১ এপ্রিল, ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত কুরাইশ বংশে ইমাম হাসান -এর জন্ম হয়।[১৭৯] ফাতেমার পিতা নবীকে এ সুসংবাদ দেওয়া হলো। তিনি দ্রুত ছুটে গেলেন এবং আদরের মেয়ে ফাতেমার সদ্যপ্রসূত সন্তানকে দু'হাতে তুলে তার কানে আযান দেন এবং গভীরভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন।

জন্মগ্রহণ করার পর আলী তাঁকে একখানা সাদা কাপড়ে আবৃত করে রাসূল -এর কোলে দেন এবং তাঁর নামকরণের জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। রাসূল নিজের লালা মিলিয়ে তাঁকে 'তাহনিক' মিষ্টি মুখ করান। রাসূল আলী কে জিজ্ঞেস করলেন– তুমি তার কি নাম রেখেছ? আলী বললেন, আমি এর নাম রেখেছি হরব। তখন রাসূল -এর নাম রাখলেন হাসান।[১৮০]

হাসানের কুনিয়াত ছিল 'আবু মুহাম্মদ' এটাও রাসূল -এর সমার্থন মোতাবেক রাখা হয়েছিল। এ নামে তাঁর কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। হাসান কে উম্মুল ফাদল তার পুত্র কুছাম -এর সাথে দুধ পান করিয়েছিলেন। এদিক দিয়ে কুছাম আত্মীয় সম্পর্কে হাসান -এর চাচা হওয়া ছাড়াও দুধ ভাই হতেন।[১৮১] রাসূল দৌহিত্র হাসানের মাথা মুড়িয়ে তার চুলের সমপরিমাণ ওজনের রুপা গরিব-মিসকীনদের মধ্যে দান করে দেন।

---

১৭৮ আল-ইসতী'আব- ৪/৩৬৭, ৩৬৮; আনসাব আল-আশরাফ-১/৪০২, ৪০৫

১৭৯ শামসুদ্দিন আয-যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৬। যাহাবি রমযানের পরিবর্তে শাবান মাসকে অগ্রাধিকার দেন।

১৮০ আবুল ফিদা হাফিজ ইবনে কাছির আদ-দামেশকি (র), আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৭), ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭৩-৭৮

১৮১ ইসলামি বিশ্বকোষ, ২৫শ খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬), পৃ. ৫৬৮।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসার পাত্র ইমাম হাসান

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, বুক থেকে মাথা পর্যন্ত হাসান হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্যের অধিকারী। আর নীচের অংশে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্যের অধিকারী।[১৮২]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তার কাঁধে চড়িয়ে রেখেছিলেন, তা দেখে জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে বৎস! কেমন সুন্দর সওয়ারিতে তুমি আরোহণ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আরোহীও কতই না সুন্দর।[১৮৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, এমনকি শৈশবে তাঁর ঠোঁটে চুমু খেতেন। কখনো বা জিহ্বা চুষতেন। বুকে নিতেন। আদর-সোহাগ করতেন। কখনো শিশু হাসান এসে দেখতেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে সিজদায় আছেন। তখন তিনি তাঁর পিঠে চড়ে বসতেন। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পিঠেই বসে থাকতে দিতেন এবং তাঁর কারণে সিজদা লম্বা করতেন। কখনো বা তাঁকে মিম্বরে উঠিয়ে বসাতেন।[১৮৪]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে ইমাম যুহরী (র) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সকলের মাঝে হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-ই ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পবিত্র মুখমণ্ডলের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যের অধিকারী।

হযরত হানী (র) আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, বুক থেকে মাথা পর্যন্ত হাসান হলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্যের অধিকারী। আর এর নিচের অংশে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্যের অধিকারী, (মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক)। পিতা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু পুত্র হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বেশ সম্মান করতেন এবং যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন। একদিন তিনি পুত্র হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, হে বৎস! একটা ভাষণ দাও না, আমি শুনি। তিনি বললেন, আপনার সামনে ভাষণ দিতে আমার সংকোচবোধ হয়। তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যত্র গিয়ে এমনভাবে বসলেন যাতে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে দেখতে না পান। তখন হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন আর হযরত আলী অন্তরাল থেকে তাঁর কথা শুনছিলেন। তিনি সেদিন অতি সারগর্ভ এক ভাষণ দিয়েছিলেন। যখন তিনি প্রস্থান করলেন, তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

---

১৮২. মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক।

১৮৩. জামে তিরমিযি; মিশকাত, হা-৫৯১২।

১৮৪ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৩

বলতে লাগলেন, ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ তারা একে অন্যের সন্তান আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।[১৮৫]

অধিকাংশ সময় তিনি নীরব থাকতেন কিন্তু যখন কথা বলতেন তখন সকল বক্তাকে ছাড়িয়ে যেতেন। কোনো দাওয়াতে তিনি শরিক হতেন না এবং কোনো বিবাদ-বিতর্কে জড়াতেন না। কোনো বিচারকের সম্মুখে ছাড়া যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতেন না। তিনি আল্লাহ্র সঙ্গে তাঁর সম্পদ তিনবার ভাগাভাগি করেছেন এবং দু'বার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্র পথে দান করেছেন। পায়ে হেঁটে পঁচিশবার হজ করেছেন, অথচ উট ও ঘোড়া তাঁর সম্মুখে চলছিল।[১৮৬]

জ্ঞান সাধনায় হাসান ﷺ

রাসূল ﷺ শিশুদের বাল্যবয়স থেকেই কুরআন শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।[১৮৭] ইমাম বুখারি এ বিষয়ক একটি অধ্যায়ও রচনা করেছেন। রাসূল ﷺ-এর যুগে শিশু-কিশোররা রাসূল ﷺ-এর সভায় উপস্থিত হয়ে কুরআন পড়া শিখতেন। সে সময় যাদের বয়স আট-দশ বা পনের-ষোল বছর পর্যন্ত ছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– হাসান ইবনে আলী, হুসাইন ইবনে আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, নু'মান ইবনে বাশির, আবুত তুফাইল কিনানি, সায়িব ইবনে সায়িদ, আনাস ইবনে মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, সাহল ইবনে সাঈদি, আবু সাঈদ খুদরি প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম।[১৮৮] জুনদুব ইবনে আবদিল্লাহ আল-বাজালি ﷺ বলেন:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا

আমরা রাসূল ﷺ-এর সময়ে শক্তি সামর্থ্যবান বালক ছিলাম। আমরা কুরআন পড়ার পূর্বে ঈমান শিখি, তারপর কুরআন পড়ি। যে কারণে আমাদের ঈমান শক্তিশালী হয়।[১৮৯]

---

১৮৫ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৭

১৮৬ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৯

১৮৭. সীরাতে ইবনে হিশাম : প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬০

১৮৮. খাতীব আল-বাগদাদী, আল-কিফাইয়াহ ফী ইলম আর রিওয়াইয়াহ (হায়দ্রাবাদ), পৃ. ৫৫।

১৮৯. তাবরানি, আল-মুজামুল কাবীর, হা-১৩৭৮; আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি, হা-৫৪৯৮; ইবন মাজাহ।

তৎকালীন সময়ে বর্তমান যুগের মতো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকলেও সাহাবিগণ মানবতার মহান শিক্ষক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যাবতীয় শিক্ষা গ্রহণ করতেন এবং তাঁর আদেশ নিষেধ মতো নিজেদের যাবতীয় কাজ-কর্ম ও চরিত্র গড়ে তুলতেন। এ অবস্থার মধ্যে ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জ্ঞানার্জনের ভার গ্রহণ করলেন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পিতা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মাতা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা। তাই কিছুদিনের মধ্যে তিনি নানা ও পিতা-মাতার কাছ থেকে কুরআন ও শরিয়তের সবকিছু হুকুম আহকম শিখে ফেলেন।

হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছ থেকে কুরআন শিক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁর আদেশ, নিষেধ, হুকুম-আহকাম, ফিকহ্ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এছাড়ও ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজ সন্তানদের চরিত্র গঠনে বেশ যত্নবান ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি একজন আদর্শ মাতা হিসেবে আপন দায়িত্ব পালন করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী

সহিহ বুখারি শরিফে আবু বাকরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমি মিম্বরে দেখেছি। হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সঙ্গে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার উপস্থিত লোকদের দিকে আরেকবার তার দিকে লক্ষ করে বলছিলেন,

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"আমার এ সন্তান (উম্মত) হলো সাইয়েদ ও নেতা। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তার মাধ্যমে মুসলমানদের দুটি বিরাট দলের মাঝে সমঝোতা করাবেন।"[১৯০]

এটা নিছক একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না। এ ভবিষ্যদ্বাণীর আলাদা তাৎপর্য এই যে, এটা ছিল হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উদ্দেশে উচ্চারিত এক দিক-নির্দেশনামূলক বাণী যা তার ভবিষ্যত জীবনের চিন্তা ও কর্ম এবং নীতি ও আদর্শকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উপরিউক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্তরের অন্তস্থলে প্রবেশ করেছিল এবং তাঁর অনুভূতিকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করেছিল এবং তার রক্ত-মাংসে মিশে গিয়েছিল। ফলে এটাকে তিনি তাঁর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি অসিয়তরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর প্রিয় নানাজানের মুখে যখন তিনি এ শব্দগুলো শ্রবণ করছিলেন এবং এটাকে তিনি তাঁর প্রতি স্নেহ ভালোবাসার কারণ রূপে উল্লেখ করছিলেন তখন তাঁর পবিত্র

১৯০. সহিহ বুখারি।

মুখমণ্ডলে অপার্থিব আনন্দের ছাপ এবং তাঁর দু'চোখে নূরের একটা চমক অবশ্যই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যা তাঁর অন্তরে গভীর রেখাপাত করেছিল। ফলে এটাকে তিনি জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যরূপে এবং ভবিষ্যতের জন্য সর্বোচ্চ আদর্শরূপে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

হযরত আলী -এর ইন্তেকালের পর খলিফা নির্বাচিত

হযরত হাসান -এর পিতা হযরত আলী ইন্তেকাল করলে কুফার লোকেরা তাঁকে শপথপূর্বক খলিফা হিসেবে গ্রহণ করলেন। ৪০ হিজরি ১৭ রমজান কুয়াস ইবনে সা'দ ইবনে উবায়দা সর্বপ্রথম হযরত হাসান -এর আনুগত্য মেনে নেন।[১৯১]

কুয়াস হযরত হাসান -এর হাতে হাত রেখে শপথ নিয়েছিল এই বলে যে, "আমি আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত ও জিহাদের শপথ নিচ্ছি।"

তখন হযরত হাসান বললেন জিহাদ কুরআনের অপরিহার্য অংশ; তাই এটাকে আলাদা বলতে হবে না। হযরত হাসান -এর ওই বিবৃতি লোকদের মাঝে এ ধারণা জন্মায় যে, তিনি যুদ্ধের বিষয়ে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেন।

এদিকে সিরিয়ায় মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান নিজেকে নতুন খলিফা হিসেবে ঘোষণা করেন। তাৎক্ষণিকভাবে সিরিয়ার জনগণ তাঁকে আমীরুল মু'মিনিন হিসেবে মেনে নেয়।

ইসলামের ইতিহাসে এই ঘটনা ছিল প্রথম যে, দু'জন ব্যক্তি একই সাথে নেতৃত্ব দাবি করছেন। পরিস্থিতি দ্রুত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দিকে ধাবিত হতে লাগল।

হযরত মুয়াবিয়া ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে কুফা অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং হযরত হাসান -এর প্রতি একটি সংবাদ পাঠালেন যে, যুদ্ধের চেয়ে শান্তিই শ্রেয়; আর এটাই অধিকতর উত্তম হবে যে, আমাকে খলিফা হিসেবে গ্রহণ করে আমার হাতে বায়আত গ্রহণ করবে।

হযরত হাসান বুঝতে পারলেন যে, মুয়াবিয়া কুফা দখল করতে চান। এ কারণে তিনিও ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে তাদের মোকাবিলায় রওনা করলেন, যেখানে কুয়াসের নেতৃত্বে ২০ হাজার অগ্রগামী সৈন্য ছিল।

হযরত হাসান যখন মদিনায় পৌছা তখন কিছু লোক এই গুজব ছড়াল যে, কুয়াসকে হত্যা করা হয়েছে। একদিন হযরত হাসান সকলের উদ্দেশ্যে বললেন- "হে লোকসকল! তোমরা আমার হাতে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে, যুদ্ধ

---

১৯১. প্রাগুক্ত

ও শান্তি উভয়ক্ষেত্রে আমার আনুগত্য করবে। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি পূর্ব-পশ্চিমে এমন কোনো ব্যক্তি নেই যাকে আমি ঘৃণা করব; বরং আমি সকলের মাঝে ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ও ঐক্য স্থাপন করতে চাই।"

হযরত হাসান -এর বিরুদ্ধে মুয়াবিয়ার বিদ্রোহ

এই বক্তব্য শুনার পর খারেজিরা এ গুজব ছড়াল যে, হযরত হাসান মুয়াবিয়া -এর সাথে সমঝোতা করতে চাচ্ছেন। তারা হযরত হাসান -এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে এবং মুসলিম শিবিরে বিভক্তি তৈরি করে।

খুব শীঘ্রই এই গ্রুপটি হযরত হাসান কে অবিশ্বাসী হিসেবে অভিযুক্ত করে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। খারেজিরা এই সুযোগকে গ্রহণ করল এবং হাসানকে অবিশ্বাসী ঘোষণা দিয়ে তাঁকে সকল দিক থেকে অবরুদ্ধ করে রাখে। তারা তাঁকে আক্রমণ করল এবং সেখানে যা যা মূল্যবান সম্পদ ছিল তা লুণ্ঠন করল।

এ পরিস্থিতির পর তিনি মাদাইন ত্যাগ করেন এবং পুনরায় খারেজি সম্প্রদায়ের জাররাহ ইবনে কাবিশা দ্বারা আক্রান্ত হন। হযরত হাসান পরবর্তীতে মাদাইনের সাদা বাড়িতে অবস্থান নেন এবং সেখানে তাঁর স্বাস্থ্যের পরিচর্যা করেন।

কায়েস ইবনে সাদ ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যান এবং মুয়াবিয়া বাহিনী তাকে আনবুর নামক স্থানে ঘিরে ফেলে।

তারপর হযরত মুয়াবিয়া আব্দুল্লাহ ইবনে আমিরকে হযরত হাসান -এর নিকট শান্তি চুক্তি নিয়ে পাঠান। এ সংবাদ শুনে হযরত হাসান তাঁর সৈন্য নিয়ে মাদাইনে ফিরে আসেন।

হযরত হাসান আব্দুল্লাহ ইবনে আমিরের নিকট এ সংবাদ পাঠান যে, তিনি মুয়াবিয়ার সাথে কিছু শর্তসাপেক্ষে শান্তি চুক্তি ও খিলাফত ছেড়ে দিতে রাজি আছেন। সেগুলো হলো :

১. হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান -এর নিকট খিলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তর করা হবে।

২. হযরত মুয়াবিয়া -এর পর মুসলমানরা তাদের খলিফা নিযুক্ত করতে স্বাধীন ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে।

৩. হযরত মুয়াবিয়া আলী -এর আত্মীয়-স্বজন কারো বিপক্ষে দাঁড়াবে না।

৪. হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন -এর সমর্থকরা তার দ্বারা আক্রান্ত হবে না।

৫. তারা দুই ভাই ও তাদের স্বজন স্বাধীনভাবে যেখানে খুশি বসবাস করতে পারবেন।

৬. হযরত মুয়াবিয়া পারস্যের জেলা আওয়াজ এর রাজস্ব কর হযরত হাসান -এর নিকট পাঠাবে।

৭. কুফার কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব হযরত হাসান -এর ওপর থাকবে এবং তা ব্যয়ের স্বাধীনতাও থাকবে।

'আল-আখবারিত-তিওয়াল' নামক গ্রন্থে সন্ধির শর্তসমূহ নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে–

১। কেবল হিংসা ও বিদ্বেষের বশে কোনো ইরাকিকে পাকড়াও করা যাবে না।

২। কোনোরূপ শত ছাড়াই সকলকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।

৩। আহওয়ায প্রদেশের যাবতীয় রাজস্ব হাসান -এর নিকট নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে।

৪। হুসাইন -কে বার্ষিক দুলক্ষ দেরহাম আলাদাভাবে প্রদান করা হবে।

৫। উপহার-উপঢৌকন বিতরণের ক্ষেত্রে বনু হাশিমকে বনু উমাইয়ার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।[১৯২]

এ সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। এ চুক্তির পর মুয়াবিয়া অবরোধ উঠিয়ে নিলেন এবং কায়েসকে মুক্ত করে দিলেন।

সেখানে থেকে মুয়াবিয়া কুফা মসজিদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং হযরত হাসান থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন। হযরত হাসান -এর ভাই হযরত হুসাইন পরবর্তী সময়ে শপথ গ্রহণ করেন।

খেলাফত থেকে সরে দাঁড়ানোর পর মু'আবিয়া -এর অনুরোধে হাসান একটি ভাষণ প্রদান করেছিলেন। সেই ভাষণে তিনি হামদ-ছানার পর বলেছিলেন–

اَمَّا بَعْدُ! اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللهَ هَدَاكُمْ بِاَوَّلِنَا وَحَقَنَ دِمَاءَكُمْ بِاٰخِرِنَا وَاِنَّ لِهٰذَا الْاَمْرِ مُدَّةً وَالدُّنْيَا وَاِنْ لَا اَدْرِىْ لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ.

---

১৯২. আল-ইস্তিআব ও আল-ইসাবা নামক গ্রন্থে কেবল দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ, কোনোরূপ পার্থক্য ছাড়াই নিরাপত্তা প্রদান ভিন্ন অন্য কোনো শর্তের উল্লেখ নেই। অবশ্য আরো একটি শর্ত লিখিত রয়েছে যে, মুআবিয়া (রা)-এর পর হাসান (রা) খলিফা হবেন। কিন্তু আল-মাসউদি, আদ-দীনাওয়ারি, আল-ইয়াকুবী, আত-তাবারি, ইবনুল আছীর ইত্যাদি গ্রন্থে এই শর্তের উল্লেখ নেই। (দ্র. ইসলামি বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৯)

"অতপর হে লোক সকল! আল্লাহ্ আমাদের প্রথমজন দ্বারা তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন আর আমাদের শেষ জন দ্বারা তোমাদের রক্তপাত বন্ধ করেছেন। এ রাজত্ব হলো নির্ধারিত সময়ের জন্য। আর পৃথিবীর ধর্মই হলো উত্থান-পতন। আর আমি জানি না, হয়ত তোমাদের জন্য এটা পরীক্ষার মাধ্যম হবে এবং সঠিক সময়ের জন্য ভোগের বিষয় হবে।"[১৯৩]

সাধারণ জনসমাবেশে এই ভাষণ ছাড়াও হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু মাদায়েন রাজ-প্রাসাদে ইরাকের নেতৃবর্গকে এই সন্ধি ও সমঝোতা মেনে নেয়ার জন্যও একটি বক্তৃতা করেছিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন–

"তোমরা আমার হাতে এই বিষয়ে বাইয়াত করেছিলে যে, আমি যার সাথে সন্ধি করবো তোমরাও তার সাথে সন্ধি করবে আর আমি যার সাথে যুদ্ধ করব তোমরাও তাহার সাথে তোমরা যুদ্ধ করবে। এখন আমি মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে বাইআত করেছি, অতএব, তোমরাও তাঁর হাতে বাইয়াত কর এবং তার আনুগত্য কর।'[১৯৪]

অন্য এক বর্ণনায় আছে ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাষণটি ছিলো নিম্নরূপ– "হে মুসলমানরা, আমার প্রতি অনিষ্ঠতা খুবই ঘৃণাজনক। আমার নানা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মাহর ঐক্য সংহত রাখতে আমি হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে শান্তি চুক্তি করেছি। যাবতীয় গোলমাল থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে আমি তাকে খলিফা হিসেবে গ্রহণ করেছি। তাই যাবতীয় আদেশ ও খিলাফত তার অধিকার। আর সেও এটা গ্রহণ করেছেন। যদিও এটা আমার ছিল, আমি এটা হস্তান্তর করেছি।"

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রভাবিত করে। তিনি হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথায় অভিভূত হন। যখন হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু মঞ্চ থেকে নামলেন। তখন হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন। হে হাসান! তুমি আসলেই একজন সাহসী ব্যক্তি। তোমার পূর্বে কাউকে এমন কথা বলতে শুনেনি।

এ শান্তি চুক্তির পর ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অনেক ভক্ত, অনুরক্ত ও সমর্থকদ মু'আবিয়ার অনুকূলে খেলাফত ত্যাগের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তাকে তিরস্কার করছিলো। অথচ এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী এবং তাঁর এ সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত সাহসিকতাপূর্ণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। এ বিষয়ে তাঁর মনে

---

১৯৩ আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খ. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

১৯৪ আল-ইসাবা, পৃ. ৩৩০

কোনো মতোবিরোধ ছিল না, আফসোস বা অনুতাপ ছিলো না; বরং তিনি পূর্ণ সন্তুষ্ট ও আনন্দিত ছিলেন। আবু আমির নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁকে একবার এভাবে সম্বোধন করেছিলেন, হে মু'মিনদেরকে অপদস্থকারী! আপনাকে সালাম, তখন তিনি বললেন, হে আবু আমির! একথা বলো না, আমি মু'মিনদেরকে অপদস্থকারী নই; বরং আমি ক্ষমতার জন্য তাদের রক্তপাত পছন্দ করিনি।[১৯৫] এ শান্তি প্রতিষ্ঠার পর হযরত মুয়াবিয়া কুফা থেকে তার রাজধানী দামেস্কের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন।[১৯৬]

শান্তির ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন

হযরত হাসান ও হযরত মুয়াবিয়া -এর মধ্যকার শান্তি চুক্তি সম্পর্কে নবী করীম অনেক বছর আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

"হযরত আবু বকর থেকে বর্ণিত আছে, "আমি নবী কে বলতে শুনেছি যে, যখন হাসান তার পার্শ্বেই ছিলেন, তিনি তাকে দেখে সামনে টেনে আনলেন এবং বললেন। আমার এই বালকটি খুবই উদার যা আল্লাহর দান। যখন মুসলমানরা উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, সে তখন তাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে।"

৪১ হিজরি সালে এ কথাটি পূর্ণতা লাভ করে। যখন হাসান তার দাবি প্রত্যাখ্যান করেন এবং মুয়াবিয়াকে খিলাফত হস্তান্তর করেন। আর এভাবেই মুসলমানরা পরবর্তী রক্তপাত থেকে রক্ষা পান। হযরত আলী -এর শাহাদাতের ঠিক ছয় মাস পর ৪১ হিজরি রবিউল আউয়াল মাসে এ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ বছরটি জামায়া বা ঐক্যের বছর হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

খিলাফতের ত্রিশ বছর পূর্ণ ও হযরত হাসান -এর মদিনায় প্রত্যাবর্তন

এ চুক্তির অল্প কিছু দিন পর তিনি মদিনার উদ্দেশে কুফা ত্যাগ করেন। তাঁর পরিবার নিয়ে সেখানে স্থায়িভাবে বসবাস করেন। রাসূলুল্লাহ -এর ভবিষ্যদ্বাণী করে ছিলেন যে, ইসলামি খিলাফত হবে ৩০ বছর। ইবনে কাছির বলেন, রাসূল বলেছেন ঃ

الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً. ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ

---

১৯৫ আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খ. প্রাগুক্ত পৃ. ১৯

১৯৬ আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খ. প্রাগুক্ত পৃ. ১৬

"আমার পরে খেলাফত ত্রিশ বছর স্থায়ী হবে। অতঃপর রাজতন্ত্র শুরু হবে।"[১৯৭] আর হাসান ইবনে আলী -এর খেলাফত দিয়েই ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়। কেননা, তিনি ৪১ হিজরির রবিউল আওয়াল মাসের মু'আবিয়া -এর অনুকূলে খেলাফত থেকে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর ঐ সময় রাসূল -এর ওফাত থেকে শুরু করে পূর্ণ ত্রিশ বছর হয়।[১৯৮]

মদিনা আসার পর হাসান জীবনের বিরাট অংশই আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত করেন। মু'আবিয়া একবার এক ব্যক্তির নিকট তাঁর অবস্থা ও খোঁজ-খবর জিজ্ঞেস করলে লোকটি উত্তর দেন: ফজরের সালাত আদায়ের পর সূর্যদয় পর্যন্ত তিনি জায়নামাযের ওপর থাকেন, অতঃপর হেলান দিয়ে উপবেশন করেন এবং আগমন ও নির্গমনকারী লোকদের সাথে সালাম বিনিময় করেন। সূর্য কিছুটা ওপরে ওঠলে চাশতের নামায আদায় করে উম্মাহাতুল মুমিনীনদের খেদমতে সালামের জন্য উপস্থিত হয়ে থাকেন। মক্কা মুআয্‌যমায় অস্থানকাল অভ্যাস ছিল পবিত্র হারামে আসরের নামাযের পর তাওয়াফে লিপ্ত হওয়া।[১৯৯]

হযরত হাসান -এর চরিত্র

হযরত হাসান ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি খুব শান্ত-শিষ্ট ছিলেন। তিনি অত্যন্ত কম কথা বলতেন; তবে তিনি যখন বলতেন, তখন লোকেরা তার কথা মনোযোগ সহকারে শুনতো। লোকেরা তাঁর কাছে তাদের বিবাদের ফায়সালা নিতে আসত। তিনি কুরআন ও হাদিস অনুসারে তাদের বিবাদের সুষ্ঠু সমাধান করে দিতেন। তার নম্র এবং কোমল ব্যবহারের জন্য সকলে তাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। মহান আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে ইমাম হাসান অধিক সময় ব্যয় করতেন। তাহাজ্জুদ আদায় করার পর তিনি আর ঘুমাতেন না। এ অবস্থাতেই ফজর, ইশরাক ও চাশত নামায আদায় করে মসজিদ থেকে বের হতেন। বছরের বেশিরভাগ সময় তিনি রোযা রাখতেন। কখনো কখনো যখন তিনি অযুতে মগ্ন হতেন তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো। তিনি কাপতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: 'আপনি এরকম হন কেন?' উত্তরে তিনি বলেন, 'যে বস্তু আল্লাহর দরবারে উপস্থিত তাঁর এরকম অবস্থাই যথোপযুক্ত।'

জাফর সাদিক বলেন, ইমাম হাসান তাঁর সময় সর্বশ্রেষ্ঠ আবিদ বা ইবাদতকারী ও অধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন।" আর যখনই তিনি মৃত্যু ও

---

১৯৭ সুনানে তিরমিযি, হা-২২২৬; আবু দাউদ, হা-৪৬৪৬।

১৯৮ নাসির বিন আলী আইয, আকিদাতু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪৩

১৯৯ ইবনে আসাকির; ইসলামি বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭০।

পুনরুত্থানের কথা স্মরণ করতেন, তখনই ক্রন্দন করতেন এবং বেহুস হয়ে পড়তেন।

ঐতিহাসিকগণ বলেন, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কোনো কোনো খুতবায় সূরা ইবরাহিম পাঠ করতেন। প্রতিরাতে ঘুমানোর পূর্বে তিনি সূরা কাহফ পাঠ করতেন। তাঁর নিকট সংরক্ষিত একটি ফলক থেকে দেখে দেখে তিনি এই সূরা পাঠ করতেন। তাঁর স্ত্রীদের নিকট যেখানে তিনি যেতেন ঐ লিপি ফলক সেখানে তাঁর সাথে থাকতো। তারপর নিজ বিছানায় শুয়ে ঘুমানোর পূর্বে তিনি ঐ সূরা পাঠ করতেন।

আলী ইবনে যায়দ ইবনে জাদআন বলেন যে, ইমাম বুখারি তাঁর সহিহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশবার মদিনা হতে পায়ে হেটে মক্কা গিয়ে হজ্জ আদায় করেন। অথচ উট ও ঘোড়া তাঁর কাছ দিয়ে চলছিল। বাহন ব্যবহার না করে এত কষ্ট করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন,[২০০] 'বাহনে আরোহণ করে আল্লাহর ঘরের নিকট যেতে আমি লজ্জাবোধ করি।

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু খুবই উদার ও দানশীল লোক ছিলেন। তিনি আল্লাহর পথে ব্যয় করতে চেয়েছিলেন। সিরিয়াবাসীদের সাথে সংঘাত করে মুসলিমদের রক্ত ঝরাতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

সালিহ ইবনে আহমদ বলেন, আমি আমার বাবাকে বলতে শুনেছি, 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পুত্র হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন মদিনার অধিবাসী। তিনি আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত লোক। ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এ ঘটনা উল্লেখ করেন। আলী ইবনে যায়দ বলেন, আল্লাহ তায়ালা হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ধন-সম্পদকে তিনবার বণ্টন করিয়েছেন[২০১] এবং হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু দুবার তার ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত দুজোড়া[২০২] জুতা থাকলে এক জোড়া কাছে রেখে অপর জোড়া দান করে দিতেন।

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন বলেন, কোনো এক সময় হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে এক লক্ষ দিরহাম দান করেন। সাঈদ ইবনে আবদুল আযিয বলেন, একদিন হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পাশে থাকা এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে মহান আল্লাহর কাছে ১০ হাজার দিরহাম প্রদানের আবেদন জানাচ্ছেন। এটি পাশ থেকে শুনে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ[২০৩] গৃহে গমন করলেন এবং লোকটির জন্যে ১০ হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন।

---

২০০ আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খণ্ড, (ই.ফা.বা), পৃ. ৮১

২০১ আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খণ্ড, (ই.ফা.বা), পৃ. ৮১।

২০২ উসদুল গাবা।

২০৩ আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২।

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর ইন্তেকাল

সালামা ইবনে মিসকিন ইমরান ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত যে করেছেন যে, তিনি বলেন, একদিন হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁর কপালে লেখা রয়েছে– قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ এ স্বপ্ন দেখে তিনি খুব আনন্দিত হলেন। এ ঘটনা সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জানতে পারলেন। তিনি বললেন, যদি হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এমন স্বপ্ন দেখে থাকেন তবে বুঝতে হবে যে, তাঁর আয়ু আর বেশি দিন নেই।[২০৪] বর্ণনাকারী বলেন, বস্তুত এই স্বপ্ন দেখার পর অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল আর সেটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। ওমায়র ইবনে ইসহাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি এবং অন্য একজন কুরায়শী হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, কয়েক বার আমাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু এবারের মতো এমন ভয়ঙ্কর বিষ আর কখনো প্রয়োগ করা হয়নি।

যখন মৃত্যুর আলামত শুরু হলো তখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার কাছে এসে মাথার কাছে বসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, প্রিয় ভাই! বলুন কে সে? তিনি বললেন, তুমি কি তাকে হত্যা করতে চাও? হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন হ্যাঁ, তিনি বললেন, আমি যাকে সন্দেহ করছি যদি সে হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহণে অধিক কঠোর। আর যদি সে না হয়ে থাকে তাহলে আমার নামে এক নিরপরাধকে হত্যা করা আমার অপছন্দ।[২০৫]

সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রাকাবাহ ইবনে মুসকালাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন মৃত্যু মুখোমুখী তখন তিনি বললেন, 'তোমরা আমাকে উঠানে নিয়ে যাও, আমি আল্লাহর এই বিশাল সাম্রাজ্য দেখে নিই।' তারা বিছানাসহ তাঁকে উঠানে নিয়ে এল। তিনি ওপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি আমার প্রাণ বিসর্জনের বিনিময়ে আপনার নিকট নেকী কামনা করছি। কারণ আমার এই প্রাণ আমার অত্যন্ত প্রিয় বস্তু।' বর্ণনাকারী বলেন, বস্তুত মহান আল্লাহ তাঁর যে পরিণতি ঘটালেন তার বিনিময়ে তিনি আল্লাহর নিকট নেকী কামনা করলেন।

আবু নুআইম বলেছেন, হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর মৃত্যু বেদনা যখন বেড়ে গেল তখন তিনি খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। তখন একজন লোক তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, 'হে আবু মুহাম্মদ! এমন অস্থিরতা, ধৈর্যহীনতা কেন? এখন শুধু এটুকু হবে যে,

---

২০৪ আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, পৃ. ৯০।

২০৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

আপনার দেহ থেকে প্রাণ পৃথক হবে আর তারপর আপনি পৌঁছে যাবেন আপনার নানা নানি– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট, আপনার পিতামাতা আলী ও ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে। আপনার চাচা হামযা ও জাফরের নিকট, আপনার খালা রুকাইয়া, উম্মু কুলসুম ও যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট।' বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বস্তি ফিরে পেলেন এবং হতাশা কেটে ওঠলেন।[২০৬]

বিশুদ্ধতম মতে হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু ৫০ হিজরির ৫ রবিউল ৪৭ বছর বয়সে শাহাদতবরণ করেন।

সুফিয়ান ছাওরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সালিম ইবনে আবী হাফসা সূত্রে আবু হাযিম থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্র যে, তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি সেদিন ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু সাঈদ ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সামনে এগিয়ে দিলেন, তিনি হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জানাযার নামাযে ইমামতি করলেন। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'এটি যদি সুন্নাত না হতো আমি তাঁকে এগিয়ে দিতাম না।" শহরের আমির জানাযায় ইমামতি করবেন এটি সুন্নাত।[২০৭]

হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জানাযায় এমন বিরাট লোক সমাগম হয়েছিল যে, জান্নাতুল বাকীতে আর একজন মানুষও ধারণের স্থান ছিল না। সা'লাবা ইবনে আকু মালিক হতে ওয়াকিদী বর্ণনা করেন। সালাবা বলেন, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু যেদিন শহিদ হলেন এবং জান্নাতুল বাকীতে দাফন হলো সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম। জান্নাতুল বাকির অবস্থা এমন দেখলাম যে, সেখানে যদি একটি সুঁই ফেলা হতো তাহলে তা কোনো না কোনো মানুষের মাথায় পড়তো।[২০৮]

২. হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু

শিশু হাসানের বয়স এক বছরের কিছু বেশি হতে না হতেই চতুর্থ হিজরির শা'বান মাসে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আরেকটি সন্তান উপহার দেন। আর এই শিশু হলেন হুসাইন।[২০৯] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে খেজুর চিবিয়ে দিয়েছিলেন এবং আপন পবিত্র থু থু তাঁর মুখে দান করেছিলেন। তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন এবং হুসাইন নাম রেখেছিলেন। জন্মের পর সপ্তম দিন আক্বীকার সুন্নাত পালন করে মাথার চুল মুণ্ডিয়ে ফেলেন এবং চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদকাহ করে ফকীর মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বহুবিদ গুণাবলী এবং

---

২০৬ আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খ. (ই.ফা.বা.), পৃ. ৯২।

২০৭ প্রাগুক্ত।

২০৮ আল-ইসাবা, ১ম খ. পৃ. ৩৩১।

২০৯ সহীহ আল-বুখারী, কিতাবুল মানাকিব

বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে 'যাকী' 'রাশীদ' 'তাইয়্যেব' 'সাইয়্যেদ' 'মুবারক' এবং 'আল্লাহর আনুগত্যকারী' ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান ও হুসাইন-এর সুস্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার জন্য নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতেন :

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔

"শয়তান জীব জানোয়ার এবং মানুষের বদ-নজরের আছর থেকে আল্লাহর কালামের সাহায্যে তোমাদের দু'জনের জন্য আশ্রয় চাচ্ছি।"[২১০]

নবীর প্রতিবিম্ব ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাসানের মত হুসাইনের সাথেও কৌতুক করে বলতেন, "হুসাইন নবীর মত, আলীর মত নয়।" বলা হয় যে, হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বক্ষ থেকে পা পর্যন্ত নবীর সদৃশ ছিল।[২১১]

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তার নানা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত মধ্যম আকৃতির ছিলেন, না অতি লম্বা- না খাটো। প্রশস্ত মুখমণ্ডল এবং ঘন দাড়ির অধিকারী ছিলেন। তাঁর বক্ষ এবং গর্দান প্রশস্ত ছিল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়া ছিল মোটা ধরনের। বড় আকৃতির পা, কম কোঁকড়ানো চুল ও সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর ভাষা ছিল অতি মধুর। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রফুল্লতা।

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অত্যধিক ইবাদতকারী, সর্বদা রোযা পালনকারী। তিনি সারারাত নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি ঔরসগতভাবে শ্রদ্ধেয় নানাজান বিশ্বনবীর মহত্ব, পিতার ইলম ও জ্ঞান এবং জননীর দুনিয়া বিরাগিতা অর্জন করেন।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হাযির হলাম, তখন হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বুকের উপর বসে খেলা করছিলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি তাদেরকে ভালোবাসেন? তিনি বললেন, কেমনে ভালো না বেসে পারি? তারা তো হলো দুনিয়াতে আমার (আল্লাহ প্রদত্ত) সম্পদ। [তাবারানী]

হযরত হারিস (র) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে মারফু সনদে বর্ণনা করেন,

اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

---

২১০ বুখারী, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাযাহ, আহমাদ- ২৩৬/১, ফাতহুল বারী- ৪০৮/৬।
২১১ তিরমিযী ইবনে হিব্বান- ২২৩৫, আহমাদ- ৯৯/১, হাইছামী- ১৭৬/৯।

"হাসান ও হুসাইন হলেন জান্নাতি যুবকগণের সরদার।"

তাবারানী বর্ণিত অন্য একটি 'মুরসাল' হাদীসে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কাঁদতে শুনে তাঁর আম্মা ফাতেমাকে বললেন, তুমি কি জান না যে, তার কান্না আমাকে কষ্ট দেয়? মুয়াবিয়া-পুত্র ইয়াযিদের নেতৃত্বে কনস্টান্টিনোপল অভিযানে প্রেরিত বাহিনীতে তিনি শরিক ছিলেন, এটা ছিল ৫১ হিজরির ঘটনা।

নামায, রোযা, হজ ইত্যাদি ইবাদত তিনি প্রচুর পরিমাণে করতেন। তিনি পায়ে হেঁটে বিশবার হজ করেছেন।

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন স্বভাব বিনয়ী। একদল দরিদ্র লোকের পাশ দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। সওয়ারির উপর থেকে তাদেরকে তিনি সালাম করলেন। তারা মাটিতে দস্তরখান পেতে রুটির টুকরো খাচ্ছিল, তারা তাঁকে দস্তরখানে শরিক হওয়ার দাওয়াত দিয়ে বলল, আসুন, হে আল্লাহর রাসূলের দৌহিত্র! তিনি সওয়ারি থেকে নেমে এসে বললেন, আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেন না। অতঃপর তিনি তাদের সাথে বসে খানায় শরিক হলেন। সবাই যখন আহার শেষ করল তখন তিনি তাদের বললেন, তোমরা আমাকে দাওয়াত দিয়েছ, আমি তোমাদের দাওয়াত কবুল করেছি। এখন আমি তোমাদেরকে আমার ঘরে দাওয়াত করছি। তারা দাওয়াত কবুল করে তাঁর বাড়িতে হাযির হলে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন দাসীকে ডেকে বললেন, হে রাবার, ঘরে কি রেখেছ, দাও।

হযরত ইব্ন উয়ায়না (রহ) আব্দুল্লাহ ইবন আবু যায়দ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হুসাইন ইব্ন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আমি দেখেছি, দাড়ির সামনের দিকে কয়েকটি চুল ছাড়া তিনি সম্পূর্ণ কৃষ্ণকেশী ছিলেন।[২১২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের প্রাক্কালে হাসান এবং হুসাইনকে নিয়ে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বিশ্বনবীর দরবারে হাজির হয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এই দুই সন্তানকে (উম্মতকে) আপনার উত্তরসূরী হিসেবে গ্রহণ করুন।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন–

اَمَّا الْحَسَنُ فَلَهُ سَخَائِىْ وَهَيْبَتِىْ وَاَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ شَجَاعَتِىْ وَسُؤْدَدِىْ۔

"হাসানের মধ্যে রয়েছে আমার দানশীলতা ও প্রভাব আর হুসাইনের মধ্যে রয়েছে আমার বীরত্ব ও নেতৃত্ব।"[২১৩]

২১২ আবুল হাসান আলী নদভী, পৃ. ২৫৭-২৫৮
২১৩ কানযুল উম্মাল- ২৪২৭২, হাইছামী- ১৮৫/৯।

বাস্তবেও হাসান নিজের মধ্যে রাসূল -এর দানের চেতনা এবং প্রভাব উপলব্ধি করতেন। মানুষ তাঁর সম্মুখে চোখ তুলে দেখার সাহস পেত না। এমনিভাবে হুসাইন নিজের ভিতর রাসূলে পাক -এর বীরত্ব এবং নেতৃত্ব উপলব্ধি করতেন। তিনি ছিলেন মহান নেতৃত্বের অধিকারী এবং সাহসী বীর।

ছোটবেলা থেকেই হুসাইন -এর মধ্যে বিশ্বনবী -এর মধ্যে বিশ্বনবী -এর মহান চরিত্র এবং নেতৃত্ব ফুটে উঠেছিল। বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের অনুভূতি ছিল। ছোট বেলারই ঘটনা, একবার হুসাইন মদীনার মসজিদে প্রবেশ করে ওমর কে রাসূলে পাক -এর মিম্বরে বসে খুতবা দিতে দেখতে পেলেন। আর দেখেই বলে উঠলেন, 'আমার নানার মিম্বর থেকে অবতরণ করুন এবং আপনার পিতার মিম্বরে গিয়ে বসুন।' ওমর নেহায়েত কাতর সূরে বললেন, 'আমার পিতার তো কোন মিম্বর নেই।' এই বলে ওমর বালক হুসাইনকে উঠিয়ে নিজের সাথে মিম্বরে বসালেন এবং খুতবা শেষে তাঁকে হাতে ধরে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাকে যা বলেছ তা তোমাকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছিল কি?' বালক হুসাইন বললেন, 'না, আমাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি, আমি নিজ থেকেই বলেছি। ওমর বললেন, 'হে প্রাণাধিক প্রিয় হুসাইন! তোমার যখনই ইচ্ছা হয় তখনই আমার নিকট চলে আসবে, অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই।'

খিলাফতের স্থলে রাজতান্ত্রিক শাসক ইয়াযিদ

মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াযিদ ছিলেন একজন উচ্ছৃঙ্খল যুবক। খেল-তামাশা, ভ্রমণ ও শিকারেই তার সময় অতিবাহিত হতো। কুফার শাসনকর্তা মুগীরাহ এই বলে মুয়াবিয়া কে প্ররোচনা দিলেন যে, তার ইন্তেকালের পর তার পুত্র ইয়াযিদই খলিফা হওয়ার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। অবশ্য মুয়াবিয়া প্রথম তা মেনে নিতে পারেননি। কেননা ইয়াযিদের চরিত্র খলিফা হওয়ার উপযুক্ত বলে মুয়াবিয়া কখনো মনে করেননি; কিন্তু মুগীরা ওয়াদা করলেন যে, "আমি কুফাবাসীকে প্রস্তুত করব, যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান বসরাবাসীকে এবং মারওয়ান ইবনে হিকাম মক্কা ও মদিনাবাসীকে ইয়াযিদের খিলাফতের অনুকূলে তৈরি করবেন। অন্যদিকে সিরিয়ার মুসলমানগণ কখনো বিরোধিতা করবে না। কাজেই ইয়াযিদের খিলাফতে কোনো বাধা নেই। এমনিভাবে কুফার শাসনকর্তা মুগীরার প্ররোচনায় তিনি ইমাম হাসান -এর সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিনামার অবমাননা করে নিজ ও গোত্রীয় স্বার্থে ইয়াযিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এ ব্যাপারে তিনি ইরাকিদের সমর্থন লাভ করেন। গণতন্ত্রের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে মুয়াবিয়া

বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে গেলেন। মক্কার ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। বিশেষকরে ইমাম হুসাইন, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর এবং আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর বিরোধীদের অন্যতম ছিলেন। তাদের বিরোধিতার কতকগুলো কারণ ছিল–

প্রথমত, খোলাফায়ে রাশেদীনের নির্বাচনে মনোনয়নের কোনো নজির ছিল না।

দ্বিতীয়ত, খলিফা নির্বাচন মদিনার লোকদের একটি বিশেষ অধিকার বলে গণ্য হতো এবং তা তারা ত্যাগ করতে কখনো রাজি ছিল না।

তৃতীয়ত, মুয়াবিয়া তাঁর নিজ পরিবারের মধ্যেই খিলাফত সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন।

চতুর্থত, ইয়াযিদ ছিলেন অসৎ চরিত্রের অধিকারী। এ সমস্ত কারণে তাদের বিরোধিতাও যুক্তিযুক্ত ছিল।

এভাবে সাহাবীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মুয়াবিয়ার মনোনয়নের মাধ্যমে ইসলামি খিলাফতের স্থলে রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মুয়াবিয়া ইন্তেকাল করেন। তারপর তার মনোনয়ন অনুসারে স্বীয় পুত্র উচ্ছৃঙ্খল ও খেলাফতের অনুপযুক্ত ইয়াযিদ ৩৪ বছর বয়সে মুসলিম জাহানের সিংহাসনে আরোহণ করেন। যার ফলে গণতান্ত্রিক নিয়মে খলিফা নির্বাচন পদ্ধতির অবসান ঘটে এবং মনোনয়ন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ইয়াযিদ সিংহাসনে আরোহণ করে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনেকেই তার প্রতি আনুগত্য স্থাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু ভয়ভীতির কারণে কেউ কোন রকম প্রতিবাদ করেনি।[২১৪]

কারবালার যুদ্ধ/ ইমাম হুসাইন -এর শাহাদাতের ঘটনা

৬০ হিজরীতে ইয়াযীদের পক্ষে বাইআত গ্রহণ শুরু হলে মদীনার গভর্নর ওলীদ ইব্‌নে উতবার নিকট ইয়াযীদের সমর্থনে বাইআত গ্রহণের ফরমান জারী হয়। কিন্তু মদীনাবাসীদের মধ্যে যারা ইয়াযীদের হাতে বাইআত গ্রহণে অসম্মত ছিলেন তারা ৬০ হিজরী রজব মাসের শেস ভাগে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমার দিকে রওয়ানা হন। তাদের অন্যতম একজন হচ্ছেন হুসাইন। হুসাইন এবং তাঁর সাথীবৃন্দ শাবান, রমযান, শাওয়াল এবং জিলকদ মাস সর্বমোট এই চার মাস মক্কায় অবস্থান করেন।

ইতিপূর্বে কুফাবাসীরা হাসান -এর সাথে গোপনভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে, চিঠিপত্র আদান প্রদান করে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্নয়ে টিম গঠন করে

---

[২১৪] হযরত আলী (রা.) : জীবন ও খিলাফত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

হুসাইন -এর সাথে সাক্ষাতে পাঠায়। তারা হুসাইন কে তাদের সমর্থনের কথা জানায় এবং বাইআতের উদ্দেশ্যে কুফায় আগমনের আমন্ত্রণ জানায়। এভাবে তারা হুসাইন কে সম্মত করতে সক্ষম হয়। অবশ্য ইবনে আব্বাস এবং ইবনে ওমর হুসাইন কে সতর্ক করে বলেছিলেন যে, ইরাক এবং কুফাবাসীদের উপর বিশ্বাস করা যায় না। এরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। কিন্তু যারা হুসাইন -এর সাথে পত্র এবং বিভিন্নভাবে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল, তাদের প্রতি সুধারণার ফলে তিনি কুফায় যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হুসাইন -এর কুফার পথে যাত্রার খবর পাওয়ার সাথে সাথে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া আপন ভ্রাতার আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করে কাতর স্বরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

হুসাইন যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখে কুফার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেন। এর পূর্বেই তিনি মুসলিম ইবনে আকীল ইবনে আবী তালিবকে তার পক্ষে বাইআত গ্রহণের জন্য কুফায় পাঠান। ইতিপূর্বে প্রায় ১২ হাজার লোকের বাইআত গ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়। কিন্তু কুফায় নিয়োজিত ইয়াযীদের গভর্নর উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমকে গ্রেফতার করে এবং হত্যা করে দেয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, মুসলিমের গ্রেফতারী এবং হত্যার সংবাদ সম্পর্কে হুসাইন কাদিসিয়া নামক স্থানে আগমনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অবগত হতে পারেননি। এদিকে মুসলিমের গ্রেফতারী এবং হত্যার কারণে কুফাবাসীদের ঐক্যে মারাত্মক ফাটল দেখা দেয়। অপরপক্ষে মুসলিমের ভ্রাতাগণ প্রতিশোধ গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং যুদ্ধ ঘোষণা করে। এমতাবস্থায় হুসাইন নিরুপায় হয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে তিনি বলেন, তোমাদেরকে ছাড়া আমার জীবন বিপন্ন, তাই তিনিও ঘোষণা করেন, যাদের ইচ্ছা ফিরে যাও, আর যাদের ইচ্ছা আমার সাথে থাকতে পার। এই ঘোষণার ফলে ভীষণ খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হয়, মাত্র ৭০/৭৫ জন মক্কা থেকে আগত সাথীবৃন্দ ব্যতীত সকলেই হুসাইন -এর সাহচর্য পরিহার করে ফিরে যায়। হুসাইন মাত্র ৩২ জন অশ্বারোহীসহ কাদিসিয়ায় অবস্থান করেন।

ইতিমধ্যে ইয়াযীদের গভর্নর উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ পুলিশ প্রধান হুসাইন তামিমীকে অসংখ্য সৈনিকসহ বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠিয়ে দেয়। সে দ্রুত যাত্রা করে কাদিসিয়ায় পৌছে এবং হুসাইন -এর বিরুদ্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয়। যাতে হুসাইন মক্কা অথবা মদীনা পথেও ফিরতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে উবাইদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ হুর্ ইবনে ইয়াযীদ তামিমীর নেতৃত্বে আর একটি সৈনিক দল কাদিসিয়ার দিকে পাঠায়। এক হাজার সৈনিকসহ এই দলটি ঠিক দুপুরের সময় মক্কা মদীনার পথে হুসাইন -এর মুখোমুখী হয় এবং চরম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ইতোমধ্যে নামাযের জন্য আযান হয়। হুসাইন -এর ইমামতীতে নামায অনুষ্ঠিত হয়। হুর্ ইবনে ইয়াযীদও নামাযে শরীক হয়। নামায আদায় করে হুর্ ইবনে ইয়াযীদ স্বীয় স্থানে ফিরে যায়। হুসাইন

সেখানেই আসরের নামাযও আদায় করেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর বান্দাগণের অধিকার সম্পর্কে অবগত হতে সচেষ্ট হও, তবে তা হবে তোমাদের জন্য আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির কারণ। আমরা আহলে বাইতের লোক। জালেম অত্যাচারীদের তুলনায় আমরা খেলাফতের অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি আমরা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় হয়ে থাকি, তোমরা যদি আমাদের হক ভুলে গিয়ে থাক, পত্র এবং লোক মারফত আমাকে তোমাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি যদি পরিবর্তন হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমি আমার স্থানে ফিরে যেতে চাই, তোমরা আমাকে ফেরত যেতে দাও।" এই বলে হুসাইন তাদের সম্মুখে দুইটি বাক্স খুলে সমস্ত চিঠিপত্র তাদের সম্মুখে রেখে দেন। এই মুহূর্তে হুর্ ইবনে ইয়াযীদ বলল, "আমরা আপনাকে পেয়েছি, আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে আপনাকে কুফার গভর্নরের নিকট না পৌছান পর্যন্ত পৃথক না হতে। তাই আমরা আপনাকে ছেড়েও দিতে পারি না এবং পৃথকও হতে পারি না।"

হুসাইন তাদের ধোঁকাবাজী এবং ষড়যন্ত্রের বিষয়টি ভালভাবেই বুঝতে সক্ষম হলেন। বুঝবার আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। তিনি ইবনে যিয়াদের বাহিনী প্রধান ওমর ইবনে সাআদের নিকট নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করলেন

(১) আমাকে আমার স্থানে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হোক।

(২) সমগ্র পৃথিবী জুড়ে আল্লাহর দ্বীন প্রচারের খেদমত আঞ্জাম দেয়ার সুযোগ দেয়া হোক।

(৩) অথবা আমাকে ইয়াযীদের নিকট উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হোক।

কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে, ইমাম হুসাইন-এর কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করা হল না, বরং কুফার গভর্নরের নিকট আত্মর্পণের জন্য হুসাইন কে বাধ্য করা হল। কিন্তু তাতে তিনি সম্মত হতে পারেননি এবং হননি।[২১৫]

নবীর নাতী, খলীফাতুল মুসলিমীনের উত্তরাধিকারী হুসাইন-এর পক্ষে চরম অপমান এবং অপদস্ততার স্তরে আত্মসমর্পণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি, তাই তাকে অবশেষে যুদ্ধেরই চূড়ান্ত ঘোষণা করতে হয়, "আমি হকের উপর বিদ্যমান, বিদ্রোহীরা বাতিলপন্থী। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ পাকের আদালতে আমি নির্দোষ সাব্যস্ত হব।"

এ ঘোষণার পর আহলে বাইতের লোকসহ মাত্র ৭০ জন হুসাইন-এর সাথে থাকলেন। আর বিশ্বাসঘাতকরা আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে ইবনে যিয়াদের বাহিনীতে যোগদান করল। হুসাইন তার সাথীদেরকে নিয়ে মক্কায় ফিরে

---

২১৫ বিদায়া-১৬৯/২/৪

যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ঠিক এই মুহূর্তে 'হুর' এই বলে সম্মুখে দাঁড়াল যে, আপনাকে ইবনে যিয়াদের দরবারে হাজির করার জন্য আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে। তাই আপনি কুফার পথ বর্জন করে পবিত্র মদীনার পথে অগ্রসর হন। আমি ইবনে যিয়াদকে অবস্থান লিখে জানাই, আর আপনি ইয়াযীদ এবং ইবনে যিয়াদের নিকট আপনার বক্তব্য লিখে জানিয়ে দিন। হতে পারে আল্লাহ পাক এমন কোন পথ সুগম করে দিবেন যে পথ আমাদের সকলের জন্যই শান্তি এবং নিরাপদের হবে। আর আপনার ব্যাপারে সংকটের সমাধান হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফার পথ বর্জন করে কাদিসিয়া পথে অগ্রসর হতে লাগলেন।

৬১ হিজরী মুহাররম মাসের ৩য় জুমার দিন ওমর ইবনে সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস চার হাজার অস্ত্রধারী সৈনিক নিয়ে কুফা থেকে কাদেসিয়ায় উপস্থিত হয়। এদের অধিকাংশই ছিল ঐ বিশ্বাসঘাতকত যারা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে ইতিপূর্বে বাইআত গ্রহণ করেছিল এবং চিঠিপত্র পাঠিয়ে লোক মারফতে অনুরোধ করে বাইআতের জন্য হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কে কুফায় আগমনের জন্য বাধ্য করেছিল। ওমর ইবনে সাআদ উপস্থিত হয়ে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে জিজ্ঞাসা করল যে, "আপনি মক্কা থেকে কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলেন।" হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমার শহরের লোকেরা লোক পাঠিয়ে চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমাকে দাওয়াত করেছিল তাই আমি এসেছিলাম। আসার পরে তোমাদের অপছন্দের কথা অবগত হয়ে ফিরে যাচ্ছি। ওমর ইবনে সাআদ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উত্তর লিখিতভাবে ইবনে যিয়াদের নিকট পাঠাল। এর উত্তরে ইবনে যিয়াদ ওমর ইবনে সাআদের নিকট লিখে পাঠায় যে, হুসাইনের নিকট ইয়াযীদের হাতে বাইআতের প্রস্তাব পেশ কর। যদি সে এতে সম্মত হয় তাহলে আমরা তার ব্যাপারে বিবেচনা করব, অন্যথায় তাকে এবং তার সমস্ত সাথীদেরকে আটক কর এবং তাদের জন্য পানি সরবরাহ বন্ধ করে দাও। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদাতের তিন দিন পূর্বে থেকেই এই নির্দেশ কার্যকর করা হয়।[২১৬]

এ মুহূর্তে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং ওমর ইবনে সাআদ একাধিকবার আলোচনায় মিলিত হয় এবং আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ওমর ইবনে সাআদ ইবনে যিয়াদের নিকট এই মর্মে আর একটি চিঠি লিখে পাঠায় যে, আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে আন্দোলনের লেলিহান অগ্নি নিবৃত করেছেন এবং আমাদের মধ্যে ঐক্যমত্য সৃষ্টি হয়েছে। হুসাইন আমার সাথে চূড়ান্তভাবে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি এখান

২১৬ আননুবালা-১১৫/৪, তারীখুল ইসলাম-২৯৬/৩

থেকে মক্কায় ফিরে যাবেন অথবা কোন সীমান্ত এলাকায় চলে যাবেন, কিংবা ইয়াযীদের নিকট হাজির হয়ে বাইআত গ্রহণ করে নিবেন। আমি মনে করি এতে আপনাদের এবং বিশ্ব মুসলিম জাতির জন্য শান্তি এবং নিরাপত্তার পথ সুগম হবে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে, এই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে ইবনে যিয়াদ এই লিখে সিমারকে ওমর ইবনে সাআদের নিকট পাঠায় যে, হুসাইনকে আমার নিকট হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বল। এ উদ্দেশ্যে অতিসত্বর হুসাইনকে তার সাথীবৃন্দসহ আমার নিকট প্রেরণ কর। যদি হুসাইন এতে সম্মত না হয়, তাহলে আর মুহূর্তকাল দেরী না করে যুদ্ধ আরম্ভ কর। ইবনে যিয়াদ সিমারকে গোপনে এ কথাও বলে দেয় যে, যদি ওমর ইবনে সাআদ আমার নির্দেশ মুতাবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাহলে তুমি তার সমর্থন এবং সহযোগিতা করবে, অন্যথায় তোমাকে আমীর নিযুক্ত করলাম। তুমি প্রথমে ওমর ইবনে সাআদের গর্দান কর্তন করবে, অতঃপর আমার নির্দেশ যথাযথভাবে কার্যকর করবে। ইবনে যিয়াদ তার চিঠিতে ওমর ইবনে সাআদকে একথাও সু-স্পষ্টভাবে লিখে দেয় যে, আমি তোমাকে হুসাইনের মুক্তির জন্য পথ সুগম করা, তার মনবাঞ্ছনা কামনা পূরণ করা, আর বসে বসে তার জন্য তোষামোদ ও সুপরিশ করতে পাঠাইনি। সুতরাং হুসাইনকে বলে দেখ যদি সে এবং তার দল আমার নিকট আত্মসমর্পণে সম্মত হয় তাহলে তাদেরকে আমার নিকট পাঠাও আর অসম্মত হলে কালবিলম্ব না করে তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়, তাদেরকে হত্যা কর এবং তাদের নাক কান কেটে দাও। কারণ এরা এরূপ শাস্তিরই উপযুক্ত। আর হুসাইনকে হত্যা করে ঘোড়ার পায়ের মর্দনে তার পেট পিট পিষে ফেল। কারণ, সে বড়ই পীড়াদায়ক ফাটল সৃষ্টিকারী এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী জালেম। আমার এ নির্দেশ কার্যকর করণে সমর্থ হলে তুমি একজন আনুগত্যকারী বীরপুরুষ হিসেবে পুরস্কৃত হবে। পক্ষান্তরে তুমি আমার নির্দেশ কার্যকর করণে অক্ষম হলে আমাদের বাহিনী থেকে তুমি পৃথক হয়ে যাও এবং সিমারের উপর দায়িত্বভার অর্পণ কর।"

ওমর ইবনে সাআদ ইবনে যিয়াদের চিঠি পাঠ করে সৈন্য বাহিনীকে প্রস্তুতির নির্দেশ দেয় এবং আসরের নামাযের পর হুসাইনকে চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করে। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু সকাল পর্যন্ত অবকাশ চান এবং সমগ্র রাত্রি সাথীবৃন্দদেরকে নিয়ে ইবাদত, এস্তেগফার এবং আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি ও মুনাজাতে নিমগ্ন থাকেন।

শনিবার ফজরের নামাযের পর অথবা আশুরার জুমাবারে ওমর ইবনে সাআদ যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হয়। আরম্ভ হল চরম যুদ্ধ। তারা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কে চতুর্দিক

থেকে বেষ্টন করে ফেলল। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে কুফাবাসী! তোমাদের মত বিশ্বাসঘাতক এবং গাদ্দার কোন দিন দেখিনি। তোমাদের প্রতি অভিশাপ, তোমাদের জন্য ধ্বংস। তোমরা আমাদেরকে বারংবার আহ্বান করেছ, তাই আমরা উপস্থিত হয়েছি। তোমরা মশা মাছির মত দ্রুত আমার হাতে বাআইত গ্রহণ করেছ। যখন আমরা তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এসে পড়েছি, তখন তোমরা মধুপোকার মত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছ। শুধু তাই নয়; বরং পাষণ্ড মনে আমাদের উপর দুশমনদের খোলা অস্ত্র তুলে ধরেছ। অথচ আমাদের পক্ষ থেকে কোন দিন তোমাদের প্রতি অবিচার করা হয়নি, কোন অপরাধও করিনি। শুনে রাখ, জালেমদের প্রতি আল্লাহ পাকের অভিশাপ।"

এই বলে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন এবং অবিরাম যোহরের নামায পর্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনা করেন। যোহরের নামায আদায় করে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ইতিমধ্যে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথীবৃন্দ অধিকাংশই শহীদ হন। ইয়াযীদ ইবনে হারিছও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে যুদ্ধ করে শহীদ হন। হুর ইবনে যিয়াদ ওমর ইবনে সাআদের দল ত্যাগ করে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাহিনীতে গিয়ে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সম্বোধন করে বললেন, 'হে রাসূলের সন্তান! আমি প্রথমে আপনার বিরুদ্ধবাদী ছিলাম, এখন আমি আপনার দলভুক্ত হয়েছি। কারণ আমি আপনার নানাজানের শাফাআত কামনা করি। অতঃপর তিনি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে যুদ্ধ করে শহীদ হন। এমনিভাবে যুদ্ধ করে করে সকলেই শাহাদাত বরণ করেন। শুধু থাকলেন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু একাই যুদ্ধ করতে থাকলেন। শত্রু বাহিনী চতুর্দিক থেকে তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং আঘাতের পর আঘাতের মাধ্যমে তাঁকে জর্জরিত করে ফেলে। চরম পানি পিপাসায় কাতর হয়ে মরদে মুজাহিদ মাটিতে ঢলে পড়েন। শত্রু বাহিনী এই সুযোগকে ভালভাবে কাজে লাগায়। কান্দাহ এলাকার এক পাপীষ্ঠ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শির মোবারকের উপর মারাত্মকভাবে আঘাত হানে। ফলে তিনি রক্তাক্ত হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যমীনে প্রবহমান রক্ত হস্ত মুবারকে নিয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত করে বলেন–

"হে আল্লাহ! যদি আপনি আমাদের ব্যাপারে আসমানী সাহয্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত করে থাকেন, তাহলে আমাদের জন্য এর চেয়ে অধিক উত্তম যা আমাদের জন্য তাই করুন। সাথে সাথে এই জালেমদের সমীচীন প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।" এই প্রার্থনা করে পানির পিপাসায় কাতর নবীর নাতী হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু পানির দিকে অগ্রসর হন। এমন সময় হুছাইন তামীমী নামক আর এক পাপীষ্ঠ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-

এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে তীরের আঘাতে হুসাইন -এর মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে পড়ে।

হুসাইন পরপর আঘাতের কারণে মুমূর্ষাবস্থায় মাটিতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং সর্বশেষ মুনাজাতে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে আর্তনাদের সুরে বলেন, "হে আল্লাহ পাক! আপনার নবী কন্যার সন্তানের সাথে যা করা হল সে ব্যাপারে আপনার দরবারে নালিশ করলাম, এদেরকে চিহ্নিত করে ফেলুন, টুকরা টুকরা করুন, এদের কেউ যেন অবশিষ্ট থাকে না। এ মুহূর্তে হুসাইন কে হত্যা করতে কেউ অগ্রসর হচ্ছিল না। এ মুহূর্তে হুসাইন কে হত্যার অপরাধ থেকে সবাই নিজেকে রক্ষা করতে চাচ্ছিল। এমন সময় পাপীষ্ঠ সিমার অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করে বলল, 'তোমরা কি দেখছ? কেন তাকে হত্যা করছ না? সিমারের ভয়ে ভীত হয়ে লোকেরা চতুর্দিক থেকে অগ্রসর হয় এবং ছুরআতা ইবনে শারীক তামীমী নামক এক পাষণ্ড হুসাইন -এর বাম হস্ত মুবারকে কঠোর আঘাত হানে। আর সিনানা ইবনে আনাস নাখ্‌য়ী নামক পাষণ্ড এই সুযোগে বর্শা দ্বারা পবিত্র শরীরের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালায়, আর পাপীষ্ঠ সিমার এই অবসরে হুসাইন কে হত্যা করে। তাকে সহযোগিতা করে হিম্‌য়ারী গোত্রের নরাধম খাওলা ইবনে ইয়াযীদ আছবাহী। সিমার হুসাইন কে শুধু হত্যা করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি বরং তাঁর শির মুবারক পবিত্র শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের সম্মুখে রেখে কবিতা আবৃত্তি করে বলে, "আমার রেকাব (ঘোড়ার উপর বসার গদি) স্বর্ণ-রূপা দ্বারা সুসজ্জিত কর, কারণ আমি মুকুটহীন রাজাকে হত্যা করেছি। শ্রেষ্ঠ পিতা-মাতার শ্রেষ্ঠতম সন্তানকে হত্যা করেছি। আমি যাকে হত্যা করেছি সে বংশ হিসেবেও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্যক্তিগতভাবে এবং বাস্তবেও সর্বমহান।"

বলা হয় যে, ইবনে যিয়াদের নির্দেশ মুতাবিক হুসাইন -এর মরদেহকে ঘোড়া দ্বারা পাড়ানো এবং পেষানো হয়। যারা এই মর্মান্তিক যুদ্ধে হুসাইন -এর সাথে শহীদ হন তাদের সংখ্যা ছিল ৭২, আর ওমর ইবনে সাআদের ৮৮৮ জন সৈনিক এবং অসংখ্য লোক আহত হয়।

তিরমিযী শরীফ সহ অন্যান্য কিতাবের উদ্ধৃতিতে প্রতীয়মান হয় যে, হুসাইন -এর পবিত্র লাশকে ইবনে যিয়াদের নিকট রাখার পর এই পাপীষ্ঠ লাঠি দ্বারা হুসাইন -এর নাকের ছিদ্র এবং মুবারক দাঁতসমূহ আঘাত করে আক্রোশ মেটায়। এই দুঃখজনক অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে রাসূলের সাহাবী আনাস কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং সাহাবী যায়েদ ইবনে আরকাম ইবনে যিয়াদকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ইবনে যিয়াদ! তোমার লাঠি সরিয়ে ফেল, আল্লাহ

পাকের কসম! আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হুসাইনের দুই ঠোঁটের মধ্যভাগে বহুবার চুম্বন করতে দেখেছি।" এই বলে তিনিও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

ইবনে যিয়াদ হুসাইনকে (শির মুবারকসহ) তার পরিবার পরিজন সমেত ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়ার নিকট প্রেরণ করে। ইয়াযীদ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে দুঃখিত এবং লজ্জিত হয় এবং বলে, ইবনে যিয়াদের নিকট আমার প্রতি আনুগত্যের কামনা ছিল তবে হুসাইনের কতল কামনা করিনি। ইবনে সুমাইয়্যার প্রতি আল্লাহ পাকের লা'নত হোক, আল্লাহ পাকের কসম! আমি হলে হুসাইনকে ক্ষমা করে দিতাম। আল্লাহ পাক হুসাইনের প্রতি রহম নাজিল করুন।" যদিও অনেক ঐতিহাসিক ইয়াযিদের এ দুঃখপ্রকাশ নিতান্তই লোক দেখানো বলে অভিহিত করেছেন।

কারবালার এ দুঃখজনক ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে এক বেদনাদায়ক ইতিহাস সৃষ্টি করে। এ মর্মান্তিক ঘটনার পর ইসলামি ঐক্যে ফাটল ধরে যা জাতীয় জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং পুনরায় ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ দানাবেঁধে ওঠে।

কারবালার ঘটনার ফলে খিলাফতের ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। ঐক্য, সংহতি ও ইসলামি বিধান সংবলিত খিলাফত চলতে থাকে অযোগ্য, ফাসেক, যালেম ও স্বৈরাচারীদের মনগড়া আইনে।

কারবালায় হযরত হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর দুর্গ

ইমাম হাসান-হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী

বিশ্বনবী মুহাম্মদ ﷺ প্রিয় দৌহিত্র হাসান ও হুসাইনকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁদের সম্পর্কে তিনি বলেন,

عن الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ

বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবী করীম ﷺ-এর কাঁধের উপর দেখেছি। সে সময় নবী করীম ﷺ বলেছিলেন, হে 'আল্লাহ! আমি একে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস।[২১৭]

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا

নবী করীম ﷺ বলেছেন, "তাঁরা (হাসান ও হুসাইন) আমার কাছে দুনিয়ার দুটি পুষ্পবিশেষ।"[২১৮]

ইমাম আহমদ হামিম ইবনে ফুদাইল উসামা ইবনে যায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল ﷺ আমাকে কোলে নিয়ে তাঁর ডান উরুতে বসাতেন। আর হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বসতেন বাম উরুতে। তারপর আমাদের দু'জনের বুকে চেপে ধরে বলতেন–

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّيْ أَرْحَمُهُمَا

"হে আল্লাহ! এ দু'জনকে আপনি রহম করুন। কারণ আমি এদের দু'জনকে রহম করছি।"

ইবনে খুযায়মা আবদাহ ইবনে আবদিল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূল ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন, এ সময় হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে প্রবেশ করলেন। তাঁদের গায়ে ছিল লাল জামা। জামা বড় হওয়ায় তাঁরা জামা বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে হোঁচট খাচ্ছিলেন আর উঠতেছিলেন। এক পর্যায়ে রাসূল ﷺ মিম্বর থেকে নেমে তাঁদের কাছে গেলেন এবং তাঁদেরকে তুলে এনে মিম্বরে তাঁর কোলে বসালেন। এরপর তিনি বললেন, মহান আল্লাহ যথার্থই বলেছেন,

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

---

২১৭ সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৩৭৪৯; মুসলিম, হাদিস নং ২৪২২।

২১৮ আস সহীহ লিল বুখারী, হাদিস নং ৩৭৫৩।

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো এক পরীক্ষাস্বরূপ।"

আমি এই ছেলে দু'টিকে দেখে স্থির থাকতে পারিনি। এরপর তিনি পুনরায় খুতবা শুরু করলেন। ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ প্রমুখ হুসাইন ইবনে ওয়াকিদি সূত্রে এ হাদিস উদ্ধৃত করেছেন।[২১৯]

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ فَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ أَحِبَّهُمَا فَإِنِّيْ أُحِبُّهُمَا وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنِيْ فَيُقْعِدُنِيْ عَلٰى فَخِذِهٖ وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَخِذَهُ الْأُخْرٰى ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّيْ أَرْحَمُهُمَا.

উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এবং হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে একসাথে কোলে নিয়ে বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি এ দুজনকে ভালোবাসি, আপনিও এদেরকে ভালোবাসেন। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে উসামা বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিয়ে তাঁর এক উরুতে (রানে) বসাতেন এবং হাসান ইবনে আলীকে অপর উদের ওপর বসাতেন, অতঃপর দুজনকে একত্রে মিলিয়ে দুআ করতেন, হে আল্লাহ! আপনি এদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমিও এদের প্রতি অত্যধিক স্নেহ-মমতা পোষণ করি।[২২০]

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ. قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ. مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ. فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ. ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ. ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا. ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ. ثُمَّ قَالَ: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}

সাফিয়্যাহ বিনতে শায়বা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, একবার সকাল বেলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন, তাঁর গায়ে কালো পশমের চাদর ছিল। এ সময় হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আসলে তিনি তাঁকে চাদরে

---

২১৯. জামে তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ি।

২২০. সহিহ বুখারি; মিশকাত, হা-৫৮৮৯।

ঢুকিয়ে নিলেন। একটু পর হুসাইন ইবনে আলী আসলে তিনিও তাঁকে তাঁর চাদরে শামিল করলেন। কিছুক্ষণ পর ফাতেমা আসলে তিনি তাঁকেও চাদরে ঢুকিয়ে নিলেন, একটু পর আলী আসলে তাঁকেও ঢুকিয়ে নিলেন। অতঃপর নবী করীম বললেন, "হে আহলে বাইত! নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান এবং সম্পূর্ণরূপে তোমাদেরকে শুদ্ধ ও পবিত্র করতে চান।"[২২১]

৩. যায়নাব বিনতে ফাতেমা

হিজরি ৫ম সনে ফাতেমা ও আলী -এর প্রথম কন্যাসন্তানের জন্ম হয়। নানা রাসূল তাঁর নাম রাখেন 'যায়নাব'। উল্লেখ্য যে, ফাতেমার এক সহোদরার নাম ছিল 'যায়নাব', মদিনায় হিজরতের পর ইন্তেকাল করেন। সেই যায়নাবের স্মৃতি তাঁর পিতা ও বোনের হৃদয়ে বিদ্যমান ছিল। সেই খালার নামে ফাতেমার এই কন্যার নাম রাখা হয়।

৪. উম্মু কুলসুম বিনতে ফাতেমা

হিজরি ৭ম সনে ফাতেমা ও আলী -এর দ্বিতীয় কন্যার জন্ম হয়। তারও নাম রাখেন রাসূল নিজের আরেক মৃত কন্যা উম্মু কুলসুমের নামে। এভাবে ফাতেমা তাঁর কন্যার মাধ্যমে নিজের মৃত দু'বোনের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখেন।

আলী -এর অন্যান্য স্ত্রী ও সন্তানগণ

ফাতেমা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আলীর একক স্ত্রী হিসেবে অতিবাহিত করেন। ফাতেমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেননি। ফাতেমা ওফাত গ্রহণ করলে আলী পর্যায়ক্রমে প্রায় ৮ জন মহিলাকে বিবাহ করেন বলে জানা যায়। তাঁরা হলেন,

১। আলী -এর দ্বিতীয়া স্ত্রী উম্মুল বানীন বিন্‌তে হেযাম কালবী। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁর চারজন পুত্রসন্তান জা'ফর, আব্বাস, আব্দুল্লাহ ও উসমান জন্মগ্রহণ করেন। আব্বাস ব্যতীত বাকি তিন ভাই হুসাইন -এর সাথে কারবালার প্রান্তরে শহিদ হন।

২। আলী -এর তৃতীয় স্ত্রী লায়লা বিন্‌তে মাসঊদ ইবনে খালেদ । তাঁর গর্ভে ওবায়দুল্লাহ্ ও আবু বকর নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরাও কারবালায় শহিদ হন।

---

২২১ সহীহ মুসলিম, হাদিস নং : ২৪২৪/৬১

৩। আলী -এর চতুর্থ স্ত্রী আসমা বিন্‌তে উমায়স। তাঁর গর্ভে মুহাম্মদ আসগর ও ইয়াহইয়া নামে দুইপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইয়াহ্ইয়া কারবালায় শহিদ হন।

৪। তাঁর পঞ্চমা স্ত্রী উমামা বিন্‌তে আবুল আস। ইনি যয়নব বিন্‌তে রাসূলুল্লাহ্ -এর কন্যা। ফাতেমা -এর অসিয়ত অনুসারে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এ ঘরে মুহাম্মদ আওসাত নামে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়।

৫। তাঁর ষষ্ঠ স্ত্রী খাওলা বিন্‌তে জা'ফর। ইনি হানাফিয়া বংশের ছিলেন বলে তাঁর এক পুত্র মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া নামে বিখ্যাত ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ও বীরপুরুষ ছিলেন। ইমাম হুসাইন কে তিনি কুফা গমন করতে নিষেধ করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে।

কারবালার ঘটনার পরে তাঁকে কেন্দ্র করে উক্ত ঘটনার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কয়েকবার প্রচেষ্টা চালনা করা হয় এবং তাঁর নামে আওয়াজ তুলে মুখতার সাকাফী কুফার শাসনদণ্ড দখল করে সিমার, ইবনে যিয়াদ প্রমুখ ইমাম হুসাইনবিরোধী ও ইয়াযিদ পক্ষীয় লোকদেরকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করেন। এই মুখতার সাকাফী দেড় বছর কাল কুফার স্বাধীন শাসনকর্তা ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়াহ্ সিফ্ফিনের যুদ্ধে আলী -এর পক্ষে পালাক্রমে সেনাপতিত্ব করেন। আলী তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। ইন্তেকালের সময় হাসান ভ্রাতৃদ্বয়কে তাঁর সাথে সদাচরণের অসিয়ত করেন। ৮১ হিজরিতে তায়েফে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

৬। তাঁর সপ্তম স্ত্রী ছাহ্বা বিন্‌তে রাবীআ। তাঁর গর্ভে ওমর নামক এক পুত্র এবং রোকাইয়া নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

৭। তাঁর অষ্টম স্ত্রী উম্মে সাঈদ মুহিয়্যা বিন্‌তে ইমরাউল কায়স। তাঁর গর্ভে একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে শৈশবেই ইন্তেকাল করেন।

৮। তাঁর নবম স্ত্রী উম্মে সাঈদ বিন্‌তে ওরওয়া। তাঁর গর্ভে উম্মুল হাসান ও রমলায়ে কোবরা নাম্নী দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।[২২২]

২২২ মাওলানা নূরুর রহমান, পৃ. ১৮৯

ইসলামের পঞ্চম খলিফা

ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ

[খিলাফতকাল : ৯৯ হিজরী থেকে ১০১ হিজরী]

ইসলামের পঞ্চম খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন খলিফা। তাঁরা হলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, এদেরকে খোলাফায়ে রাশেদীন বলা হয়। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তেকালের পর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্ষমতা দখল করলে খিলাফতের স্থলে রাজতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। পরবর্তীতে উমাইয়া বংশের ওমর বিন আব্দুল আজীজ (র.) ক্ষমতা দখল করে পুনরায় ইসলামি খিলাফত অনুসারে রাজ্য পরিচালনা করেন। এ জন্য তাঁকে ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলা হয়। খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজীজকে যেসব কারণে পঞ্চম খলিফার এই দুর্লভ খেতাব দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে :

১. তিনি তাঁর রাজত্বকালে ইসলামি খিলাফতের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করেছিলেন।

২. তাঁর রাজত্বকালে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসারী খোলাফায়ে রাশেদার মতো নীতিতে রাজ্য পরিচালনা করেন।

৩. তিনি শরীয়তকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

৪. বাইতুল মালকে তিনি জনগণের সম্পত্তি হিসেবে মনে করতেন।

৫. তিনি বাইতুল মাল থেকে সামান্য পরিমাণ বেতনও গ্রহণ করতেন না।

৬. তিনি স্বয়ং এবং পরিবারের সকলে অত্যন্ত সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন।

৭. দ্বিতীয় খলিফা ওমর ফারুকের মতোই তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

৮. তিনি নিজের সহায় সম্পত্তি এবং স্ত্রী ফাতিমার সবরকমের গহনাপত্র বিক্রয় করে বাইতুল মালে জমা দিয়েছিলেন।

৯. তিনি সবসময় প্রজাসাধারণের ও ইসলামের জন্য নিবেদিত ছিলেন।

১০. অত্যন্ত উন্নত চরিত্র, সরলতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি গুণে তিনি ছিলেন উমাইয়া রাজত্বকালের মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যান সদৃশ।

ইসলামের রাজ্য শাসননীতি, বৈদেশিক নীতি, অর্থনীতি সকল বিভাগে ওমর বিন আব্দুল আজীজ খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণ করায় মুসলিম উম্মাহ তাঁকে পঞ্চম খোলাফায়ে রাশেদীন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ঐতিহাসিকগণ ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের শাসনামলকে খোলাফায়ে রাশেদীনের মতোই সম্মান প্রদর্শন করেন। বর্ণনাকারী ইবনে সাদ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবি আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের পেছনে নামায পড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলে উঠলেন-"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

এর পর এই যুবক ছাড়া অন্য কারো পেছনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-নামাযের মতো নামায আমি আর পড়িনি।"

ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ একজন রাজতান্ত্রিক শাসনকর্তা ছিলেন। ইসলামের সত্য-সনাতন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুস্মরণে তাঁর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি, তাঁর পূর্বের এক রাজতান্ত্রিক শাসক তাঁকে খলিফা বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ স্বীয় কর্মপ্রবাহ দ্বারা তিনি নিজেকে খোলাফায়ে রাশেদীনের নিকটতম করেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের চার খলিফা জনসাধারণের সুখ-সুবিধার জন্য যা করেছিলেন, তিনিও তাই করেছিলেন। তাই ঐতিহাসিকগণ তাঁকে ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

ইবনে আব্দুল হাকামের বর্ণনা মতে ওমর ইবনুল আব্দুল আজীজ (র.) মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আব্দুল আজীজ যখন এ বিবাহ করেন তাঁর পিতা মারওয়ান তখনও খিলাফতের আসন লাভ করেননি।

প্রসিদ্ধ হাদিস বিশারদ আল্লামা নব্বী তাহযীবুল আসমা ওয়াল ফাতে লিখেছেন যে, ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) ৬১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মতে ওমর মিশরে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনুল হাকামের টীকায় লিখা আছে যে, ওমর ৬৩ হিজরিতে হালওয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর পিতা মিশরের শাসনকর্তা ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনে সাদ ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.)-এর জন্মের কথা উল্লেখ করে বলেন, "বর্ণিত আছে যে, ওমর ৬৩ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। এ বছরই উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্তেকাল করেন। এ কথার সম্পর্ক দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইবনে সাদের মতে এটা নির্ভরযোগ্য ছিল যে, ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.)- মদিনাতে জন্মগ্রহণ করেছেন।"[১]

তিনি বংশগতভাবে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বংশধর।

পিতা আব্দুল আজীজ

ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের পিতা ছিলেন উমাইয়া খলিফা মারওয়ানের ছোট ছেলে আব্দুল আজীজ। আব্দুল আজীজ একজন উচ্চশ্রেণির আলেম এবং নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ছিলেন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু–এর অন্যতম শিষ্য। তিনি তাঁর নিকট থেকে বেশ কয়েকটি হাদিসও বর্ণনা করেছেন। তিনি একজন ন্যায়বান শাসকও ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা মারওয়ান ও বড় ভাই আব্দুল

---

[১] তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৫ম, পৃ. ২২৪

মালেকের শাসনামলে মিশরের গভর্নর ছিলেন। তাঁর শাসনামলে তিনি শিক্ষা-দীক্ষা, ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ইবনে কাছীর বলেন, "আব্দুল আজীজ একজন যোগ্য শাসক ও দয়ালু দাতা এবং প্রশংসার পাত্র ছিলেন।"

মাতা উম্মে আসেম

ইবনে সাদ বলেন- আব্দুল আজীজ ইবনে মারওয়ান যখন ওমরের মাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাঁর সচিবকে ডেকে বললেন, আমার পবিত্র রাজস্ব থেকে চারশত দিনার সংগ্রহ করুন, আমি একটি পুণ্যবান ও উচ্চ ঘরে বিবাহকার্য সম্পন্ন করতে ইচ্ছা করেছি।

ইবনুল জাওযি বলেন- এ পুণ্যবান উচ্চ ঘর ছিল ওমর ফারূক -এর বংশ। উম্মে আসেম ছিলেন ওমর ফারূক -এর পুত্র আসেম -এর কন্যা। তারপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ থেকে একটি মৌখিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। মিশরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনুল হাকাম এ ঘটনাটি আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো-

ওমর ইবনে খাত্তাব তাঁর খিলাফতের সময় দুধে পানি মিশানো নিষেধ করে একটি আদেশ জারি করেছিলেন। এক রাতে তিনি মদিনার ওলি-গলি ঘুরে দেখতে বের হলেন। তখন একটি স্ত্রীলোক তার মেয়েকে বলছিল, সকাল হয়ে গেল, তুমি দুধে পানি মিশাও না কেন? বালিকা উত্তর করল, আমি কীভাবে দুধে পানি মিশাব? খলিফা ওমর যে দুধে পানি মিশাতে নিষেধ করেছেন! মা বলল, লোকে পানি মিশায়, তুমিও মিশিয়ে নাও। খলিফা কীভাবে জানবেন? বালিকা বলল, ওমর যদিও না জানেন, কিন্তু ওমরের আল্লাহর নিকট এটা গোপন থাকবে না। খলিফা ওমর যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন, আমি কখনও তা করব না।[১] এ সম্পর্কে দুটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।

প্রথমত, ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন- খলিফা ওমর এ কথোপকথন শুনতে পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পরদিন সকালে তিনি তাঁর পুত্র আসেমকে ডেকে এনে বললেন, বৎস! অমুক স্থানে গিয়ে এ বালিকাটির সন্ধান করে আস। তিনি সে বালিকার গুণাবলি বলে দিলেন। আসেম সেখানে গিয়ে অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে, উক্ত বালিকাটি হেলাল গোত্রের কোনো একজন বিধবার কন্যা। আসেম ফিরে এসে পিতা ওমর -এর নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। ওমর

---

[১] রশীদ আখতার নদভী, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ- ইসলামী শাসনের বাস্তবচিত্র, মাওলানা আবুল বাশার অনূদিত, (ঢাকা : খন্দকার প্রকাশনী), পৃ. ৩১

তাঁকে এ বালিকাকে বিবাহ করতে নির্দেশ দিয়ে বললেন, হয়তো এ বালিকার গর্ভেই এমন এক মনীষী জন্মগ্রহণ করবেন, যার জন্যে সমস্ত আরব গর্ববোধ করবে, যিনি আরবের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং সমস্ত আরবের নেতৃত্ব দিবেন।

আসেম এ বালিকাকে বিয়ে করে স্ত্রীরূপে বরণ করে নিলেন। এ বালিকাই পরবর্তীকালে মুসলিম জাহানের গৌরব ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.)-এর মাতা উম্মে আসেমকে গর্ভে ধারণ করে বিশ্বে অমর হয়ে রয়েছেন। আব্দুল আজীজ উম্মে আসেমকে বিবাহ করলেন, তাঁর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করল ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী শাসক ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.)।[৩]

দ্বিতীয়ত, এ সম্পর্কে ইবনুল জাওযি বলেন, ওমর তদীয় খাস খাদেম আসলামকে বললেন, সেস্থানে গিয়ে দেখ, যারা এ ধরনের কথোপকথন করেছিল, তারা কে? তাদের কোনো পুরুষ লোক আছে কিনা।

আসলাম বলেন, আমি সেস্থানে এসে এদিক ওদিক খোঁজ নিয়ে দেখলাম একটি কুমারী বালিকা এবং তার বিধবা মাতা ছাড়া তাদের সংসারে আর কোনো পুরুষ নেই। আমি তাদের এ অবস্থা দেখে ওমর-এর নিকট বিস্তারিত বিবরণ দিলাম। তখন খলিফা ওমর তাঁর পুত্রগণকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কারও স্ত্রীর প্রয়োজন আছে কি যে, আমি এ বালিকার সাথে তার বিবাহ দিব? আব্দুল্লাহ বললেন, আমার স্ত্রী আছে, সুতরাং আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর কোনো প্রয়োজন নেই। আব্দুর রহমানও অনুরূপ উত্তর করলেন। তখন আসেম নিবেদন করলেন, পিতা! আমার কোনো স্ত্রী নেই, আমার নিকট তাঁকে বিবাহ দিন। তারপর ওমর (র.) সে বালিকাকে ডেকে আনালেন এবং আসেমের সাথে তাঁকে বিবাহ দিলেন।

ইবনুল জাওযির বর্ণনা অনুযায়ী এ বালিকার গর্ভে আসেমের ঔরসে দু'জন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের একজনকে আব্দুল আজীজ বিবাহ করেন এবং তাঁর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন ওমর ইবনুল আব্দুল আজীজ (র.)।[৪]

বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন

ইবনে আব্দুল হাকাম বলেন, ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে সেখানকার শিক্ষকগণের নিকটই বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন।[৫]

---

[৩] রশীদ আখতার নদভী, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ- ইসলামী শাসনের বাস্তবচিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

[৪] ইবনে জাওযি ৫ম খণ্ড, তাবাকাতে ইবনে সাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ.৩৪৫

ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) মদিনাতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মদিনাতেই তিনি প্রতিপালিত হন। সালেহ ইবনে কাইসান এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উতবার মতো বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণ ছিলেন তাঁর শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক।[৬]

ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর -এর কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। যখন তাঁর পিতা আব্দুল আজীজ মিশরে গিয়ে সেখানকার শাসনকর্তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রী উম্মে আসেমকে পুত্র ওমরসহ তাঁর নিকট চলে যাওয়ার জন্য লিখে পাঠালেন। উম্মে আসেম তাঁর পিতৃব্যের নিকট এসে স্বামীর পত্র সম্পর্কে জানালে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্রী! তিনি তোমার স্বামী তাঁর নিকট চলে যাও। উম্মে আসেম যখন স্বামীর নিকট চলে যেতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর তাঁকে বললেন, বালকটিকে আমার নিকট রেখে যাও, সে আমার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। অতএব উম্মে আসেম ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.)কে তাঁর চাচার নিকট রেখে তিনি স্বামীর নিকট চলে গেলেন। এভাবে ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর –এর তত্ত্বাবধানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন।[৭]

ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) তাঁর ওস্তাদগণের প্রভাবে খুবই প্রভাবিত ছিলেন। বিশেষত জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবাহর প্রভাব তাঁর ওপর বিশেষভাবে কার্যকরী ছিল।

ইবনুল জাওযি বলেন- "ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ বলতেন, যদি উবায়দুল্লাহ জীবিত থাকতেন তবে তাঁর পরামর্শ ব্যতীত আমি কোনো আদেশ জারি করতাম না।" ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) আরো বলছেন, "আমি অন্যান্য সকলের নিকট থেকে যে সমস্ত হাদিস বর্ণনা করেছি তার চেয়ে অধিক বর্ণনা করেছি উবায়দুল্লাহর নিকট থেকে।"[৮]

উবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা ছাড়াও সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, আনাস ইবনে মালেক এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর প্রমুখ মনীষীর নিকট থেকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

---

[৫] ইবনে আব্দুল হাকাম, পৃ. ১৯

[৬] তাযকেরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, ১৩৩ পৃ, ইবনুল জাওযি ৯ পৃ.

[৭] ইবনুল জাওযি ৯

[৮] ইবনুল জাওযি-৯

ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) মদিনায় অবস্থানকালে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে এবং তদসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যেমন- ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র ইত্যাদি এবং কুরআন ও হাদিসের অসাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যখন মদিনা থেকে বের হয়ে সিরিয়া তারপর মিশরে গমন করেন তখন তিনি ছিলেন একজন বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম। তাঁর জ্ঞানের স্বীকৃতি দিয়ে মায়মুন ইবনে মেহরানের মতো যোগ্য আলেমও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন- "আমরা ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.)-এর নিকট আগমন করলাম, আমাদের ধারণা ছিল যে, জ্ঞান সম্পর্কে তিনি আমাদের মুখাপেক্ষী হবেন, কিন্তু তাঁর নিকট এসে উপলব্ধি করলাম যে, আমরা তাঁর ছাত্রতুল্য।"[৯]

আব্দুল আজীজ ওমর ইবনে আব্দুল আজীজকে মদিনা থেকে মিশরে নিয়ে এলেন, কিন্তু অল্প দিনেই তিনি বুঝতে পারলেন মদিনা ছাড়া তাঁর উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। তারপর তিনি তাঁকে আবার মদিনায় পাঠিয়ে দিলেন।[১০]

পিতার ইন্তেকাল

ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) শিক্ষা-দীক্ষা সমাপ্ত করে মদিনা থেকে দামেশকে চলে গেলেন, তারপর সেখান থেকে পিতার নিকট মিশরে চলে গেলেন এবং তাঁর পিতার ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি পিতার নিকট অবস্থান করেছিলেন। আব্দুল আজীজ শত আশা পোষণ করা সত্ত্বেও তাঁর পুত্র ওমরকে রাজসিংহাসনে বসাতে পারেননি। যদি আব্দুল আজীজ আরও কিছুদিন জীবিত থাকতেন তবে হয়তো তিনি ওমর ইবনে আব্দুল আজীজকে আফ্রিকা অথবা পাশ্চাত্যের কোনো দেশের আমির নিযুক্ত করতেন অথবা তারপর তাঁকে মিশরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। কিন্তু তাঁর জীবন তাঁকে এ সুযোগ দেয়নি। তাঁর পুত্রদের বা ওমরের জন্য কিছু না করেই ৮৫ হিজরিতে তিনি ইন্তেকাল করলেন। অবশ্য তিনি তাঁর পুত্র-কন্যাদের জন্য প্রচুর ধন-সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন।

আব্দুল আজীজের মৃত্যুর পর অনতিবিলম্বে আব্দুল মালেক তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহকে মিশরের শাসনকর্তার দায়িত্ব দিলেন। পিতার মৃত্যুর পর ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ মিশর হতে দামেশকে চলে আসেন। ইবনে কাছীর বলেন- তিনি যখন মিশর থেকে দামেশকে গেলেন তখন আব্দুল মালেক তাঁকে তাঁর পুত্রদের সাথে অবস্থান করাতেন। তাঁকে তাঁর পুত্রদের চেয়েও অধিক প্রাধান্য দিতেন।

---

[৯] ইবনুল জাওযি ২৭

[১০] ইবনে আব্দুল হাকাম ১৯-২০

ওমর বিন আব্দুল আজীজের চরিত্র

ওমর বিন আব্দুল আজীজ ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় ওমর নামে পরিচিত। তিনি চারিত্রিকভাবে ইসলামের একজন পূর্ণাঙ্গ অনুসারী ছিলেন। তিনি প্রজাহিতৈষী, ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মপ্রাণ খলিফা ছিলেন। তাঁকে উমাইয়া বংশের সাধুপুরুষ ও পঞ্চম খলিফা বলা হয়। ওমর বিন আব্দুল আজীজের চরিত্রের বিশেষ দিকগুলো নিচে তুলে ধরা হলো :

১. ন্যায়নিষ্ঠতা : ওমর বিন আব্দুল আজীজের ন্যায়বিচার, সরলতা, ধর্মের প্রতি অনুরাগ, অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা প্রভৃতি গুণে উমাইয়া সাম্রাজ্যের শাসকদের মধ্যে ছিলেন অতুলনীয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি উমাইয়া খলিফা না হয়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে আবির্ভূত হলে অধিক শোভনীয় হতো।

২. আদর্শবান : তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ ও নীতি অনুসরণ করে চলতেন। তাঁর নিজের এবং পরিবারের জীবন অত্যন্ত সাধারণ ছিল। তিনি ওমরের মতো তালিযুক্ত বস্ত্র পরিধান করতেন। তাঁর স্ত্রীর সমস্ত যৌতুক ও অলংকারসমূহ বিক্রয় করে তিনি বায়তুল মালে জমা দিয়েছিলেন। কারণ আব্দুল মালেক তা বাইতুল মাল হতে দিয়েছিলেন। রাজকীয় আড়ম্বর ও জাঁকজমক পরিহার করে চলতেন এবং সরকারি অশ্বশালার সমস্ত অশ্ব নিলামে বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাইতুল মালে জমা করেন। তিনি দৈনিক ব্যয়ের জন্য মাত্র দুই দিরহাম বাইতুল মাল হতে গ্রহণ করতেন।

৩. গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী : ওমর বিন আব্দুল আজীজ ধর্মশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তিনি কুরআন শরীফের হাফিয ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে কুরআন ও হাদিসের প্রতিটি অনুশাসন মেনে চলতে চেষ্টা করতেন। তাঁরই চেষ্টায় সিন্ধুদেশ, আফ্রিকা ও স্পেনে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য প্রচারক প্রেরণ করা হয়। তাঁর ধর্মানুরাগের জন্য তাঁকে মুজাদ্দিদ বা ধর্মসঞ্জীবক নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

৪. উদারতা : অমুসলমানগণও তাঁর উদার শাসনে পরিপূর্ণ জান-মাল ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত। উমাইয়া শাসনবিদ্বেষী খারিজিগণ তাঁকে ন্যায়সঙ্গত খলিফা বলে স্বীকার করত। সকল ধর্মশ্রেণি ও বর্ণের লোকদের মঙ্গল সাধন করাই খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজীজের লক্ষ্য ছিল।

৫. প্রজাবৎসল : তাঁর আমলে কৃষি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। পথিক ও হজযাত্রীদের সুবিধার জন্য তিনি সারাদেশে বহু সরাইখানা নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে প্রজাগণ এত সুখে-শান্তিতে বসবাস করত যে, যাকাত নেওয়ার মতো গরিব খুঁজে পাওয়া কষ্টকর ছিল। তবে মাত্র আড়াই বছরের খিলাফতকালে তিনি তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তব রূপ প্রদান করে যেতে পারেননি।

৬. সত্যবাদিতা : ওমর বিন আব্দুল আজীজ বলতেন, যখন আমি জানতে পারলাম, মিথ্যা বলা পাপ, তখন থেকে আমি কখনও মিথ্যা বলিনি। ওহাব ইবনে মুনবাহ বলেন, যদি এই উম্মতের কোনো মাহদী হতেন, তবে ওমর বিন আব্দুল আজীজই হতেন। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম সুরী (র.)-এর মতে, তিনি পঞ্চম খোলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন।

ধনী-দরিদ্র, আরব-অনারব, মুসলমান-অমুসলমান সকল শ্রেণির ও বর্ণ-ধর্মের প্রজাদের মঙ্গল সাধনই ছিল এ মহান খলিফার একমাত্র কর্তব্য। খলিফা দুস্থ ও গরিবদের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। অমুসলমানগণও তাঁর উদার শাসনে জান-মালের নিরাপত্তা লাভ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করত।

হাদিস সংকলনে ওমর বিন আব্দুল আজীজ

ওমর বিন আব্দুল আজীজের দুই বছরের সংক্ষিপ্ত শাসনামলে একটি বড় পদক্ষেপ ও কৃতিত্ব হলো হাদিসসমূহকে একত্রিত করা। মুহাম্মদ ﷺ-এর ওফাতের পর থেকে যখন কালক্রমে সহীহ হাদিস মুসলিমগণের ভেতর থেকে চলে যাচ্ছিল আর জাল হাদিসের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয় ঠিক তখন থেকে ওমর বিন আব্দুল আজীজ হাদিস সংকলনের নির্দেশ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রদান করে হাদিসের ইতিহাসে একটি মাইলফলক স্থাপন করেন। তিনি যে সকল কারণে হাদিস সংকলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করলেন তা হলো–

১। ইসলামি জীবনযাপন ও খিলাফতের হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য হাদিস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

২। যদি হাদিসসমূহ সংকলন না করা হয় তাহলে অনতিবিলম্বে মুসলিমগণের ভিতর থেকে হাদিস বিলুপ্তির আশঙ্কা দেখা দেয়। কারণ অনেক সাহাবা আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যায়।তাবিঈদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য ছিল। তারাও যে

অনেকদিন জীবিত থেকে হাদিস মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ রাখতে পারবে তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না।

৩। ব্যাপক আকারে জাল হাদিসের সয়লাব সমাজে বিস্তার করেছিল। কোন হাদিসটি সঠিক ও কোনটি বেঠিক তা নির্ধারণ করা দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই হাদিসের সত্য-মিথ্যা নিরূপণে এর প্রয়োজনীয়তা সকলে উপলব্দি করেছিল।

ওমর বিন আব্দুল আজীজ হাদিসকে লিপিবদ্ধ করার জন্য ধাপে ধাপে কিছু নীতিমালা গ্রহণ করেন। হাদিস সংকলনের জন্য তার কার্যক্রম নির্ধারণে গৃহীত নীতিমালাসমূহ নিম্নরূপ :

ক. বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের ফরমান জারি : ওমর বিন আব্দুল আজীজ হাদিসশাস্ত্রের এই অববিলুপ্তিকে রোধ করার জন্য যখন তা সংকলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন, তখন সেই কথা তিনি তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন শাসকবর্গের নিকট চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। তিনি যা বলেছিলেন তার ভাষা ছিল– "রাসূলের হাদিসের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা সংগ্রহ ও সংকলন করতে শুরু কর। তিনি তৎকালীন মদিনার শাসক আবু বকর বিন হাযমের কাছে এই পত্র প্রেরণ করেছিলেন যে, রাসূলের হাদিস, তাঁর সুন্নাত কিংবা ওমরের বাণী অথবা তার মতো কিছু পেলে তার প্রতি দৃষ্টি দাও এবং তা লিখে ফেল। কেননা আমি আশঙ্কা করছি যে, ইলমে হাদিসের ধারকদের অন্তর্ধান এবং হাদিস সম্পদের বিলুপ্তির আশঙ্কা বোধ করছি।"[২৫]

খ. আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত হাদিসসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য আহ্বান : ইবনে সয়াদ এই কথাও উল্লেখ করেছিলেন যে, ২য় ওমর আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর হাদিসসমূহ লিপিবদ্ধ করার জন্য আদেশ প্রদান করেছিলেন। আর ওমর বিন আব্দুল আজীজ ওমরা বিনতে আব্দুর রহমানের নিকট হতে বর্ণিত হাদিসসমূহ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। কেননা এই ওমর বিনতে আব্দুর রহমান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কোলে বিশেষভাবে লালিত-পালিত হন এবং তাঁর কাছ থেকে আকাইদ ও শরীয়তের আহকামের ব্যাপারে হাদিসসমূহ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। ওমর বিন আব্দুল আজীজ নিজেই এই ওমারার ব্যাপারে বলেছেন, আয়েশার বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে ওমারা থেকে বড় আলেম আর কেউ ছিল না।[২৬]

---

[২৫] সুনানে দারেমী, উদ্ধৃত, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী,), পৃ. ৩০২।

[২৬] ইমাম যুহরী, তাযকেরাতুল হুফফাজ, উদ্ধৃত, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী,), পৃ. ৩০৩।

ইমাম যুহরী বলেছিলেন, আমি তাঁকে হাদিস জ্ঞানের এক অফুরন্ত সমুদ্রের মতো পেয়েছিলাম।

কাসিম বিন আবু বকর ছিলেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ভাতিজা। তাঁর পিতা যখন নিহত হন তখন তিনি তাঁর ফুফু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর নিকট লালিত-পালিত হন এবং তাঁর কাছে থেকে দীন জ্ঞান অর্জন করেন। এই কাসিম বিন আবু বকরের ব্যাপারে ইবনে হাব্বান বলেন, কাসিম তাবিঈ এবং তাঁর সময়কার লোকদের মধ্যে হাদিস ও দীনের জ্ঞানের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ছিলেন।

তিনি সে সময়ে মদিনার একজন প্রধান ফকীহ ছিলেন এবং ইসলামি আইন-কানুনে তাঁর নিকট অতুলনীয় পারদর্শিতা ছিল। ওমারা বিনতে আব্দুর রহমানের নিকট বর্ণিত যাবতীয় হাদিস তিনি লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। এভাবে করে তিনি অসংখ্য হাদিস লিপিবদ্ধ করেছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা খলিফার মৃত্যুর আগে দারুল খিলাফতে পৌছানো সম্ভব হয় নি। যদিও কেউ বলে থাকেন যে, পরবর্তীতে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়। মূলত তা সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে হাদিসের বিকাশে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

গ. ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যাকাতসংক্রান্ত হাদিস সংগ্রহে দিক-নির্দেশনা : হাযম বিন আবু বকর ছাড়াও ২য় ওমর সেই সময় সালিম বিন আব্দুল্লাহকে হাদিস সংকলনের দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। আল্লামা সুয়ূতী লিখিছেন যে, ওমর বিন আব্দুল আজীজ সালিম বিন আব্দুল্লাহকে ওমরের যাকাত ও সদকা সম্পর্কে অবলম্বিত রীতি-নীতি লিখে পাঠানোর জন্য আদেশ করেছিলেন।

সুয়ূতী সালিম সম্পর্কে লিখেছিলেন, সালিম যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছিলেন তা তিনি পুরোপুরি লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সাথে সালিম তাকে এটাও লিখিছিলেন যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার আমলেও তদান্তীন লোকদের মধ্যে অনুরূপ কাজ করেন তবে আপনি আল্লাহর নিকট ওমর ফারূক থেকে উত্তম বলে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আনসারী বলেন, ওমর বিন আব্দুল আজীজ যখন খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হলেন,তখন মদিনায় রাসূলে করীমের ও ওমরের যাকাতসংক্রান্ত দস্তাবেজ সংগ্রহের জন্য তাকিদ করে পাঠালেন। পরবর্তীতে আমর বিন হাযমের বংশ এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বংশধর থেকে দস্তাবেজ পাওয়া গেল।

ঘ. ইমাম যুহরীকে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ : ওমর বিন আব্দুল আজীজ ইমাম যুহরীকে হাদিস সংকলনের জন্য বিশেষভাবে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। ইমাম যুহরীর ব্যাপারে স্বয়ং ওমর বিন আব্দুল আজীজ নিজেই বলেছেন, সুন্নাত ও হাদিস সম্পর্কে যুহরীর থেকে বড় আলেম বিগত কালে আর কেউ ছিলেন না। এ

সম্পর্কে ইমাম ইবনে যুহরী (র.) বলেন, ওমর বিন আব্দুল আজীজ আমাদেরকে হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য আদেশ করলেন। এ আদেশ পেয়ে আমার হাদিস গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়, তারপর তা তাঁর রাজ্যে পাঠানোর পর রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রদেশে একখানি গ্রন্থ পাঠিয়ে দেন। এটি যে সর্বপ্রথম সংকলিত হাদিস তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই ইমাম মালেক (র.) বলেন, সর্বপ্রথম যিনি হাদিস সংকলন করেন তিনি হলেন ইবনে শিহাব যুহরী। ইমাম ইবনে যুহরী নিজেই স্বীকার করে বলেছেন, আমার পূর্বে কারো দ্বারা হাদিস সংকলিত হয়নি।[২৭]

ঙ. খলিফার নিজের পক্ষ থেকে হাদিস সংকলন : হাদিস শিক্ষা দান করার পাশাপাশি ওমর বিন আব্দুল আজীজ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুদ্ধ-বিগ্রহের শিক্ষা-দীক্ষা এবং চরিত্র গঠনের শিক্ষা দেওয়ার জন্য দামেশকের জামে মসজিদে বসে ওমর কাতাদাহকে প্রেরণ করেছিলেন। ওমর বিন আব্দুল আজীজ শুধু হাদিস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন নি; বরং তার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার জন্য সুস্পষ্টভাবে ফরমান জারি করেছিলেন। তিনি একজন শাসকের কাছে এই ফরমান জারি করেছিলেন যে, প্রত্যেক বিদ্বান ব্যক্তি যেন হাদিসের সুশিক্ষা সকলের নিকট যথাযথভাবে পৌছিয়ে দেয়। তা না হলে হাদিসের শিক্ষার অস্তিত্বকে তিনি হুমকিস্বরূপ মনে করতেন। ওমর বিন আব্দুল আজীজ শুধু সকলকে হাদিস সংগ্রহের জন্য তাগিদ দেন নি; বরং তিনি নিজেও হাদিস সংকলন করতেন। তার হাদিস সংকলনের ব্যাপারে এমন দৃষ্টান্ত আছে যে, তিনি একবার যোহরের নামাযের সময় মসজিদ গমন করেন এবং বের হন আসরের নামাযের সময়। তখন তাঁর হাতে বেশকিছু দস্তাগত কাগজ ছিল যার ভেতর আউন বিন আব্দুল্লাহর বর্ণিত হাদিস লিপিবদ্ধ হয়।[২৮]

ইন্তেকাল

উমাইয়া বংশের লোকেরা ওমর বিন আব্দুল আজীজের দ্বারা খুব বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ তিনি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, তাদের লুণ্ঠিত সম্পদ জনগণকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যদি ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ আরো কিছু দিন জীবিত থাকতেন তবে বনু উমাইয়ার লোকদের বিপদ আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পেত। বিশেষত ইয়াযিদ ইবনে আব্দুল মালেকের এ আশঙ্কা ছিল যে, ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ তাকে পদচ্যুত করে তার পরিবর্তে অন্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করে যাবেন। যদিও সুলায়মানের অসিয়তক্রমেই ইয়াযিদ ইবনে

---

[২৭] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী,), পৃ. ৩০৬।
[২৮] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী,), পৃ. ৩০৭।

আব্দুল মালেক যুবরাজ নিযুক্ত হয়েছিলেন। পূর্ববর্তী খলিফার কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা যদিও খুব কঠিন কাজ ছিল কিন্তু তবুও ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এটা খুব অসম্ভব ছিল না যে, তিনি ইয়াযিদকে পদচ্যুত করে কোনো সৎ ও নিষ্ঠাবান লোককে খলিফা নিযুক্ত করে যাবেন। এ আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত ইয়াযিদকে খলিফার বিরুদ্ধে এক হীন ষড়যন্ত্র করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সে তাঁকে খাদ্য বা পানীয়ে বিষ মিশিয়েছিল। এ বিষক্রিয়ায় তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ থেকে ইন্তেকাল করেছেন।

ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাঁর সন্তানদেরকে ডেকে এনে তাদের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করলেন। ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছিল তখন তাঁর স্ত্রী ফাতিমা ও শ্যালক মুসলিমা তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, তোমরা আমার নিকট হতে সরে যাও। কারণ আমার বিপুলসংখ্যক সৃষ্টিজীব এসে ভিড় করছে, তারা মানুষ অথবা জিন কিছুই নয়। মহান আল্লাহই জানেন, এরা কি আল্লাহর ফেরেস্তা না অন্য কোনো অদৃষ্ট সৃষ্টি যারা ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের অন্তিম মুহূর্তে তাঁর নিকট এসে ভিড় জমাচ্ছিলেন।

অতঃপর মুসলিমা এবং স্ত্রী ফাতিমা তাঁর কথা অনুযায়ী অন্য কক্ষে চলে গেলেন, সেখান হতে তারা শুনলেন, কে যেন পাঠ করতেছে- "যারা দুনিয়ার মান মর্যাদার কামনা করে না বিপর্যয় ঘটাতে চায় না, তাদের জন্যই আমরা সেই পারলৌকিক গৃহের ব্যবস্থা করব।" এরপর সে আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে গেল। ফাতিমা, মুসলিমা ও অন্যান্য পরিচর্যাকারীরা কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন যে, মুসলিম বিশ্বের মহামানব পঞ্চম খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র.) দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট চলে গেছেন। এ দিন ছিল ১০১ হিজরির জুমার রাত। তখনও রজব মাসের পাঁচদিন অথবা দশ দিন বাকি। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৯ বা ৪০ বছর এক মাস। তিনি সর্বমোট দু'বছর ৫ মাস খিলাফতের পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছেন।[২৯]

---

[২৯] রশীদ আখতার নদভী, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ- ইসলামী শাসনের বাস্তবচিত্র, মাওলানা আবুল বাশার অনূদিত, (ঢাকা : খন্দকার প্রকাশনী), পৃ. ২২৩।